

শ্রীশ্রীগুরুগৌরান্দৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

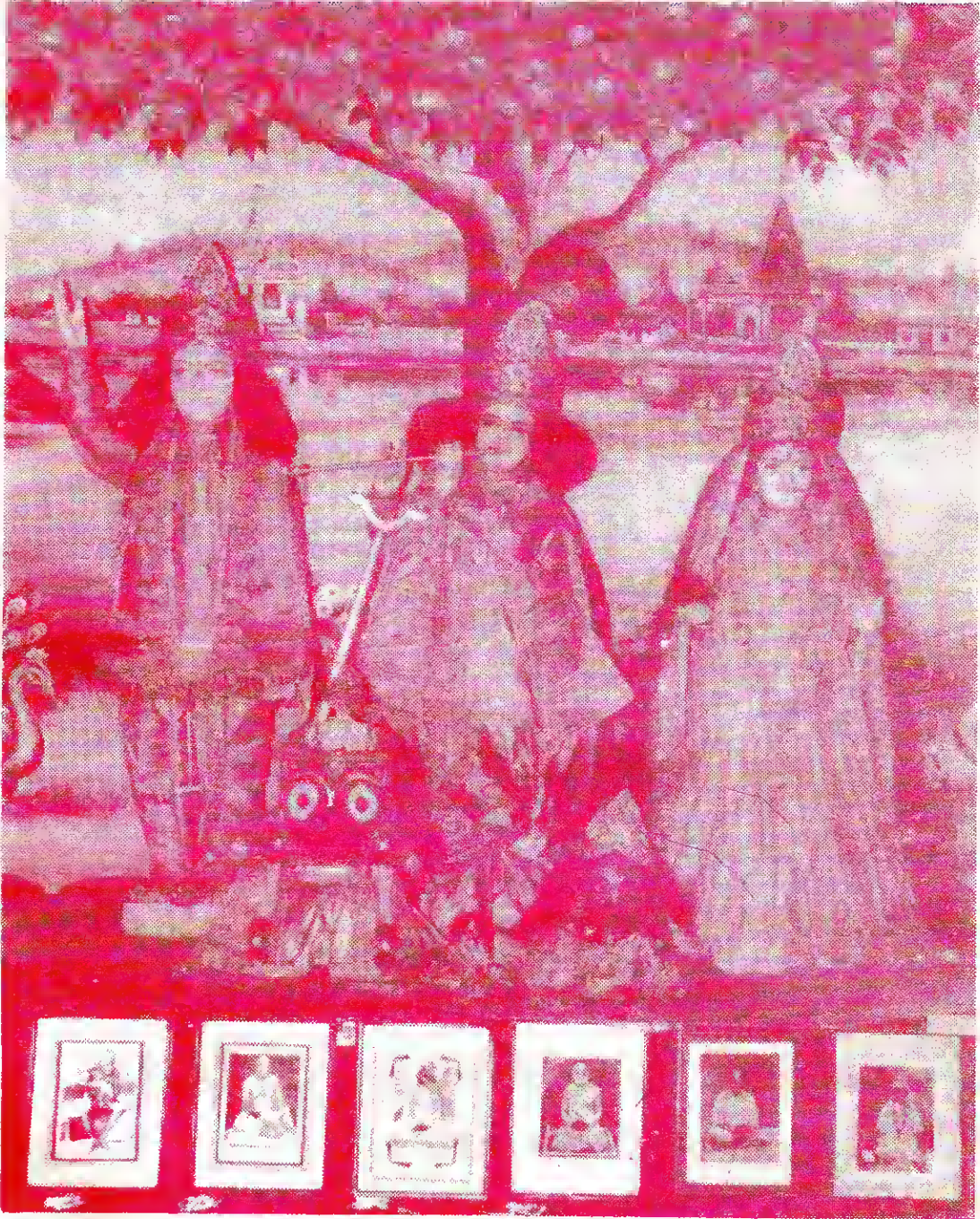
৪৮শ বর্ষ

}

মাঘ, ১৪০৬

{

১২শ সংখ্যা



শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে সেবিত শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

যুগ্ম-সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

—: কার্যালয় :—

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ফোন: ৫৫৫-৮৯৭৩

২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৪

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার.

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ঔ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত পর্যটক মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বোধায়ন মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি.এ, বি.টি. কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি.এ.

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিত্বষণ

শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, সেবারত্ন

শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন

(ত্রিদণ্ডিস্বামী) শ্রীভক্তিবাদান্ত আচার্য্য (মহারাজ)-কর্তৃক শ্রীদেবানন্দ
গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও

নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

[মাসিক]

অষ্টচত্বারিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগোরাঙ্গ ৫১০ বিষ্ণু হইতে ৫১০ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৪০২ ফাল্গুন হইতে ১৪০৩ মাঘ,
খ্রষ্টাব্দ ১৯২৬ মার্চ হইতে ১৯২৭ ফেব্রুয়ারী ।]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিপ্ৰজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত আচার্য মহারাজ
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমন্তক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি.এ, বি.টি. কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি.এ.

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ

শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, সেবারত্ন

শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন

(ত্রিদণ্ডিস্বামী) শ্রীভক্তিবাদান্ত আচার্য্য (মহারাজ)-কর্তৃক শ্রীদেবানন্দ

গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও

নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

অষ্টচত্বারিংশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার

প্রবন্ধাদির সূচীপত্র

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
“অমৃতস্য পুত্রাঃ”	১।২০
অমল শ্রীপুরুষোত্তম-মাস	৫।১৮০
অপ্রাকৃত-দীনতা হীনতা নহে	৬।২৩৩, ৭।২৬৫
অসংসঙ্গ কেন সংসঙ্গ ?	৯।৩৩৪
অধিকারানুরূপই শাস্ত্রব্যবস্থা	১১।৪০২
অর্চন	১১।৪১৬
আচার ও প্রচার	১২।৪৪২
আবির্ভাব [কবিতা]	৮।৩০৭
আমার নিজের কথা [কবিতা]	১১।৪২৪
উত্তমা ভক্তি	১।১৭, ২।৪২
কুঞ্জবিহার্যষ্টকম্—শ্রীশ্রী	৫।১৬১
কৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	৩।১১২
গীতার প্রথম অধ্যায়ের আবশ্যকতা কি ?	৭।২৫৫
গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা—শ্রীল [দামোদর-ব্রতে	
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত]	২।৭২, ৩।১১৫, ৪।১৫৩, ৫।১৯৩,
	৭।২৭৫, ৮।৩১০, ৯।৩৪২, ১০।৩৯৪, ১১।৪৩১, ১২।৪৬০
গুরু-সেবা	১০।৩৮৮
গুরুতত্ত্ব—শ্রী	১২।৪৫২
গেরুয়া বসন	১০।৩৭৭
গৌরধাম—শ্রী [কবিতা]	১।২৮
গৌড়ীয়-স্তোত্র-রত্নমালা—শ্রী [বিজ্ঞাপন]	৯।৩২৮
গৌরান্দ-স্তবকল্পতরুঃ—শ্রী	১০।৩৬১
চৈতন্যবাণী প্রচারোদ্দেশে পাশ্চাত্যযাত্রা—শ্রী [বিজ্ঞাপন]	২।৮০
জগন্নাথষ্টকম্—শ্রীশ্রী	৪।১২১
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৪।১৫৯

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাক
জগন্মোহনাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	১২/৪৪১
জন্মাষ্টমী-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ]	২/৩৫৬
জীবের কৃত্য	১/২৫, ২/৬০, ৩/১০৩, ৪/১৪৪, ৬/২২৬, ৭/২৫২, ৮/৩০৩, ৯/৩৩৮, ১০/৩৮১, ১১/৪২৫
ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৬/২৩৯
ঝুলনযাত্রা—শ্রী	৯/৩৪৬
তুর্গাদেবী	১১/৪২০
ধর্ম ও বিজ্ঞান	১/৪, ২/৪৪
নবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	২/৪১
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	২/৭৭
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১২/৪৭৩
নাম-প্রভুর চরণে প্রার্থনা—শ্রী [কবিতা]	৩/১০৭
নিরপেক্ষতা ও পক্ষপাতিত্ব	৬/২১৩
নিরপেক্ষতা	৬/২৩০, ৭/২৬৯
নূতন খেলা [কবিতা]	১০/৩৮৫
পত্রিকার নববর্ষ-প্রবেশ—শ্রী	১/৩৪
পাপ ও অপরাধ	৪/১৩৬
পাশ্চাত্যে প্রচার-যাত্রায় শ্রীশ্রীল সত্যাপতি-মহারাজের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন	৪/১৩১
পাশ্চাত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম-প্রচার [বিবরণ]	৮/৩১৭, ১১/৪৩৫
প্রগতি-প্রশ্নাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের ব্যাসপূজা-বাসরে	১২/৪৫৬
প্রভুপাদের হরিকথামৃত—শ্রীল	১/৮, ২/৪৭, ৩/৮৭, ৪/১২৮, ৫/১৬৭, ৬/২০০, ৭/২৫০, ৮/২৮৮, ৯/৩২৯, ১০/৩১৯, ১১/৪০৭, ১২/৪৪৭
প্রশ্নোত্তর [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৩/৮৪, ৪/১২৪, ৫/১৬৩, ৬/২০৪, ৭/২৪৫, ৮/২৮৪, ৯/৩২৪, ১০/৩৬৫, ১১/৪০৩, ১২/৪৪৩
প্রেমিক ভক্তের কৃপাতেই প্রেমপ্রাপ্তি	৫/১৬৯, ৬/২০৯, ৭/২৫১

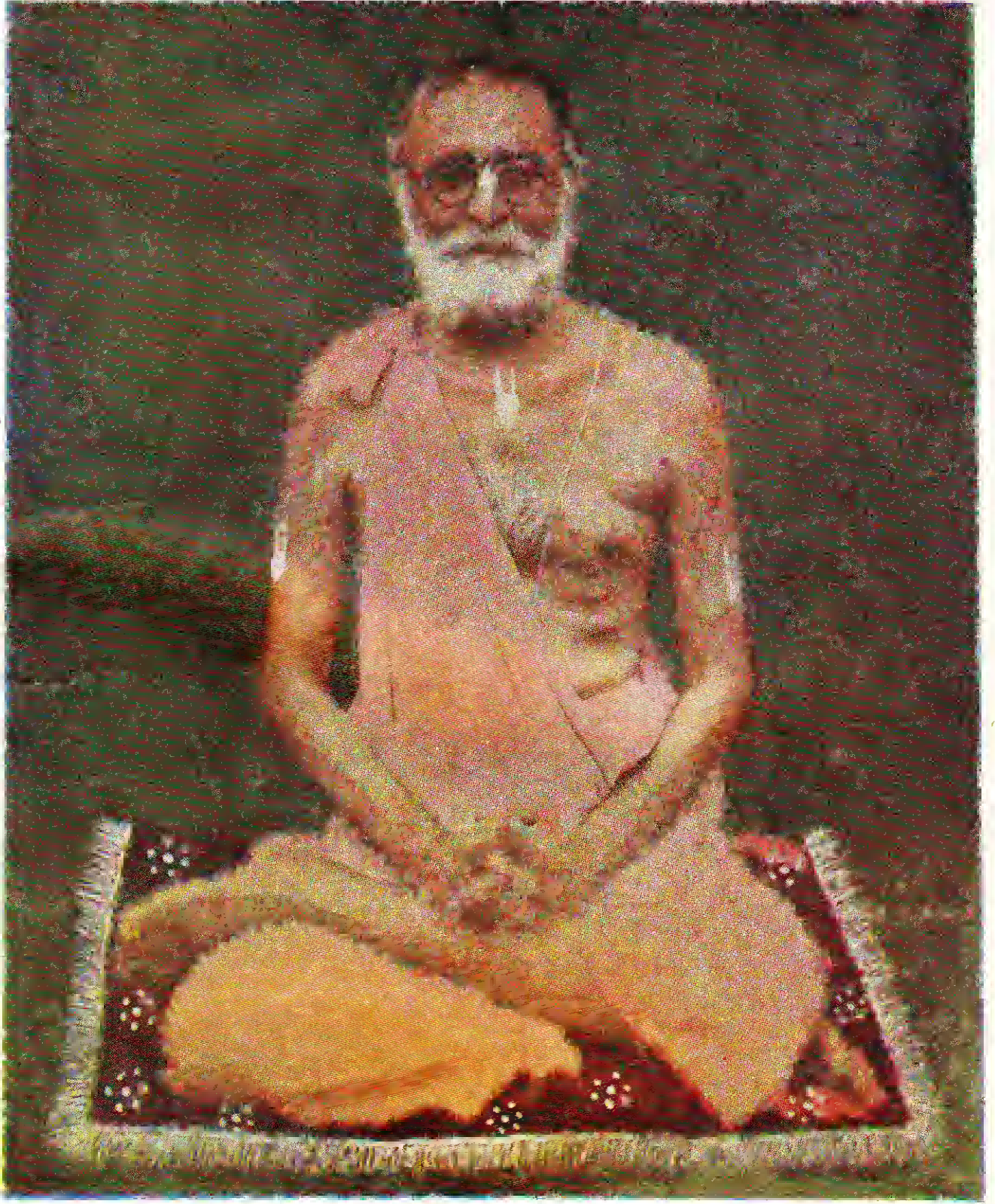
প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
বিশ্বশান্তিতে আর্থবিচার	১।১০
বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব—শ্রী [শ্রীকৃষ্ণের গোড়ীয় মঠে]	১।৩৮
বিশেষ নিবেদন	১।৩৯, ২।৮০
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি [বিজ্ঞাপন]	১২।৪৬৮
বিষয় ও বিষয়ী	৩।২৪
বিরহিণী শ্রীরাধিকা (রাসান্তে) [কবিতা]	৬।২৩৭
বাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী	১০।৩২২
বাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী	১১।৪৪০
বাসপূজা-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	১২।৪৬৯
ভবঘুরের ভণিতা	২।৬৮, ৪।১৪৯
ভক্তি-অর্থ্য [শ্রীমন্নহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে]	২।৫৫, ৩।২৯
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব—	
শ্রীমদ্ [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৮।৩১৯
ভ্রম-সংশোধন	৮।৩১৬
মহাপ্রভুর ধর্মের সহজ-বিকাশ ?— শ্রীমন্	৪।১৩২
মহাপ্রভুর পারতমত্ব — শ্রীমন্	১০।৩৭১
মায়ামুগ্ধগণেরই বহু দেবযজ্ঞ	৫।১৭৪
মাধুর্য্য-কাদম্বিনী [বিজ্ঞাপন]	১২।৪৭২
মুকুন্দ-মুক্তাবলী— শ্রীশ্রী	৬।২০১, ৭।২৪১, ৮।২৮১
মুকুন্দাষ্টকম্ শ্রীশ্রী	৯।৩২১
যুগপর্য্যয়ে সত্যের অবনতি	৯।৫৩০
রাধা-বিনোদবিহারি-তত্ত্বাষ্টকম্— শ্রীশ্রী [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব]	১।১
রামচন্দ্রাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	৩।৮১
ললিতোক্ততোটকাষ্টকম্—শ্রী	১১।৪০১
শ্যামে রাই [কবিতা]	৭।২৭৩
শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি [কবিতা]	৯।৩৪৩
শ্রীক্ষেত্র নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথের মনোরথ-প্রকাশ-মাহাত্ম্য	১।১৮৮, ৬।২১৮
ষড়্গোস্বামীর অবদান বৈশিষ্ট্য	১।২৯, ২।৬৪, ৩।১০৯, ৪।১৩৯
সনাতনধর্ম ও শ্রীবিগ্রহ	৩।৮৯
সদাচার ও কদাচার	৮।২৯৬ (২৮৬)

ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ	ସଂଖ୍ୟା ଓ ପତ୍ରାଙ୍କ
ସାଧୁସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀବ୍ରଜ ଓ ଦ୍ଵାରକାଧ୍ୟାୟ ତୀର୍ଥାଦି ଦର୍ଶନ	୧।୧୨୨
ସ୍ଵଧାୟେ ଶ୍ରୀଘୋଷାନନ୍ଦନ ବ୍ରଜବାସୀ ପ୍ରଭୁ	୮।୩୧୧
ସ୍ଵଧାୟେ ଶ୍ରୀପାଦ ଅଚିନ୍ତ୍ୟଗୌର ବ୍ରଜବାସୀ ପ୍ରଭୁ	୨।୩୧୨
ହରିନାମ ନାର [କବିତା]	୧।୩୩
ହରେନାମେବ କେବଳମ୍	୩।୧୧୨
କୃଷିକର ଅର୍ପିତ	୨।୧୩
VOX POPULI, VOX DEI	୧।୨୨୦ (୨୮୦)
Statement about Shri Goudiya-Patrika	୧।୮୦

ଶ୍ରୀଗୌଡ଼ୀୟ-ପତ୍ରିକାର

ଆଜ୍ଞାପନ ସଦସ୍ୟାଗଣର ତାଲିକା (୧୯୯୬)

- ୧ । ଶ୍ରୀରଘୁନାଥ ହାଲଦାର, ଗ୍ରା: ଜୟନଗର କାମାରି ପାଢ଼ା,
ପୋ: ଜୟନଗର ମଞ୍ଜିଲପୁର (୨୪ ପରଗଣା ଦକ୍ଷିଣ) ।
- ୨ । ଶ୍ରୀଦେବବ୍ରତ ମୌନିକ, ବଡ଼ାଳ କଳାବାଗାନ, ପୋ: ବଡ଼ାଳ
(୨୪ ପରଗଣା ଦକ୍ଷିଣ) ।
- ୩ । ଶ୍ରୀନାରାୟଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସାଧିକାରୀ, ପଶ୍ଚିମପାଢ଼ା, ପୋ: ବେଗମପୁର (ହଗଲୀ) ।
- ୪ । ଶ୍ରୀସୁଧିଷ୍ଠିର ହାଲଦାର, ବହରମପୁର (ମୁର୍ଶିଦାବାଦ) ।
- ୫ । ଶ୍ରୀତାରାପଦ ମଞ୍ଜୁଳ, ୧, ଦୀକ୍ଷିତ ପାଢ଼, ପୋ: କ୍ୟାନିଂ
(୨୪ ପରଗଣା ଦକ୍ଷିଣ) ।



ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরমর ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন ।

অন্য ধর্ম সূত্ররূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই ভ্রম ॥

১৮৮৭ বর্ষ } ২ বিষ্ণু, কারণোদশায়ী, ৫১০ শ্রীগোরাঙ্গ
৩০ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৪০২, ইং ১৪/৩/৯৬ } ১ম সংখ্যা

সামুবাদঃ

শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারি-তত্ত্বাষ্টকম্

[পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যেণাষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমতা

ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি-মহারাজেন বিরচিতম্]

(শ্রীকৃষ্ণ গোর-কান্তি-প্রাপ্তি-হেতুঃ)

রাধা-চিন্তা-নিবেশেন যস্য কান্তিবিলোপিতা ।

শ্রীকৃষ্ণচরণং বন্দে রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহম্ ॥ ১ ॥

শ্রীমতী রাধাশ্রীরাধার অভিমান হইলে তাঁহার বিরহে অত্যন্ত চিন্তা-নিবেশের দ্বারা ঐহার কৃষ্ণবর্ণ-কান্তি বিলুপ্ত হইয়া শ্রীরাধার গায় হইয়াছিল, আমি সেই রাধাচিহ্নিত-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মকে বন্দনা করি । অথবা মানভঙ্গে শ্রীরাধাকর্তৃক আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের বন্দনা করি ॥ ১ ॥

সেবা-সেবক-সন্তোগে দ্বয়োভেদঃ কুতো ভবেৎ ।

বিপ্রলস্তে তু সর্বস্য ভেদঃ সদা বিবর্তিতে ॥ ২ ॥

সেবা অর্থাৎ ভোক্তা-ভগবান্ যখন ভোগ্য সেবকের সহিত মিলিত হইয়া সম্যক্রূপে তাহাকে ভোগ করেন, তখন ভেদ কোথায় থাকে ? (অর্থাৎ ভেদ থাকে না—অভেদ বলিয়া গণ্য হয়) । পক্ষান্তরে, বিপ্রলস্ত অর্থাৎ বিরহ উপস্থিত হইলে কিন্তু সকলের মধ্যেই ভেদ সর্বদা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে ॥ ২ ॥

চিল্লীলা-মিথুনং তত্ত্বং ভেদাভেদমচিন্ত্যকম্ ।

শক্তি-শক্তিমতোরৈক্যং যুগপদ্বর্ততে সদা ॥ ৩ ॥

শক্তি ও শক্তিমানের ঐক্য-স্বরূপ চিল্লীলা-মিথুন-তত্ত্ব নিত্যকাল অচিন্ত্য-ভেদাভেদরূপে যুগপৎ অবস্থিত । অর্থাৎ, পরতত্ত্ববস্ত্ত কখনও নিঃশক্তিক নহেন । সেই তত্ত্বে শক্তি ও শক্তিমান্ একত্বরূপে নিত্য বর্ত্তমান । তিনি পূর্ণ চেতনময় লীলাপুরুষোত্তম, স্বয়ং মিথুন-বিগ্রহ, অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের (শক্তি-শক্তিমানের) সম্মিলিত বিগ্রহ । সেই মিথুন-বিগ্রহই শ্রীরাধাকৃষ্ণ বা গৌরতত্ত্ব । তাহাতে ভেদ ও অভেদস্বরূপ এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে যুগপৎ নিত্য বর্ত্তমান ॥ ৩ ॥

তত্ত্বমেকং পরং বিচাল্লীলয়া তদ্বিধা স্তিতম্ ।

গৌরঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ং হ্যেতদ্ব্যভাবুভয়মাপ্নুতঃ ॥ ৪ ॥

পরতত্ত্বকে ‘এক’ বলিয়া জানিবে । কিন্তু সেই এক তত্ত্ববস্ত্ত লীলাদ্বারা দুই প্রকারে অবস্থিত ; যথা—শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণ । তাঁহারা স্বয়ং সেই তত্ত্ববস্ত্ত । অথবা তত্ত্বতঃ শ্রীগৌরই স্বয়ং কৃষ্ণ এবং উভয়ই উভয়তা প্রাপ্ত হন । অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণসুন্দর হন, এবং শ্রীকৃষ্ণসুন্দরও আবার শ্রীগৌরসুন্দর হন ॥ ৪ ॥

সর্ব বর্ণাঃ যত্রাবিষ্টাঃ গৌর-কান্তিবিকাশতে ।

সর্ব বর্ণেন হীনস্ত কৃষ্ণ-বর্ণঃ প্রকাশতে ॥ ৫ ॥

[এস্থলে আধুনিক জড়-বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তদ্বারা শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-উপাস্ত-তত্ত্বদ্বয়ের নির্দেশ করা যাইতেছে :—]

যে-স্থলে সমস্ত বর্ণের (রং এর) একত্র সমাবেশ হয়, সে-স্থলে গৌর-কান্তির বিকাশ হইয়া থাকে । যেমন, সূর্য্যে যাবতীয় রং থাকায় তাঁহার বর্ণ গৌর । অপর পক্ষে, যে-স্থলে সমস্ত বর্ণের হীনতা বা অভাব হয়, অর্থাৎ কোনও রং-ই থাকে না, সে-স্থলে ‘কৃষ্ণ’ বা ‘কাল’ প্রকাশ হইয়া পড়ে । (যেহেতু বৈজ্ঞানিকমতে ‘কাল’ কোনও রং নহে ।) ॥ ৫ ॥

সগুণং নিগুণং তত্ত্বমেকমেবাদ্বিতীয়কম্ ।

সর্ব-নিত্য-গুণৈর্গৌরঃ কৃষ্ণো রসস্ত নিগুণৈঃ ॥ ৬ ॥

[উক্ত পূর্বশ্লোকের 'বর্ণ'কে এই শ্লোকে 'গুণ'-শব্দের সহিত উপমা দিয়া বা তুলনা করিয়া শ্রীগৌর ও কৃষ্ণের তুল্য-উপাস্তত্ব প্রদর্শিত হইতেছে :—]

সগুণ ও নিগুণ-তত্ত্ব একই এবং অদ্বিতীয় । যাবতীয় নিত্য সদগুণের সমষ্টি-দ্বারা শ্রীগৌরহৃদর এবং নিগুণে অর্থাৎ সর্বপ্রকার গুণহীনতায় শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ । অর্থাৎ সেই বস্তু স্বয়ং রস ; রস নিগুণ অপ্রাকৃত । উহা কখনও প্রাকৃত নহে ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণং মিথুনং ব্রহ্ম ত্যক্ত্বা তু নিগুণং হি তৎ ।

উপাসতে মৃষা বিজ্ঞাঃ যথা তুষাবঘাতিনঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বা গৌর মিথুন-ব্রহ্ম । তাঁহাকে (বা তাঁহার ভজন) পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যাজ্ঞানিগণ বা অজ্ঞগণ তুষ পেষণকারিগণের ন্যায় নিগুণ-ব্রহ্মের বৃথা উপাসনা করে । অর্থাৎ তুল প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় তুষাবঘাতিগণ যেরূপ বৃথা শ্রম করে, সেইরূপ জ্ঞানিগণ কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিয়া নিগুণ ব্রহ্মের বৃথা উপাসনাদ্বারা শ্রম স্বীকার করে ; অর্থাৎ তদ্বারা প্রকৃত মোক্ষ কখনও হইবে না ॥ ৭ ॥

শ্রীবিনোদবিহারী যো রাধয়া মিলিতো যদা ।

তদাহং বন্দনং কুর্য্যাম্ সরস্বতী-প্রসাদতঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীবিনোদবিহারী কৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার সহিত মিলিত হন, শ্রীল সরস্বতী-প্রসাদে অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমি তখন যথাবিধি তাঁহাদের বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

ইতি তত্ত্বাষ্টকং নিত্যং যঃ পঠেৎ শ্রদ্ধয়াস্থিতঃ ।

কৃষ্ণ-তত্ত্বমভিজ্ঞায় গৌরপদে ভবেন্মতিঃ ॥ ৯ ॥

যিনি এই তত্ত্বাষ্টক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া নিত্য পাঠ করিবেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইতে পারিবেন এবং শ্রীগৌরপদে তাঁহার মতি হইবে ॥ ৯ ॥

ধর্ম ও বিজ্ঞান

চিৎ ও জড়ের সমন্বয় অসম্ভব

কোন খ্রীষ্টিয়ান পণ্ডিত একখানি ইংরাজী পত্রিকায় লিখিয়াছেন :—বর্তমান বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সহিত ধর্মভাবের সামঞ্জস্য যে-প্রকার উচ্চজীবন-প্রার্থীদিগের নিকট গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়াছে এমন আর কিছুই নহে। সদস্য নির্দ্বারিত বুদ্ধি কি-প্রকারে মানবের জড়মূলক সিদ্ধান্তের সহিত একত্রাঙ্গান করিতে পারে এবং কিরূপেই বা মনুষ্যের উচ্চ অর্থাৎ অপ্রাকৃত জীবন জড়বিজ্ঞান-নির্দ্বারিত মানবের জড়মূলকস্বনাধক সিদ্ধান্তের সহিত যুগপৎ স্বীকৃত হইতে পারে, এই দুইটী প্রমেয় তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের হৃদয়কে অবশ্য উদ্ভিন্ন করিতে থাকিবে। পারমাণবিক-বুদ্ধি এবং জড়বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি এতদূতয়ের মধ্যে একটি বিবদমান ভাব আছে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। জীবননির্গমস্থলে এই বিবদমান ভাবটী নিত্যবর্তমান, প্রেম-চেষ্টাস্থলে জ্ঞানচেষ্টাকে স্থাপন করিবার বাসনা চইতে উৎপন্ন হয়।

জীব জড়বস্তু হইতে পৃথক ও ইচ্ছাশক্তি-চালনে সমর্থ

নরজীবনের জড়মূলক সাধকভাবে সদস্য বিচার এবং ধর্মভাবের সহিত তাহার কতদূর সম্বন্ধ ইহা স্থির করিতে গেলে যে কোন-প্রকার লাভ হইবে না, তাহা নয়। বরং সমস্ত মানবের পক্ষে এই অনুসন্ধানটী নিত্যান্ত প্রয়োজনীয়। সর্বকালে এবং সর্বদেশে একাল পর্যন্ত যত প্রকার সামাজিক ব্যবস্থা হইয়াছে, সে সমুদয়ই একটি বিশ্বাসের উপর অবস্থিত। বিশ্বাসটী এই যে, মানব একটি আধ্যাত্মিক পদার্থ এবং তাহার স্বতন্ত্র ইচ্ছানুসারে মানসিক ও শারীরিক শক্তিসালন করিতে সক্ষম। আধুনিক বিজ্ঞান এই বিশ্বাসকে দূর করিয়া তাহার স্থলে সেই বিশ্বাস হইতে বিলক্ষণ আর একটি বিশ্বাসকে আনিয়া স্থাপন করিতে চান।

জড় হইতে চেতনের সৃষ্টি অত্যন্ত অসম্ভব

তাহার প্রস্তাবিত ভাব এই যে, মন এবং শরীরের শক্তিসমূহ হইতে একটি জড়যন্ত্রের দ্বারা মানব সৃষ্ট হইয়াছে। এই দুইটী ভাবের অত্যন্ত পার্থক্য লক্ষিত হইবে। শেবোক্ত ভাবটী স্বীকার করিতে গেলে ধর্ম ও সংস্কারের প্রাচীন মন্দির কেবল ভগ্ন করিয়া ফেলা হয়। এমত নয়, কিন্তু তাহাদের প্রতীতি অমূলক ছবির দ্বারা এককালে তিরোহিত করিয়া দেওয়া হয়। সদস্য চিন্তা, বিচার, দয়া, আশা এবং ক্ষমা যাহা সম্প্রতি আমাদের সম্বন্ধে গম্ভীর সত্যরূপে প্রতীত আছে, সে-সমস্ত এককালে অপুষ্ণের দ্বারা অমূলক প্রতীচ্ছায়াভাবে পরিণত হইয়া পড়ে। সলোক ও অসলোকের মধ্যে পার্থক্যবুদ্ধি একেবারে উঠিয়া যায়। নরভোজী রাক্ষস এবং পরোপকারী যীশুখ্রীষ্ট উভয়ই জড়ীয় পূর্বভাবের জড়সত্ত্বত্বরূপে প্রতীয়মান হয়।

তাহার মাধ্যাকর্ষণবলনিষ্কিপ্ত পর্বত হইতে নিপতিত প্রস্তর ফলকের তায় জড়ভাব-বিশেষ হইয়া পড়ে, তাহাদের প্রশংসা ও নিন্দা এবং তাহাদের প্রতি রাগ-দ্বेष কিছুই আবশ্যক হয় না। ডারউইন, টিণ্ডল, হাক্সলি প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পুরুষগণের গ্রন্থ আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, তাহাদের মত এইরূপ বিকৃত সিদ্ধান্তকে ভয় করে না।

তর্কশূন্যে বিজ্ঞান ও আত্মার অবিরোধ হইলেও প্রতিদ্বন্দ্বী

নরজীবনের অন্তরঙ্গ রহস্য নির্ণয়স্থলে প্রাপ্ত জড়মূলক মতকে সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস করিলে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের হাত হইতে রক্ষা পাইবার আর উপায় নাই। মনুষ্য যে কেবল জড়জাত যন্ত্রবিশেষ ইহাই মাত্র মানিয়া লইতে হয়, ইহা না মানিলে আর জড়বাদীদিগের অগ্রগামী হইবার পথ দেখা যায় না। এস্থলে মরল জিজ্ঞাসু-দিগের কর্তব্য এই যে, তাহারা জড়বাদীদিগকে তাহাদের নিজ সিদ্ধান্ত ভাল করিয়া বিচার করিতে বাধ্য করান এবং তাহাদের নিকট হইতে স্পষ্টবাক্যে আমরা সত্য বলিলাম কিনা ইহার উত্তর গ্রহণ করুন। কয়েক বৎসর পূর্বে লুএলিন্ ডেভিস্ নিজ প্রবন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

মনে করা যাউক যে বিজ্ঞান এবং আত্মার তত্ত্বের বিরোধ না থাকিলেও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে।

জড়বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা আত্মাতাত্ত্বিক শ্রদ্ধের

এখন দেখা উচিত, ইহাদের মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধার উপর কাহার বিশেষ অধিকার। উভয়কে সমান সম্মান দিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইতাম; কিন্তু তাহা আমরা করিতে পারি না। যখন জড়বাদিগণ বিজ্ঞানকে অধিক সম্মান দেওয়া উচিত—এরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তখন আমাদের এরূপ প্রশ্ন করা অনধিকার চর্চা নয়। তাহাদের বিজ্ঞান তাহাদের অপ্রাকৃত জীবন-দৃষ্টীয় কোন ভাবেরই আভাস দেয় না। কেবল ক্রমোৎপত্তি, শক্তির রূপান্তরতা, স্বভাবের গতি ও সিক্রক্রম—এইসকল শব্দ ব্যক্ত করিয়া থাকে। এইসকল ভাবের প্রতি আদর তাহারা নিজেই করিয়া থাকেন। এই সকলকে তাহারা সুন্দরতম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, অথচ তাহারা নিজেই কিছু বুঝিতে পারেন না। এইসকল তত্ত্বের অনুশীলন-প্রয়াসে তাহারা অনেক কার্য করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টিয়ান ধর্মাবলম্বী আমরা এইরূপ বিশেষ ব্যক্তি-সিদ্ধান্তের বাক্যকে অনাদর করি না, কিন্তু জড়বাদীদিগের বিজ্ঞান আমাদের সম্মুখীন হইলে তাহার প্রতি কোনপ্রকার বিশেষ আদর প্রকাশ করিতে পারি না। আমরা স্পষ্টই বলিয়া থাকি যে, বিজ্ঞান-বৈশারদী বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মতত্ত্বের প্রতি আমাদের ভক্তি অধিক।

আত্মতত্ত্ব পারমার্থিক উদ্ধগতিসম্পন্ন

আমাদের বিবেচনায় আসল প্রশ্ন এই যে, বৈকুণ্ঠ হইতে প্রেরিত আলোক তাঁহারা অবলম্বন করিবেন কি না ? এখনকার কথা এই যে, তুমি বিজ্ঞানের অনুগত হইবে, না আত্মজ্ঞানের অনুগত হইবে। বিজ্ঞান বিগত-ব্যাপার এবং নিম্নগত ব্যাপারসকল লক্ষ্য করে। কিন্তু আত্মতত্ত্ব জীবের ভাবী ব্যাপার এবং উদ্ধগতির প্রতি দৃষ্টি করে। বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়-গৃহীত ব্যাপারসকল অনুসন্ধানপূর্বক দেখিয়া থাকেন যে, বস্তু-সকলের কিরূপে ক্রমবিবর্ত হইয়াছে। কিন্তু আত্মজ্ঞান পারমার্থিক জীবনের অমৃতপান করত কাব্য এবং শিল্প রচনা করিতে সক্ষম হন।

লুএলিন্ ডেভিসের মত শুদ্ধ নহে

লুএলিন্ ডেভিসের কথাগুলি সুন্দররূপে সজ্জিত হইলেও আমরা ইহাতে অনেক বিতর্কের স্থল পাই। ইহার সর্বত্র এই কথাগুলি লক্ষিত হয়—যদিও আত্মজ্ঞান বিজ্ঞান অপেক্ষা কাব্য, শিল্প ও সামাজিক ভাবও ধর্মপ্রসূত হইয়া আমাদের শ্রদ্ধার উপর অধিক দাবী করিতে পারে, তথাপি জীবনের বৈজ্ঞানিক ভাব আমাদের কিছু না কিছু শ্রদ্ধার উপর দাবী রাখে, কেন না ইহা সত্য।

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অপ্রমাণিত, স্মৃতরাং হেয়

আমরা স্থির করি এই যে, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আমাদের শ্রদ্ধাই হওয়া দূরে থাকুক, নিতান্ত হেয়। কেননা যাহাকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলেন তাহাতে বিজ্ঞান-লক্ষণ কিছুই নাই। তাহাতে কতকগুলি কথা আছে যাহা প্রমাণিত হয় নাই এবং প্রমাণ হইবার যোগ্য নয়। দেখা, নব্য বৈজ্ঞানিকদিগের আসল কথা কি ? তাহাদের আসল কথা এই যে, মানবের আধ্যাত্মিক সত্ত্ব নাই, স্মৃতরাং তাঁহাদের চরিত্র এক ইতিহাসের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে তাহার কোন কার্য নাই। খ্রীষ্টের কোন অনুগত গোস্বামী বলেন যে, খ্রীষ্টপ্রেমদ্বারা আমি এইরূপ কার্য করিয়া থাকি, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ক্রমোৎপত্তি-সাধক বৈজ্ঞানিক বলিয়া থাকেন তাহা নয়। হে খ্রীষ্টিয়ান, তোমার বিশ্বাস শুদ্ধ ভ্রম। তোমার খ্রীষ্টপ্রেম বৈদ্যুতিক সংবাদদাতার কার্য সম্বন্ধে গায় সাংসারিক কার্যের নিতান্ত গোণ কর্তামাত্র। সুখ-দুঃখ, অশ্রু ও হাস্য, বিশ্বাস, আশা, উচ্চাভিলাষ এবং প্রেম ইহারই সামাজিক কার্যের গোণ নিয়ন্তা।

ক্রমোৎপত্তিবাদের যুক্তি-খণ্ডন

গায়মতে বৈজ্ঞানিকদিগের এই কথাই সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। মানবজাতির বিশ্বাসের উপর এরূপ দাবীর হেতু কি, দেখা যাউক। আজকাল যাহাকে বৈজ্ঞানিক-জগৎ বলা হইয়াছে তাহা ভারউইনের ক্রমোৎপত্তি সিদ্ধান্তের

স্বপ্নে এতদূর সাপ্তাঙ্গ প্রণত যে, ডারউইনের সিদ্ধান্তটী যে একটি মতবাদমাত্র, তাহা দেখাইতে হইলে বিশেষ সাহসের প্রয়োজন। ডারউইনের পরম ভক্তগণ যে যে কথা স্বীকার করিয়াছেন তাহাতেই স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাঁহাদের আজও প্রমাণের বিশেষ অভাব। কেবল এইমাত্র তাহা নহে—প্রমাণ চিরদিনই অভাব থাকিবে। এক জাতীয় বস্তু হইতে বহু জাতীয় আকৃতি ও বর্ণ কৃত্রিম উৎপত্তির দ্বারা হইতে পারে, দেখিয়া তাঁহারা এই স্থির করিয়াছেন যে, কোন মূল আকার হইতে আকার-বৈচিত্র্য জন্মিয়া থাকে। প্রকৃতি কখনই দুইটী সর্বপ্রকারে সমান বস্তু উৎপন্ন করেন না। বৃক্ষের এক পত্রের গায় অণু আর এক পত্র সে বৃক্ষে দেখা যায় না। কোন জন্তু সর্বপ্রকারে তাহার মাতা বা পিতার সমান হয় না। এই অতাত্ত্বিক ঘটনাগুলি দৃষ্টি করিয়া মালিগণ, পশুপালকগণ এবং তাহাদের গায় অনেকেই বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নের সহিত একজাতীয় বস্তু হইতে বহু প্রকার আকৃতিশালী বস্তু অর্থাৎ উদ্ভিদ ও জন্তু উৎপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত দুই জাতীয়কে একত্র করিয়া পৃথক জাতি নির্মাণ করিতে সক্ষম হন নাই। মানব সৃষ্টির পর ক্রমোৎপত্তির কোন কার্য দেখা যায় না—একথা ক্রমোৎপত্তিবিদ পুরুষেরাও অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন যে, বহুকাল বিগত না হইলে একটি নূতনজাতীয় বস্তু উৎপত্তি হয় না, সুতরাং নূতন জাতি দর্শনের আশা এত শীঘ্র করা উচিত নয়। এখন কথা এই হইল যে—প্রতিদিবসের প্রতিঘণ্টার এবং প্রতিমহূর্তের ঘটনাসকলে বিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক একটি অদৃষ্ট-ফল-মতবাদ স্বীকার কর, যাহার স্বভাব বিচার করিলে তাহাকে প্রমের বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে না।

জড়বাদ স্বীকারের গুরুতর প্রতিবন্ধক

জড়বাদ স্বীকার করার পক্ষে এই সমস্ত প্রতিবন্ধক থাকিলেও তদপেক্ষা গুরুতর আর একটি প্রতিবন্ধক আছে। ক্রমোৎপত্তিবাদকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহার অধিকার নির্ণয়স্থলে ইহাকে একটি সামান্য প্রক্রিয়ামাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যে শক্তি হইতে এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে তাহার মূল ও স্বভাব সম্বন্ধে এই বাদ নিতান্ত নিস্তর। যে-পর্য্যন্ত ভূমিস্তরসমূহে উদ্ভিদ ও জন্তুদিগের আকৃতি ও নির্মাণসম্বন্ধে এই মতের ক্রিয়া হইতে থাকে, সে-পর্য্যন্ত এই ক্রিয়ারও মূলানুসন্ধান প্রবৃত্তি কার্য করে না। এই মতে তত্ত্ববাদী যথেষ্ট। কিন্তু সম্মুখিশালী ব্যক্তিগণ যখন দেখিতে থাকেন যে—অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আত্মপ্রত্যয় পরিপূর্ণ জীবন সম্বন্ধে যে-সময়ে অনুসন্ধান করিতে থাকেন, তখন তাঁহার সম্মুখে অনেক প্রকার সত্তা প্রতীত হয়, যাহার সম্বন্ধ-প্রাপ্ত বস্তু আত্ম-প্রত্যয়ের সীমার বাহিরে নাই। (ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

কৃষ্ণবস্তুটি ত্রিভুবনকে আকর্ষণ করেন। বাস্তব বস্তুই আকর্ষক। তিনি কাহাকে আকর্ষণ করেন? চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, কিন্তু কাষ্ঠকে আকর্ষণ করে না। তদ্রূপ সেব্য-ভগবান্ সেবোন্মুখ ও সেবককেই আকর্ষণ করেন। সেব্যের মাধুর্য্য-লোভে সেবোন্মুখ ও সেবকগণ আকৃষ্ট হন। সেই আকর্ষক বস্তুর এমন শক্তি আছে—যাহা দ্বারা তিনি আকৃষ্টকে টানিয়া লইয়া যান। মধ্যস্থলে বা পথে বাধা পড়িলে অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপ বা অন্তর্য্যেতু ও ব্যবধান ঘটিলে আকর্ষণ কম হয়। মধ্যস্থলে বা পথে আকৃষ্ট যদি অপর কোন অবাস্তব বস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট অর্থাৎ বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে মূল আকর্ষণ হইতে বিচ্যুত হয়।

একদিকে বন্ধন বা বঞ্চনামূলক সংসারের আকর্ষণ, অন্ডদিকে কৃষ্ণের আকর্ষণ। এ দুগতে রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শাদি আকর্ষক বস্তুগুলি আমার অতি নিকটে আছে। আমি দুর্বল বলিয়া তাহাদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যাই। সেইজন্য হরিকথার অনন্তরত শ্রবণ করিতে থাকিলেই তবে ঐ নিকটস্থ শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারিব। ভগবান্ আমাদিগকে না টানিলে মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হইতেই হইবে। কৃষ্ণের নাম-রূপাদি আমাদিগকে আকর্ষণ করিলে আমরা বর্তমানে ভোক্তরূপে কৃষ্ণের সজ্জায় যে বসিয়া আছি, সেই অনুবিধা হইতে ছুটি পাইব। কৃষ্ণের কথা যতই অনুশীলিত হইবে, ততই আমাদের ভোক্তৃত্বভাব দূর করিয়া তিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করিবেন।

ভগবদ্ভক্ত যে পথে গমন করিয়া ভগবৎসেবা পাইয়াছেন, আমরা তাহার সেই পথই নিরন্তর অনুসরণ করিব। আমরা ভগবদ্ভক্তের অনুগমনের চেষ্টা করিব। মূল বস্তু ভগবানের সেবা অপেক্ষা তদীয় সেবকের সেবা অধিক লাভজনক।

শ্রীকৃষ্ণের মন্দির—সংসর্গ শ্রীবলদেবের অভিন্নপ্রকাশ। শ্রীবলদেব শয্যা, আবাস, ছত্র, উপাধান প্রভৃতি দশদেহে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। জীবের হৃদয়ই শ্রীভগবানের মন্দির। ভগবানের ধাম ও মন্দিরাদি স্বয়ং প্রকাশভবের সেবাকার্য্য। যাহারা শ্রীমন্দিরকে বিষ্ণু মনে করেন, তাহারাই আস্তিক। মন্দির বিষ্ণু হইতে অভিন্ন হইলে তাহা ভাঙ্গা সম্ভব নহে। মন্দির কেহ ভাঙ্গিতে পারে না, ভাঙ্গে ভোগের বস্তু। ভগবতার ব্যাপার-সমূহ ভোগের সামগ্রী নহে। আধ্যাত্মিকের চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট এবং কর্ণদ্বারা শ্রুত শ্রীবিগ্রহ ও বৈকুণ্ঠশকে ছদ্ম বস্তু ও শব্দসামান্য-বুদ্ধি উপস্থিত হয়। মাপিয়া লইবার বুদ্ধিকে ভোগবুদ্ধি বলে। শ্রীমন্দির ও

শ্রীবিগ্রহকে যাহারা প্রাকৃত মনে করে, তাহারা অজ্ঞ। দিব্যজ্ঞান লাভ না হইলে শ্রীবিগ্রহ-অর্চন ও শ্রীমন্দির-দর্শনাদি কিছুই হয় না।

শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। তিনি কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা করেন বলিয়া কৃষ্ণের প্রিয়তম; ভগবানের যাবতীয় প্রিয়গণের মধ্যে গুরুদেব সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়তম। কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, আর সকলেই আশ্রয়। বিষয় ও আশ্রয়ের যোগে লীলা সংঘটিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্বিচার করিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে-প্রকার সেবা করেন, তদাশ্রিতগণেরও সেই সকল বিচার থাকিবে। আমি একদিকে চলিলাম, আর গুরুপাদপদ্মের ইচ্ছা অন্যরূপ, তাহা হইলে অভক্তি হইয়া যাইবে।

ভক্তি আত্মার ধর্ম, অনানুপ্রতীতি-বশে যে চিন্তাস্রোত, তাহা ভক্তি নহে। অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন হওয়া চাই। তিনি আর কিছু চান না, আনুকূল্য মাত্র চান অনুশীলন-যোগ্যতা না থাকিলেও যিনি অনুশীলন করেন, তাঁহাকে তিনি সাহায্য করেন। নচেৎ বিপরীত দিকে যাইতে হইবে। ব্রহ্ম-পরমাত্মার জ্ঞান-অনুশীলন আংশিক। কৃষ্ণ-জ্ঞানপূর্ণ। যেখানে জীবন আছে, সেখানে সেবা করাই তাহার বৃত্তি। কিন্তু জড়জগতের সেবা করিলে কৃষ্ণসেবা হইবে না। আমরা ভোজ্য পদার্থ গ্রহণ করি, বাতাস গ্রহণ করি, যথাকালে বিষয়সেবা করি; উদ্দেশ্য এই শরীরটী রক্ষা করা; কিন্তু ইহা ত' চিরদিন থাকিবে না। সংগৃহীত জ্ঞান ত' আমরা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব না। যে সময় বৃথা কাটাইলাম, তৎকালে আত্মার বৃত্তিগুলি আবৃত ছিল। বাহিরের জিনিষটী সরাইয়া ভিতরের জিনিষ আলোচনা করা দরকার।

আমি কহি—এই অভিমান প্রবল হইয়াছে। এই বিচার হইতে কিরূপে নিস্তার হইবে? “আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ”—এই বিধিকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। অন্তবস্তুর যে ভোগ বা ত্যাগ করার বিচার আসিয়াছে, তাহা গর্হণ কর কর্তব্য। যাহারা আশ্রয়ধর্মের অবস্থিত, তাহাদের ক্রিয়াকলাপ বহির্জগতের চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ, তাহারা অবিবেচনার রাজ্যে। তজ্জন্ম অখিল-রসামৃত-মূর্তি কৃষ্ণপাদপদ্ম বিচার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা রিপূর বশ হইয়া বিশ্ব দর্শনে ব্যস্ত হইয়াছি; ইহা হইতে উদ্ধারের উপায়—গুরুপাদপদ্মসেবা। তাহার কাজ ৬০ দণ্ডকাল কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা করা। যিনি বিশ্বদর্শন করেন, তিনি ভোগী। যিনি ভোগ-ত্যাগ করিয়া নিক্লিষ-বিচারপর হইয়া নিজস্ব স্থাপন করেন, তাহার গুরুপাদপদ্ম-আশ্রয় হয় নাই। ব্যাসগুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ত্যাগ করিয়া

অহংগ্রহোপাসনার দুর্বুদ্ধি যাহাদের, তাহাদের মৌখিক গুরুপাদাশ্রয় । প্রত্যেক ইন্দ্রিয় হৃদীকেশের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া বৃত্তফুদ্বারা অমঙ্গলই বরণ করিব— ইহা ভোগীর বিচার । যাহাতে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইবেন, সেইরূপ বিচার তাহাদের নাই । আমরা বর্তমানে সেবাবিমুখ হইয়া এ জগতে আসিয়াছি ; সকলে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ করুক—এই বিচার আমাদের প্রবল ; কেহ ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত করিলে বড় খারাপ লোক ; এ দুর্গতির হাত হইতে উদ্ধারের উপায় শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ।

বিশ্বশান্তিতে আশ'বিচার

সমগ্র বিশ্বে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করিয়া বিশ্বশান্তি-স্থাপনের প্রবল প্রচেষ্টা বর্তমানে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে । বৈজ্ঞানিক উন্নতির অপব্যবহারই এই সমস্তার মূল কারণ বলিয়া অনেকের বিশ্বাস । বিজ্ঞানের উন্নতিই অতীব ভয়ঙ্কর বিশ্বধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করিতেছে । অতীতকালে ব্রহ্মাস্ত্র, পাণ্ডপত্নাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, বরুণাস্ত্র প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল । আধুনিক আবিষ্কার প্রায় তাহার সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে । এই অস্ত্রাদি হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত কত না কত সংস্থা ও গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছে । বিশ্বের মনীষিবৃন্দ এই ভয়ঙ্কর ধ্বংস হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিবার জন্ত সচেষ্ট হইলেও কোন ব্যবস্থাই সম্যক্ কলপ্রসূ হইতেছে না ।

বর্তমান ভারতীয় মনীষিবৃন্দের অনেকেই জাতিভেদকে এই অশান্তির অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া স্থির করিয়া তাহার বিলোপসাধন করিয়া ফেলিয়াছেন সমাজসংস্কারকরূপে তাঁহারা বিধবা-বিবাহ, অবগুষ্ঠন-নির্বাসন, অসবর্ণবিবাহাদির প্রচলন করিয়াছেন । স্পর্শবিচারকে দণ্ডনীয় করিয়াছেন । যথেষ্ট ইন্দ্রিয়-তর্পণজনিত গর্ভপাতের সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থা কৃত হইয়াছে । স্ত্রীজাতির প্রতি অতীব মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করিতে গিয়া পরিণামে পতিদিগের দুর্দশার বর্ণনা “স্বামী ঝাচাও”-নামক প্রবন্ধে পত্রিকায় প্রকাশ পাইয়াছে (ফাগুন ২৪ ভিসেম্বর) । ঋষিদের “মাতৃবৎ পরদারেষু” বিচার অরোচক হওয়ায়, পরিবারে ‘বৌদি’, ‘দিদিমণি’ প্রচলিত হইয়াছে । আহার-বিহার, আচার-বিচার, সমাজ-ব্যবস্থা, বিবাহাদি বহির্দেশের অনুসরণ করিয়া ভারতীয় ঋষি-ব্যবস্থা বজ্জিত হইয়াছে । অমেধ্য তামসিক কুখাদ্যকে সুখাদ্য বলিয়া ভদ্র ও উন্নত সমাজে

আদৃত হইয়াছে। ভাবের বিবাহ (Love-marriage) কল্যাণায় সমস্তার সমাধানরূপে আদৃত হইয়াছে। সর্বত্রই কালের পরিবর্তনহেতু সংস্কার অবশ্যজ্ঞাবী-
-যুক্তিতে আর্থ-ব্যবস্থার উৎসাদন করত বর্তমান ভারত আত্মতুষ্টি বোধ করিলেও
সর্বত্র অশান্তির অগ্নিদাহে দহমান ও অসহায় হইয়া পড়িয়াছে।

দেশ আজ দুর্নীতির চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়া দিশাহারা হইয়াছে। সামাজিক,
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, ধার্মিক—সর্বক্ষেত্রেই ভয়ঙ্কর সমস্তার উদ্ভব
হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়া যে ক্রমবর্ধমান
ভয়ঙ্কর দ্রব্যমূলে কাতর হইতেছে তাহা মর্মস্তুদ। চুরি-ডাকাতি ও অরাজকতার
তাণ্ডবে দেশবাসী হাহাকার করিতেছে। রেলগাড়ী ও যানবাহনেও ডাকাতি,
ছিনতাই, অসাধুতা ও অব্যবস্থায় যাত্রীদের ক্রেশ অবর্ণনীয় হইতেছে। ছিনতাই,
ধর্ষণ, মধুচক্র, খুন-খারাপি, উৎকোচগ্রহণ, প্রতারণা, অবরোধ প্রভৃতি দৈনন্দিন বৃদ্ধি
পাইতেছে। তথাপি দেশবাসী উন্নত-জীবনে ও পরমশান্তিতে বসবাস করিতেছে
বলিয়া কেহ কেহ যোগ্যতা জাহির করিতেছে।

মনুষ্যজাতির সকল জাতির শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণিত। পশ্বাদি মনুষ্যের প্রাণীকে
দুর্ভাগ্যজনক বলা হয়। কোন্ বিচারে মনুষ্যজাতির শ্রেষ্ঠত্ব তদ্বিষয়ে প্রকৃত
জানীবাতির উক্তি—

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।

ধর্মোহি তেষামধিকো বিশেষো ধর্মেণ-হীনা পশুভিঃ সমানাঃ ॥

আহার-নিদ্রা-ভয় ও মৈথুন ব্যাপার পশু ও মনুষ্যে সমান, ধর্মব্যাপারেই
মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব। ধর্মহীন মনুষ্য পশুসম।

ধর্মবজ্জিত-জীবনই পশুতুল্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই ধর্মকে সর্বাধিক
ক্ষতিকারক বিবেচনা করত “ধর্মনিরপেক্ষ” নামে ধর্মবজ্জিত তথা ধর্মবিরোধি-
ব্যবস্থা অধুনা প্রচলিত হইতেছে। পশুবৎ যথেষ্ট ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই সমাজসেবা,
দেশসেবা, জাতির সেবা ও মানবিকতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। মনুষ্যের এট
ইন্দ্রিয়তর্পণ করাকেই পরম ধর্ম বলিয়া অনেকে প্রচার করিতেছে। বদ্ধজীবের
ইন্দ্রিয়তর্পণের পরাকাষ্ঠা স্ত্রীসঙ্গ। বেশভূষা, খাদ্য ও গৃহাদির উৎকর্ষ সাধিত
হইলেও বদ্ধজীব স্ত্রীসঙ্গবিহীন জীবনকে পরম দুর্ভাগ্য ও দুঃখজনক বিচার করে।
স্ত্রীসঙ্গের জগুই তাহার সর্বাধিক প্রয়াস। পরন্তু এই স্ত্রীসঙ্গ পরম মঙ্গললাভে
সর্বাধিক ক্ষতিজনক বলিয়া পারমাণ্বিক শাস্ত্রের প্রধান নিষেধ। স্ত্রীসঙ্গীকে কেহ
কখনও সাধু বলেন নাই। স্ত্রীজাতিতে এমনই প্রভাব যাহা পরম মঙ্গল বা পরমার্থ
হইতে জীবকে পাতিত করে। ধন ও ঋণ (Positive এবং Negative) যেরূপ

বিরুদ্ধ গুণযুক্ত, পরমার্থ ও স্ত্রীসঙ্গ তদ্রূপ বলিয়া পারমার্থিক ক্ষেত্রে তাহার বিবর্তনের ব্যবস্থা ।

নিষ্কিঞ্চনস্ত ভগবন্তু জনোন্মুখস্ত পারং পরং জিগমিষোর্ববসাগরস্ত ।

সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোহপ্য সাধু ॥

সকল ধর্মের মহাপুরুষগণ তজ্জন্ত স্ত্রীসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান করেন । খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈনাদি ধর্মের সর্বোচ্চ পদাধিকারীকে স্ত্রীসঙ্গী হইতে দেখা যায় না । সর্বধর্মসমন্বয়কারী উদারধর্মের প্রবর্তকও স্ত্রীসন্তোগকারী নহেন । তজ্জন্ত এই স্ত্রীসন্তোগ সর্বধর্মমতে নিন্দনীয়, গহিত ও অবশ্য বর্জনীয় ।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থা পরমার্থমুখী, তাহা ভোগমুখী, নহে । এই কারণেই চরমভোগ স্ত্রীসঙ্গকে সর্বত্র বর্জনীয় করিয়াছেন । পরন্তু যাহারা সন্তোগপ্রধান ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ, তাহাদের বিচারে এরূপ যৌনসুখবঞ্চিত জীবন দুর্ভাগাজনক ও দুঃখময় । সেই কারণেই তাহারা যৌনসন্তোগপ্রধান ধর্মের প্রবর্তন করত ভোগী সমাজের পরমাদৃত ও পরমোদাররূপে পূজিত । পরন্তু ইহার বিষময় ফলভোগে কাতর হইয়াও তাহাতে মোহগ্রস্ত ।

সমগ্র বিশ্বে গ্রাসাচ্ছাদনের প্রাচুর্য্য বিহিত হইলেও বিশ্বে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না । এই অশান্তির যাহা মূল কারণ, তাহা বীজরূপে বর্তমানই থাকে । গ্রাসাচ্ছাদনের অপ্রতুলতা বা অভাবই মুখ্য কারণ নহে । অধিকন্তু গ্রাসাচ্ছাদনের প্রাচুর্য্য বিহিত হইলে জীবের যৌন সুখলিপ্সা অধিকতর বৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক । ইহাই শান্ত ও ভগবানের উক্তি ।—‘এছে থাইলে যৈছে হয় ইন্দ্রিয়-বারণ ।’ ‘জিতে রসে জিতং নরং ।’ ‘নাত্যশ্রতস্ত যোগোহস্তি ।’ ধনী সমাজেই এই যৌনসন্তোগের জন্ত নানাবিধ কুকীর্তি অধিকতরভাবে দৃষ্ট হয় । আহার্যের উৎকর্ষ ও প্রাচুর্য্যে ইন্দ্রিয়গণও প্রচুর ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া অধিকতর যৌনসুখের প্রতি ধাবিত হয় । অনক্লিষ্ট, নির্জিত ও ক্ষীণ ইন্দ্রিয়ের যৌনসুখ প্রচেষ্টা প্রবল থাকে না ।

বিশ্ব হইতে ভোগবাদকে পূর্ণরূপে বিতাড়িত করা অসম্ভব ব্যাপার । পরন্তু তাহার প্রাবল্য দমন করাই মঙ্গলজনক । তদনুকূলে যদি বিশ্ববাসী সজাগ ও সচেতন হন তাহা হইলে অশান্তি বহুলাংশে প্রশমিত হইতে পারে । সম্পূর্ণ শান্তি-স্থাপন তাহাতেও সম্ভবপর নহে । তাহা একমাত্র ভগবৎপাদপদ্ম-সেবায় বর্তমান । ইহাই সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদাদিতে উপদিষ্ট । এই অধিকার একমাত্র সত্ত্বগুণের প্রাধান্য-মূলক । ‘চাই রজোগুণ’ বলিয়া চিৎকার করিলে তাহা সম্ভবপর নহে । রজোগুণে ভোগপ্রবৃত্তিই বৃদ্ধি করে । তামসিক ও রাজসিক আচার-বিচার

প্রবর্তন করত কখনও শান্তিলাভ হইতে পারে না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—
উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা, মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজস।

জঘত্গুণবৃতিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ (১৪।১৮)

জঘন-দেশ-সম্বন্ধীয় গুণ অর্থাৎ ঘোন-সুখপরায়ণতায় অধঃপাত অর্থাৎ নরকাদি নানাবিধ দুঃখ ঘটে ; পরাশান্তি ঘটে না।

স্বর্গাদি উন্নত লোকে অন্নবস্ত্রের অসচ্ছলতা নাই। রোগ-যাতনা ও মৃত্যু সে-রাজ্যে দেবগণের নাই বলা চলে। অত্যন্ত ভোগোপযোগী সে-রাজ্যেও ভোগব্যাপার-জনিত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তি বর্তমান দেখা যায়। গীতায় স্বর্গস্থলকে আপাতঃ পুষ্পিতবাক্য বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহাই উপদিষ্ট।

এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কৰ্ম্মনির্মিতম্।

সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্তিনাম্ ॥ (১১।৩২০)

সামন্ত রাজাগণ যেরূপ পরস্পর স্পর্ধা ও যুদ্ধবিগ্রহে রত থাকে, স্বর্গরাজ্যেও তদ্রূপ তুল্য স্পর্ধা, অতিশয়ের প্রতি ঈর্ষা এবং পরিণামস্বরূপে ধ্বংস বিদ্যমান।

ভোগাসক্ত মানব বা বন্ধজীব এই ভোগবৃত্তিতে পরস্পর কাড়াকাড়ি, মারামারি, লুণ্ঠরাজ ও যুদ্ধবিগ্রহে রত থাকিবে। বিশ্বশান্তি ততদূর সম্ভব, যতদূর জীব এই ভোগবৃত্তিকে দমন ও ত্যাগ করিতে সক্ষম হইবে। ‘ত্যাগাচ্ছান্তি নিরন্তরম্’।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর “কেন মোরে জারে তাপত্রয়”-প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণ তুলি’ সেই জীব অনাদি বহিষ্কৃত ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ (চৈঃ চঃ ২০।১১৭)

মায়াবদ্ধ জীব তাহার অশান্তির মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে অক্ষম এবং উপদিষ্ট হইলেও তদনুরূপ চেষ্টা করিতে সক্ষম নহে। তাহার! আপাতঃ কারণে দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া তাহা দূর করিতে চেষ্টা করে। তাহাতে অশান্তি বিনষ্ট হয় না বরং অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যেরূপ বর্তমানকালে খাটা পায়খানা (Service latrine) স্থলে Sanitary latrine তৈয়ার করিয়া মশকদংশনে মরণাপন্ন অবস্থা ঘটিয়াছে। যতদিন জীব কৃষ্ণোন্মুখ না হয়, ততদিন তাহার অশান্তি দূরীভূত হইতে পারে না।

নাধু-শাস্ত্র-রূপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয় ।

সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥ (চৈঃ চঃ ২০।১২০)

সুতরাং জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই প্রকৃত শান্তি-স্থাপন বা বিশ্বশান্তি। ইহাই

জীবে দয়া নামে কীর্তিত। যেহেতু ইহা সম্পূর্ণরূপে সাধু-শাস্ত্র রূপাসাপেক্ষ।
তাহাদের রূপাব্যতীত ইহা সম্ভবপর নহে। বদ্ধজীবের ভোটাধিকো জয়লাভদ্বারা
ইহা সম্ভবপর হয় না।—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোহভিপদ্যোত গৃহব্রতানাম্।

অদান্তগোভির্বিশতাং তমিশ্রং পুনঃ পুনর্চর্কিতচর্কণানাম্।

(ভাঃ ৭।৫।৩০)

অজ্ঞিতেন্দ্রিয়, জ্ঞেয় ও নিরয়গামী ব্যক্তির নিজচেষ্টা, তদ্রূপ অপর-কোন ব্যক্তির
সাহায্য-চেষ্টা বা সংসর্গে অথবা সমগুণবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মিলিত চেষ্টাদ্বারা
বদ্ধজীবের কৃষ্ণপাদপদ্মে মতি উৎপন্ন হয় না।

নৈবাং মতিস্তাবদুরক্রমাজ্জিৎ স্পৃশ্যত্যানর্থাপগমো যদর্থঃ।

মহীয়সাং পাদরজোহভিষেকং নিক্ষিঞ্চনান্যং ন বৃণীত যাবৎ।

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

যতদিন পর্য্যন্ত না নিক্ষিঞ্চন ভগবন্তের পদধূলিতে অভিষিক্ত হয়, অর্থাৎ নিজ
বিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যাদি অভিমানকে অকর্মণ্যজ্ঞানে পরিত্যাগ করত ভগবন্তের
শরণ-গ্রহণ না করে, অর্থাৎ তাহার বিচারধারাকে অঙ্গীকার না করে, ততদিন পর্য্যন্ত
মায়াগ্রস্ত জীবের কৃষ্ণপাদপদ্মে মতি জন্মে না।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।

গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।

মায়াজাল ছুটে, পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ। (চৈঃ চঃ)

শ্রীগুরু ও কৃষ্ণ-কৃপা ব্যতীত জীবের ভক্তিলতা-বীজ অর্থাৎ শ্রদ্ধা জন্মে না।
কালপ্রভাবে এবং দুঃসঙ্গের পরিণামে বর্তমান ভারতবাসীর জ্ঞানীশূণীর প্রতি
কৃতজ্ঞতা ও সেবাবুদ্ধি লুপ্ত হইয়াছে। মিথ্যা ও মারাত্মক সাম্যবাদ প্রচলন করিতে
গিয়া অধীনস্থ কেহই তাহার উন্নতাদিকারীকে সম্মান দান করে না। কলে সর্বত্রই
পরিচালনকার্য্য অচল হইয়া পড়িয়াছে, ইহা বর্তমানে স্পষ্ট। দুর্বল ও অধীনস্থের
প্রতি উৎপীড়ন ও নিপীড়ন যেরূপ অগ্রায় ও অল্পচিত, উন্নত ও উর্দ্ধতনের
প্রতি অসম্মান, অবমানন ও বিরুদ্ধাচরণও তদ্রূপ অগ্রায় ও ক্ষতিকারক।
এতদুভয়ের বহু উর্দ্ধে “তৃণাদপি স্নানীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন
কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।”—এই বিচার পরমশান্তিময় সেবারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত;
ভোগরাজ্যে তাহার বর্তমানতা নাই। ইহার উৎপত্তি ভক্তিলতাবীজ বা শ্রদ্ধা
যাহা শ্রীগুরুকৃষ্ণরূপায় লভ্য হয়।

শাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রকৃত গুরু অতি দুর্লভ—ইহা সুসত্য হইলেও, সচ্ছাত্তের এখনও দুর্লভতা হয় নাই। কিন্তু ভোগপ্রধান পাশ্চাত্য ও বহির্দেশের সংসর্গফলে বর্তমান ভারত মোহগ্রস্ত হইয়া বেদাদি সনাতন শাস্ত্রকেও মিথ্যা করণা এবং চলনা জ্ঞান করত ছাত্র ও তরুণদিগকে শিক্ষাদান কঠোরভাবে বর্জন করা হইয়াছে। এমন কি সর্বশ্রেষ্ঠ দেবভাষা বলিয়া যাহার সুখ্যাতি সেই সংস্কৃত ভাষাকেও “dead language” বলিয়া অন্ধ্যায় প্রচার করা হইতেছে। জাতির উন্নতির বা শান্তির পথে ইহা অপেক্ষা প্রধান কষ্টক আর কি হইতে পারে ?

তর্ক হইতে পারে—যে দেশে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন নাই সে দেশ কি উন্নত হয় নাই। এতদুত্তরে বক্তব্য ভোগব্যাপারে উন্নতি প্রকৃত উন্নতি নহে, তাহা শাস্তিবহু কখনই হইতে পারে না। এই ভোগোন্নত দেশকে আদর্শ করিয়া তদেক্ষীয় সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষাদীক্ষাই ভারতের বিষময় অধঃপতন। কালপ্রভাবে আর্থঋষিদের ব্যবহার অপপ্রয়োগ ও বিকৃত অবস্থাকে সংস্কার করত তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠাই মঙ্গলজনক; তাহার উৎসাদন ও তামসিক-রাজসিক ব্যবহার প্রচলনদ্বারা কখনই শাস্তিস্থাপন সম্ভবপর নহে।

বেষভূষার পারিপাট্যে উন্নতি বিচার করিলে ভুল হয়। নগ্নতা অনধিকারীতে নিন্দনীয় হইলেও অধিকারীর পক্ষে তাহাই পরমপূজ্য। ভোগীর বেষভূষাকে প্রাচীন ভারত উন্নতি বলে নাই। দিগন্তর শিবঠাকুরই মহাদেব, মহাযোগী ও মহাভক্ত। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী, নবযোগেন্দ্রগণ ও চতুঃসন—সকলেই দিগ্বাস ছিলেন। তাঁহারা সভ্যগণের শিরোমণি। সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণী-সমলঙ্কৃত সভ্য-মধ্যে তাঁহারাই সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অলঙ্কৃত করিতেন। যাবতীয় মুনি-ঋষি-সমলঙ্কৃত পরীক্ষিত মহারাজের প্রায়োপবেশন-সভায় নগ্ন শুকদেবই সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া সকলকে শান্তির বাণী শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করিয়াছেন। সঙ্কীর্ণ বস্ত্র-পরিধানকে অসভ্যতা বলিয়া গণ্য করা সেকালে হয় নাই। সমাগত সভ্যগণ সকলেই সঙ্কীর্ণ বস্ত্র ও কোপীনধারী ছিলেন। তথায় কেহই বৈদেশিক সভ্যতার পরিচ্ছদ-পরিহিত ছিলেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শুকদেব-কথিত ভাগবতের সর্বশ্রেষ্ঠতা ও পরমসভ্যতা ও পরাশান্তিবাহকত্ব বলিয়া প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন।—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্য জাতাহুঃরাগো দ্রুতচিত্ত উচৈঃ।

হস্যাত্থো রোদিতি রৌতি গায়তুয়ান্নাদবন্যত্যতি লোকবাহুঃ।

(তা: ১১।২।৪০)

এই ‘লোকবাহু’-পদে বাহুজগতের অর্থাৎ মায়িক আচার-বিচারকে অনাদর করা বুঝায়। অলিত-বসন ও উলঙ্গদেহে প্রিয়তম ভগবদ্গুণ-মহিমায় আবিষ্টচিত্তে

উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নাম-কীর্তনে রত থাকিয়া উন্মাদের স্থায় হান্স, রোদন ও ক্রন্দন করাই সর্বোত্তম সভ্যতা ও চরম শান্তি। ভোগীজগৎ ইহা অনুধাবন করিতে অক্ষম।

বর্তমান কলিকালে সর্বাধিক অধর্ম ও দোষ বিद्यমান থাকিলেও কলিকালকেই জ্ঞানি-গুণিগণ সর্বাধিক প্রশংসা করিয়াছেন। কেননা এই কলিযুগে বিশেষতঃ ধন্য কলিযুগে অর্থাৎ যে-কলিযুগে কৃষ্ণ পুনরায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে লীলা প্রকাশ করেন, সেই কলিযুগে অত্যন্ত অনায়াসে সর্বশ্রেষ্ঠ পরমার্থ প্রেমভক্তিলভের সর্বাধিক সুযোগ বর্তমান। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগাদিতে তাহা নাই বলিয়াই কলিযুগ ধন্য। পরমশান্তি লাভ করিতে হইলে এই কালেই শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্তন-দ্বারাই সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হইবে—ইহাই ভারতের প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের উৎকর্ষের জন্ত রাস্তায় রাস্তায় হস্তবিক্ষেপ ও চিৎকার না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরির নামসঙ্কীর্তন করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের বিচার। ইহাই শাস্ত্রের সর্বত্র নির্দেশ,—

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরনুথা ॥

কলিং সত্যজয়ন্ত্যার্য্য গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ।

যত্র সঙ্কীর্তনেনৈব সর্বস্বার্থোহভিলভ্যতে ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৬)

গুণগ্রাহী আর্ধ্যগণ এই কলিযুগেরই সর্বাধিক প্রশংসা করিয়াছেন, যেহেতু এই যুগে একমাত্র শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্তনদ্বারাই কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি দ্বারা নহে সর্ববিধ ও সর্বোত্তম পুরুষার্থ সুষ্ঠুভাবে লভ্য হয়।

ন হৃতঃ পরমে লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ ।

যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্চতি সংসৃতিঃ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৭)

এই সংসারে জন্ম-মরণ-চক্রে ভ্রাম্যমান জীবগণের এই হরিনাম সঙ্কীর্তন অপেক্ষা পরমলাভজনক অণু কিছুই নাই; যেহেতু ইহা হইতেই পরম-শান্তিলাভ এবং জন্ম-মরণমালা হইতে অব্যাহতি ঘটে।

এই নাম-সঙ্কীর্তন-সৌভাগ্য লাভ করিবার জন্ত সত্যযুগীয় মানবগণও কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিতে অভিলাষী।—

কৃতাদিবু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সন্তবম্ ।

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৮)

এই কলিযুগীয় সঙ্কীর্তনধর্ম ও তদদ্বারা উপাস্ততত্ত্ব ‘অন্তঃকৃষ্ণঃ বহির্গোরঃ’ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই শ্রীমদ্ভাগবতে এবং বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। তিনিই “ছন্নঃ কলৌ যদভব” বাক্যের উদ্দিষ্ট প্রচ্ছন্ন অবতারী।—

কৃষ্ণবর্ণং ত্রিধাহকৃষ্ণং নাক্ষোপাক্ষান্তপার্বদম্ ।

যজ্ঞৈঃ সঙ্কীৰ্ত্তনপ্রায়ৈর্বজন্তি হি স্মমেধসঃ ॥ (ভাঃ ১১।৫ ৩২)

তিনিই মহাভারতোক সন্ন্যাসাশ্রমা স্বয়ং ভগবান্ । তিনি ভিন্ন অণু কোন অবতার সন্ন্যাস-লীলা প্রকাশ করেন নাই ।

স্ববর্ণবর্ণো মেমাক্ষো বরাঙ্গচন্দনাদ্দদৌ ।

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণঃ ॥ (মহাভাঃ দানধর্ম ১৪৯ অঃ)

ইত্যাদি ঋষি ও শাস্ত্রবাক্যে শান্তির উপায় উপদিষ্ট হইলেও মায়াচ্ছন্ন মনুষ্যের তাহাতে বিশ্বাস হয় না ।

ন মাং হৃকৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপণন্তে নরাধমাঃ ।

মায়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

পাপী, মূঢ়, নরাধমগণ মায়াদ্বারা জ্ঞানাচ্ছন্ন হওয়ায় আসুরিক স্বভাবযুক্ত হইয়া আমার ভজন করে না । ঈশ্বরই পরমাত্মারূপে সকল জীবহৃদয়ে বর্তমান থাকিলেও আসুরিক বৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার পরণাগত হয় না ।

‘তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি স্বাততম্’—এই বাক্যকে তাহার গ্রাহ করে না । পরন্তু স্মেধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সঙ্কীৰ্ত্তন-যজ্ঞে তজনা দ্বারা পরাশান্তি লাভ করেন ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

উত্তমা ভক্তি

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির মনোভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতাসন্ধু-গ্রন্থে উত্তমা ভক্তির সংজ্ঞা নিম্নোক্ত প্রকারে নিরূপণ করিয়াছেন,—

অন্যাত্মাভিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্মাগ্ণ্যাবৃতম্ ।

আত্মকূল্যেন কৃষ্ণাত্মশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

অন্যাত্মাভিতাশূন্য (শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানেচ্ছা ব্যতীত অন্যাত্ম অভিলাষ) জ্ঞান-কর্মাদিদ্বারা অনাবৃত অথচ আত্মকূল্যাত্মক অর্থাৎ কাযিক, বাচিক, মানসিক সমস্ত চেষ্টা এবং ভাবের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ শ্রীকৃষ্ণাত্মশীলনকেই ‘উত্তমা-ভক্তি’ বলে ।

শ্রীকৃষ্ণানুগ বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে এই শ্লোকের অনুশীলন করিলে ভক্তি সঙ্ঘর্ষে ভক্তি-সাধকের সুস্পষ্ট জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্ভব। ভক্তিরহিত বিদ্বানের আনুগত্যে অনুশীলন করিলে ইহার বিপরীত অর্থেরই বোধ হইয়া থাকে। যদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতে ‘কৃষ্ণস্ত তগবান্ স্বয়ম্’ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্ঘর্ষ-তত্ত্বের পরিভাষা দেওয়া হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু এই শ্লোকদ্বারা অভিধেয়-তত্ত্বের পরিভাষা প্রদান করিয়াছেন। পরিভাষা কাহাকে বলা হয়? সমস্ত প্রকার বিধিবাচ্যকে উপমর্দন করিয়া যে বাক্য সর্বপ্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে ‘পরিভাষা’ বলা হয়। ‘সা চা নিয়মে’ নিয়মকারিণী ভক্তিসঙ্ঘর্ষে কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, কর্মার্পণকারী বিষয়ী, বিভিন্ন মতাবলম্বী এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমস্ত প্রকার ধারণা, জ্ঞান এবং অনুভূতিকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করিয়া ভক্তি-মাহাত্ম্যে সর্বোৎকৃষ্টরূপে এই শ্লোক নিরূপিত হইয়াছে।

যদ্রূপ শব্দের দ্বারা ধাতুর সমস্ত প্রকার অর্থের বোধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ এখানে ‘অনুশীলন’-শব্দের দ্বারাও এই ধাতুর সমস্ত প্রকার অর্থের বোধ হইতেছে। ধাতুর অর্থ দুই প্রকার,—চেষ্টারূপ এবং ভাবরূপ। চেষ্টারূপও দুই প্রকার—প্রবৃত্তিমূলক এবং নিবৃত্তিমূলক। প্রবৃত্তাত্মক ধাতুর অর্থ কার্যিক, মানসিক এবং বাচিক চেষ্টারূপ হইয়া থাকে, নিবৃত্তাত্মক ধাতুর অর্থ প্রবৃত্তিমূলক ধাতুর অর্থ হইতে ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে, অর্থাৎ এইরূপ কোন চেষ্টা না হয় যাহার দ্বারা নামাপরাধ, ধামাপরাধ ও সেবাপরাধ হইয়া যায়। ভাবরূপের যে অর্থ নিরূপিত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, মহাভাব আদি বুদ্ধিতে হইবে। ভাবরূপের অর্থ শুদ্ধ মানসিক অনুভাবাত্মক হইয়া থাকে, ইহার অর্থ বিবেচনা পরবর্ত্তিকালে করা হইবে।

এইপ্রকার ‘অনুশীলন’-শব্দের প্রবৃত্তাত্মক-নিবৃত্তাত্মক চেষ্টারূপ এবং ভাবরূপ অর্থ যাহা বলা হইয়াছে, যদি তাহা শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধিত বা শ্রীকৃষ্ণের জন্ত হয়, তবেই তাহাকে ‘ভক্তি’ বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধিত সমস্ত প্রকার অনুশীলন অথবা শ্রীকৃষ্ণের জন্ত সমস্ত প্রকার অনুশীলন—এই প্রকারের চেষ্টাকে কৃষ্ণানুশীলন-পদের দ্বারা ব্যাখ্যা করিবার জন্ত গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা-শিক্ষা, বিশ্রুতভাবে গুরুসেবাদি ভক্ত্যঙ্গে অব্যাপ্তি-দোষের সম্ভাবনা নাই। এই প্রকার রতি-প্রেমাদি ভাবরূপ অর্থকেও কৃষ্ণানুশীলন-পদে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়ার রতি ইত্যাদি স্থায়ী এবং ব্যভিচারী ভাবসমূহেও অব্যাপ্তি-দোষের সম্ভাবনা নাই। শ্রীকৃষ্ণের জন্ত চেষ্টারূপ এবং ভাবরূপ অনুশীলন একমাত্র কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তের রূপাতেই সম্ভব। শ্রীল গুরুদেব পরম ভগবদ্বক্ত, এইজন্ত শ্রীগুরুপদাশ্রয় আদিও কৃষ্ণানুশীলনেরই অন্তর্গত। কৃষ্ণানুশীলন অথবা ভক্তি—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-

শক্তির বৃত্তিবিশেষ। বদ্ধজীবের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন সমস্তই অচেতন। বদ্ধজীবের মন, বাক্যে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তির উদয় হওয়া অসম্ভব। তথাপি করুণাবরুণালয় শ্রীকৃষ্ণ অথবা পরম ভগবন্তের অহৈতুকী কৃপাতে শ্রীগুরুপদাশ্রিত ভক্তের কায়, মন, বাক্যে (জড়ীয় হইলেও) স্বরূপশক্তির বৃত্তি তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই বিষয়টিকে পরে আরও সুস্পষ্টরূপে বর্ণন করা হইবে। তাদাত্ম্য অর্থাৎ অগ্নি যেমন লোহাতে প্রবেশ করিয়া অল্প বস্তুকে জ্বালাইয়া দেয়, লোহা কিন্তু জ্বালায় না। এখানে লোহাতে অগ্নির তাদাত্ম্য হইয়াছে। ঐরূপ ভগবৎকৃপাতে স্বরূপশক্তির ভক্তিবৃত্তি ভক্তের কায়, মন ও বাক্যে তাদাত্ম্য হইয়া ক্রিয়া করিয়া থাকে।

এখানে ‘শ্রীকৃষ্ণ’-শব্দ প্রয়োগের দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্ত্যন্ত সমস্ত প্রকার অবতারের জ্ঞাত হইয়াছে, তথাপি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য অবতারের ভক্তি-অনুশীলনে তারতম্য বিদ্যমান রহিয়াছে। ভক্তি-অনুশীলনের এই তাৎপর্য্য পরে বর্ণন করা হইবে।

উপরোক্ত কৃষ্ণানুশীলনের দুইটা লক্ষণ—স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ। এখানে স্বরূপ-লক্ষণ বর্ণন করা হইতেছে। ভক্তের স্বরূপসিদ্ধির জ্ঞাত ‘আনুকূল্যেন’ অর্থাৎ ‘আনুকূল্যাবিশিষ্ট’ এই বিশেষণের প্রয়োগ করা হইয়াছে। কেননা প্রতিকূল অর্থাৎ বিরুদ্ধাচরণদ্বারা ভক্তিসিদ্ধি সম্ভব নহে। কোন কোন মহাত্মা ‘আনুকূল্য’-শব্দের অর্থ রোচমানা প্রবৃত্তি (রুচিকর) করিয়াছেন। অর্থাৎ কৃষ্ণানুশীলন যেন কৃষ্ণের রুচিকর হয়, এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের জন্য এইরূপ রোচমানা প্রবৃত্তির নাম আনুকূল্যাবিশিষ্ট ভক্তি। কিন্তু এই প্রকার অর্থ গ্রহণ করিলে অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়া যায়, যেমন—চাখুর, মুষ্টিক আদি অন্ন মল্লযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে প্রহার করিতেছে এবং ঐ প্রহারের জন্য কৃষ্ণের উৎসাহও হইতেছে, চাখুর-মুষ্টিকের সহিত বীররস আন্বাদন করিতেছেন। এখানে অন্নপ্রহাররূপ অনুশীলন শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর প্রতীত হইতেছে। এখন সংশয় হইতে পারে যে, অন্নের প্রহার কি-প্রকারে কৃষ্ণের রুচিকর হইতে পারে? এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতের (১।১৩।৩০) শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে,—“মনাস্বিনামিব সন্ সংপ্রহার” ইতি অর্থাৎ সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে শত্রুর সহিত ভীষণ সংগ্রাম দুঃখপ্রদ হইলেও, বীরপুরুষের ক্ষেত্রে রুচিকর হইয়া থাকে। অতএব মল্লযুদ্ধে অন্নপ্রহারের ভয়ানক প্রহার কৃষ্ণের রুচিকর হওয়ায় অন্নপ্রহারের চেষ্টাকে যদি ভক্তি মনে করা হয়, তাহা হইলে ভক্তি-লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ অন্নপ্রহারের বিদেষ্যভাবপূর্ণ যে প্রহাররূপ অনুশীলন তাহা

ভক্তির অত্যন্ত বিরোধী হইলেও কৃষ্ণের রুচিকর হওয়ায়, ভক্তির লক্ষণ ব্যাপ্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, ইহাই অতিব্যাপ্তি দোষ ।

অন্যক্ষেত্রে মা-যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কোণে লইয়া স্তন্যপান করাইতেছিলেন । শুদিকে দুধ উথলাইয়া আগুনে পড়িতে ছিল । মা অতৃপ্তাবস্থায় গোপালকে রাখিয়া দুগ্ধ রক্ষার জন্য চলিয়া গেলেন । কৃষ্ণের ইহা রুচিকর হইল না, ক্রোধে অধর কম্পিত হইতে লাগিল—‘নজাতকোপঃ ক্ষুরিতারুণাধরামতি’ (ভাঃ ১০।৩।৬) । এখানে মা-যশোদার চেষ্টা কৃষ্ণের রুচিপূর্ণ না হওয়ায় ভক্তির পরিভাষাতে ব্যাপ্তি হইতেছে না । অতএব এখানে ভক্তি-লক্ষণে অব্যাপ্তি-দোষ প্রতীত হইতেছে ।

উপরিউক্ত অমুরগণের এবং মা-যশোদার অনুশীলনরূপ উদাহরণের দ্বারা ক্রমশঃ অতিব্যাপ্তি এবং অব্যাপ্তি-দোষ প্রতীত হইতেছে । উহা নিরাকরণের জন্য আনুকূল্য-শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে অর্থাৎ আনুকূল্যের তাৎপর্য্য প্রতিকূলভাব রহিত হওয়া ।

প্রাতিকূল্য-শূন্যত্ব না হইলে ভক্তিসিদ্ধ হয় না—এই সিদ্ধান্ত-অনুসারে অমুরগণের মধ্যে সর্বদা দ্বেষরূপ প্রতিকূলভাব বিদ্যমান থাকায় তাহাতে অতিব্যাপ্তি দোষ স্পর্শই করে না অর্থাৎ প্রাতিকূল্যভাব (বিদ্বেষ) রহিত না হওয়ার কারণে অমুরগণের অনুশীলন ভক্তি নহে । এখানে আনুকূল্যের তাৎপর্য্য প্রতিকূলভাব-রহিত হওয়া । অপরক্ষেত্রে মা-যশোদার অনুশীলনে বাহ্যতঃ প্রতিকূলভাব দৃষ্টিগোচর হইতেছে । কৃষ্ণের কল্যাণ এবং পালন-পোষণ ভাবনা সর্বদা অন্তর্নিহিত থাকায় মা-যশোদাতে প্রাতিকূল্যের কোন গন্ধই থাকিতে পারে না । অতএব এই লক্ষণে অব্যাপ্তি-দোষ স্পষ্টই অসম্ভব । স্বাভাবিকরূপে কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণের সেবোপকরণে ভক্তগণের প্রীতি প্রতীয়মান হইয়া থাকে । উক্ত দুগ্ধ হইতেই কৃষ্ণের পালনপোষণ হইবে—এইজন্য কৃষ্ণকে ছাড়িয়া কৃষ্ণের জন্যই মা-যশোদাতে দুগ্ধ-রক্ষার চেষ্টা দেখা যাইতেছে । অতএব এই চেষ্টাই ‘ভক্তি’ । (ক্রমশঃ)

—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত ভাষ্যরাজ মহারাজ

“অমৃতস্য পুত্রাঃ”

শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।১৪।২৩) “একমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ” শ্লোক ভগবানকে জগজ্জ্ঞানাদির মূল-কারণ, পুরাণপুরুষ, সনাতন, নিত্যানন্দময়, অক্ষর, অমৃতস্বরূপ, নিরঞ্জন, অপরিচ্ছিন্ন, উপাধিনিষ্মুক্ত ও অদ্বিতীয় তত্ত্ব বর্ণিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । স্বায়ত্ত্ব মনু পৌত্র ধ্রুবকে তত্ত্বোপদেশ-প্রসঙ্গে বর্ণিয়াছেন,—

তমেব মৃত্যুমমৃত্যুং তাত দৈবং সর্বাঅনোপেহি জগৎপরায়ণম্ ॥

(ভাঃ ৪।১।২৭)

“হে বৎস ! ভগবান্ অভক্ত-পুরুষগণের পক্ষে মৃত্যুস্বরূপ এবং ভক্তগণের পক্ষে অমৃতস্বরূপ। তিনি বিশ্বের পরমেশ্বর এবং জগদ্বাসীর সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়।” ঋগ্বেদে মানবকে ‘অমৃতের পুত্র’ বলা হইয়াছে,—“শৃঙ্খল বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।” আমরা প্রত্যেক নর-নারীই সেই তেজোময় অমৃতময় ভগবানের সন্তান। যেহেতু আমরা অমৃতের পুত্র (Heirs of Immortality)। সেইজন্যই অমৃতত্বই আমাদের নিত্য আকাজক্ষার বস্তু। চাতক যেমন কটিক জল ভিন্ন অন্য বারিতে তৃপ্ত হয় না, জীবও তদ্রূপ ‘অমৃতত্ব’ ভিন্ন অন্য কিছুতেই স্বস্তি বোধ করিতে পারে না। সেইজন্য তাহার চিরন্তন প্রার্থনা,—“মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়” (বৃহঃ ১।৩২৮)। তাই যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ী মানবের প্রতিভূ হইয়া স্বামীকে বলিয়াছেন,—“যেনাহং নাম্বতা স্মাং কিম্ অহং তেন কুর্যাম্” (বৃহঃ ৪।৫।৪৩)। ঋগ্বেদে (৫।৬৩।২) পাওয়া যায়—“বৃষ্টিং বাং রাধো অমৃতত্বম্ ঈমহে” অর্থাৎ “হে মিত্রাবরুণ ! এমন ধন বর্ষণ কর, যাহাতে আমরা অমৃতত্বের ভাগী হইতে পারি।” ঋগ্বেদের (১।৩১।৭) অন্তর্ভুক্ত পাওয়া যায়, “ত্বং তম্ অগ্রে অমৃতত্ব উত্তমে মর্ত্যং দধামি” অর্থাৎ “হে অগ্নি ! তুমি মর্ত্য মানুষকে উত্তম অমৃতত্ব স্থাপন কর।” ঋগ্বেদের ৫।৫৫।৪ শ্লোকেও উক্ত রহিয়াছে,—“আভূষণাং বো মরুতো মহিষ্মনম্...উতো অস্মান্ অমৃতত্বে দধাতন” অর্থাৎ “হে মরুদগণ ! তোমাদের মহিমা মহনীয় ! আমাদের অমৃতত্ব দধাতন” অর্থাৎ “হে মরুদগণ ! তোমাদের মহিমা মহনীয় ! আমাদের অমৃতত্ব নিধান কর।”

বিভিন্ন ধরনের সাধক বিবিধ বিচিত্র সাধনদ্বারা পিতৃলোক, স্বর্গলোক, তপঃলোকেরও উদ্ভেদ ব্রহ্মলোকে সত্যলোকে গমন করে—এইবার কি আকাজক্ষার বিষয় অমৃতত্ব তাঁহার করতলগত হইল ? আর কি তাঁহাকে কোনকালে পুনর্মৃত্যুর কবলে পতিত হইতে হইবে না ? এই স্থলে গীতা এই দুরাশার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। গীতা (৮।১০) বলিয়াছেন,—“আব্রহ্মভুবনোল্লোকাঃ পুনরাবত্তি-নোহজ্জুন।” ব্রহ্মলোক হইতেও জীবের পতন হয় - নিম্নতর লোকের ক কথা ! দেবতাদিগকে সাধারণতঃ ‘অমর’ বলা হয়,—‘অমরা নির্জরা দেবাঃ।’ কিন্তু এই অমৃতত্ব আপেক্ষিক মাত্র, প্রকৃত অমৃতত্ব নয়। মনুষ্যের তুলনায় দেবতারূপ দীর্ঘজীবী বটে, কিন্তু তাঁহারা চিরজীবী নহেন। যেহেতু—

বহুনীল-সহস্রাণি দেবানাঞ্চ যুগে যুগে।

কালেন সমতীতানি কালো হি চরতীক্রমঃ ॥

“কত সহস্র ইন্দ্রের, কত লক্ষ দেবতার কালের গতিতে পতন হইয়াছে, কালের গতি তাঁহাদের কে অতিক্রম করিবে ?” অগ্ন্যত্রয় পাওয়া যায়,—“অষ্ট কুলাচল, সপ্ত সমুদ্র, ইন্দ্র, দিবাকর, ব্রহ্মা, রুদ্র কেহই চিরস্থায়ী নহেন। কালের করাল গতিতে শীঘ্র বা বিলম্বে সকলকেই ধ্বংসমুখে পতিত হইতে হয়।”

দেবগণের আবাসভূমি স্বর্গলোকে বসতি কখনও চিরস্থায়ী নহে, পুণ্যের ফলে কতদিন স্বর্গে স্থিতি হয় ? শত বর্ষ, সহস্র বর্ষ, অযুত বর্ষ, লক্ষ বর্ষ, কোটি বর্ষ -- আর কত ? কিন্তু অনন্তকালের তুলনায় এই স্থিতি অত্যল্প নয় কি ? ঋষিদিগের শিক্ষা এই,—স্বর্গলোকেও কাল জীবের পুণ্যের আয়ুঃ হরণ করে,—“স্বর্গং লোকম্ অভিবহতি । অহোরাত্রৈর্বা ইদং সযুগ্ভিঃ ক্রিয়তে ॥” (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।১০।১১।২) । অজ্ঞিত পুণ্যের ক্ষয় হইলে স্বর্গবাসীর পতন হয় ।—

তে তং ভুক্তা স্বর্গলোকং বিশালং

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি । (গীতা ৯।২১)

মুণ্ডক উপনিষদ (১।২।২) “তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাঃ চ্যবন্তে” শ্লোকে বলিয়াছেন,—“পুণ্যক্ষয়ের অবশ্যস্ফাবী পরিণাম—স্বর্গ হইতে চ্যুতি বা পতন ।” শাস্ত্রের অন্তত্বও পাওয়া যায়,—

নাকশ্য পৃষ্ঠে তে স্কৃততেহনুভূত্বা

ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥ (মুণ্ডক ১।২।১০)

“স্বর্গলোক ভোগের দ্বারা পুণ্যক্ষয় হইলে, জীব ইহলোকে বা নিম্নতর লোকে প্রবেশ করে ।” ছান্দোগ্য উপনিষদের (৫।১০।৫) “তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতম্ উষিত্বা পুননিবর্তন্তে” শ্লোকে উক্ত রহিয়াছে,—“পতন পর্যন্ত স্বর্গে বসতি করিয়া জীব মর্ত্যে আবার ফিরিয়া আসে ।”

অনিত্য উপাঙ্গদ্বারা অমৃতত্ব লাভ অসম্ভব

মুণ্ডক উপনিষদের (১।২।১২) “নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন” শ্লোক—‘নশ্বরদ্বারা অনশ্বরের অর্জন অসম্ভব’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । কঠ উপনিষদে নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে যম মহারাজ বলিয়াছেন,—

জানাম্যহং শেবধিরিত্যানিত্যং

ন হৃক্ষবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ ॥ (কঠ ২।১০)

“পুণ্যফল কখনও নিত্য হয় না—অনিত্যদ্বারা নিত্য ফল পাওয়ার সম্ভাবনা কোথায় ?”

রূপ-স্পর্শাদি বিষয়ের সহিত চক্ষু ও ত্বকাদি ইন্দ্রিয়ের সংযোগবশতঃ যে সুখের অনুভব হয়, তাহা প্রথমে অমৃততুল্য অতিশয় স্বাদু বলিয়া অনুভূত হইলেও, পরিণামে নিরয়-প্রাপকহেতু বিষতুল্য দুঃখপূর্ণ হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি প্রেমরূপ অমৃত ছাড়িয়া বিষরূপ বিষয়ের কামনা করে, সে ব্যক্তি অত্যন্ত মূর্থ ।—

কৃষ্ণ কহে,—আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ ।

অমৃত ছাড়ি’ বিষ মাগে,—এই বড় মূর্থ ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২।৩০)

হেন দান্তযোগ ছাড়ি' আর যেবা চায় ।

অমৃত ছাড়িয়া যেন বিষ লাগি' ধায় ॥ (চৈঃ ভাঃ মধ্য চাঃ ৮২৮)

যে ব্যক্তি ভক্তিপথ পরিত্যাগপূর্বক সালোক্যাদি মুক্তি-পক্ষের পক্ষপাতী হয়, তাহার বিচার—অমৃত ছাড়িয়া বিবে জর্জরিত হইবার তুল্য ।—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোহনৃদেবমুপাসতে ।

তাত্লামৃতং ন বুঢ়াত্মা ভুংক্তে হৃদাহলং বিষম্ ॥ (ঈশ্বরপুরাণ)

যস্ত বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদনৃমুপাসতে ।

স হেমরাশিমুংস্রজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি ॥ (মহাভারত)

কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,

অমৃত বলিয়া যেবা খায় ।

নানা যোনি নদা ফিরে, কদর্যা ভক্ষণ করে,

তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥ (শ্রীল নরোত্তম)

যিনি কৃষ্ণপাদপদ্মের মধু পান করেন, তিনি পাপজনক বিষয়কে তুচ্ছ বলিয়া পরিত্যাগ করেন, পুনর্ব্বার তাহাতে রত হন না । কিন্তু যে-ব্যক্তি তাহা আশ্বাদন করেন নাই, তাহার চিত্ত কাম্যাত্তত । শ্রীভগবানের সমুদ্রমথনোদ্ভূত অমৃত-বিতরণ-লীলা অপেক্ষা ভক্তিরসামৃত বিতরণ-লীলা পরমচমৎকারময়ী এবং মহা-ঐশ্বর্যময়ী । কেন-না, সিদ্ধ-সুখা লঘুকারী মোক্ষ-সুধাকেও লঘু করে—ভক্তিরসসুখা অর্থাৎ ভোগানন্দকে লঘু করে মোক্ষানন্দ, আবার সেই মোক্ষানন্দ বা ব্রহ্ম-রসাস্বাদকে লঘু করে লীলারসাস্বাদন । প্রাকৃত লেখকের ‘অমৃতের সন্ধান’-পাঠ করিলে কখনও অমৃতের সন্ধান পাওয়া যাইবে না । অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তিই ভক্তসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থ অমূল্যলবণ্য করিয়া কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন ।

কৃষ্ণপ্রেমামৃত সেবনের দ্বারাই নিত্য অমরত্ব লাভ সম্ভবপর

ভক্তি—অমৃতস্বরূপিণী । সেই ভক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া জীব সিদ্ধ হন, অমৃতত্ব লাভ করেন এবং আনন্দপ্ত হন । “ও যল্লক্কা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতীভবতি তুপ্তো ভবতি” (নারদহৃত ১।৪-২) । কুপুত্র যেরূপ নিজদোষে পুত্রবৎসল পিতার গুণধনে বঞ্চিত হয়, আর সুপুত্র পিতৃধনে অধিকারী হইয়া পিতার যশ বিস্তার করে ; তদ্রূপ অভক্ত আনন্দের তাবশতঃ ভক্তবৎসল ভগবানের পাদপদ্মামৃত সেবাস্থখে সর্বদাই বঞ্চিত হয়, আর ভক্ত অহর্নিশ দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করিয়া ভগবানের মহিমা জগতে ব্যাপ্ত করেন । এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে রহিয়াছে,—

ইহৈব সন্তোহথ বিগন্তদ্বয়ং ন চেদ্ অবৈদির্মহাত্মিনষ্টিঃ ।

য এতদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি অথৈতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ॥

(বৃহঃ ৪।৪।১৪)

“ইহলোকে থাকিয়াই ভগবানকে জানিতে পারা যায়, যাঁহারা জানিতে পারেন, তাঁহারাঃ অমৃতত্ব লাভ করেন, আর অপরে যাঁহারা অজ্ঞ, তাঁহাদের মৃত্যু ও পুনর্মৃত্যু এবং জন্মে জন্মে দুঃখভোগ হয়।” কঠোপনিষদের (৬২) “য এতদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি” শ্লোকে পাওয়া যায়,—“যাঁহারা ভগবানকে জানেন, তাঁহারা অমৃত হন। মুণ্ডকের (৩২৯) “স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ..... গুহ্যগ্রন্থিত্যো বিমুক্তঃ অমৃতো ভবতি” শ্লোকেও উক্ত রহিয়াছে,—“যিনি সেই ভগবানকে জানিতে পারেন, তিনি গুহ্যগ্রন্থি হইতে মুক্ত হইয়া অমৃত হন।” “তমেবমন্ত আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মায়তোহমৃতম্” (বৃহঃ ৪।৩।১) শ্লোকে বলিয়াছেন,—“সেই অমৃতময় ভগবানকে জ্ঞাত হইলে, তবেই অমৃত হইতে পারিবে।” শাস্ত্রের অন্তরও পাওয়া যায়,—

তমেব বিদিত্বা আত্মত্বমেতি

নাশ্চঃ পশ্য বিজ্ঞতে অয়নায় । (শুক্ল যজুর্বেদ ৩।১৮)

“ভগবানকে জানিলে মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়—অন্ত কোন পন্থায় মৃত্যুকে জয় করা যায় না।”

যে পূর্বং দেবা ঋষয়শ্চ তদ্ বিদুঃ

তে তন্ময়া অমৃতো বৈ বভূবুঃ ॥ (শ্বেতাশ্বতর ৫।৬)

“দেবতা বা ঋষি—পূর্বতন যাঁহারা ই ভগবানকে জানিয়াছিলেন, তাঁহারা তন্ময় হইয়া অমৃত হইয়াছিলেন।” তুচ্ছ বিবরের আলোচনা ত্যাগ করিয় একমাত্র ভগবানকে জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে—যেহেতু তিনি অমৃতের সেতু। “তমেবৈকং জ্ঞানম্ আত্মানম্ অজ্ঞা বাচো বিমুক্তম্ অমৃতশ্চৈষ সেতুঃ” (মুণ্ডক ২.২।৫)। তাহাই বলা—যাঁহারা অমৃতত্ব অর্জন করা যায়। “বিদিত্বা অমৃতমশ্নুতে” (ঈশ ১১)। “ক্ষরং অবিদ্যা হমৃতং তু বিদ্যা” (শ্বেতঃ ৫।১)।

ভগবানের কথা অমৃতেরও অমৃত। জন্ম-মরণাদি কালকোভ্য ব্যাপারে আবদ্ধ না থাকায় সেই নিত্যকথা ব্রহ্মা-ঈশ্বাদিরও সেবা ও প্রার্থনীয়। শ্রীভাগবতে (ভাঃ ৩।২৯) ভক্ত ব্রহ্ম বলিয়াছেন,—“হে নাথ, আপনার নিজজনের ন্যায় আপনার চরিতকথা শ্রবণে যে আনন্দলাভ হয়, ব্রহ্মানন্দেও সেইরূপ আনন্দ অনুভূত হয় না, তখন কালদ্বারা খণ্ডিত স্বর্গ হইতে যে দেবগণের পতন হয়, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ?” কি কামনার পূর্ণতাজনিত পার্থিব সুখ, কি স্বর্গীয় সুখ, তাঁহারা তৃষ্ণা-ক্ষয়রহিত বিমুক্ত ভগবৎসেবা স্ত্রুথের ষোড়শাংশেরও একাংশ নহে।

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎসুখম্ ।

তৃষ্ণা-ক্ষয়-সুখশ্চৈত নাইতঃ বোড়শীং কলাম্ ॥ (মহাভারত)

যে অমৃতত্বে ক্ষয়-ব্যয় নাই, উদয়াস্ত নাই, অপচয়-উপচয় নাই, পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যু নাই, সেই অমৃতত্ব ভক্তগণ ভগবৎসেবার দ্বারা লাভ করেন । আধ্যাত্মিক সরণলীন জীব যে-কালে স্বীয় প্রাপঞ্চিক জ্ঞান ও কর্মের চেষ্টা প্রভৃতি ছাড়িয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, তখন ভগবৎপ্রাপ্তি হেতু তাঁহার কোন অভাব থাকে না । তিনি বৈকুণ্ঠবস্তুর সেবায় অমর হইয়া লাভ করেন এবং কুণ্ঠাধর্ম্মে বা মায়িক-ভোগে আর তাঁহাকে আবদ্ধ থাকিতে হয় না ।

—ত্রিদণ্ডিয়ারী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বোধায়ন মহারাজ

জীবের কৃত্য

(পূর্ববৃত্তান্তানুসারে)

জীবগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ শক্তি ও সনাতন তত্ত্ব—তাহা তিনি নিজেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ব্যক্ত করেছেন,—

“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কথতি ॥” (গীতা ১৫।৭)

অর্থাৎ—(ভগবান্ বলছেন) আমারই অংশভূত বিভিন্নাংশ সনাতন জীব এই জগতে প্রকৃতির উপাধিতে স্থিত মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে থাকে । এস্থলে জীব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ অর্থাৎ ব্রহ্মা, রুদ্রাদি ঈশ্বরের অংশ ন’ন এবং জীব সনাতন বা নিত্য হওয়ায় ঋণাকাশাদির ন্যায় কল্লিত ন’ন—ইহাই প্রতিপন্ন হয় । ‘মমৈবাংশঃ’, ‘জীবভূতঃ’, ‘সনাতন’—প্রভৃতি শব্দসমূহে জীবের নিত্যত্ব বিচার স্থাপিত হইয়াছে । আর’ যারা বলেন ব্রহ্ম মায়ার আশ্রয়ে জীব হয়েছে ও মারামুক্ত হলে ব্রহ্ম হবেন,—তাঁদের বিচার যে ভ্রমপূর্ণ তাহা প্রমাণিত হয়েছে । জীব বদ্যাবস্থা বা মুক্তাবস্থা—উভয় অবস্থার যে কোন অবস্থাতেই ভগবানের বিভিন্নাংশ তত্ত্ব ও সনাতন বস্তু । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্বাহ ও অবতারগণ স্বাংশ । এঁরা সকলেই শক্তিমত্ত্ব বা ঈশতত্ত্ব । কিন্তু বিভিন্নাংশ জীবগণ শক্তিতত্ত্ব তথা তটস্থা শক্তি বা অণু চিৎশক্তি । শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে,—

“অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
 স্বরূপ শক্তিতে তাঁ’র হয় অবস্থান ॥
 স্বাংশ-বিভিন্নাংশ-রূপে হৈয়া বিস্তার ।
 অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার ॥
 স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ভূহ অবতারগণ ।

বিভিন্নাংশ জীব তাঁ’র শক্তিতে গগন ॥” (টীঃ চঃ মধ্য ২২।৭-৯)

অণু সচ্চিদানন্দ জীব যেহেতু ভগবান্ কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ, সেইহেতু ভগবান্ কৃষ্ণ নিশ্চয়ই পূর্ণ সচ্চিদানন্দময় পুরুষ হবেন । শাস্ত্রে কৃষ্ণকে পূর্ণ সচ্চিদানন্দময় পুরুষ বলা হয়েছে । জগদগুরু বেদব্যাস সাক্ষাৎ ভক্তিয়োগ অবলম্বন করে ভগবান্ কৃষ্ণকে কিভাবে দর্শন করেছেন ? বেদব্যাস প্রথমে ব্রহ্মানুভবী ছিলেন । তিনি ব্রহ্মানুভূতি লাভ করেও জীবশিক্ষার জন্য অজ্ঞতার ভান করে বলেছেন,—“নাতি প্রসীদদ্ধৃদয়ঃ”—‘আমি মুক্ত হলেও আমার আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভ হয় নি ।’ উপনিষদ ও পুরাণাদিতে জ্ঞান-বৈরাগ্যাди সাধনের কথা কীর্তন করেও বেদব্যাস তাঁর গুরুপাদপদ্ম শ্রীনারদের নিকট নিজের অপ্রসন্নতার কথা জানালে নারদ বল্লেন—জ্ঞানাদি দ্বারা সমাহিত হয়ে যে ব্রহ্ম দর্শন, তাহা একদেশ দর্শন,—পূর্ণ দর্শন নয় । তাই তোমার আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভ হয় নি । চিন্মাত্র-স্বরূপ ব্রহ্ম ও আংশিক সবিশেষ-স্বরূপ পরমাত্মার অনুশীলন অপেক্ষা চিহ্নিসঙ্গী ভগবান্ কৃষ্ণের অনুশীলনে আনন্দের চমৎকারিতা ও বৈচিত্র্য সর্বাধিক আশ্বাদন হয় এবং তা’তেই আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভ হয় । ভগবদ্দ্রষ্টা শ্রীনারদ বল্লেন,—

“অথো মহাভাগ ভবানমোষদৃক্ শুচিশ্রবাঃ সত্যব্রতো ধৃতব্রতঃ ।

উরুক্রমশ্চাখিল-বন্ধমুক্তয়ে, সমাধিনাত্মস্বর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥” (ভাঃ ১।৫।১৩)

হে মহাভাগ, অমোষদর্শী, সত্যব্রত ও ধৃতব্রত বেদব্যাস তুমি নিখিল জীবের ভববন্ধ মোচনের জন্য সমাধির দ্বারা উরুক্রমের লীলা অনুস্মরণ কর । তখন ব্যাসদেব ভক্তিয়োগ-প্রভাবে সর্বোপাধি বিনিমুক্ত হয়ে নির্মলচিত্তে সমাহিত হয়ে লীলা-পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁর শক্তির কার্যগুলি দর্শন করলেন,—

“ভক্তিয়োগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেহমলে ।

অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥” (ভাঃ ১।৭।৪)

অর্থাৎ—ভক্তিয়োগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যকরূপে সমাহিত হ’লে ব্যাসদেব দেখলেন—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ—পূর্ণপুরুষ নিজ পরিকরগণের সঙ্গে চিন্ময় লীলা করছেন, আর তাঁর পশ্চাদ্ভাগে বহিরঙ্গ বা মায়াশক্তি গর্হিতভাবে আশ্রিতা আছেন এবং তদ্বারা মোহিত তটস্থ শক্তির পরিণাম জীবসকলও সদা বিত্তমান রয়েছেন ।

এইভাবে বেদব্যাস কৃষ্ণের পূর্ণত্ব দর্শন করলেন এবং তৎপরে জীবের অনর্থ উপশমের জন্য তিনি প্রীতির একমাত্র বিষয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দাম্ভ্য ভক্তিব্যোগ বিধানের জন্য দাম্ভ্যত-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করলেন । শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণব্রহ্ম এক গোপাদি তাঁর নিত্য পরিকর—তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণ ;—

“অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপ-ব্রজৌকসাম্ ।

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥” (ভাঃ ১০।১৪।৩২)

অহো নন্দগোপ-ব্রজবাসীগণের এক অনির্বচনীয় সৌভাগ্য এই—পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের পুত্ররূপে প্রকটিত হয়েছেন । পূর্ণ পরমানন্দ ব্রহ্মবস্তু সনাতন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদের মিত্র হওয়ায় তাদের মিত্রতাও সনাতন ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হয়েছে,—“সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ—কৃষ্ণের স্বরূপ” ।

(চৈঃ চঃ আদি ৪।৬১)

ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মার বাক্যে জানা যায়,—

“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গৌবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্ ॥” (ব্রঃ সং ৫।১)

অর্থাৎ—“সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোবিন্দ কৃষ্ণই পরমেশ্বর । তিনি—অনাদি, সকলেরই আদি এবং সকল কারণের কারণ ।”

“অঙ্গানি যশ্চ সকলেন্দ্রিয়বৃন্তিমন্তি

পশ্যন্তি পাস্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি ।

আনন্দচিন্ময়সমুজ্জলবিগ্রহশ্চ

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥” (ব্রঃ সং ৫।৩২)

অর্থাৎ—“সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ; তাঁর বিগ্রহ—আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়, সূতরাং পরমোজ্জল ; সেই বিগ্রহগত অঙ্গসকল প্রত্যেকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট এবং চিদচিৎ অনন্ত জগৎসমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন এবং কলন করেন ।”

এস্থলে প্রতীয়মান হয় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ সচ্চিদানন্দময় এবং জীব অণু সচ্চিদানন্দস্বরূপ । ভগবান্ ও জীবে যথাক্রমে পূর্ণতা ও অণুতা প্রযুক্তহেতু উভয়ের স্বরূপে ও স্বভাবে ভেদ থাকতে বাধ্য । ভগবান্ পূর্ণ চিৎ বা বিভূ চিৎ, আর জীব চিদকণ বা অণুচিৎ হওয়ায় আয়তনে জীব ভগবানের অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র ।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীগৌরধাম

ব্রজবনাভিন্ন, এই গৌরবন, শ্রীগৌরচাঁদের ধাম ।
চিস্তামণিময়, চিন্ময় কানন, যোগমায়াপুর-নাম ॥
পরিপূর্ণতম, পরমচেতন, চৈতন্যলীলার স্থান ।
এ ভূমি হ'তে, অচেতন ধরা, পেয়েছে গোকুল-দান ॥
যশোদানন্দন, শচীসুতরূপে, আসিয়া এ মায়াপুরে ।
আপনি আপন, শ্রীনামরতন, গাহেন মধুর সুরে ॥
লীলাময় হরি, দেখা অবতারি', প্রেমের বচা আনি' ।
কত করুণায়, জগৎ ভাসায়, প্রচারি' প্রেমের বাণী ॥
শ্রীরাধার ভাবে, বিভাবিত চিত, শ্রীরাধাকান্তি ধরি' ।
আপনি নিগূঢ়, প্রেমের মরম, আশ্বাদিলা গৌরহরি ॥
সেই কৃষ্ণ হেথা, গোরারায়-রূপে, নিজ পারিষদ ল'য়ে ।
উপাস্য হইয়া, উপাসক-বেশে, নাচিছে বিহ্বল হ'য়ে ॥
নর্তন কীর্তন, মৃদঙ্গ বাদন, মহা-সঙ্কীৰ্তন-রস ।
এই গৌরবনে, শ্রীবাস-অঙ্গনে, হইতেছে বারমাস ॥
প্রভু নিত্যানন্দ, অদ্বৈত-গদাই, শ্রীবাসাদি ভক্ত-সনে ।
গৌর-কৃষ্ণ হেথা, নিজ নামধন, বিলান পতিত জনে ॥
অধম দুৰ্গত, মায়াবদ্ধ জীব, নাহি জানে কৃষ্ণনাম ।
তাঁদেরি লাগিয়া, করুণাসাগর, আইলেন গৌরধাম ॥
এমন করুণা না মিলে উপমা, তুলনা কোথায় আছে ?
পতিতের তরে, যেয়ে ঘরে ঘরে, শ্রীনাম-অম্লিষ যাচে ॥
এই মায়াপুর, এখানে ঠাকুর, করেন কতই লীলা ।
আমার এ প্রাণ, বজর সমান, গলে না কঠিন শিলা ॥
চিস্তামণিময়, এই ধাম হয়, সচেতন তরুলতা ।
খগ-মৃগ-কুল, প্রেমেতে আকুল, গাহিতেছে কৃষ্ণগাথা ॥
হেথাকার ধূলি, পেতে কুতূহলী, ব্রহ্মাদি দেবগণ ।
হায়রে আমার, রুচি ত' হ'ল না, বরিতে সে ধূলিকণ ॥

শচীর আলয়, অদ্বৈত-ভবন, সঙ্কীৰ্ত্তন রাসস্থলী ।
 শ্রীচন্দ্রশেখর, আচার্য্য ভবনে, সুমধুর লীলাবলী ॥
 শচী-মালিনীর, কত প্রীতিময়, অপূৰ্ব্ব সেবার কথা ।
 সে কথা স্মরিয়া, আসে না ত' মোর, মানসে তন্ময়তা ॥
 আমি ত' কখন, না হেরি নু ধাম, মায়া-আবরণ-বশে ।
 চেতনের দেশে, আমি অচেতন, রয়েছি অবিজ্ঞা-রসে ॥
 অন্ধনয়ন, না হেরে চেতন, আমি অচেতন শব ।
 কর্ণে আমার, না পশিল কভু, শ্যামের বাঁশরী-রব ॥
 যে গোড়ীয় মঠ, নিখিল বিশ্বে, (মহা) মিলনের গীতি কয় ।
 সেথায় আমার, বিমুখ এ প্রাণ, ভেদ-বাদে মত্ত রয় ॥
 মায়িক পুরের, আমি অধিবাসী, না হেরি নু মায়াপুর ।
 যদি হেরিতাম, তবে কি আজিও, মায়া না হইত দূর ॥
 তবে কি আজিও, প্রাণ না সঁপিয়া, নিশ্চিন্তে থাকিতে পারি ॥
 যদি হেরিতাম, মায়াপুর-শোভা, চিত্ত হইত চুরি ॥
 ওহে গৌরজন ! ওহে গৌরবন ! কৃপা কর অভাজনে ।
 যে কোন দিন, হ'য়ে দীন হীন, বরি ধামধূলি-ধনে ॥

ষড়্গোস্বামীর অবদান ও বৈশিষ্ট্য

বন্দে গুরুনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্ ।
 তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্ৰীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞকম্ ॥
 শ্রীচৈতন্য-কৃপাভরৌ ভুবি ভুবো ভারাহস্তারকৌ ।
 বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুগুণৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥
 সংখ্যাপূৰ্ব্বক-নামগান-নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
 নিদ্রাহার-বিহারকা দি-বিজিতৌ চাত্যন্ত-দীনৌ চ মো ।
 রাধাকৃষ্ণ-গুণস্বতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
 বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুগুণৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥
 জয় রূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ ।
 শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ ॥

এই ছয় গৌসাইর করি চরণ-বন্দন ।

যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট-পূরণ ॥

সর্ববিষয়ে অযোগ্য, মাদৃশ অধমের পক্ষে এই বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপিত হইতে যাওয়াও এতটা অহঙ্কারের বিষয় । ইহা কিছু নূতন কথা নহে । তাই সর্বজন-বিদিত এই সত্য বিজ্ঞাপনের অপেক্ষা রাখে না । তথাপি নিজের অক্ষমতার কথা, অযোগ্যতার কথা পুনঃ পুনঃ ঘোষণা না করিলে অঙ্গহানি ঘটে এবং কৃপালু বৈষ্ণব-গণের নিকট হইতে করুণা প্রাপ্তিতে বিনয় ঘটিবার আশঙ্কায় এবং উৎকণ্ঠায় তারম্বরে নিজের দীনতা জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করে । অপিকারী ব্যক্তির লোক-শিক্ষার নিমিত্ত নিজ অপকর্ষ প্রদর্শনের চেষ্টার নাম 'দৈন্ত' । ইহা তাঁহার স্বাভাবিক মহানুভবতা । মাদৃশ পামরের পক্ষে যতই অযোগ্যতার বিশেষণ প্রয়োগ করি না কেন, কোনটিই তাহার গুণাবলীর যথোপযুক্ত হইবে না । কয়েকজন বিশিষ্ট শুদ্ধ-ভক্তের প্রেরণায় এবং আদেশে যে মহদবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে চলিয়াছি, তাহা এ অর্ধাচারীদের পক্ষে একান্ত পরিতোষ । অদোষদর্শী শ্রীগুরুদেব, পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ এবং কৃপাধুশি বড়গোস্বামীর অহৈতুকী করুণায় যাহা কিছু মৌনব্য প্রকাশিত হইবে, তৎসমুদয়ই তাঁহাদের স্নেহাশীর্ষাদের ফল । কিছু ভ্রম হইলে এই দীনাতি-দীনের অবিদ্যা, বিমূঢ়তা ও তমদাচ্ছন্নতার বহিঃপ্রকাশ । জীবহৃৎক্ষে কাতর, প্রম ককরুণ বৈষ্ণববৃন্দ তাঁহাদের স্বকীয় স্বভাবে এ বালখিল্যের সহজাত চপলতা মার্জনা করিয়া যুটের মঙ্গল অন্বেষণ করিবেন, এ দাসকে পর ভাবিবেন না, ইহাই একান্ত প্রার্থনা ।

অমৃধি অনন্ত জলরাশির অধীশ্বর হইলেও ইহা একেবারেই অপেক্ষ । অথচ দিনমণির প্রথর তাপে এই জল যখন বাষ্পাকারে আকাশে জমা হয় এবং অবশেষে মেঘাকারে যখন পৃথিবীতে অমৃতের ন্যায় বারি বর্ষণ হয়, তখন ইহা সম্পূর্ণ নিম্মল পরিশ্রুত জল । কিন্তু সূর্য্যের কিরণে এই সবশাক্ত জল পরিশ্রুত হইয়া মেঘরূপ ধারণ করা পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ঘটনাবলী আমাদের কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না । তাহার পর সেই মেঘ বারিবর্ষণ করিয়া সমাগরা বহুস্ররাকে শশিশ্রামলা করিয়া আবার নদীরূপে যখন সাগরে আসিয়া মিলিত হয়, তখন বারিধির কার্য্যাবলীর ফলশ্রুতির প্রকাশ দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত হই । আবার এই বৃষ্টি-রাশির গুণ ও কর্ম্ম এক হইলেও বিভিন্ন বৃক্ষরাজির বীজ ও প্রকৃতি বিভিন্ন হওয়ায় তাহাদের আকৃতিতে, গুণে ও ফলে বিভিন্নতা দেখা যায় । তদ্রূপ তিস্রূষ্যরূপী ভগবৎকিরণে অগাধ শাস্ত্র-সমুদ্র হইতে শ্রীগুরুদেবরূপী মেঘ হইতে পরিশ্রুত সিদ্ধান্ত-বারিদকল জীবকলাগোন্ধে অবিচ্ছিন্নভাবে অজস্র ধারায় বর্ষিত হইতেছে । কিন্তু

জীবের কর্মফল, রুচি ও অধিকারানুযায়ী তাহাদের ফলে তারতম্য ও বিভিন্নতা দেখা যাইতেছে।

‘গো’-শব্দে গাভী, গো-বৎস, গোপ, গোপী, গোকুল, গিরিরাজ-গোবর্দ্ধন ও ইন্দ্রিধ-সকলকে বুঝায়। ইহাদের সকলের প্রভু বা অধিপতিকেই স্বামী বুঝায়। এই অর্থে শ্রীগোবিন্দই একমাত্র প্রকৃত অর্থে ‘গোশ্বামী’। কিন্তু ‘রাজা’ বলিলে কেবলমাত্র একজন ব্যক্তিবিশেষ নহে, তাঁহার সহিত পাত্র-মিত্র, সভাসদ ও রাজ্যাদিকে একই সঙ্গে বুঝায়, কারণ ইহারা রাজারই অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইহারা ছাড়া রাজাকে কল্পনা করা অসাধ্য। তদ্রূপ ‘গোবিন্দ’ বলিলেও তাঁহার নিত্য পার্শ্বদাফি ও তাঁহার অনন্ত শক্তির প্রাভব ও বৈভবাদি বিন্যাস ও প্রকাশকেই বুঝিতে হইবে। আবার “কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকলি সঞ্চাবে”—ইহা হইতে তাঁহার একান্ত ভক্ত ও তাঁহার সমস্ত গুণেরই অধিকারী। অতএব ‘গোশ্বামী’ শব্দে গোবিন্দ এবং ‘তদনুরাগী জনানুগামী’ জনই গোশ্বামি-পদবাচ্য। এই সিদ্ধান্তে রূপ-সনাতনাদি ছাড়াও আমরা আরও গোশ্বামীবর্গের পরিচয় পাইয়া থাকি। কিন্তু ‘ষড়্গোশ্বামী’ বলিতে শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথভট্ট, শ্রীজীব, শ্রীগোপালভট্ট ও শ্রীরঘুনাথদাস গোশ্বামীকেই বুঝায়, অথচ কোনও গোশ্বামীকে বুঝায় না কেন, তাহার বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই তাৎপর্য ব্যাপ্তিগত ও সমষ্টিগত উভয়ভাবেই বিদ্যমান।

মহাপুরুষগণের জীবনই তাহাদের কার্য ও বাণী এবং তাহাদের কার্যাবলীই তাহাদের জীবন। ষড়্গোশ্বামীর পুত্র জীবনচরিত আমবা অনেকেই জানি। একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইব ইহাদের জীবনচরিতে ক্রমঃপন্থায় একটী সূক্ষ্ম যোগসূত্র রহিয়াছে; ইহা উপর হইতে নীচে বা নীচ হইতে উপরে যেভাবেই আলোচনা করি না কেন। ইহাতে আবার তর-তম ভেদরূপী অপরাধের অবকাশ যেন না থাকে। একটী বৃক্ষের যেরূপ মূল, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল সমস্তই অপরিহার্য অংশ, কিন্তু এই সমস্তেরই আবার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান; সমস্ত গুলি মিলিয়াই একটী পূর্ণাঙ্গ বৃক্ষ, কোনটিকেই বাদ দেওয়া যায় না—তদ্রূপ ষড়্গোশ্বামী মিলিয়া একটী পূর্ণাঙ্গ মহীকহ, যাহা আমাদের মত ত্রিতাপে দক্ষীভূত জীবকে শীতল ছায়া ও অমৃত ফল দানে তুষ্ট ও পুষ্ট করিয়া অমরত্ব দান করিতেছে। যদ্রূপ অনেক মহাপুরুষই মহাজন পদবাচ্য, কিন্তু ‘দ্বাদশ মহাজন’ বলিতে বিশেষ বারো জন মহাজনকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে, ইহাদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন শুধু বৃন্দাবনে বাস করিলেই হইবে না, বৈষ্ণবের গণ হইতে হইবে, শুধু নীলাচলে বাস করিলেই সকলের চরণ বন্দনা করিতে হইবে না, মহাপ্রভুর

গণ হইতে হইবে। শ্রীনবদ্বীপে বাস করিলেই হইবে না, মহাপ্রভুর ভক্ত হইলে তবেই তাঁহাদের চরণে অনুরক্ত হইবার কথা বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও যিনি যেখানেই বাস করুন না কেন শ্রীমন্নহাপ্রভুর সহিত যথাযথ সম্বন্ধযুক্ত হইলেই অর্থাৎ তাঁহার নীতি-আদর্শের সঠিক অনুগামী হইলেই তিনি সকলের পূজ্য। অন্ত্যায় সেই লোক-সমাজে গোস্বামী শব্দ গ্রহণ করুন আর মহাজন শব্দেই পরিচিত হোন না কেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃত সাধারণ জীব ছাড়া কিছুই নহে,—ইহাই শাস্ত্র-বিচার।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত সমগ্র সাধক ও সিদ্ধবর্গের একটি **Synopsis**। ১৪২৮ শকাব্দে তাঁহার আবির্ভাব। তাঁহার সমগ্র জীবনচরিতে তিনি আচরণপূর্বক দেখাইয়াছেন, একজন সাধারণ জীবেরও কিরূপ ত্যাগ, তিতিক্ষা, বৈরাগ্য ও উৎকর্ষা থাকিলে তিনিও সেই পরম অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন। শ্রীল দাস গোস্বামী লক্ষপতির একমাত্র বংশধর, অপরা-সমা স্ত্রী, একচ্ছত্র আধিপত্য, তথাপি তিনি দেখাইলেন—কৃষ্ণ-ভজনের যথোপযুক্ত অনুকূল পরিবেশ না হইলে এসবই পরিত্যাজ্য। তিনি সমস্ত পরিত্যাগপূর্বক একাধিকবার শ্রীমন্নহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন, কিন্তু প্রত্যেকবারেই শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন,—“স্থির হও ঘরে যাও না হও বাতুল। ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবদিক্কুল ॥ মক্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া ॥” কারণ জীব শুধু নিজের চেষ্টায় কখনও সরাসরি ভগবানের (সহিত সম্বন্ধ স্থাপন) বা সেবা লাভ করিতে পারে না। জীবকে সংসার-সমুদ্র পার করাইয়া চৈতন্য-বন্দরে পৌছাইয়া দিবার একমাত্র ভেলা হইলেন শ্রীল গুরুদেব। শ্রীগুরুতত্ত্বই হইলেন শ্রীনিত্যানন্দ। নিত্যানন্দই চৈতন্য-হেতু, নিত্যানন্দই চৈতন্য-সেতু। তাঁহার কৃপা ছাড়া শ্রীচৈতন্য-মন্দিরে প্রবেশ অসম্ভব। সংসার ত্যাগ করাও অসম্ভব।

শ্রীদাস গোস্বামী পানিহাটীতে এক জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরু দ্বাদশীর পুণ্যলগ্নে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন,—“চোর! এতদিন পর ধরা দিলে, ধরতে যখন পেরেছি, তখন তোমাকে দণ্ড দেব।” সত্যই ত’, গৌরহৃন্দের নিত্যানন্দের সম্পত্তি। ষাঁহার সম্পত্তি তাঁহাকে না জানাইয়া যে লুকাইয়া লইতে চায়, সে একশবার চোর, যে চুরির চেষ্টা করে সে-ও চোর। দাস গোস্বামী শ্রীমন্ত্রশিবে দণ্ড গ্রহণ করিলেন। শুরু হইল শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড-চিড়ার ‘দণ্ড-মহোৎসব’। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবীরভদ্রদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন

হরিনাম-সার

হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার ।
হরিনাম বিনা ভাই গতি নাহি আর ॥
আলস্ত ত্যজিয়া সদা ভজ হরিনাম ।
শ্রীনাম-প্রভাবে সত্য পাবে প্রেম ধাম ॥
শ্রীনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দৃঢ়রূপে জান ।
শ্রীনাম চিন্তয় তত্ত্ব মনে ইহা মান ॥
গাইয়া স্মরিয়া নাম সদা দৈন্ত মনে ।
নিরন্তর কাট' কাল শ্রীনাম-সেবনে ॥
তব সেবাগুণে তুষ্ট হইয়া শ্রীনাম ।
রূপ-গুণ-লীলা প্রকাশিবে গুণধাম ॥
নিজের চেষ্টাতে ভাই কিছু নাহি হয় ।
নামাশ্রয়-বলে সব পাই সুনিশ্চয় ॥
নিষ্কপটে দৃঢ় করি ধর হরিনাম ।
শয়নে স্বপনে নাম লও অবিরাম ॥
শ্রীনাম শ্রীপদে কর জীবন অর্পণ ।
নিরন্তর নামময় কর এ জীবন ॥
এরূপ হইলে তবে শ্রীনাম কি ধন ।
অচিরে জানিবে তুমি হইবে সজ্জন ॥
সকল অনর্থ যা'বে পা'বে নাম রস ।
নামরসে যা'বে ভেসে হ'বে নাম বশ ॥
শ্রীনাম সমান ধন ত্রিভুবনে নাই ।
গৌর মোরে কৃপা কর সদা নাম গাই ॥

শ্রীপত্রিকার নববর্ষ-প্রবেশ

শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গের বন্দনামুখে-মঙ্গলাচরণ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সপ্ত-চত্বারিংশ বর্ষ অতিক্রমপূর্বক নববর্ষে প্রবেশ করিলেন। বিগতবর্ষে শ্রীপত্রিকা শ্রীমন্নহাপ্রভুর বিসুদ্ধ প্রেমধর্মের কথা অমর-ব্যতিরেকভাবে প্রচার ও প্রকাশের প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহাতে কুকর্মী, কুজ্ঞানী, কুযোগিগণ নিকৃৎসাহিত হইলেও, শুদ্ধ গৌড়ীয়গণের আত্মতৃপ্তি পরিলক্ষিত হয়। প্রতিকৃষ্ণ-বর্জন না হইলে, আত্মকল্যাণ-গ্রহণ কখনই সম্ভব নহে। তজ্জন্ত বাস্তব গুণগ্রাহিগণ ভজনবিরোধী অগ্রাভিসাধিতাদি পরিত্যাগপূর্বক সাধন-ভজনাত্মকুল পরিবেশে অবস্থানকেই বাস্তব কল্যাণ বা আত্মাস্থিক মঙ্গলসাধনের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং অমর-ব্যতিরেক না অভিধা-লক্ষণাকে পাশাপাশি রক্ষা করিয়া তুলনামূলক আলোচনা ও অনুশীলনের ব্যবস্থা না থাকিলে যথার্থ মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়? তজ্জন্ত সর্বাগ্রে আমরা সর্ববিধ-বিনাশের নিমিত্ত শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী ও শ্রীনিমিহ-বরাহদেবের শরণাপন্ন হইতেছি। তাঁহাদের শুভেচ্ছা-শুভাশীর্ষাদিই ভজন-বিষয়ে-আমাদের একমাত্র পাথের ও সমল।

‘শ্রদ্ধা’-শব্দের ব্যাখ্যা ; শ্রদ্ধা দুই প্রকার :- লৌকিক ও শাস্ত্রীয়

ভক্তিশাস্ত্র ও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে আমরা জানিতে পারি, বিশেষ সৌভাগ্যবান্ জীবই ভগবৎকৃপা ও ভক্তকৃপা হইতেই ভক্তিতার বীজস্বরূপ শ্রদ্ধা লাভ করিয়া থাকেন। বাহ্যর শ্রদ্ধা লাভ হইয়াছে, তিনি পরম সৌভাগ্যবান্। শ্রদ্ধা হইতেই সৌভাগ্যের উদয়। শ্রদ্ধা হইতেই জীবাত্মার গুরুবৃত্তিধারাই গোলোক-বৃন্দাবনে পরম ভজনীয় বস্তুকে সেব্যরূপে লাভ করিবার সুযোগ হয়। শ্রদ্ধা-শব্দে সুদৃঢ় বিশ্বাসকে বুঝায়। আবার সুদৃঢ়-বিশ্বাস ও অন্ধ-বিশ্বাস পরস্পর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। অক্ষজ্ঞ জ্ঞানবরা জড়বস্তুতে আস্থা-স্থাপনের নাম—অন্ধ-বিশ্বাস। অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা অধোক্ষজ বস্তুকে কখনই অনুধাবন করা যায় না। ভাগ্যহীন ব্যক্তিগণই প্রাকৃত জ্ঞানের বশীভূত হইয়া ভজনীয় বস্তুর সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা পোষণ করিয়া বঞ্চিত হয়। বস্তুতঃ প্রকৃত শ্রদ্ধা তুচ্ছের বস্তুর অভিজ্ঞান-বিষয়ে অন্ধ-বিশ্বাস নহে। অধোক্ষজ সেব্যবস্তুর প্রতি শ্রদ্ধালাভের ক্ষেত্রে যে সাধুসঙ্গ হয়, তাহা জড় বা প্রাকৃত কোন বস্তু নয়। সুতরাং তাহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হওয়ায়, দৃশ্য জগতের প্রতি আস্থাহীন সাধু-শাস্ত্রের প্রতি আত্মগত্য ও প্রপত্তি-স্বীকারই যথার্থ শ্রদ্ধা-শব্দে অভিহিত।

ভক্ত ও নির্বিশেষবাদীর শ্রদ্ধার পার্থক্য

“শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।” সুতরাং শ্রদ্ধালুব্যক্তিই ভক্তি-প্রাপ্তির একমাত্র যোগ্য পাত্র। অশ্রদ্ধা বা অভক্তিতে অক্ষজ্ঞান সহল করিয়া ভক্তিপথে চলিতে গেলে, ঐ পথের সন্ধান কোনদিনই লাভ করা যায় না। অক্ষজ্ঞবাদী জ্ঞানী অন্ধ-বিশ্বাসের দ্বারা কখনই জ্ঞেয়বস্তুর সন্ধানে সফলকাম হন না। প্রাকৃত চেষ্টির দ্বারা জড়জগৎই দর্শন সম্ভব। অধিরোহ-পথাবলম্বী নিজের অনভিজ্ঞতা গোপন-পূর্বক ভগবদর্শনের ছলনা করিয়া নিজে বঞ্চিত হন এবং অপরকেও বঞ্চিত করিয়া থাকেন। তাহারা বাস্তব বস্তুজ্ঞানের অভাববশতঃ জড়মায়াকে জগতের মূলকারণ বলিয়া স্থাপন করেন। বস্তুতঃ তাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ অগ্ন্যভিলাষিতাদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অভক্তিমার্গকেই আশ্রয়পূর্বক পারলৌকিক অনিত্যভোগ বা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকেই পরম শ্রেয়ঃরূপে প্রমাণের অপচেষ্টির ব্যস্ত হন। ফলে অজ্ঞতাবশতঃ অন্ধ-বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহার বিচারানুসারে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতার একত্বহেতু তাহার মুক্তাভিমান বা গুরুভিমান অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং সাধন-ক্ষেত্রেই সিদ্ধি-প্রাপ্তির অপচেষ্টি নিষ্ফল হইয়া তাহাকে ভক্তিহীন ও মন্দভাগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করে।

স্বকৃতি ও ভক্তি-শব্দের ব্যাখ্যা

ভাগ্যবান্ জীব শ্রীগুরুদেব ও ভগবানের অহৈতুকী রূপালাভ করিয়া ভক্তি-সোপানের প্রাথমিক স্তর শ্রদ্ধা লাভ করেন। জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে জীবের যে স্বকৃতি উদয়ের কথা শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আছে, তাহা সাধু-সজ্জনগণও যথাযথভাবে স্বীকার করেন। জাতিশ্রম দেবর্ষি শ্রীনারদ আমাদিগকে তাঁহার পূর্বজন্মার্জিত স্বকৃতির কথা রূপাপূর্বক জানাইয়াছেন। আমাদের ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ-সময়ে অদৃষ্টরূপ স্বকৃতিলাভের সুযোগ-সুবিধা আছে,—ইহা দেবর্ষির আত্মজীবন-বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারি। সেই স্বকৃতি-বিচারে আমরা নিজ স্বকৃতিদ্বারা পরিচালিত হইয়া সাধু-শাস্ত্রের আত্ম-মঙ্গলময় উপদেশ লাভ করি। সাধুসঙ্গ-প্রভাবেই আমাদের শ্রবণ-কীর্তনের সৌভাগ্য উদ্ভিত হয় এবং সৌভাগ্যোদয়ে আমরা অন্ধ-বিশ্বাসকে পরিহারপূর্বক বাস্তব উপলব্ধি-দ্বারা সাধু-শাস্ত্রের সান্নিধ্যলাভ করি। অতএব সঞ্চিত-স্বকৃতির প্রভাবে জীবের সাধুসঙ্গ এবং তাহা হইতেই ভক্তিলাভ হয়, ইহাই ভগবদ্বক্তিত্বলাভের ক্রম-বিচার।

ভক্তি ও কর্মের পার্থক্য-বিচার

আমরা ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে যে-সকল কর্মোচরণ করি, তাহাই ‘ভক্ত্যঙ্গ’-নামে অভিহিত। আর ইহজন্মে বা পরজন্মে বা স্বীয় সুখভোগের আশায় স্বর্গসুখ, অথবা নিজ আত্মীয়-কুটুম্ব, গ্রামবাসী, স্বদেশবাসী, পৃথিবীবাসীর সুখের জন্য যে কর্ম অনুষ্ঠিত

হয়, তাহাই ‘কর্ম’-পদবাচ্য। শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে, তাঁহার প্রীতিকামনায় যাহা কিছু কৃত হয়, তাহাই ‘ভক্তি’। “ভজ্-ধাতু সেবায়াম্” অর্থাৎ সেবার নামই ভক্তি। একই কার্য্য ক্ষেত্রবিশেষে কর্ম, আবার অন্তর্ক্ষেত্রে ভক্তি হইতে পারে। শাস্ত্রোক্ত কর্মসমূহ যখন পুণ্য বা স্বর্গাদি-কামনায় অন্তর্ভুক্ত হয়, তখনই তাহা কাম্য বা নৈমিত্তিক কর্ম বলিয়া বিবেচিত।

মায়িক কর্ম্মাচরণে পুণ্যফলে বন্ধনদশা

জড়বদ্ধজীব কর্ম্মকল ভোগ করিতে বাধ্য এবং সেই কর্ম্মই আমাদের বন্ধনের কারণরূপে আমাদেরিগকে সংসার-দশায় নিক্ষেপ করে। কর্ম্মাচরণে জড়স্বথভোগের সঙ্গে দুঃখও পাশাপাশি বর্তমান। মায়িক সংসারে এমন কোন স্থখ নাই, যাহার পশ্চাতে দুঃখ লুক্কায়িত নাই। জড় সংসারে মায়িক স্বথভোগে বাস্তব শান্তি নাই। ভোগকালে কামনা-বাসনা উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতে থাকে। কামনার অতৃপ্তিতে দুঃখভোগ অবশ্যস্তাবী। নিরবচ্ছিন্ন স্থখ-শান্তি মায়িক সংসারে কখনই সম্ভব নহে। স্বর্গাদি-স্থখেও কামনা-বাসনার অন্ত নাই। আধিকারিক দেব-দেবীগণও কর্ম্মকল-বাধ্য। পুণ্যাদি সমাপ্ত হইলে স্বর্গচ্যুত হইয়া আবার সংসার—“কীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি।”

অহৈতুকী ভক্তিই আত্মার নিত্যবৃত্তি

ভগবদ্ভক্তিই আত্মার নিত্যবৃত্তি। শ্রীভগবান্—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, জীবাত্মার স্বরূপও চিৎ ; তজ্জন্তু শ্রীভগবানে ও জীবে নিত্য অভেদ বর্তমান। অচিৎ সংস্পর্শে জীব স্বাবর-জঙ্গমত্ব প্রাপ্ত হইয়া সংসার-দশা ভোগ করিতেছে। আর নিম্নলিখিত চিৎকণ জীব নিত্যকাল শ্রীহরিসেবায় নিযুক্ত। সে যখন অন্ধারিত হইয়া নিষ্কিঞ্চন সাধু-পদাশ্রয়পূর্বক শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে থাকে, তখন তাহার সংসার-দশা হইতে মুক্ত হইয়া অনর্থ-নিবৃত্তি হয়। পরে নিষ্ঠা, কৃতি, আসক্তি, ভাবক্রমে ভগবৎপ্রেমে অধিকারলাভ ঘটে—যাহা জীবের পরম প্রয়োজন ও পরম পুরুষার্থ। তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কামরূপ ত্রিবর্গাত্মক কর্ম্ম ও মোক্ষাভিসন্ধানরূপ অপবর্গ—এই চারি পুরুষার্থকে নরকতুলা জ্ঞানপূর্বক অহৈতুকী ভক্তিই যাজন করেন।

কর্ম্মজড় স্মার্তের ভক্তি-বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা

বহু কর্ম্মজড় ব্যক্তির ধারণা এই যে, কর্ম্ম করিতে করিতে তাহার ফলরূপে ভক্তি মিলিবে, যেহেতু তাহারাও পূজার্চনাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত তাহা নহে। কারণ জড়কর্ম্ম করিতে করিতে কেবলমাত্র প্রাকৃত কামনা-বাসনাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; সুতরাং কর্ম্মের ফল কখনই ভক্তি হইতে পারে না। সুতরাং প্রাকৃত কর্ম্মে ভক্তির গায় কিছু অন্তর্ধান দেখা গেলেও উহা কর্ম্মঙ্গ, কখনই ভক্ত্যঙ্গ নহে।

শ্রীভগবানই সর্বস্বাধা ও নিত্যসেবা হওয়ায়, যাবতীয় ভোগবাস্তা পরিহারপূর্বক একান্তভাবে তাঁহার সেবা করাই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। জীব যতদিন স্বীয় ভোগ-প্রচেষ্টায় ব্যস্ত থাকিবে, ততদিন তাহার কোন অনুষ্ঠানই ভগবৎপ্রীতিমূলক না হওয়ায় উহা কখনই অহৈতুকী ভক্তি-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। উহা আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক প্রাকৃত কাম্যাদি বলিয়াই জানিতে হইবে।

মিশ্রভক্তি হইতে শুদ্ধভক্তির বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব

কর্মজড় স্মার্তের অনুষ্ঠানকে মিশ্রভক্তি বলা যায় কিনা, তদন্তরে বলা যায়,— উহা মিশ্রভক্তি নহে; উহাকে বিদ্বা ভক্তি বলা যাইতে পারে। বিদ্বাভক্তি কখনই শুদ্ধভক্তি হইতে পারে না, উহা নিজভোগপর অনুষ্ঠান-বিশেষ। যেস্থলে ভগবৎসেবা বা ভক্তির জন্মই কেহ যত্নশীল এবং ভগবানকে নিত্যসেবাজ্ঞানে তাঁহার সেবায় মনোনিবেশ করা হয়, অথচ অনাদিকাল-সঞ্চিত বন্ধসংস্কার বন্ধমূল বা প্রাকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই, সে-ক্ষেত্রেও উহা মিশ্রভক্তি বলিয়াই গণ্য হইবে। সাধুসঙ্গ-কলে জীবের ঐ কর্ম-ভাব ক্রমশঃ ভগবৎরূপায় দূরীভূত হইয়া শুদ্ধভক্তি লাভ হয়, এইরূপ উদাহরণের অভাব নাই। মহারাজ ধ্রুব এস্থলে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভগবান্ তাঁহাকে দেবর্ষি নারদের সঙ্গদানে রাজ্যলাভরূপ দুর্কামনা পরিত্যাগ করাইয়া তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি প্রদান করেন। শ্রীপ্রহ্লাদ-মহারাজের ভক্তি আদৌ কর্ম-জ্ঞানমিশ্রা নহে। গর্ভবাস-কালেই তিনি দেবর্ষি নারদের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং কোন প্রাকৃত কামনা-বাসনা তাঁহার চিত্তকে কলুষিত করিতে পারে নাই। অতএব সাধুসঙ্গ ব্যতীত আমাদের শুদ্ধভক্তিলাভের আর কোন উপায়ান্তর নাই। তজ্জন্ম শাস্ত্র বলেন,—“কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।” “সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ—সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয় ॥”

শ্রীসমিতি হইতে প্রকাশিত ভক্তি-গ্রন্থাদি

এ বৎসর শ্রীসমিতি হইতে পরিশিষ্টসহ শ্রীল দাস-গোস্বামীর “শ্রীমনঃশিক্ষা” ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত “শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি”-গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ এবং “শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছেদ” বৃহদাকার ‘পঞ্চম সংস্করণ’ প্রকাশিত হইয়াছেন। শীঘ্রই “শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্র-রত্নমালার” আদি সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীসমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, মথুরা হইতে হিন্দিভাষায় ‘শ্রীগৌড়ীয়-কণ্ঠহার’, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের টীকা-সম্বলিত ‘শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা’ এবং ‘শ্রীভাগবত-পত্রিকা’ (মাসিক) শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছেন। সুধীসজ্জনবৃন্দ ঐগুলি আলোচনা করিলে পরম পরিতৃপ্ত হইবেন। পরিশেষে শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ ও শ্রীনৃসিংহদেব-চরণে দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপনপূর্বক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য সমাপন করিলাম।

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(রেজিষ্টার্ড)

ফোন-৪০০৬৮

শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠ

শ্রীচৈতন্য এ্যাভিনিউ, ডি-সেক্টর

পোঃ দুর্গাপুর-৭১৩২০৫ (বর্দ্ধমান)

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
৬ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
শুভাশীর্বাদে ও সমিতির বর্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমন্তুক্তি-
বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে আগামী ৬ই চৈত্র, ১৪০২
বঙ্গাব্দ (ইং ২০।৩।১৯৯৬) বুধবার শ্রীসমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীকৃতিরত্ন
গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মাণ্যমান শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-নিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীরাধা-
বিনোদবিহারীজীউর শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

এতদুপলক্ষে ৫ই চৈত্র (ইং ১৯।৩।৯৬) মঙ্গলবার ও ৬ই চৈত্র (ইং ২০।৩।৯৬)
বুধবার শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, অভিষেক, বৈষ্ণব-হোম, ধর্ম্মসভা ও
নগর-সঙ্কীৰ্ত্তনাদি সমিতির সহ-সভাপতি ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত নারায়ণ
মহারাজের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হইবে। সমিতির ও বিভিন্ন মঠের বিশিষ্ট
ত্রিদিগ্বিপাদগণ শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্বাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাঙ্গক যোগদান
করিলে সমিতির সদৃশগণ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে
যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির
সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী স্বকৃতি অজ্জিত
হইবে। ইতি—১লা ফাল্গুন, ১৪০২

শুদ্ধভক্ত-রূপাশেষপ্রার্থী—

সত্যব্রন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে জানিতে বা আনুকূল্যাদি পাঠাইতে হইলে
ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ-এ'র নিকট উপরিউক্ত
ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

—ঃ অনুষ্ঠান-সূচী :—

৫ই চৈত্র (ইং ১৯৩৯), মঙ্গলবার—

ব্রাহ্মমুহূর্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্তন ।

বৈকাল—৩ ঘটিকায় শ্রীনগর-সঙ্কীৰ্তন ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে মহাজন-পদাবলী ও অধিবাস-কীর্তন এবং
শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ।

৬ই চৈত্র (ইং ২০/৩/৩৯), বুধবার—

মঙ্গলারতি— প্রাতঃ ৪.৩০ টায় ।

সকাল—৮.৩০ মিঃ হইতে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহগণের অভিনেক,
শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণব-হোমাদি ।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ ।

সন্ধ্যা—৭ ঘটিকায় ধর্মসভা—‘শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব’ ও ‘সনাতন ধর্ম’ সম্পর্কে
বক্তৃতা ।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কাৰ্য্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্তন স্বীকার্য্য ।

বিশেষ নিবেদন

বর্তমানে সর্বত্র কাগজেঃ অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং মুদ্রণ-ব্যয়
বৃদ্ধি হইলেঃ আমরা সেবানুকূল্য বৃদ্ধি না করিয়া পূর্ব-নির্দ্ধারিত
অর্থানুকূল্যে গ্রাহকগণকে ত্রীপত্রিকা সরবরাহ করিতে মনস্থ করিয়াছি ।
তজ্জন্ম সহৃদয় গ্রাহকগণকে এককালীন অথবা এক বৎসরে চারিটী
সমান কিস্তিতে ১০০১ টাকা (এক হাজার এক) প্রদানপূর্বক
আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি ।

আশা করি, আপনারা আমাদের এই ক্ষুদ্র নিবেদন সহানুভূতির
সহিত বিবেচনা করিয়া ত্রীপত্রিকার পরিচালনা-কার্য্যে আমাদিগকে
সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন ।

বিনীত নিবেদক—

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

FORM—IV
STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND
PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER
SHRI GOUDIYA-PATRIKA

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers
(Central) Rules 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P. O. Nabadwip (Nadia), W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every
Bengali month i. e. once in month.
3. Printer's Name—Tridandi Swami Bhakti Vedanta
Acharyya Maharaj.
Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
Address—Shri Devananda Goudiya Math.
Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
4. Publisher's Name— Do
Nationality— Do
Address— Do
5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti
Vedanta Narayan Maharaj.
Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
Address—Shri Devananda Goudiya Math.
Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
6. Name and address of Tridandi-Swami Shri
individuals who won the Shrimad Bhakti Vedanta
newspapers and partners Baman Maharaj, President-
or share holders holding Acharyya on behalf of Shri
more than one percent of Goudiya Vedanta Samiti
the total capital,—

I, *Swami Bhakti Vedanta Acharyya* hereby declare that
the particulars given above are true to the best of my know-
ledge and belief.

Dated—29. 2. 96

Sd./Swami B. V. Acharyya
Signature of Publisher.



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।
অধোক্ক্ষেজে অহৈতুকী ভক্তি বিব্রশৃণু ॥

অল্ল ধর্ম স্মৃষ্টরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৮শ বর্ষ	১০ মধুসূদন, ক্ষীরোদশায়ী, ৫১০ শ্রীগোরাঙ্গ ৩০ চৈত্র, শনিবার, ১৪০২, ইং ১৩/৪/৯৬	২য় সংখ্যা
----------	---	------------

সান্নুবাদং

শ্রীশ্রীনবাব্টকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্যো নমঃ

গৌরীং গোষ্ঠবনেশ্বরীং গিরিধর-প্রাণাধিক-প্রেমসীং
 স্বীয়-প্রাণপরাক্ষ-পুষ্প-পটলী-নির্মল্য-তৎপদ্ধতিম্ ।
 প্রেমা প্রাণ-বয়স্যা ললিতয়া সংলালিতাং নর্মতিঃ
 সিক্তাং সূচু বিশাখয়া ভজ মনো ! রাধামগাধাং রসৈঃ ॥ ১ ॥

যিনি স্বীয় প্রাণসমূহ-রূপ পুষ্পশ্রেণীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পথকে নির্মল্য অর্থাৎ
 আরতি বা পরিষ্কার করিতেছেন, যিনি গিরিধর শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ হইতেও সমধিক
 প্রিয়তমা, প্রাণবয়স্যা ললিতা-কর্তৃক যিনি প্রেমদ্বারা সংলালিতা এবং বিশাখা-কর্তৃক

যিনি পরিহাস-বাক্যদ্বারা সুন্দররূপে পরিষিক্তা, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপৰ্য্যাপ্ত গুণশালিনী গোষ্ঠবনেশ্বরী গৌরী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ১ ॥

স্বীয়-প্রের্ত-সরোবরাস্তিক-বলৎ-কুঞ্জাতুরে সৌরভোৎ-

ফুল্লৎ-পুষ্প-মরন্দ-লুক-মধুপশ্রেণী-ধ্বনি-ভ্রাজিতে ।

মাগুন্মথ-রাজ্য-কার্যামসকুং সন্তালয়ন্তীং স্মরা-

মাত্য শ্রীহরিণা সমং ভজ মনো ! রাধামগাধাং রসৈঃ ॥ ২ ॥

সৌরভশালী পুষ্পের মকরন্দ-পানে অত্যন্ত লুক মধুপ-শ্রেণীর মনোহর শব্দে যাহা সুশোভিত—এমত স্বীয় প্রিয়তম রাধাকুণ্ড-সমীপে বিরাজিত কুঞ্জমধ্যে কন্দর্পরাজ-মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণের সহিত যিনি উন্নত মন্মথরাজ্যের কার্যসকল নিরন্তর অন্বেষণ করিতেছেন, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপৰ্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ২ ॥

কৃষ্ণাপাঙ্গ-তরঙ্গ-তুঙ্গিততরানঙ্গা-সুরঙ্গাং গিরাং

ভঙ্গ্যা লঙ্গিমঙ্গরে বিদধতীং ভঙ্গং নু তদ্রঙ্গিণঃ ।

ফুল্লৎ স্মের-সখীনিকায়-নিহিত-স্বাশীঃ সুধাস্বাদন-

লকোন্মাদ-ধুরোদ্ধুরাং ভজ মনো ! রাধামগাধাং রসৈঃ ॥ ৩ ॥

যাহার ইন্দ্রিয়গণ শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ-তরঙ্গদ্বারা অত্যন্ত বর্দ্ধিত কন্দর্পহেতু নৃত্য করিতেছে, যিনি বাক্য-কোশলে শ্রীকৃষ্ণকে কামসমর হইতে নিবর্তিত করিয়া হাস্তবদনা বয়স্রাগণের প্রদত্ত স্বীয় অভিলাষ-রূপ অমৃত পান করত অতিশয় উন্মাদে গর্বিতা হইতেছেন, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপৰ্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ৩ ॥

জিহ্বা পাশককেলি-সঙ্গরতরে নির্বাদ-বিশ্বাধরং

স্মিত্বা দ্বিঃ পণিভং ধরত্যঘহারে সানন্দ-গর্বেক্কুরে ।

ঈষৎ শোণ-দৃগন্ত-কোণমুদয়দ্রোমাঞ্চ-কম্প-স্মিতং

নিঘন্তীং কমলেন তং ভজ মনো ! রাধামগাধাং রসৈঃ ॥ ৪ ॥

“পাশ-ক्रीড়ায় জয়ী হইলে তুমি বারদয় মদীয় বিশ্বাধর-গ্রহণে অধিকারী”— শ্রীরাধিকার এই পণ স্বীকারপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ পাশক्रीড়া-রূপ মহাসংগ্রামে তাঁহাকে জয় করিয়া সানন্দে ও সগর্বে পূর্বপ্রতিশ্রুত তদীয় অধর-গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে, যে শ্রীরাধিকা ঈষৎ কটাক্ষ, রোমাঞ্চ, কম্প ও মধুর হাস্ত বিস্তারপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে লীলা-

কমলদ্বারা আঘাত করিতেছেন ; হে মন ! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপৰ্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ৪ ॥

অংসে ত্র্যস্ত করং পরং বকারিপোৰ্বাঢ়ং সুসখ্যোন্মদাং

পশ্যন্তীং নব-কানন-শ্রিয়মিমামুচুদ্বসন্তোদ্ববাম্ ।

শ্রীত্যা তত্র বিশাখয়া কিশলয়ং নব্যং বিতীর্ণং প্রিয়-

শ্রোত্রে দ্রাগদধতীং মুদ্রা ভজ মনো ! রাধামগাধাং রসৈঃ ॥ ৫ ॥

যিনি বকারি শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে স্বীয় বামকর সমর্পণপূর্বক তদীয় সুসখ্যভাবে অতিশয় উন্মত্ত হইয়া অভিনব বসন্তসমভূত নবকাননের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং যিনি বনমধ্যে বিশাখার সহিত হর্ষ ও প্রীতি-সহকারে শীঘ্র প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে সুবিস্তীর্ণ নূতন পল্লব পরিধান করাইতেছেন, হে মন ! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপৰ্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ৫ ॥

মিথ্যা-স্বাপমনল্ল-পুষ্প-শয়নে গোবর্দ্ধনাভ্রেণ্ডহা-

মধ্যে প্রাগদধতো হরমূর্লিকাং হত্বা হরন্তীং শ্রজম্ ।

স্মিতা তেন গৃহীত-কণ্ঠ-নিকটং ভীত্যাপসারোৎসুকাং

হস্তাভ্যাং দমিত-স্তনীং ভজ মনো ! রাধামগাধাং রসৈঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ গোবর্দ্ধন-পর্বতের গুহা-মধ্যে বিবিধ পুষ্পরচিত শয্যা অলীক-ভাবে নিদ্রিত হইলে শ্রীরাধা অগ্রে মুরলী হরণ করিয়া পশ্চাৎ মালা হরণ করিতে-ছিলেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ সহাস্তে তদীয় কণ্ঠের অধ্যপ্রদেশ স্পর্শ করায় যিনি ভয়-প্রযুক্ত পলায়নে উৎসুক হইয়া দুইহস্তে কুচদ্বয়কে দমন অর্থাৎ নিজায়ত্তীভূত করিয়া-ছিলেন, হে মন ! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপৰ্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ৬ ॥

তূর্ণং গাঃ পুরতো বিধায় সখিভিঃ পূর্ণং বিশন্তং ব্রজে

ঘূর্ণদ্রৌবতকাজ্জিক্তাক্ষি-নটনৈঃ পশ্যন্তমস্যা মুখম্ ।

শ্যামং শ্যাম-দৃগন্ত-বিভ্রম-ভরৈরান্দোলয়ন্তীতরাং

পদ্মা-গ্লানিকরোদয়াং ভজ মনো ! রাধামগাধাং রসৈঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র গোবৎস-সকল অগ্রে করিয়া শ্রীদামাদি সখাগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রজে প্রবেশ করিতে করিতে চঞ্চল যুবতীরূপের অভিলষিত নেত্র-নটনদ্বারা শ্রীরাধার বদনমণ্ডল দর্শন করিতেছিলেন, যিনি এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত স্বীয় দৃষ্টি-বিলাসদ্বারা ঐ শ্রীকৃষ্ণকে আন্দোলিত করিতেছেন এবং

যাঁহার আবির্ভাবে স্বীয় সৌভাগ্য প্রকটন-হেতু চন্দ্রাবলী-সখী পদ্মার গ্লানি উপস্থিত হয়, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপৰ্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ৭ ॥

প্রোতং কান্তি-ভরেণ বল্লব-বধূতারাঃ পরাধ্বাং পরাঃ
কুর্বাণাং মলিনাং সদোজ্জল রসে রাসে লসন্তীরপি ।
গোষ্ঠারণ্য-বরেণ্য-ধন্য-গগনে গত্যানুরাধাশ্রিতাং
গোবিন্দেন্দু-বিরাজিতাং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥ ৮ ॥

উজ্জল-রসবিশিষ্ট রাসলীলাতেও যাঁহাদিগের শোভা সতত দেদীপ্যমান, তাদৃশ গোপ-বনিতারূপ অসংখ্য তারকাগণকে যিনি প্রকৃষ্ট ও উজ্জলকান্তিধারা মলিন করিতেছেন এবং যিনি শ্রীবৃন্দাবনরূপ উৎকৃষ্ট ও ধন্য গগনপ্রান্তে অনুরাধারূপে বিবিধপ্রকারে সেবিতা হইয়া গোবিন্দ-রূপ চন্দ্র-সঙ্গে বিরাজ করিতেছেন, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপৰ্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ৮ ॥

প্রীত্যা স্মৃষ্ট নবাষ্টকং পটুমতিভূমৌ নিপত্যা স্মৃটং
কাক্কা গদগদ-নিস্বনেন নিয়তং পূর্ণং পঠেদযঃ কৃতী ।
ঘূর্ণমুত্ত-মুকুন্দ-ভৃঙ্গ-বিলসদ্রাধা-সুধা-বল্লবীং
সেবোদ্ভেক-রসেন গোষ্ঠ-বিপিনে প্রেম্না স তাং সিঞ্চতি ॥ ৯ ॥

যে স্মৃতিমান্ ব্যক্তি ভূমি-নিপতিত হইয়া স্থিরবুদ্ধিতে প্রীতি, কাকু ও গদগদ-স্বরে স্পষ্ট করিয়া অর্থবোধের সহিত এই নবাষ্টক নিয়ত পাঠ করেন, তিনি গোষ্ঠ-বিপিনে অর্থাৎ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণরূপ ভ্রমর যাঁহাতে মত্ত হইয়া ঘূর্ণন করিতেছেন, সেই বিলাসশালিনী রাধারূপ অমৃত-লতাকে প্রেম-সহকারে সেবারূপ উদ্ভিক্ত-রসদ্বারা সেচন করেন ॥ ৯ ॥

ধর্ম ও বিজ্ঞান

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৭ পৃষ্ঠার পর]

ক্রমোৎপত্তিবাদের হেয়তা ও দ্ব্যর্থতা

যখন আমরা আনন্দ ও বিষাদ, সুখ ও দুঃখ, বাক্য ও ক্রিয়া বিষয় চিন্তা করি, তখন তাহাদের উৎপত্তিক্রমের মূল জানিতে পারি না, কেবল যখন সৃষ্টিশক্তির তত্ত্ব

সিদ্ধান্ত করি, তখনই তাহা জানিতে পারি। ক্রমোৎপত্তিবাদী সাহসের সহিত কিন্তু প্রমাণশূন্য হইয়া বলিতে থাকেন যে, এই শক্তি জড়যন্ত্রোদিত এবং আত্ম-প্রত্যয়ের সম্বন্ধবিহীন। কি প্রকারে জড়যন্ত্রোদিত এবং আত্মপ্রত্যয় সম্বন্ধশূন্য কোন প্রকার শক্তি আধ্যাত্মিক স্বতন্ত্রতাপূর্ণ জীব সকলকে উৎপত্তি করিতে পারে, তাহা বিষয়ে ক্রমোৎপত্তিবাদী কোন সিদ্ধান্ত করিতে চায় না। পক্ষান্তরে তিনি স্বীকার করিয়া থাকেন যে এই তত্ত্বটি অপরিজ্ঞাত এবং অবিচিন্ত্য। তথাপি তাঁহার জড়বাদের অকর্মণ্যতা স্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় অবিচারপূর্বক তিনি বলিয়া থাকেন, যাহারা ক্রমোৎপত্তিবাদের সত্যতা সন্দেহ করেন, তাঁহারা অতদ্বজ্ঞ এবং বাদদূষিত।

জড়ীয় মতবাদ সমীক্ষা ও ভ্রম-প্রমাদাদি দোষযুক্ত

হারবার্ট স্পেন্সার, হাক্সলি প্রভৃতির উদ্ভাবিত বিজ্ঞান করণাপাটবে-সমুত্ত প্রমাদবিশেষ। অপক চিকিৎসক যেরূপ অযথা ঔষধ প্রয়োগদ্বারা সমস্ত শারীরিক পীড়া নিবৃত্তি করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, সেইরূপ আমাদের নব্য জড়বিৎ পণ্ডিতাভিমানিগণ জৈবজীবনের সমস্ত গুহতত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিবার অভিপ্রায়ে ক্ষুদ্র জড়বাদান্তর্গত বিধিসকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রমাদজনিত ক্লেশ না বুঝিয়া অমূলক স্বপ্নবৎ বিচার উপর বিশ্বাস করিয়া সকল বিষয়েরই তথ্য অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। জড়ীয় মতবাদ যে নিতান্ত নীমাবিশিষ্ট এবং ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবে পরিপূর্ণ—ইহা দেখাইয়া দিলে আধ্যাত্মিক জীবনের বিরোধে সেই ভ্রান্তদিগের শিক্ষা কিছুমাত্র কার্য্য করিতে পারিবে না।

খ্রীষ্টিয় মতের Soul ও বেদের আত্মা এক নহে

এই প্রবন্ধটি কোন খ্রীষ্টিয়ান লেখনী হইতে নিঃসৃত, ইহাতে সন্দেহ নাই। লেখক জড়বাদ অস্বীকারপূর্বক যেটুকু আধ্যাত্মিকবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা খ্রীষ্টিয়ান ধর্মোচিত সঙ্কোচিত আত্মবাদ মাত্র। খ্রীষ্টিয়ানধর্মে যে একটি 'Soul' শব্দ আছে, তাহা স্থাপনা করিতে গেলে নিতান্ত জড়বাদিদিগের মতের খণ্ডন করা আবশ্যক, কেন না জড়শক্তিগত বিধি সকলকে অতিক্রম করিয়া সেই Soul বর্তমান। পরন্তু খ্রীষ্টিয়ান মত-ভাবিত Soul যে শুদ্ধ আত্মা তাহা নয়। বেদশাস্ত্রে “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ মন্তব্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে যে আত্মার উদ্দেশ আছে সে আত্মা নিত্যন্ত জড়বাদ ও মিশ্র-জড়বাদ হইতে পৃথক্। খ্রীষ্টিয়ানের আত্মা মিশ্র জড়বাদের অন্তর্গত। মন ও মনের ধর্ম সমস্তই খ্রীষ্টিয়ানের আত্মা কিন্তু শুদ্ধ আত্মা মন হইতে অভ্যন্ত উচ্চ ও শুদ্ধ।

জড়বাদ অপেক্ষা খ্রীষ্টিয় আত্মবাদও শ্রেষ্ঠ

লিঙ্গ-শরীরকে খ্রীষ্টিয়ানগণ আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করেন। সেই বিশ্বাসের অন্তর্গত একটি স্বর্গ ও একটি নরকের কল্পনা করিয়াছেন ও সেই বিশ্বাসের অন্তর্গত একটি ঈশ্বর ও একটি সয়তানের বিশ্বাসকে অঙ্গীকার করেন। যাহা হউক খ্রীষ্টিয়ানগণ বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব অনুভব করিতে না পারিলেও সর্বপ্রকার জড়বাদীর পূজনীয়, কেন না সর্বপ্রকার জড়বাদেই আত্মতত্ত্বের অন্বেষণমাত্রই নাই। খ্রীষ্টিয়ানগণের স্থূল ও জড়বন্ধন-মুক্তি-পূর্বিকা আত্মপথে শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়—ইহাই তাহাদের মঙ্গলের বীজ। এই শ্রদ্ধাভাস জন্মজন্মান্তরে সংসদ্বরূপ স্মৃতি বলে অনন্তা ভক্তিতে শ্রদ্ধারূপে পরিণত হইবে। জড়বাদিগণ ভূতগণ। তাহাদের মরণান্তে জড়ধর্ম প্রাপ্তিই কল। “ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা” এই ভগবদ্বাক্যই ইহার প্রমাণ। “যাস্তি দেবব্রতা দেবান্” এই বাক্য দ্বারা খ্রীষ্টিয়ানগণ দেবতত্ত্বের স্বর্গলোক লাভ করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। বেদার্থবিৎ বৈষ্ণবগণ “যাস্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্” এই বাক্যক্রমে শুদ্ধ আত্মবস্তুর যাজন পূর্বক পরমাত্মস্বরূপ ভগবৎ-সেবা লাভ করেন।

জড়বাদিগণই ভূত-পূজক—‘ভূতেজ্যা’ এবং ইহাদের

সত্যতা আধুনিক ও আত্মিক

জড়বাদিদিগকেই ভূতেজ্যা বলা যায়, কেননা তাহারা জড়ভূত ও জড়ভূতদিগের বিধি ও জড়-শক্তি আলোচনা পূর্বক যতপ্রকার ক্রমোন্নতি ও ক্রমোৎপত্তি বিধি নির্ণয় করিয়াছে এবং সেই বিধিকে জগচ্চক্রের প্রধান বিধি বলিয়া মানিয়াছে। তাহারা মরণান্তে আত্মতত্ত্ব হইতে দূরীভূত হইয়া জড়মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ তাহাদের আত্মশক্তি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া জড়শক্তি প্রধান হইয়া জড়ীভূত হয়। ইহাদিগের অবস্থা শোচনীয়। ইহারা স্বয়ং বঞ্চিত হইয়া জগৎকে বঞ্চিত করিয়া থাকে। এই অপরাধেই তাহারা চরমে অধিকতর বঞ্চিত হয়। এই প্রকার ক্রমোৎপত্তিবাদ আধ্যাপকদিগের মধ্যে বহুতর অধঃপতিত পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ কালে কালে স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে কিছু মাত্র নূতনতা নাই। পাশ্চাত্য দেশে অতি অল্পকালই মানবের সত্যতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেখা যায়। সেই সব দেশে সূতরাং টিওল, হাক্সলি, ভারউইন প্রভৃতি পণ্ডিত মধ্যে পরিগণিত। পুরাতন কথা নূতন ভাষায় বলিলে যে পাণ্ডিত্যের দাবী করা যায় তাহাই তাহারা করিতে পারেন। চারি সহস্র বৎসর পূর্বে যে ভগবদীতা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহাতে আত্মর প্রবৃত্তি বর্ণনে “জগদাহরনীশ্বরং”, “অপরম্পরমভূতং” ইত্যাদি বাক্যে স্বভাববাদ, ক্রমোন্নতি ও

ক্রমোৎপত্তিবাদ এই সকল যে আশ্রয় প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়—তাহা কথিত হইয়াছে।

ক্রমোন্নতিবাদী ও ক্রমোৎপত্তিবাদিগণের প্রতি উপদেশ

এই সকল বাদ পরিত্যাগ পূর্বক আত্মতত্ত্বে প্রবেশ করা স্বার্থক জীবের কর্তব্য। জড় জগতের বৈচিত্র্য সমস্ত স্বীকার পূর্বক তাহাতে অধিকর্তার লীলা, আলোচনা করতঃ ভগবৎ প্রেমের অনুসন্ধান করা উচিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতবাদে আবদ্ধ থাকা বুদ্ধিমান পুরুষের কর্তব্য নয়। প্রক্রিয়ান্বেষী শিল্পীদিগের পক্ষে সেই সেই বিজ্ঞান মাননীয়। শিল্প-বিজ্ঞা ও বিজ্ঞান-বিজ্ঞাকে উন্নতি করিয়া তত্ত্ববিদগণের সেবা করাই কর্তব্য। আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ়, ঘাঁহারা তাহার আলোচনায় নিযুক্ত তাঁহাদের সামান্য শিল্প-বিজ্ঞানাদিতে আবদ্ধ হওয়ার অবসর নাই। এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের শরীর নির্বাহী ব্যাপার সকলের সাধনের জন্য অগ্নাত্ত সকলের চেষ্টা করা উচিত। হে ভ্রাত, ক্রমোন্নতিবাদি! হে ভ্রাত, ক্রমোৎপত্তিবাদি! তোমরা আপনাপন কার্য্যকর, তাহাতে তোমাদের এবং জগতের উভয়ের মঙ্গল হইবে। তোমরা অনধিকারচর্চাপূর্বক আত্মতত্ত্বের দোষগুণ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিও না। তোমরা ভাল মানুষ হইয়া কার্য্য করিলে আমরা তোমাদিগকে নিরন্তর আশীর্ব্বাদ করিব।

— জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রীগুরুকৃপা হইতে সব লাভ হয়; আমরা লঘু; আমাদের একমাত্র আশ্রয় শ্রীগুরুদেব। যিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। ভগবানের সেবাকারী বস্তুসকল ভগবানের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং ভগবানের আশ্রয়জাতীয় সেবকগণকে পৃথক্ বুদ্ধিতে সেবার বিচার আমাদের না হউক। বিষয়জাতীয় ভগবান্ কৃষ্ণ, আর আশ্রয়জাতীয় তাঁহার অভিন্ন সেবকগণ—কান্তাগণ, পিতামাতা, বন্ধুবর্গ, ভৃত্যবর্গ ও নিরপেক্ষ-ভেদে পাঁচপ্রকার। জড়চিন্তাপর বিশ্বতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইয়া যাওয়ার যে বিরাগ, তাহা ফল—তুচ্ছ। কৃষ্ণসেবায় যাহা না লাগে, তাহাতে বৈরাগ্য করিতে হইবে; চেতনসেবায় যাহা লাগিবে, তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করিব। নচেৎ “আধিক্যে ন্যূনতয়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।” অধিক বৈরাগ্য বা আসক্তি হইলে সুবিধা হয় না। “পরের সোনা দিয়ো না কাণে, প্রাণ যাবে তোমার হেঁচকা টানে।” তখন বিষয় লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে। বিশ্বে

যত দ্রব্য আছে, সে-সকল সেবাবিশ্বত জীবকে আকর্ষিত করিয়া নিজ ভোক্তাজ্ঞান করায়। দিব্যজ্ঞান-প্রাপ্ত ব্যক্তির বিচারে ঐ সকল কৃষ্ণভোগ্য। ভগবান্ হাত তুলিয়া যাহা দিবেন, তাহাই জীবের প্রাপ্য। ইহা না বুঝিয়া অতিরিক্ত গ্রহণ করিলে অশুবিধা। ভগবৎস্তু আমি গ্রহণ করিব—এ বুদ্ধি না হউক, তাহা হইলে আমাদের ইন্দ্রিয়-বিলাসের জন্য এ জগতে আসিতে হইবে। কৃষ্ণবিশ্বত হইলে জীব ভ্রান্ত হইয়া নানা দুর্গতি ভোগ করে। কেহ ব্রহ্মজ্ঞানে রত, কেহ পরমাশুসহ মিলিত হইবার চেষ্টা করে, কেউ বা অগ্যাভিলাষের ভূত্যাগিরি করে।

বর্তমান জগৎ মায়া হইতে উদ্ভূত। তাহাতে মেপে নেওয়া ধর্ম বিঘ্নমান; কিন্তু অধোক্ষজবস্তু মাপের অতীত। যশোদা কৃষ্ণকে বাঁধিতে যাইতেছেন, তাহাতে দুই আঙ্গুল (রজ্জু) কম হইয়া যাইতেছে। আধ্যাত্মিকসম্প্রদায় অক্ষকে অবলম্বন করিয়া যে অভিজ্ঞতা-বিশিষ্ট হয়, তাহা এখানে নিরস্ত হইয়াছে। ভাগবত বলিয়াছেন,—বিশ্বের বস্তুসকল সং নয়, মনে করিয়াছি মাত্র যে সং। জগতের চিন্তাশ্রোতে ভোগের কথা, আমি ভোক্তা, সব আমার ভোগ্য—এই সকলের চিন্তা। ভোগ করিতে গিয়া স্থখের জন্য যত্ন করা হয়, কিন্তু লাভ হয় দুঃখ, তাই জগৎ পুরুদুঃখদুঃখম্। পুরু—অতিশয় দুঃখ। মানুষকে বেকুব করিবার জন্য এ জগৎ। দৃশ্য পদার্থের অস্তিত্ব না থাকিলেও স্বপ্নদর্শনকারী যেমন উহা ভোগ করে, তদ্রূপ এ জগতের অবস্থা স্বপ্নাভ। বিষয়টী বুঝিলে, ভগবৎকৈঙ্কর্য জানিলে জানিতে পারি যে, এর স্থায়িত্ব ক্ষণভঙ্গুর। ভগবৎসেবা আরম্ভ করিলে নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিব। ইহার হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য নিত্যশুখ-বোধতত্ত্বের অনুসন্ধান করা আবশ্যিক। এখানের যাহা বিচিত্রতা, তাহা নিত্যবর্তমান থাকে না। ইহ জগৎ আমাদের বাস্তব স্থান নহে। মনুজন্ম বহু ইতর জন্মের পর লাভ হয়। মনুজন্মের প্রাণী যে ব্যাপারে অবস্থিত, সেইটুকুতেই যদি মানুষ ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের বৈশিষ্ট্য কি? আমরা যদি হিংসাবৃত্তি, কাম-ক্রোধাদি সংকলন করি, তাহা হইলে মৎসরস্বভাব হইলাম। তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইলে ভাগবত আলোচনা করা দরকার। পশুর স্বভাব—পরহিংসা, মৎসরগণের স্বভাবও তাহাই—পরশুখ অসহন। তাহারা কামাদি পাঁচটার অশুবিধায় পড়ে। সেইজন্য ভক্ত-স্বভাব অভক্তের চিত্তবৃত্তির সঙ্গে সমপর্যায়ে অবস্থিত নয়। তামসিক বৃত্তি সংহারে প্রবৃত্ত, রাজসিক প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত; সাত্ত্বিক সেরূপ নয়। ভাগবত বলেন,—নির্ম্মৎসর ব্যক্তিগণ অসং বস্তু লইয়া ব্যস্ত নহেন, তাঁহারা ভগবৎপাদপদ্ম আশ্রয় করেন।

উত্তমা ভক্তি

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৭ পৃষ্ঠার পর]

এখানে সংশয় হইতে পারে, যদি আনুকূল্য অর্থাৎ প্রাতিকূল্য-রাহিত্যই ভক্তি হয় এবং একমাত্র ভক্তিই কৃষ্ণের রুচিকর, তবে অনুশীলন এই বিশেষ্য-পদের আবশ্যকতা কোথায়? নিরর্থক এই বিশেষ্য-পদের প্রয়োগ কেন করা হইয়াছে? এই সংশয় দূরীকরণার্থেই এই অনুশীলন-পদের অবতারণা করা হইয়াছে। কেবলমাত্র প্রাতিকূল্যভাবেই ভক্তিকে সিদ্ধ করিতে পারে না। কেন-না, ঘটে প্রাতিকূল্যাব বিদ্যমান, তবে কি ঘটকেও 'ভক্তি'-সংজ্ঞা দেওয়া যাইবে? কখনও না। ঘটে প্রাতিকূল্যাব বিদ্যমান থাকিলেও 'অনুশীলন'-শব্দের দ্বারা যে চেষ্টা দ্যোতিত হয়, ঘটে ইহার অভাবহেতু ভক্তিত্ব সিদ্ধিতে বাধক হইতেছে। অতএব অনুশীলন-পদ নিরর্থক প্রয়োগ করা হয় নাই।

ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ বর্ণনানন্তর ভক্তির উত্তমতা সিদ্ধি হেতু শ্লোকের প্রারম্ভে দুইটী বিশেষণ পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে,—(১) অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্, (২) জ্ঞান-করাদি অনাবৃতম্। অনুশীলন কিরূপ হওয়া উচিত? ভক্তি বুদ্ধি হউক, ইহা ছাড়া কোনপ্রকার লৌকিক, পারলৌকিক অভিলাষরহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হইয়াছে,—ভক্তিধারাই ভক্তি হইয়া থাকে। 'ভক্ত্যা নজ্ঞাতয়া ভক্ত্যা' (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।৩১)—এই উক্তি অনুসারে ভক্তির উদ্দেশ্যেই ভক্তি (শ্রবণাদি সাধন-ভক্তি) করা কর্তব্য। ইহার তাৎপর্য এই—প্রেমভক্তির উদ্দেশ্যেই সাধন এবং ভাবভক্তি হওয়া উচিত। এইজন্য ভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত অভিলাষ-রাহিত্যই উত্তমা ভক্তি।

ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে—এখানে 'অন্যাভিলাষশূন্য' না বলিয়া 'অগ্ন্যভিলাষিতাশূন্য' কেন বলা হইয়াছে? ইহাতে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের রহস্যপূর্ণ অন্তর্নিহিত ভাব লুকায়িত রহিয়াছে। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু অনেক বিচার করিয়াই 'অগ্ন্যভিলাষিতাশূন্যম্' পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। অগ্ন্যভিলাষ-শব্দের অন্তে (স্বভাবার্থবাচক) শীলার্থে নি-নি প্রত্যয় এবং তদনন্তর ভাবার্থে তা-প্রত্যয়ের দ্বারা দেখাইতেছেন,—কোন সাধক-ভক্তের স্বাভাবিক স্থিতিতে ভক্তি ব্যতীত অগ্ন্য কোন অভিলাষ হওয়া উচিত নহে। কিন্তু অকস্মাৎ কোন সহট উপস্থিত হইলে সাধকভক্ত যদি প্রার্থনা করেন,—“হে ভগবন্! আমি তোমার ভক্ত, এই বিপদ হইতে রক্ষা কর”,—এইরূপ কচিং অভিলাষ হইলেও, ভক্তির হানি হইতেছে না। কেন না স্বভাব বিপর্যয়-হেতু অস্বাভাবিক স্থিতিতে এইরূপ

প্রার্থনা করিয়াছেন। এইপ্রকার অভিলাষ সাধকের স্বভাবসিদ্ধি নহে, ইহা জানিতে হইবে।

পুনরায় দ্বিতীয় গৌণ লক্ষণ বলিতেছেন,—‘জ্ঞান-কর্মাদি অনাবৃতম্’ অর্থাৎ ভক্তি-অনুশীলন জ্ঞান ও কর্মদ্বারা অনাবৃত হওয়া আবশ্যক। জ্ঞানের তিনটি অঙ্গ—তৎ-পদার্থ জ্ঞান, ত্বং-পদার্থ জ্ঞান, ও জীব-ব্রহ্ম ঐক্য জ্ঞান। তৎ-পদার্থের জ্ঞান,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরম তত্ত্ববস্তু, অদ্বয়জ্ঞান পরব্রহ্ম, সকলের আদি, স্বয়ং অনাদি, সমস্ত কারণের কারণ, ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য-গুণের পরম নিধান-স্বরূপ। ইনি সর্বদা প্রাকৃত গুণরহিত, অপ্রাকৃত গুণসম্পন্ন, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, সর্বশক্তিমান্, একাধারে রস এবং রসিক-স্বরূপ। ইনিই বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়—স্বয়ং-ভগবান্। এইপ্রকার জ্ঞানকে তৎ-পদার্থের জ্ঞান বলে।

ত্বং-পদার্থের জ্ঞান,—চিৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কিরণ-কণস্থানীয় চিৎ পরমাণু-স্বরূপ জীব। জীব ভগবান্ হইতে অভিন্ন হইয়াও নিত্য ভিন্ন। জীব—অণুচৈতন্য, ভগবান্—বিভূচৈতন্য, জীব—মায়াবশ, ভগবান্—মায়াধীশ, মুক্তাবস্থাতেও জীব তটস্থ-স্বভাবহেতু মায়াবশ-যোগ্য। জীব—জ্ঞান-স্বরূপ, জ্ঞাতা-স্বরূপ, জীবে কৰ্ত্তৃত্বও আছে, তথাপি অণুচিৎ। জীবে অণুস্বাতন্ত্র্যও বিদ্যমান—এইজন্য পরতত্ত্ব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। তাহার নিত্যপৃথক্ অস্তিত্বহেতু পরতত্ত্ব-স্বতন্ত্র। জীব কৃষ্ণের তটস্থ শক্তির পরিণাম হওয়ায় কৃষ্ণের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। এতদ্ব্যতীত ভগবানের অংশত্ব-হেতু ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি জীব-স্বরূপে বিদ্যমান হওয়ায়, কৃষ্ণের সহিত নিত্য সেব্য-সেবক-সম্বন্ধও রহিয়াছে। এই প্রকার জ্ঞানকে ত্বং-পদার্থের জ্ঞান বলা হয়।

জীব-ব্রহ্ম ঐক্য জ্ঞান,—জীব এবং ব্রহ্ম কোন ভেদ নাই, অবিদ্যা দূরীভূত হইলে জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়, ঐ সময় জীবের আর কোন পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। এবস্তূত জ্ঞানকে জীব-ব্রহ্ম ঐক্য-জ্ঞান বলে।

মূলশ্লোকে জ্ঞান-শব্দের তাৎপর্য্য জীব-ব্রহ্ম ঐক্য জ্ঞান, এবস্তূত জ্ঞানকেই নির্বিশেষ জ্ঞান বলে, এই নির্বিশেষ-পদবাচ্য জ্ঞান সর্বথা ভক্তিবিরোধী, কিন্তু উপরিউক্ত তৎ-পদার্থ এবং ত্বং-পদার্থ-জ্ঞান ভক্তির বিরোধী নহে। ভক্তিতে প্রবেশ করিবার জন্ত পূর্বলিখিত দুই প্রকার জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কিন্তু ভক্তিতে প্রবেশ করিলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেও বাহ্য বলিয়া ত্যাগের বিধি দেওয়া হইয়াছে। জীব-ব্রহ্ম ঐক্যজ্ঞানে জীব-ব্রহ্মের স্বরূপগত সম্বন্ধ অর্থাৎ সেব্য-সেবক-সম্বন্ধের উদয় কদাপি সম্ভব নহে। এই সেব্য-সেবক ভাবই ভক্তির প্রাণ। অতএব নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে সর্বদা দূরে থাকাই উত্তমা ভক্তির গৌণ লক্ষণ।

ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভক্তি তিনপ্রকার,—আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা এবং স্বরূপসিদ্ধা। স্বরূপতঃ ভক্তিত্ব অর্থাৎ আনুকূল্যভাবে সহিত কৃষ্ণানুশীলন ধর্ম্মই না থাকিলেও, নিজ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্ত ভগবৎ-প্রীত্যর্থ্যে তাঁহাকে কৰ্ম্ম এবং কৰ্ম্ম ফল অর্পণ করার নাম—‘আরোপসিদ্ধা ভক্তি’।

স্বরূপতঃ ভক্তিত্ব অর্থাৎ আনুকূল্য-অনুশীলন না থাকিলেও ভক্তির পরিকররূপে সংস্থাপিত হওয়ায় যাহার ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয়, তাহাকে ‘সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি’ বলা হয়। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদে—কৃপালু, অকৃতদ্রোহ আদি, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসাদি পালন, শীত-উষ্ণ সমান অনুভব করা, সর্বত্র ভগবানের অস্তিত্ব দর্শন, একান্তে বসবাস, গৃহের মমতা ত্যাগ করিয়া যথালোভে সন্তোষ ইত্যাদি যাহা ভাগবতধর্ম্মের আচরণ-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, তাহা স্বরূপতঃ ভক্তি না হইলেও ভক্তির সহায়ক। ষড়্‌বিংশ গুণ হইতে ভগবদ্ভক্তির যদি পৃথকীকরণ করা হয়, তাহা হইলে দয়া, মৈত্রী, তপস্শাদির ভগবানের সহিত কোন সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই। ভক্তির সহায়ক বা পরিকররূপে বিদ্যমান থাকিলেই ইহার ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয়। এইজগুই ইহাকে ‘সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি’ বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত প্রকার অভিলাষরহিত, জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত, আনুকূল্যময় শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণাদি চেষ্টা এবং তাব—‘স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি’। অর্থাৎ ব্যবধান-রহিত সাক্ষাৎরূপে শ্রীকৃষ্ণের জগুই কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কায়িক, বাচিক, মানসিক চেষ্টার নাম ‘স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি’। এইজগুই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রায়রামানন্দ-সংবাদে আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধা ভক্তিকে বাহ্য বলা হইয়াছে। এখানে ‘কর্ম্ম’-শব্দের দ্বারা স্মৃতিশাস্ত্রকথিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি আদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। ভক্তনোপযোগী সেবা পরিচর্য্যারূপ কর্ম্ম নিষিদ্ধ করা হয় নাই। ভক্তনীয় সেবা-পরিচর্য্যাди কর্ম্মসমূহ কৃষ্ণানুশীলনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, কখনই বর্জনীয় হইতে পারে না। জ্ঞান-কর্ম্মাদি-শব্দের দ্বারা কলুষবৈরাগ্য, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত অভ্যাসযোগ এবং তপস্শা ইত্যাদিও নিষিদ্ধ হইয়াছে। এখানে আর একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য,—এখানে শূন্য না বলিয়া ‘অনাবৃত’-শব্দ কেন প্রয়োগ করা হইয়াছে? ভক্তিবাদক জ্ঞান-কর্ম্মাদি নিষেধার্থে অনাবৃত-শব্দের অবতারণা, ভক্তিপোষক জ্ঞানকর্ম্মের জন্ত নহে। কেন-না, জ্ঞান-কর্ম্ম ব্যতিরেকে, সাধকের জীবন নির্বাহ সম্ভব নয়।

ভক্তির আবরণ দুই প্রকার,—(১) শাস্ত্রানুমোদিত নিত্যকর্ম্ম না করিলে পাপ হয়—এই ভয়ে, (২) স্মৃতিশাস্ত্র-কথিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ভক্তিরূপ অভীষ্টফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে—এইরূপ বিশ্বাস করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক

কর্ম করিলে ভক্তি আবৃত হইয়া থাকে, এইজন্য মহানুভব (উন্নত শ্রেণীর ভক্ত) লোকশিক্ষা ও লোকসংগ্রহের জন্ত, কখনও কখনও শ্রদ্ধা না থাকিলেও পিতৃশ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু উক্ত অনুষ্ঠান অশ্রদ্ধাপূর্বক করায় শুদ্ধভক্তির আবরক বা বাধক হয় না।

এখানে কৃষ্ণানুশীলনই কৃষ্ণভক্তি, এই অভিপ্রায় স্পষ্টীকরণার্থই কৃষ্ণানুশীলন-শব্দের অবতারণা করা হইয়াছে। কেন-না শ্রীমদ্ভাগবত, নারদপঞ্চরাত্নাদি ভক্তিশাস্ত্রে সর্বত্রই ভক্তি-শব্দের প্রয়োগ কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তির জন্তই করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই,—‘ভক্তি’-শব্দ কেবলমাত্র বিষ্ণুতত্ত্বের জন্তই ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

‘কৃষ্ণানুশীলন’-শব্দের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ, রাম, নৃসিংহাদি সমস্ত অবতারের অনুশীলনকেই বুঝিতে হইবে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে,—‘কৃষ্ণানুশীলন’-শব্দদ্বারা যদি সমস্ত অনুশীলনকেই বুঝায়, তবে গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের মূল গুরু শ্রীল রূপ গোস্বামি-কথিত উত্তমা ভক্তির সর্বোৎকৃষ্ট লক্ষণে গোড়ীয়গণের সর্বোচ্চ উত্তমা ভক্তির পরাকাষ্ঠার ইঙ্গিত থাকাও বাঞ্ছনীয়। এইজন্য শ্রীল গোস্বামীর অন্তরঙ্গ রহস্য মর্ম্মানুভবী রূপানুগগণের অন্ততম শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উক্ত শ্লোকের অনুবাদ নিম্নরূপ করিয়াছেন,—‘আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন’, এখানে ‘সর্বেন্দ্রিয়’-পদের দ্বারা ভক্তির সর্বোত্তম অবস্থার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। সর্বেন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন কেবলমাত্র মধুররসে ব্রজ-গোপীগণের দ্বারাই সম্ভবপর, অন্তের দ্বারা ইহা সম্ভবপর নহে। এমনকি, বাৎসল্যেও অসম্ভব। শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি ভক্তির স্বরূপ। এই সাধন-ভক্তির অনুশীলন একমাত্র ভগবৎ-প্রীতির জন্ত হইলে অতিশীঘ্র কৃষ্ণপ্রেম, তথা প্রেমপ্রাপ্তির পর উত্তরোত্তর মেহ, মান, প্রণয় আদি প্রাপ্তি হইতে পারে। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

“ভক্তিয়োগো ভগবতি তনাম-গ্রহণাদিভিঃ।”

এখানে কেবল ‘ভক্তিয়োগ’ বলিলেই চলিত, কিন্তু ‘ভগবতি’-শব্দ প্রয়োগের বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে—নাম-গ্রহণ, স্মরণাদি ভক্তির সমস্ত অঙ্গ যখন একমাত্র ভগবৎ-প্রীতির জন্তই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তখনই উহাকে ‘ভাক্তিয়োগ’ বলা হয় এবং এই প্রকার ভক্তিয়োগই প্রেমফল প্রদানে সমর্থ। ভগবৎপ্রীতি-বিধান ব্যতীত অন্যান্য উদ্দেশ্যে শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যাঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইলেও ভক্তিয়োগ বলা যাইবে না এবং উহার দ্বারা প্রেম-ফল প্রাপ্তি কখনই সম্ভব নহে।

—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈদ্য নারায়ণ মহারাজ

ক্ষণিকের অতিথি

হে মায়াবদ্ধ জীব! তুমি ত' ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমাত্মক প্রপঞ্চের অতিথি, নিত্য বাসস্থান ছাড়িয়া ক্ষণকালের জন্ত এখানে বেড়াইতে আসিয়াছ। তবে কেন চিরকালের জন্ত এখানে বসবাস করিবার আকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ করিতেছ? তুমি কি জান না, এই প্রপঞ্চ মায়াদেবীর রাজ্য অর্থাৎ মায়াদেবী এই প্রপঞ্চের অধিশ্বরী। কৃষ্ণবহিন্মূখ জীবকে শাস্তি দেওয়ার জন্তই তিনি সংসাররূপ কারাগার নির্মাণ করিয়াছেন। তালপাতার ছায়া যেরূপ অল্পক্ষণস্থায়ী এবং শীতলতা দানে অনমর্থ, তদ্রূপ পার্থিব জগতের সকলপ্রকার বস্তুই ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণ করিয়া নিত্যস্থখ দানে অপারগ। গুটিপোকা যেরূপ গুটি পাকাইতে পাকাইতে নিজের লালায় নিজে বদ্ধ হয়, তদ্রূপ জড়জগতের প্রতি অত্যধিক আসক্তি বর্দ্ধন করিতে গেলো মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া নিত্যকালের জন্ত নিজের মঙ্গলের পথ হারাইয়া ফেলিতে হয়। তুমি অতিথি হইয়াও অপরের (প্রকৃতির) জিনিষ লইয়া তাহার যথেষ্ট অপব্যয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছ কেন? পরের জিনিষ ভোগ করিতে তোমার কেন খুবই ভাল লাগে? 'পরের ধনে পোদ্ধারি' করিয়া 'গায়ে ছুঁ দিয়া' অর্থাৎ নির্ভাবনায় বাবুয়ানা ও স্ফুর্তি করিয়া তুমি যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, তাহাতে তোমার লাভ কি? আবার পরের গোয়ালের গরু লইয়া গোদান অর্থাৎ পরের ধন দান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিবার মধ্যেও তোমার বাহাদুরি কোথায়? সর্বদা মনে রাখিও, "পরের সোনা দিও না কাণে, কেড়ে নিবে হেঁচকা টানে।" অপরের অর্থাৎ মায়ার জিনিস ভোগ বা দান করিতে গেলে প্রতি পদক্ষেপে বিপদ অবশুস্তাবী।

পরশ্রমে থাকিলে কাহারও কখনও আত্মমর্যাদা থাকে না। "পরসদননিবিষ্টঃ কো লঘুত্বং ন যাতি।" মায়ার রাজ্যে চিরকালের জন্ত থাকিবার ইচ্ছা করিলে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'-এর তায় তোমার যে অবস্থা হইবে, তাহা কি তুমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছ না? তোমার মঙ্গলার্থে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' গল্পটী সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইতেছে।

এক ব্রাহ্মণের চার জামাতা ছিল। তাহাদের জ্যেষ্ঠের নাম হরি, মধ্যমের নাম—মাধব, তৃতীয়ের নাম—পুণ্ডরীকাক্ষ এবং চতুর্থের নাম—ধনঞ্জয়। এই চার জামাতা একসময়ে শ্বশুরালয়ে অনেকদিন বাস করায় শালকগণ বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে দূর করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে একদিন আহার-কালে ঘৃত না দেওয়ায় জ্যেষ্ঠ হরি অপমান বোধ করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু অন্য

তিনজন রহিয়া গেলেন। তখন অশ্রুদিন ভোজনকালে আসন না দেওয়ায় মধ্যম মাধব চলিয়া গেলেন। আর একদিন কদর্য্য অন্ন দেওয়ায় তৃতীয় পুণ্ডরীকাক্ষ প্রস্থান করিলেন, কিন্তু ধনঞ্জয় কিছুতেই গেলেন না। তখন শ্রালকেরা একদিন তাহাকে রীতিমত প্রহার করায় তিনি স্বশুরালয় ত্যাগ করিলেন। ইহ জগতে ‘গলায় গলায় পীরিত’ অর্থাৎ অতিমাত্রায় প্রীতি বা প্রণয় বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। “মা কুরু ধনজনযৌবন গর্বম্।” ধন, জন, যৌবনের গর্ব পরিত্যাগ কর, কারণ কাল এক মুহূর্তের মধ্যে এই সমস্ত হরণ করিয়া লইতে পারে।

যে মায়িক দেহের প্রতি মমতাবশতঃ গভীর আসক্তি প্রকাশ করিতেছ, তাহার স্বরূপ নিশ্চয় তুমি জান না। এই মায়িক শরীর—পঞ্চভূতদ্বারা নির্মিত, অস্থিরূপ স্তম্ভে বিধৃত, স্নায়ুরূপ রজ্জ্বদ্বারা বদ্ধ, রক্ত ও মাংসদ্বারা প্রলিপ্ত, চর্মদ্বারা আচ্ছাদিত, মূত্র ও বিষ্ঠাদ্বারা পূর্ণ, দুর্গন্ধময়, জরা-শোকে আক্রান্ত, নানা-প্রকার ব্যাধিমন্দির, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, অনিত্য, মহাক্লেশ ও কষ্টপাশে বদ্ধ। তোমার জীবনের অর্দ্ধেক সময় জড়স্থখে কাটাইলে, বাল্যকাল ও বার্লুক্যে কতদিন অতিবাহিত করিলে, যৌবনে স্ত্রী-সঙ্গে কামবিলাসে মত্ত হইলে, এই সমস্ত কালে ত’ ভগবানের সাধন-ভজন কিছুই করিলে না। যাহাদের প্রভু-অভিমান বা কর্তৃত্ব-অভিমান আছে, যাহাদের লাল্য-পাল্য আছে, ভগবান্ ব্যতীত যাহাদের অণু কেহ আছে বা কিছু আছে, যাহাদের গুরুদাস-অভিমান হওয়ার পরিবর্তে পতি, পিতা, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন প্রভৃতি মায়িক অভিমান আছে, তাহারাই সেব্যকে ছাড়িয়া স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সেবক-অভিমানে প্রমত্ত হইয়া উদ্বিগ্ন ও দুঃখ পায়—এই শাস্ত্রের কথা তুমি অনুক্ষণ স্মরণে রাখিবে।

উত্তপ্ত বালুকণায় জলবিন্দু দিলে তাহা যেমন তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া যায়, তদ্রূপ এই সংসারে পুত্র, মিত্র, স্ত্রী প্রভৃতি সমস্তই নশ্বর—এই আছে এই নাই। হে অতিথি! যে বিষয় আজ তোমার বলিতেছ, কাল তাহা নাশ পাইয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে; যে স্ত্রী-পুত্রকে আমার আমার বলিয়া এত আদর করিতেছ, তাহার মরিয়া কে কোথায় চলিয়া যাইতেছে, তাহাদের সহিত আর কোনও সম্পর্কই তোমার থাকিতেছে না; তথাপি এই সকলকে “আমার আমার” করিয়া তাহাতেই বৃথা আসক্ত হইয়া রহিয়াছ। ইহাই শ্রীভগবানের দুরতিক্রমণীয়া মায়া দূর্দান্ত প্রভাব। ভগবজ্-জ্ঞানের অভাববশতঃ স্বতন্ত্রতাই তোমাকে সর্বদা বিপন্ন করিতেছে। বহিরঙ্গা মায়া কৃষ্ণবিমুখ তোমাকে বিষয়বিগ্রহ করিয়া তুলিয়াছে—ভোক্তা-অভিমানে প্রমত্ত করিয়াছে। এখানে তোমার নিজ-স্বরূপের কথা তুলিয়া বিরূপগ্রস্ত হইয়া মায়িক অভিমানে কষ্ট পাইতেছ।

এই নখর দেহ ধারণ করিয়া কেবল 'আমার আমার' করিয়া মিছা মায়ায় মত্ত হইয়া গর্ব করিতেছ কেন? তোমার পশ্চাতে যে মৃত্যু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা কি একবারও ভাবিয়াছ? কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি দুর্বৃত্ত—সকলেই মৃত্যুর নিকট সমান। গর্ভ বা বাল্যকালে, যৌবন বা বৃদ্ধাবস্থায় সকলকে মৃত্যুবশ হইতে হইবেই হইবে। সগরাদি কত রাজা সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া কত পুণ্যকর্মের অতুষ্ঠান করিয়াছেন, কিন্তু সেইসকল কর্ম ও সেইসকল নরপতিও তিরোহিত হইয়াছেন, স্তবরাং সংসার অনিত্য। অনিত্য সংসারের উপর নির্ভর করিলে দুঃখ ও মৃত্যুই লাভ হইবে। কৃষ্ণবহিন্মুখ-সংসার করার ফলই প্রকৃত মরণ ও নানা আধি-ব্যাধিরূপ ত্রিতাপে জ্বলন। সংসারের চিন্তা-ভাবনা সমস্তই মরণের জন্ম, তাহা যে তোমাকে দিন দিন নরকের দিকে লইয়া যাইতেছে, উত্তরোত্তর দুঃখে নিম্বেপ করিতেছে ও করিবে—এই চিন্তা তোমার নাই; যেহেতু তুমি গৃহব্রত-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ।

মায়ায় কুহকে পড়িয়া তুমি তোমার নিজের স্বরূপ অর্থাৎ তুমি যে কে, তাহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছ। তোমার নিজের স্বরূপ হইতেছে, তুমি কৃষ্ণের নিত্য-দাস। এই সংসার হইতেছে বিদেশ-স্বরূপ, শ্রীব্রজধামই হইতেছেন তোমার নিত্য-স্বদেশ, তুমি বিদেশী-রূপে এই সংসার-বিদেশে আসিয়া তাহাতে আনক্ত হইয়া রহিয়াছ। যখন শরীর ক্ষণভঙ্গুর, সম্পদ অচিরস্থায়ী ও মৃত্যু নিত্য-সন্নিহিত, তখন হে ক্ষণকালের অতিথি, তোমার ধর্মসঞ্চয় করা সবিশেষ কর্তব্য। এই যে স্বজনবর্গ দেখিতেছ, ইহারা চিরস্থায়ী নহে, বৈভব আজ আছে, কাল নাই, শরীরের নাশ অবশ্যস্বাবী; অতএব হরিভজন করিয়া জীবন সার্থক কর।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত বোধানন্দ মহারাজ

শ্রীমদ্রহস্যপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে

ভক্তি-অর্ঘ্য

চৌদশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।

পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈলে শুভক্ষণ ॥

সিংহ-রাশি, সিংহ-লগ্ন, উচ্চ-গ্রহগণ।

ষড়্‌বর্গ, অষ্টবর্গ সর্ব-সুসক্ষণ ॥

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।

সকলক চন্দ্রে আর কোন্‌ প্রয়োজন ॥ (১৫: ৮:)

আজ শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তী-তিথি। এই শুভ-তিথিকে কেন্দ্র করিয়া দিকে দিকে শ্রীগৌরহৃদয়ের “কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ”—এই বাণীর জয়গানে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। আহুন, আজ আমরা আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দুর্লভ মানব-জন্মকে সার্থক করিয়া তুলি। ভারত-ভূমিতে জন্মিয়া মানবমাত্রেই জীবকে নিত্যদয়া বা কৃষ্ণোন্মুখী করা অবশ্য কর্তব্য। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন,—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।

জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥ (চৈঃ চঃ আদি ৯৪১)

রূপানুগ বৈষ্ণববর্গের তথা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আনুগত্যে কৃষ্ণনাম-প্রচারদ্বারাই সঙ্কীর্তন-পিতার নিত্যসঙ্গলাভ হয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিলেন,—

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।

আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥

কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ।

পুনরপি এই ঠাক্রি পাবে মোর সঙ্গ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৭।১২৮-১২৯)

অতএব, মহাপ্রভুর আদেশ পালনই আমাদের জীবাত্ম হউক।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লেখক শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ কৃপা করিয়া জগজ্জীবকে “চৈতন্যলীলা” নিত্যকাল শ্রবণ করিবার জন্য আবাহন করিয়া বলিলেন,—

শ্রব্যতাং শ্রব্যতাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মূদা।

চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্ত্যাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥

অলৌকিক লীলা প্রভুর, অলৌকিক রীতি।

বনিলেও ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি ॥

আত্মোপাস্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক জ্ঞান।

শ্রদ্ধা করি' শুন ইহা সত্য বলি' মান ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২৫-২২৬)

এক্ষণে শাস্ত্র “গৌর-তত্ত্ব” নিরূপণে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহারই বিক্ষিপ্ত অংশ কীর্তন করিয়া আমি আমার “ভক্তি-অর্ঘ্যের পাত্রটি পূর্ণ করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সম্বন্ধে শ্রুতি বলিলেন,

মহান্ প্রভুর্বে পুরুষঃ সত্ত্বশৈশ্ব প্রবর্তকঃ।

হুনির্মল্যামিমাং শান্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥

(শ্বেতাশ্বতর ৩।১২)

অর্থাৎ সেই পুরুষ মহান প্রভু অর্থাৎ স্বামী । তিনিই বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্তক । তাঁহার রূপাতেই সুনির্মল অর্থাৎ সর্বদোষ-বিবর্জিত শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় । তিনি জ্যোতির্ময় অর্থাৎ মূর্তিমান হইয়াও অব্যয় ; সাধারণ মূর্ত-পদার্থের দ্বারা তাঁহার ক্ষয়োদয় নাই ।

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণ,—

কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাহকৃষ্ণং সাক্ষোপাঙ্গাস্ত্র-পার্শ্বদম্ ।

যজ্ঞৈঃ সংকীৰ্ত্তন-প্রারৈষ্যজন্তি হি স্মমেধসঃ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩২)

অর্থাৎ ঐহার মুখে সর্বদা ‘কৃষ্ণ’ এই দুইটি বর্ণ, ঐহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্শ্বদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে স্মবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সংকীৰ্ত্তনপ্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিলেন,—

‘কৃষ্ণ’ এই দুই বর্ণ সদা ঐ’র মুখে ।

অথবা কৃষ্ণকে তিহৌ বর্ণে নিজস্বথে ॥

দেহ-কাস্ত্যে হয় তিহৌ অকৃষ্ণ-বরণ ।

‘অকৃষ্ণ’-বরণে কহে, পীত-বরণ ॥ (আদি ৩।৫৩, ৫৬)

গুরু, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত-ক্রমে চারিবর্ণ ।

চারিবর্ণ ধরি ‘কৃষ্ণ’ করেন যুগধর্ম ॥ (মধ্য ২০।৫৩০)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসাশ্রম সম্বন্ধে পুরাণ-প্রমাণ,—

অহমেব কচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাস্রিতঃ ।

হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্মরান্ ॥ (উপপুরাণ বচন)

অর্থাৎ হে ব্রহ্মন্ ! কোন বিশেষ কলিযুগে আমি সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয়পূর্বক পাপহত মানবসকলকে হরিভক্তি প্রদান করিব ।

শ্রীগৌরহরির ছন্দাবতার সম্বন্ধে আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের “ছন্নঃ কলৌ” শ্লোক পাইয়া থাকিলেও, এখানে আদিপুরাণের একটি শ্লোক লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম,—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ ।

ভগবদ্বক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্বদা ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমার এই প্রচ্ছন্নবিগ্রহ নিত্য । আমিই নিজরূপ গোপন-পূর্বক ভগবদ্বক্তরূপে লোকসমূহে ধর্ম-স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে সর্বদা রক্ষা করি ।

বৃহস্পতি-গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুই যে অবতারী স্বয়ং ভগবান্ তাহার উল্লেখ আছে । আমার ভক্তি-অর্ঘ্যের ডালিটি ক্ষুদ্র বলিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও, অল্প সম্ভার লইয়া

আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবার স্পর্ধা করিতেছি। ইহা আমার ত্রায় অধমের পক্ষে বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নহে। তবুও আশার সঞ্চার হইতেছে এই কারণে যে, আমি আমার গৌরহরির কথাই কীর্তন করিতেছি।

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার “অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরম্” শ্লোকে বলিলেন,—
“অঙ্গ-উপাঙ্গাদি বৈভব-লক্ষিত ভিতরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, বাহ্যে গৌরম্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্যকে কলিকালে সংকীর্ণনাদি অঙ্গের দ্বারা আশ্রয় করিতেছি।”

ভক্তের আহ্বানে যে ভগবান্ এই মর্ত্যে অবতার-লীলা গ্রহণ করেন, তাহা
শ্রীমমহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীতে পাই,—

শুতিয়া আছিহু ক্ষীর সাগর-ভিতরে।

নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর নাড়ার হৃদয়ে ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩২৮)

এখানে ‘নাড়া’ শব্দে মহাবিকুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকেই বুঝাইতেছে।
এইজন্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ অদ্বৈত প্রভুকে “গৌর-আনা ঠাকুর” নামে অভিহিত
করিয়াছেন।

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।

আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।১০২)

অতএব চৈতন্য-গোসাঞি পরতত্ত্ব-সীমা।

তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি, কি তাঁর মহিমা ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ২।১১০)

শচীগর্ভসিন্ধুতে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার অধোক্ষজতত্ত্বের কথা কৃষ্ণ-
বহিস্মুখ অক্ষজ অভক্তগণের অগম্য। শ্রীচরিতামৃত বলিলেন,—

দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।

উলুকে না দেখে যৈছে সূর্যের কিরণ ॥ (আদি ৩।৮৫)

ভাগবত, ভারতশাস্ত্র, আগম-পুরাণ।

চৈতন্য কৃষ্ণ-অবতার প্রকট-প্রমাণ ॥ (আদি ৩।৮৩)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর তত্ত্ব-নিকূপণে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ আদিতে
বলিলেন,—

কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।

শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস ॥ (১।৩১)

চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্য-গোসাঞি।

তাঁর গুরু অণু—এই কোন শাস্ত্রে নাই ॥ (১২।১৬)

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ একটী শ্লোকে মহাপ্রভুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কথা
সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—

নমো মহাবদান্তায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নামে গৌরস্বিষে নমঃ ॥

অর্থাৎ মহাবদান্ত, কৃষ্ণপ্রেমদাতা, কৃষ্ণ-স্বরূপ, কৃষ্ণচৈতন্যনামা, গৌরান্বিতরূপধারী প্রভুকে নমস্কার । শ্রীমহাপ্রভুর নাম—কৃষ্ণচৈতন্য, তাঁহার রূপ—গৌরবর্ণ, তাঁহার গুণ—মহাবদান্ততা এবং তাঁহার লীলা—কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান ।

তিনিই কলিকালে সংকীৰ্ত্তন-যজ্ঞের প্রবর্তক এবং সংকীৰ্ত্তন-যজ্ঞই যে সৰ্ব্বযজ্ঞের সার, তাহা চরিতামৃত রচনাকার উল্লেখ করিয়াছেন,—

সংকীৰ্ত্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।

সংকীৰ্ত্তন-যজ্ঞে তাঁ'রে ভজে সেই ধন্য ॥

সেই ত' স্তম্বেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার ।

সৰ্ব্বযজ্ঞ হইতে কৃষ্ণনাম যজ্ঞ-সার ॥ (আদি ৩৭৬-৭৭)

কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেম-প্রদানে পাত্রাপাত্র বিচার ছিল না । কিন্তু তাঁহার এই প্রেম-বন্তায় কুতর্কিক মায়াবাদিগণ নিজ-কর্মবিপাকে আশ্রয় লাভ করিতে পারেন নাই । চরিতামৃত বলিলেন,—

পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান ।

যেই ষাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেম দান ॥ (আদি ৭১২৩)

মায়াবাদী, কর্মনিষ্ঠ, কুতর্কিকগণ ।

নিদুক, পাষণ্ডী যত পড়িয়া অধম ॥

সেইসব মহাদক্ষ ধাত্রা পলাইল ।

সেই বন্তা তা সবারে ছুঁইতে নারিল ॥ (আদি ৭১২২-৩০)

এ বন্তায় যে না ভাসে, সেই জীব ছার ।

কোটিকল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার ॥ (অন্ত্য ৩২৫৩)

শ্রীচৈতন্য-কৃপাপাত্র পুরুষই শুদ্ধসিদ্ধান্ত জানিতে সমর্থ,—

হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ ।

এ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥ (আদি ৪১২৩৩)

শ্রীমহাপ্রভুর প্রচার-লীলাতে বর্ণাশ্রমভেদের বিচার ছিল না । তাঁহার লীলাতে তিনি সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের গর্বনাশ করিবার জন্য তত্ত্বভাব অঙ্গীকার করিয়া নীচ-শূদ্র রায়রামানন্দের দ্বারা সাধ্য-সাধনতত্ত্বের কথা জগতে প্রকাশ করিলেন । (ক্রমশঃ)

— শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

জীবের কৃত্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৭ পৃষ্ঠার পর]

কিন্তু ভগবান্ ও জীব গুণগতভাবে এক, যেহেতু উভয়েই সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। উদাহরণস্বরূপে বলা যায়,—সূর্যের এক একটা কিরণকণ পূর্ণ-সূর্য্যাপেক্ষা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কিন্তু সূর্য্য ও কিরণকণ—উভয়েই জ্যোতিঃস্বরূপ হওয়ায় গুণগতভাবে একই প্রকার। পূর্ণ সূর্যের শক্তি অপেক্ষা সেই সূর্যের একটা কিরণ-কণার শক্তি নিতান্ত নগণ্য। পূর্ণ সূর্য্য সর্বত্রই উপস্থিত থাকে, কিন্তু তার একটা কিরণকণ একস্থানেই উপস্থিত থাকে। ভগবান্ও সূর্যের মত সর্বত্রই তথা প্রতি অণু-পরমাণুর মধ্যে বিরাজমান, কিন্তু তাঁর অণুশক্তি জীব একস্থানেই অবস্থান করে। চিদ্বস্তুর ধর্ম্মানুযায়ী ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, অল্পভবশক্তি প্রভৃতি গুণগুলি ভগবানে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, আর অণুচৈতন্য জীবে তাহা অণুমাত্রায় থাকে। ভগবান্ সর্বশক্তিসম্পন্ন, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় হওয়ায় তিনি যে কোন সময় যে কোন ভাবে নিজকে প্রকাশ (manifest) করতে পারেন এবং যা খুশী তাই করতে পারেন। কিন্তু জীব অণুশক্তি-সম্পন্ন হওয়ায় অণু স্বতন্ত্র এবং পূর্ণবস্তুর ভগবানের অধীন তত্ত্ব। জড়বস্তুর চাহিদা জড় সম্পত্তি, আর চিদ্বস্তুর চাহিদা চিৎ সম্পত্তি। অণু সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রত্যেক জীবের তথা আত্মার চাহিদা একই প্রকার। অণুবস্তুর পূর্ণবস্তুরকেই চাইবে ও পূর্ণের দ্বারাই আকৃষ্ট হবে—এটাই স্বাভাবিক। জীব অণু সচ্চিদানন্দ বলে পূর্ণ সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ কৃষ্ণকেই চায়। জীব সচ্চিদানন্দ বস্তু হওয়ায় জগতের প্রতিটি অসৎ অচিৎ নিরানন্দ বস্তুর মধ্যেও সচ্চিদানন্দ পাবার জ্ঞান চেষ্টা করে। কিন্তু জাগতিক জড়ীয় বস্তুকে প্রীতি করে তাতে সচ্চিদানন্দের সন্ধান না পেয়ে নানাপ্রকার দুঃখ-তাপাদি ভোগ করে। জীবের সুখ-দুঃখাদি ভোগের কারণ কি? তদন্তরে গীতা বলেছেন,—

“সদং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি-সম্ভবাঃ।

নিবলন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥” (গীতা ১৪।৫)

অর্থাৎ—যে-সকল জীব কৃষ্ণ-বহিস্মুখতা দোষে জড়া প্রকৃতির আশ্রয় লাভ করে, জড়া প্রকৃতি হতে জাত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণত্রয় দেহমধ্যে অবস্থিত নির্বিকার চিৎস্বরূপ দেহী জীবসকলকে সুখ-দুঃখাদি ভোগে আবদ্ধ করে। জীব নিগুণ শুদ্ধসত্ত্বময় বটে, কিন্তু বদ্ধদশায় তার শুদ্ধ সত্ত্বটি গুণীভূত হয়েছে।

শাস্ত্রে জীবকে ভগবানের তটস্থা শক্তি বলা হয়েছে। যথা—পঞ্চরাত্রে শ্রীনারদ

বলেছেন,—“যতটস্থং তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদিনির্গতম্”—অর্থাৎ “চিচ্ছক্তি-নির্গত চিংকণ-জীবই তটস্থ।”

বিষ্ণুপুরাণ মতে,—“ক্ষেত্রজাখ্যা চ যা শক্তিঃ সা তটস্থা নিরূপিতা।

জীবশক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া জীবাস্তনেকধা ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৬১)

অর্থাৎ—“যে ক্ষেত্রজা-নাম্নী শক্তির বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, উহাই তটস্থা বলে নিরূপিতা হয়েছে। তাকেই জীবশক্তি বলে। সে শক্তি হ’তে অনন্ত জীবের উৎপত্তি হয়েছে।”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত হয়,—

“জীব নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।” (চৈঃ চঃ আঃ ৫।৪৫)

গীতাতেও ভগবান্ “অপরেয়মিতস্যস্থাঃ প্রকৃতিং.....” শ্লোকে জীবকে তাঁরই শক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। জীব যেহেতু শক্তিতত্ত্ব, সেইহেতু জীবের কোন কর্তৃত্ব নেই। কর্তৃত্ব নেই বলে জীব কর্তাও নয়। শক্তি কোথায় থাকে? শক্তি শক্তি-মানের আশ্রয়েই থাকে, অন্য কোথাও থাকে না। জীব তটস্থা শক্তি হওয়ায় তার অণু স্বতন্ত্রতা রয়েছে। চিদ্রূপ জীব যে পরিমাণে ক্ষুদ্র, সেই পরিমাণে স্বতন্ত্রতা ও সচ্চিদানন্দ ধর্ম তার মধ্যে বিজ্ঞমান। জীব কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ হওয়ায় কৃষ্ণের ইচ্ছা হ’তে ভিন্নাভিন্নাবলম্বী হয়েছে। জীব যদি সর্বদা কৃষ্ণের ইচ্ছায় পরিচালিত হ’ত, তা’হলে জীব বন্ধদশা প্রাপ্ত হ’ত না। জীব তটস্থাশক্তি হওয়ায় স্বাধীন ক্রিয়াবিশিষ্ট। ভগবান্ জীবের এই অণু স্বাধীনতায় বাধা দেন না। ভগবান্ জীবকে স্বাধীনতা দিলেন কেন? জীবের স্বাধীনতা না থাকলে জীবের পক্ষে উচ্চোচ্চ রস প্রাপ্ত্যধিকার সম্ভব হবে না। জীব স্বাধীন চেষ্টির দ্বারা কার্য্যাকার্য্য বিচার নিরূপণ করে যা’তে স্বতন্ত্রতার পূর্ণ সদব্যবহার করতে পারে, সেজন্য জীবের প্রতি কৃষ্ণের এবশ্রকার কৃপা প্রকাশিত হয়েছে। ‘তটস্থা’ অর্থে মধ্যবর্ত্তিণী। চিংকণ জীব চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যবর্ত্তী সীমায় অবস্থিত হ’লেও অণুত্বহেতু দুর্বল। জীব এতই দুর্বল যে কা’রও সহায়তা ব্যতীত দাঁড়াতে পারে না ও থাকতে পারে না। তাই জীব একবার চিজ্জগতের দিকে, ও আর একবার মায়িক জগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকে। এইভাবে জীব স্বতন্ত্রতা ধর্মবশতঃ চিজ্জগতের দিকে অথবা মায়িক জগতের দিকে—যে কোন একদিকে ধাবিত হয়। মায়াবদ্ধ জীবগণের মায়িকজগতে প্রবেশের পূর্বেই কৃষ্ণ-বহিস্মুখতারূপে অপরাধ সংঘটিত হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন,—

“যে-সব জীবের ভোগবাঞ্ছা উপজিল।

পুরুষ ভাবেতে তা’রা জড়ে প্রবেশিল ॥”

ভোক্তা অভিমানই পুরুষ ভাব। বন্ধজীব মাত্রেই ভোক্তাভিমানী হওয়ায় পুরুষ-ভাব পোষণ করে জড়ের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে।

মায়া ও জীব—উভয়েই ভগবান্ কৃষ্ণের শক্তি, তাই উভয়েই অনাদি ও নিত্য। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (১৩।২০) ভগবান্ বলেছেন,—“প্রকৃতিং পুরুষকৈব বিদ্যানাদী উভাবপি।” অর্থাৎ—প্রকৃতি (মায়া) এবং পুরুষ (জীব) উভয়কেই অনাদি জানবে। জড়ীয় কালের মধ্যে মায়া ও জীবের সৃষ্টি হয়নি। জড়া প্রকৃতি বা মায়াশক্তি কৃষ্ণে লীন ছিল, ভগবদ্ভিচ্ছায় কোন একসময়ে জড়ীয় কালকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়েছে। যে-সকল জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারক্রমে চিদ্রাজ্যে প্রবেশ করেন, তাঁরা ভগবৎসান্নিধ্যে পরমানন্দে মগ্ন হন; আর যারা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ক্রমে মায়ার সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হয়ে জড় বিষয়বস্তুতে মোহগ্রস্ত হয়ে মায়িক রাজ্যে প্রবেশ করেন, তাঁরা ত্রিগুণময়ী মায়ার কবলে পতিত হয়ে নানাপ্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে থাকেন।

বেদ বলেন,—

“যস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চাত্তো মায়ায়া সন্নিবদ্ধঃ ॥

মায়াস্ত প্রকৃতিঃ বিদ্যান্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্।

তস্মাবয়বভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥”

(শ্বেতাশ্বতর ৪।৯-১০)

অর্থাৎ—মায়াধীশ ঈশ্বর মায়াদ্বারা এই জড়বিশ্ব সৃজন করেছেন। এই জড়-বিশ্বে ঈশ্বর হ'তে ভিন্ন এক তরু জীব মায়াকর্তৃক আবদ্ধ হয়েছেন। মায়া একটা পরমেশ্বরের শক্তি ও মায়াধীশ পুরুষই পরমেশ্বর। সেই পরমেশ্বরের অবয়বদ্বারাই এই জগৎ ব্যাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে,—

“যয়া সন্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।

পরোহপি মনুতেহনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥” (ভাঃ ১।৭।৫)

অর্থাৎ—“সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হওয়ায় জীব মন, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মক জড়ের অতীত হয়েও আপনাকে জড় দেহ ও মন-বুদ্ধি জ্ঞান করে। তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিমানজাত কর্তৃত্বাদি-মূলে জীব সংসার বাসন লাভ করে।”—এই অবস্থাই জীবের বন্ধদশা।

এই জগৎটা কৃষ্ণের মায়াশক্তির পরিণতি হওয়ায় এই জগৎটা কৃষ্ণেরই ভোগের উপকরণ। এই জগতের যাবতীয় বস্তু কৃষ্ণের এবং তিনিই একমাত্র ভোক্তা। জীব কৃষ্ণের একটি ক্ষুদ্র শক্তি হ'য়ে কৃষ্ণেরই আর এক শক্তিকে ভোগ করতে পারে

না। মায়াশক্তি চিহ্নিত্রি ছায়া হওয়ায় মায়াশক্তির বিভূত্ব ও ব্যাপকতা আছে। জীব চেতন হলেও অণুমাত্র। তাই জীব অণুমাত্র হওয়ায় বিভূ মায়াশক্তির কাছে পরাভূত হয়। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, মায়া ত' জড়! জড়-মায়া আমাদের মত চেতন জীবকে কি সঙ্গ দিতে পারে? আমরা যখনই জড় বিষয়গুলিকে নিজেদের ভোগ্যরূপে গ্রহণ করি ও নিজেদের মায়াবদ্ধ বলে মনে করি, তখনই মায়া আমাদের গ্রাস করে।

কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে তাঁর মায়াশক্তি বিমুখমোহিনী হয়ে কৃষ্ণবিমুখ জীবগণকে তুচ্ছ ভোগের প্রলোভনে আবদ্ধ করে। মহাজন-পদ হ'তে আমরা জানতে পারি,—

“অতি তুচ্ছ ভোগ আশে, বন্দী হয়ে মায়া-পাশে,
রহিলে বিকৃতভাবে দণ্ড যথা পরাধীন।”

আমরা বরুদশায় এই জগতে এসে চিৎস্বরূপতা ভুলে জড়দেহে ও লিঙ্গ-দেহে আত্মাভিমান করে এক নূতন বিকৃত স্বরূপকে বরণ করেছি। আমাদের স্বাভাবিক চিদ্গুণাবলী জড় স্বভাব-রূপ ধূলিতে আবৃত হয়েছে। আমাদের বিস্তৃত চিৎস্বভাব এক্ষণে জড় স্বভাবের দ্বারা আবৃত হওয়ায় পূর্ণ চিদ্বস্তুর আকর্ষণ আমরা জড়াসক্তি হেতু উপলব্ধি করতে পারছি না। যেমন জাগতিক বস্তুতে দেখা যায়,—কোন বৃহৎ চুষক অতি ক্ষুদ্র চুষক-কণাকে আকর্ষণ করে, কিন্তু চুষক-কণাতে যদি কাদা লেগে থাকে, তা'হলে বৃহৎ চুষকের আকর্ষণ চুষক-কণাকে আকৃষ্ট করে না অর্থাৎ চুষক-কণার গায়ে কাদা লেপন থাকার জন্যই বৃহৎ চুষকের আকর্ষণ তা'তে লাগে না। মায়া অভিনিবেশ বা জড়াসক্তিরূপ উপাধি আমাদের চিৎস্বভাবকে আচ্ছাদন করে থাকায় আমরা ভগবান্ কৃষ্ণের আকর্ষণ অনুভব করতে সমর্থ হই না। আমাদের এই দেহটা জড় প্রকৃতিজাত অর্থাৎ মায়া-জাত। চর্ম, মাংস, রক্ত, অগ্নি, মজ্জা, মেদ ও শুক্র প্রভৃতি সপ্ত-ধাতু-নির্মিত এই স্থূল দেহটাকে ‘আমি-আমার’ বোধ করে দেহ ও দৈহিক বস্তুগুলিকে ভোগ্যরূপে আমরা যে প্রীতি করি, তা'তে মায়ার প্রতি আমাদের প্রীতি হয়ে যায়। মায়ার প্রতি এই আকর্ষণই কৃষ্ণ-বিমুখতা। এই কৃষ্ণ-বিমুখতা যাবে কি করে? মায়া কৃষ্ণের বশবর্তিনী। তাই মায়াদেবীর প্রভু কৃষ্ণের শরণাপন্ন হ'লে তাঁর কৃপা ও ইচ্ছায় মায়ার হাত থেকে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারব, নচেৎ অন্য কোনও উপায়ে মায়া হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। ভগবান্ কৃষ্ণের কৃপা হ'লে তিনি ইচ্ছামাত্রেই তাঁর শক্তি মায়াকে অপসারিত করে দিতে পারেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—

“দৈবী হ্যেবা গুণং য়ী মম মায়া দুৰতয়া।

মামেব যে প্রপত্তন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥” (গীতা ৭।১৪)

অর্থাৎ—“আমার এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া অতীব দুর্ভিতক্রমণীয়া । তথাপি যারা একমাত্র আমাতেই শরণাগত হন, তাঁরাই শুধু এই দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করতে পারেন ।” ভগবানের ভাষায়—“মামেব যে প্রপদন্তে”—বনার উদ্দেশ্য, মায়াকে অতিক্রম করতে গেলে একমাত্র ভগবান্ কৃষ্ণকেই আশ্রয় করতে হবে ; মায়াদেবী দুর্গা, শিব, সূর্য্য, গণেশ, ইন্দ্র প্রভৃতি কোন দেবতাকে আশ্রয় করলে মায়াবদ্ধতা বিমোচন হবে না । দেবী মহামায়ার কাছে যারা ‘মা মুক্তি দাও’—বলে প্রার্থনা করে, তা’রা কি মায়া থেকে মুক্ত হ’তে পারে ? (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

ষড়্গোস্বামীর অবদান ও বৈশিষ্ট্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩২ পৃষ্ঠার পর]

এইবার দাস গোস্বামী নীলাচলে পলাইয়া আসিতে সমর্থ হইলেন, ১৪৫৫ শককে মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে । মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভুর হস্তে সমর্পণ করিলেন, নাম হইল—স্বরূপের রঘু । তাঁহার নিকট তিনি সমস্ত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত, বৈষ্ণব-আচার শিখিলেন হাতে-কলমে । এরপর তিনি দেখাইলেন যথাযথ ভজন করিতে হইলে দেহ-সম্বন্ধীয় সমস্ত আহার-বিহারাদির নিমিত্ত সকলও ত্যাগ করিতে হইবে । অনায়াসলব্ধ যাহা কিছু, তাহাতেই জীবন নির্বাহ করিতে হইবে । “রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষণের রেখা ।” রঘুনাথের বৈরাগ্যে প্রভুর অশেষ সন্তোষ । দাস গোস্বামী মহাপ্রভুর দেওয়া নিজের বুদ্ধির গুজাহার আর গোবর্দ্ধন-শিলার অর্চন করেন, আর রাত্রিকালে সকলের অগোচরে প্রভুর পদসেবা করেন এবং লীলাবেশে মহাপ্রভু যখন বাহজ্ঞানশূন্য হন, তখন তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন ।

এইভাবে তাঁহার আট বৎসরকাল নীলাচলে অতিবাহিত হইলে পর একদিন শ্রীচৈতন্যচন্দ্র অন্তর্মিত হইলেন । স্বরূপ-দামোদর প্রভুও বেশীদিন বিপ্রলভ-ভাব সহ্য করিতে না পারিয়া অতিশীঘ্র মিলন-রসে মিলিত হইলেন । শ্রীরামানন্দ রায়ও সাথে সাথে লীলাসম্বরণ করিলেন । মহাপ্রভুর বিরহে রঘুনাথ গোস্বামী অতিকষ্টে জীবন-ধারণ করিয়াছিলেন । এইবার তাঁহার পক্ষে জীবন-ধারণ করাও অসম্ভব হইয়া পড়িল । তিনি প্রাণত্যাগের মানসে শ্রীধূন্দাবন যাত্রা করিলেন । এইভাবে

তিনি দেখাইলেন, যে-স্থানে স্বজাতীয়-স্নিগ্ধ বৈষ্ণব নাই, হউক না কেন সেই স্থান পুরুষোত্তম শ্রীক্ষেত্র-ধাম, ভগবানের সাক্ষাৎ বিরাজভূমি, একান্ত ভজন-পরায়ণ ব্যক্তিকে সেই স্থানও ত্যাগ করিতে হইবে। সেইজন্ত তিনি শ্রীবৃন্দাবন-ধামে শ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গলাভের নিমিত্ত চলিয়া আসিলেন। তিনি অধিকারের অবস্থানুযায়ী এক একটী ত্যাগের মাহাত্ম্য ও প্রয়োজনীয়তা দেখাইলেন। তখন তাঁহার বয়স ২৭ বৎসর।

বৃন্দাবনধামে তিনি শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে ভজন করিতেন। অন্ন-জল, অগ্ন্য-কখন ত্যাগ করিলেন, এক গণ্ডুষ মাঠা মাত্র তাঁহার সমস্ত দিনের আহার। শরীর ক্ষীণ ও দুর্বল, তথাপি তাঁহার একবিन्दু নিয়ম ভঙ্গ নাই। “যতপি শুষ্কদেহ বাতাসে হেলয়। তথাপি নির্লব্ধ-ক্রিয়া সব সমাধয়।” সংখ্যাপূর্বক নামগান ও দণ্ডবৎ-প্রণাম, আট প্রহরের মধ্যে সাড়ে-সাত প্রহরই ভজনাবেশে মত্ত থাকেন, চারিদণ্ড মাত্র নিদ্রা। যেদিন লীলাবেশে মত্ত থাকেন, সেদিন নিদ্রাও নিদ্রিত থাকে। তারপর একদিন শ্রীরূপগোষামী ও শ্রীসনাতন গোষামীও লীলা সম্বরণ করিলেন। তখন আর তিনি সেই বিরহ সহ্য করিতে পারিলেন না। এইসময় তাঁহার কাছে থাকিতেন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং শ্রীজীব গোষামী।

‘শ্রীগৌরাঙ্গ-সুবকল্লতক’-গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন,—“আমি কু-জ্ঞান, পতিত ও ঘৃণিত, তথাপি যিনি ভোগস্বথের দাবানল হইতে রূপাপূর্বক উদ্ধার করিয়া, নিজের বৃকের গুঞ্জাহার আর গোবর্দ্ধন-শিলা উপহার দিয়া, স্বরূপ-গোষামীর হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে আনন্দময় হইয়া বিরাজ করুন।” মনঃ-শিক্ষা-গ্রন্থে তিনি চরমে শ্রীরাধাকুণ্ড-ভজনকেই সার বলিয়াছেন। জীবনের চরম বিরহকাতর অবস্থায় একেবারে শেষ দশায় তিনি লিখিলেন,—“বিলাপকুশ্মাঞ্জলি।” সেখানে তিনি সর্বদা শ্রীরূপানুগত্যে ভজন শিখাইয়াছেন। “শ্রীরূপ-মঞ্জরী-করাচিহ্ন পাদপদ্যো, গোষ্ঠেন্দ্র-নন্দন-ভূজাপিত মস্তকায়াঃ। হা মোদত কণকগৌরী পদারবিন্দম্, সম্বহনানি শনকৈস্তব কিং করিষ্যে।” কবে শ্রীরূপগোষামী আমাকে রূপা করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-সেবায় অধিকার দান করিবেন। তিনি তাঁহার সমস্ত জীবনধারায় দেখাইয়াছেন, জীবের চরম সাধ্যবস্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমভক্তি-লাভের জন্ত যথোপযুক্ত সাধুসঙ্গই প্রধান এবং তাহার জন্ত কোন্ অবস্থায় কি মহামূল্য বস্তুও ত্যাগ করিতে হয়। তিনি সর্বদা সর্বত্র শ্রীরূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে সেবালাভের জন্ত প্রার্থনা করিয়াছেন। রূপানুগত্য ছাড়া কোথাও নিজের যোগ্যতা সত্ত্বেও সরাসরি শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণে সেবা প্রার্থনা জানান নাই। ইহা আমাদের বিশেষ শিক্ষণীয় ও লক্ষণীয়। দীর্ঘ ৪৯ বৎসর শ্রীবৃন্দাবনে কাটাইবার পর ১৫০৪ শকাব্দে ৭৬ বৎসর বয়সে তিনি প্রকটলীলা সম্বরণ করেন।

শ্রীদাস গোস্বামীর ত্যাগ, বৈরাগ্য ও আত্মগত্য সাধক জীবনে একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু সাধক কিভাবে সেগুলিকে তাঁহার বাস্তব-জীবনে প্রয়োগ করিবেন। এই জিজ্ঞাসার মূর্ত উত্তর হইয়া প্রকট হইলেন অগ্ৰতম গোস্বামী **শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী**। ১৪২৫ শকাব্দে শ্রীরঙ্গমের বিখ্যাত ভক্ত শ্রীবৈষ্ণভট্টের সুসন্তান এই গোস্বামী। ১১ বৎসর বয়সে নিজের গৃহে শ্রীমন্নহাপ্রভুর দর্শন লাভ করেন। মহাপ্রভুর আদেশে ইনি অকৃতদার থাকেন এবং সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন। তাঁহার খুল্লতাত শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণান্তে ৩০ বৎসর বয়সে তিনি শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্ট ৪৫ বৎসর তিনি সেইস্থানেই অবস্থান করেন।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী গওকী নদী হইতে ১২টী শালগ্রামশিলা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া সেবাপূজা করিতেন। একদা একটি শালগ্রাম-মূর্তি হইতে দ্বিভুজ-মুরলীধর ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম শ্রীরাধারমণজীউ বিগ্রহ প্রকটিত হন। কাহারও মতে শ্রীবল্লভভট্ট তাঁহার প্রাণনাথ একটি শালগ্রাম-মূর্তি শ্রীগোপালভট্টকে সমর্পণ করেন এবং এই শালগ্রাম হইতেই শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ প্রকটিত হন। তিনি সর্বদা “হে ভাগীর-বনাধিপতি, শিখিপুচ্ছভূষণ, চন্দনচচ্চিতাঙ্গ, বৃন্দাবনেন্দ্র, হে বরণীয়তম, বিকশিত নীলপদ্মের হৃদয় শ্রামল, কালিন্দীবান্ধব, নন্দনন্দন, পরানন্দ, কমলেক্ষণ, হে গোবিন্দ, কমলীয়-দেহ মুকুন্দ, দীন আমাকে আনন্দ দান কর। মাং দীনমানন্দয়”— এইভাবে বিভোর হইয়া নিরঞ্জে কীর্তন করিতেন।

একদা শ্রীসনাতন বলিলেন,—“গোপাল, বৈষ্ণব-আচার ও ক্রিয়া-মুদ্রা-নিয়মের বিবরণ লিপিবদ্ধ কর, তোমার পাণ্ডিত্যকে কাজে লাগাও।” তিনি রচনা করিলেন ‘**শ্রীহরিভক্তিবিলাস**’। সমস্ত পুরাণবাক্য উদ্ধার করিলেন। ভগবান্, ভক্তি আর ভক্তযোগ্য কোন কথাই বাকি রাখিলেন না। শুধু বৈষ্ণব-স্মৃতি-গ্রন্থই নহে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের একটি কড়চা বা কারিকা-গ্রন্থও রচনা করিলেন। শ্রীরূপ-সনাতনের মুখে শ্রীচৈতন্যমুখনিঃসৃত যে-সমস্ত সিদ্ধান্ত গুনিয়াছিলেন, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের বিচার, তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত এই কারিকা। ইহা হইতেই শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার ষট্‌সন্দর্ভ বা শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ রচনা করেন।

মর্ত্যজীবকে সাধন-ভজন করিতে হইলে ইচ্ছামত কিছু আচার-বিচার বার-ব্রত করিলে কোন লাভ হইবে না। বার-ব্রতরূপ সাধন যথাযথ বিধি-নিষেধ মানিয়া পালন করিলে, তবেই প্রকৃত শ্রেয়োলাভ হইবে। সেই সমস্ত নিয়ম-কাহুন সমস্ত পুরাণাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া তিনি রচনা করিলেন—“**শ্রীহরিভক্তিবিলাস**”। কিন্তু এই রচনার গৌরব তিনি তুলিয়া দিলেন—শ্রীসনাতন গোস্বামীর উপর।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনায় অনুরমতি দিবার সময় নির্দেশ দিলেন, গ্রন্থে তাঁহার স্তুতি যেন না থাকে। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার স্তব-পঞ্চকে শ্রীগোপালভট্টের মহিমা বর্ণন করিলেন—“নিরন্তর হরিতক্তি কখনে ধাঁহার শক্তি, ধাঁহার সর্বদাই সং-অনুভব, নখর-বিষয়ে যিনি বিরক্ত, মহাপ্রভুর আগমনে ধাঁহার শ্রীপাট বিখ্যাত, তিনি আমার হৃদয়ে সতত স্মৃতি হউন।” এইভাবে তিনি প্রাকৃত নাম-যশের অনারতা এবং যথাযথ আচার-বিচারের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়া দেবদ্বন্দ্ব-গ্রামের ব্রাহ্মণ-পুত্র গোপীনাথকে তাঁহার **শ্রীরাধারমণের** সেবার ভারার্পণপূর্বক ১৫০০ শকাব্দের শ্রাবণী শুক্লাপঞ্চমীতে মর্ত্যলীলা সম্বরণ করেন।

তাগ, বৈরাগ্য, বার, ব্রত প্রভৃতি সাধন-বিধিসম্মতভাবে করিলেও, তাহা ঠিক কাহার উদ্দেশ্যে অর্পিত হইবে? সাধারণ জীব ত’ তুচ্ছ ফল-কামনায় ‘বার’ বলিতে শনিঠাকুর, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ‘ব্রত’ বলিতে সত্যনারায়ণাদি অবৈদিক দেবতা এবং বড়জোর কিছু আধিকারিক দেব-দেবীর পূজাকেই ধর্ম বলিয়া জানে। জীবের নিত্যমঙ্গল, নিত্যকল্যাণ কিম্বে হয়, তাহা তাহারা জানে না। **শ্রীজীব-গোশ্বামিপাদ** ইহার সন্তুস্তর লইয়া প্রকট হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবল্লভ বা অনুপম, তাঁহার পুত্র শ্রীজীব গোশ্বামী। ১৪৫৫ শকাব্দে ইহার আবির্ভাব, ইনি অকৃতদার। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের চরণাশ্রয় করেন এবং জীবনের বাকি ৬৫ বৎসর সেইখানেই অতিবাহিত করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে রামকেলিতে প্রথম শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের সমস্ত অমূল্য দর্শনকে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অবিশ্বাস্য প্রতিভা আর অকাট্য যুক্তির সাহায্যে একে একে পঁচিশখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া বাস্তবের আলোকে উদ্ভাসিত করেন। সেইগুলি হইল,—(১) শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ, (২) সূত্রমালা, (৩) ধাতু-সংগ্রহ, (৪) কৃষ্ণার্চন-দীপিকা, (৫) গোপাল-বিরূদাবলী, (৬) রনামৃত-শেষ, (৭) শ্রীমাধব-মহোৎসব, (৮) সঙ্কল্প-কল্পদ্রুম, (৯) ভাবার্থসূচক চম্পু, (১০) গোপাল-তাপনীর টীকা, (১১) কৃষ্ণ-সংহিতার টীকা, (১২) রনামৃত-টীকা, (১৩) উজ্জল-নীলমণির টীকা, (১৪) যোগসারস্তব-টীকা, (১৫) গায়ত্রী-ভাষ্য, (১৬) কৃষ্ণ-পদচিহ্ন, (১৭) রাধিকাকর-পদচিহ্ন, (১৮) শ্রীগোপাল-চম্পু, (১৯) ক্রমসন্দর্ভ-নামক ভাগবত-টীকা, (২০) তত্ত্ব-সন্দর্ভ, (২১) ভগবৎ-সন্দর্ভ, (২২) ভক্তি-সন্দর্ভ, (২৩) পরমাত্ম-সন্দর্ভ, (২৪) কৃষ্ণ-সন্দর্ভ ও (২৫) প্রীতি-সন্দর্ভ। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

ভবঘুরের ভণিতা

নমস্কার। ‘কেমন আছেন?’—প্রথম মুখেই এমন একটা প্রশ্ন আমরা হামেশাই শুনি। আর তেমনই চট্জলদি বলেও ফেলি—‘ভাল-ই’। যেমন প্রশ্ন, তেমনই উত্তর—দুটোতেই একেবারে গা-সওয়া। পূর্বপুরুষদের সময়কার সেই আন্তরিক প্রশ্নের রেওয়াজ এখন নিঃসার-প্রশ্নের রূপ নিয়েছে। আবার ঠিক তেমনই তাঁদের ভাল থাকার নিকপট স্বীকারোক্তি বর্তমানে গ্রহসনময় **Formality** মাত্র। দুটোই এখন সেই রেওয়াজেই চলছে। ‘ভাল-ই আছি’—কথাটির মধ্যে যুগোপযোগী বেশ সুন্দর কিছু অর্থ আছে। জগতে ভাল থাকা যে নিরেট-অপবাদ মাত্র, তা আটাকা না করে পোষাক-সরস্ব-সভ্যতায় ব্যক্ত করা। তথাপি যে ছিটে-ফোঁটা সুখের কিছু আভাসে মাঝে মাঝে হাড় জুড়োই—তাতেই আহ! হয়ত এটুকুর জন্তই ‘ভাল-ই আছি’ বলা। নতুবা তাও যে থাকে না। আপনারা গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণ হয়ত এতেও আপত্তি হাজির করবেন; বলবেন—“ভাল করে দেখ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই, যে আছে সে দুঃখের কারণ।” একেবারে নিখাদ সত্যি কথা—কোমরে গামছা বেঁধে লাগলেও এর খণ্ডন নেই। এর ব্যতিক্রম আবিষ্কার করতে সারা দুনিয়া চেষ্টা ফেলছি, কিন্তু সর্বত্রই এর স্ফুট-অস্ফুট করুণধ্বনিতে অন্তর আমার অন্তপ্রায়।

আজ্ঞে, আমার পরিচয়? আর লজ্জায় ফেলবেন না। ‘মাধু’ বলে যেমন আপনাদেরকে অনেকেই ভাল পায় না, আমিও ‘ভবঘুরে’ বলে সবার কাছেই বিরক্তিকর। বহু চেষ্টা করেছি—একটু সংসার-ধর্ম করতে, কিন্তু আমার যে তা ধাতেই নেই। আমাদের বাড়ীর কাছে ‘জীব-সেবা’ মিশনের এক জ্যাঠা আমার দুর্দশা দেখে প্রায়ই নিখরচায় উপদেশ দিতেন,—“বাবা, আগে ভোগ, পরে না ত্যাগ। বিবাহ কর, সংসার-সুখ আচ্ছা করে ভোগ করে নেও, তবে কিনা ত্যাগ।” জ্যাঠার কথামত কিন্তু নন-স্টপ আমার কাণের এফোড়-ওফোড় হয়ে যেত। আমার ঠাকুরদাও নাকি এই প্রকারই ছিলেন। আর তাঁর থেকেই নাকি আমার এমন ছন্নছাড়া রোগ। আমার বাবা কিন্তু সাংঘাতিক সংসার বীর পুরুষ—সেই জ্যাঠার উপদেশের প্রথম অংশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাচ্ছেন। শেষটুকুর প্রতিই তাঁর যত রোষ। আমাকে সাংসারিক জ্ঞান এবং সাংসারিক কর্মের মাপা-ছাঁচে ঢালতেই তিনি অবতীর্ণ। শেষ পর্যন্ত সর্বচেষ্টা একেবারে পণ্ড প্রমাণিত হলে একদিন তাঁর অশেষ বিরক্তির মহাবিস্ফোরণ ঘটল,—ঘর থেকে পথে

ছিটকে পড়লাম। ঠাকুরদার আদর করে নাম রাখাটা অবশেষে সার্থক হলো—
'জ্ঞান-কর্ম-রহিতানন্দ দাস'।

নামটা বিশাল, না? এর অর্থটাও নাকি বিশাল। আপনাদের চোখ-মুখ দেখেই ঠাণ্ডা হচ্ছে—ভারী আনন্দ পাচ্ছেন। এমন নাম নাকি পৃথিবীতে এই প্রথম—ঠাকুরদা বলতেন। তিনি কিন্তু আপনাদের শ্রীসরস্বতী প্রভুপাদের সময়কার লোক—ওঁর শিষ্যবর্গের সাথে নাকি তাঁর খুবই দহরম-মহরম। তখন 'সাপ্তাহিক গোড়ীয়'-তে ওঁর লেখা 'ভবঘুরের উক্তি'-নামে এক সিরিয়াল বেরোত। সেই রক্তের টানে টানে আমিও আপনাদের দরজায়। আপনারা তো ছুনিয়ার খবর রাখেন না। অবশ্য এ জগতের খবরে আপনাদের কোন কাজ নাই। তথাপি দেশে সাধুপ্রীতির বিশেষ বিশেষ নমুনা বয়ে নিয়ে আসলে বিরক্ত হবেন না তো?

একদিন ফোভ-ভরেই ঠাকুরদাকে বললাম—“তোমার জগুই আমার এ অবস্থা।” একটু বোকা বোকা দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকতেই বুঝলাম—ব্যাখ্যার প্রয়োজন। “মানে ঐ যে তোমার রাখা অভূত বিটকেন-নাম—‘জ্ঞান-কর্ম-রহিতানন্দ দাস’, ওটাই আমার কাল! এজগুই জ্ঞান-কর্মের সাথে আমার এমন ‘বউ-শাশুড়ী’ সম্পর্ক। কিস্তি হলো না।” “বউ-শাশুড়ী?”—হাজার প্রশ্নের বাস্তব দপ করে জল উঠল। তাড়াতাড়ি উত্তর না দিলে অঘটন অনিবার্য, বললাম,—“আর কতকাল ‘আদায়-কাচকলায়’, ‘তেলে-জলে’ এসব Phrase চলবে? তাই অধুনা এই বউ-শাশুড়ী।” শুনে তিনি হেসেই কুটিকুটি। দশ-বার বিষম খেতে খেতে বললেন,—“আমি হলে কি বলতাম জানিস? গোড়ীয়—সহজিয়ায়, অথবা গোড়ীয়ে-মায়াবাদীতে, কিংবা গোড়ীয়ে-স্মার্ভে।” ঠাকুরদা আমার ‘ভবঘুরে’ হলে কি হবে, অত্যন্ত দার্শনিক প্রকৃতির আর দাক্ষণ রগুড়ে। ওঁর জন্তে বরাবরই আমার একটি Soft-corner—তাই পরিব্রাজকরূপেই আমার কাছে ওঁর সম্মান। ‘ভবঘুরে’—কথাটা যেন ওঁকে একেবারেই মানায় না।

হাসিটা ইতোমধ্যে হজম হয়ে এলে, বেশ রয়ে-সয়ে তিনি বলতে শুরু করলেন,—“এখনও শিশু আছিস। সাধুসঙ্গ তো করিস নি, কিভাবে বুঝবি ও নামের মাহাত্ম্য।” ‘সাধুসঙ্গ’ প্রশঙ্গ উঠলেই কি এক নষ্টালজিয়ায় যেন তাঁকে ডুবে যেতে দেখি। এবারও তার বিপরীত কিছু ঘটল না। কোন এক সুদূর-স্মৃতি মনন করতে করতে মস্তমুগ্ধের মত বলতে লাগলেন,—“বিনোদদার কথা খুব মনে পড়ে। সাংঘাতিক তেজস্বী পুরুষ। প্রভুপাদের একেবারে কাছের লোক—মায়াপুর-এষ্টেটের তিনি তখন ম্যানেজার। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বেদান্তে ওঁর সাংঘাতিক দখল। একদিন আমার ঐরকম একটি প্রশ্নের উত্তরে হাসতে হাসতে

বললেন,—দেখ হে নারদ ! খুব সাধাসিধে-ভাবে যদি বলা যায়, তবে ‘কর্ম’ হচ্ছে সত্ত্ব-বিষ্ঠা অর্থাৎ রসাল। আর ‘জ্ঞান’ হচ্ছে শুষ্ক বিষ্ঠা। মানে ঘুরে ফিরে বিষ্ঠাই, শুধু সরস আর নীরস, এই যা।”

“বিষ্ঠা ?”—ছোট খাট উম্মা, তাও চেপে রাখা গেল না। কিতাবেই বা যাবে—পৃথিবীতে এত কিছু থাকতে বিষ্ঠা ? ছিঃ ! এবার আমাকে সামলাতেই তাঁর তড়িৎ-তৎপরতা,—“ধৈর্য ধর। সত্য-অনুসন্ধান ঐভাবে হয় না। সেটা তো একটা উদাহরণ মাত্র। একটা কিছু সাদৃশ্য থেকেই উদাহরণ, তুলনা ইত্যাদি হয়। অর্থাৎ খাত্ত যেমন গ্রাহ, বিষ্ঠা তেমনই পরিত্যজ্য। এখানে খাত্তগ্রহণের পর বিষ্ঠাবর্জন অবশ্যস্তাবী। তাই বলে বিষ্ঠা-বর্জনের জন্ত নিশ্চয়ই খাত্ত-গ্রহণ হয় না। তুষ্টি, পুষ্টি আর ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্তই খাওয়া। আর খাত্তের অসার অংশটুকুই হচ্ছে বিষ্ঠা। সুতরাং এখানে বিষ্ঠা মানে—যা অসার। বুঝলে ?”

বুঝলাম কি না, তাও সঠিক বুঝলাম না। ‘বিষ্ঠার’ ব্যাপার—পরিষ্কার না হলেও অস্বস্তি। তাই ঝেড়ে-কেশে আবার লাগলাম,—“কিন্তু ঠাকুরদা, ঐ যে সরস-নীরস—এর কি...?” “ব্যাখ্যা—এই তো ?”—প্রশ্নটা যেন লুফে নিলেন। আসলে তিনি ওৎ পেতেই ছিলেন, তাই একটুও বিরক্তি প্রকাশ না করে আরম্ভ করলেন,—“দেখ দাদু, একটু মাথা-ঠাণ্ডা করলে কিন্তু তুমি নিজেই বুঝতে। এ জড়-জগতে যত কর্ম আছে—সবেতেই কিন্তু একটা রস আছে—অথবা ধর, রসের উদ্দেশ্য আছে। শাস্ত্রীয় ভাষায়—এটা জড় রস। সুতরাং ‘কর্ম’ নিশ্চয়ই সরস। কিন্তু হলে হবে কি—জড়রস তো বটে। তাই ক্ষণস্থায়ী, শুধু কি তাই—পরিণামে আবার দুঃখ। শাস্ত্রে এইজন্তই কর্মকে দাদ-খুজলির সাথে তুলনা করেছে।”

দাদ-খুজলি ? বাঃ বেশ যুগ্মই উদাহরণ তো ! মাথা মনে হয় একটু করে খুলছে। ছোটবেলার কথা ভালই মনে পড়ে। খোস-পাচড়ার মড়ক লেগেছিল আমার সারা শরীরে। প্রথম প্রথম চুলকাতে তো ভারী আরাম—একেবারে চোখ বুজে আসত ! তারপর চামড়া ছিড়ে যখন রক্তোদগীরণ অবস্থা—তখন মুহূর্তে সব স্তব্ধ বেমালুম উধাও, সাথে সাথে সে কি জ্বালা ! যাবৎ কর্মফল যেন পেকে গলে রস হয়ে নিঃসৃত হয়েছিল। গ্যারান্টি দিয়ে বলছি—এমন কর্মের খুজলিতে সারা জগৎ নাকাল। অশান্ত শান্তির পিছনে লাগাতার ছুটছে—হাফাচ্ছে, আবার ছুটছে—বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আমলা, মন্ত্রী—সবাই, সুতরাং আমিও। কর্ম যদি সরস হয়েই থাকে, তবে নিশ্চয়ই তা পচা-পুতিগন্ধময় রস। এইজন্তই হয়ত বিরক্ত হয়ে কেউ ‘জ্ঞান, জ্ঞান’ করেন।

কিন্তু জ্ঞানেও তো আবার সেই 'নীরস বস্তু'র তকমা তিনি লাগিয়ে দিলেন। এর মধ্যে কেমন গালাগালির মতো শোনাচ্ছে না?

“মোটাই না, যেটা যা, তা ব্যাখ্যার মধ্যে অহেতুক প্রশংসাও নেই, গালাগালিও নেই।” ঠাকুরদা উৎসাহে যেন উপচে পড়ছেন,—“‘সরস’ মানে—‘রস চাই, রস চাই’ করে যেখানে নিরস চেষ্টা। অবশেষে রস তো মিলে, কিন্তু ঐ যে বললাম—জড়রস। তাই প্রতিক্রিয়াও ভীষণ জড়ীয়। আনন্দে শুরু, কিন্তু দুঃখেই তার লয়। এতে কেউ যখন তিত্তিবিরক্ত হয়ে পড়েন, তখন ভালবাস্তব সব চাহিদাকে হাড়কাঠস্থ করে বিড়বিড়াতে থাকে—বাব্বা! ‘আর রস চাই না, যথেষ্ট, No রস’—নীরস। ‘জ্ঞান’ সেই কথাই বলছে,—রস, রস করো না, কারণ রস মানেই কষ্ট। তাই চল আমরা নীরস হয়ে যাই। এর মধ্যে উপনিষদ্ পড়ুয়া যদি কেউ তাতে বাধ সাধে,—কিন্তু দাদা, শাস্ত্রে যে বলে ‘রসো বৈ সঃ, রসং হেবায়ং লক্কানন্দী ভবতি,—অর্থাৎ সেই ভগবান্ই স্বয়ং রসস্বরূপ, তাঁকে পেয়েই জীবের যত আনন্দ।’ তখন ঘরপোড়া গরুর মত তাঁকে উঠে,—রস-স? রসগোল্লা বলে যদি কিছু থেকেই থাকে তবে তা শুধুই ব্যবহারিক, পরমার্থে কিন্তু তা ফক্কা। তাই নিজেই রসগোল্লা বনে যাও—‘সোহহম্’, ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ করতে থাকো। ব্যস্, তাহলে আর রসের জ্ঞান হাঁকপাঁক থাকবে না। অর্থাৎ সেই নীরসেরই সরস ব্যাখ্যা।”

সংস্কৃতির সংস্কার এখন চারিদিকে ঝাড়পোছ করে অসংস্কৃত করা হচ্ছে। তাই বেদ-উপনিষদের কথায় আসলেই ধরাশায়ী হয়ে পড়ি। কিন্তু আগুনের কাছে আছি, তাই ঝর ঝরে একটু ঝাঁচ করতে নিশ্চয়ই অস্ববিধা হয় না। বললাম,—“তার মানে কি, সেই খেঁকশেয়ালী যুক্তি—আঙুর ফল টক?” “ঠিক তাই”—ঠাকুরদা আনন্দে ফেটে পড়লেন! চোখ, কাণ, নাক—সব দিয়ে তাঁর হরিকথা যেন বেঁচিয়ে আসতে চাইছে,—“একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেই সেই ফলের খবর আছে। গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণই সেই ফলের যথার্থ আন্বাদক। সেই আন্বাদন থেকেই বঞ্চিত হয়েই আজ কেউ সরস, আর কেউ নীরস। বুঝলে দাদুভাই, এই জ্ঞান, কর্মই হচ্ছে প্রধান বাধা। এর থেকে নিষ্কৃতি পেলেই আত্মার স্বরূপের আনন্দ বুঝা যায়। ‘জ্ঞান-কর্ম-রহিতানন্দ’ বলতে নেটাই বুঝায়—তোমাকে অজ্ঞান মূর্থ বা নিষ্ক্রিয় করা নয়। ভক্তির নিজস্ব জ্ঞান আছে, কর্ম আছে—সেটা কিন্তু দাফাৎ ভক্তিই। “অগ্ণ্যভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্মাভ্যনাবৃতম্……।”

একেবারে শাস্ত্রনিক্ষু-মাঝে ডুব দিলেন। আর আমি তার কিনারায় ঠায় দাড়িয়ে। নেই সমুদ্রে আমার আর প্রবেশ নেই। তবে এটা বুঝেছি, জগতে জ্ঞান-কর্ম সম্বন্ধে যে ধারণা—তা মহাজন-বিতারে একদম আলাদা। তাই ‘জ্ঞান-

কর্ম-রহিত' বলতে বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবামূলক জ্ঞান-কর্ম-বাদ দেওয়া নয়—এ যে কত ভরসা! আজ আমি সবারকম জ্ঞান-কর্ম-রহিত হয়ে 'ভবঘুরে'—তবে ঠের দেওয়া নাম কিন্তু আজও ছাড়িনি।

—জ্ঞান-কর্ম-রহিতানন্দ দাস

শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

(পূর্ববৃত্তান্তক্রমে)

পদ্মপুরাণে দ্বাদশ মাসের মধ্যে কার্তিকমাস বিষ্ণুর প্রিয়তম। এই মাসে যদি অল্প উপায়নদ্বারাও বিষ্ণু সম্পূজিত হন, তাহলে অর্চক নিশ্চয় বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। দামোদর যেমন ভক্তবৎসল-নামে সকল লোকের নিকট বিদিত, তদ্রূপ তাঁর এই কার্তিকমাসও স্বল্পকে অধিক করে থাকেন। দেবতাদিগের সহস্র মনুষ্যদেহ দুর্লভ, তা' আবার ক্ষণভঙ্গুর। তার মধ্যে হরিবল্লভ কার্তিকমাস অতিশয় দুর্লভ।

কার্তিকমাসে কর্মবিশেষ মহিমা-মাহাত্ম্য স্বন্দপুরাণে উক্ত হয়েছে,—হে দ্বিজোত্তম! কার্তিকমাসে অন্নাদি দান, হোম, জপ ও তপশ্চাকৃত হলে তার অক্ষয় ফল কীর্তিত হয়েছে। মানবগণ কার্তিকমাসে বিষ্ণুকে উদ্দেশ করে যা কিছু দান—বিশেষতঃ অন্নদানাদি যদি করেন, তাহলে তার অক্ষয় ফল প্রাপ্তি হয়। সংবৎসরপূর্ণ অগ্নিহোত্র যাগের উপাসনা করে যে ফল লাভ হয়, কার্তিকমাসে স্বস্তিক করলে ততুল্য ফল লাভ হয়, এতে সংশয় নাই। যে স্ত্রী কার্তিকমাসে বিষ্ণুর আশ্রয়ে মণ্ডল নির্মাণ করেন, আকাশে কপোত-কপোতী পক্ষিণী যেমন শোভা পায়, তার গায় তিনিও শোভিতা হন। যে মনুষ্য কার্তিকমাসে পত্রে ভোজন করেন, চতুর্দশ ইন্দ্రిয়ের অধিকারকাল পর্যন্ত তিনি দুর্গত প্রাপ্ত হন না। মনুষ্যগণ আজন্ম যে-সকল পাপ করেছেন, কার্তিকমাসে পলাশপত্রে ভোজন করলে তৎসমুদয় বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে পলাশপত্রে ভোজন করেন, তার সকল কামনা-বাসনা পূর্ণ হয়, সকল তীর্থের ফল লাভ হয়, তিনি কখনও মরক দর্শন করেন না।

হে মুনিসত্তম! পলাশবৃক্ষ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলে কীর্তিত এবং নিখিলকামদ। পলাশের মধ্যমপত্র শূদ্রের বর্জ্যন করা উচিত, ঐ পত্রে ভোজন করলে চতুর্দশ

ইন্দ্রপাত পর্য্যন্ত নিরয়ে থাকতে হয়। কার্তিকমাসে তিলদান, নদীস্নান, সংকথা শ্রবণ, সাধুসেবন এবং পলাশপত্রে ভোজন এই সকল মুক্তি প্রদান করে।

হে বিপ্রেন্দ্র! যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে অরুণোদয়ে দামোদরের অগ্রে জাগরণ করেন, তার গোসহস্র দানের ফললাভ হয়। হে মহামুনে! কার্তিকমাসের শেষ প্রহরে যিনি বিষ্ণুর সন্নিধানে জাগরণ করেন, বিষ্ণুর পদও তাহার করস্থিত। হে ব্রহ্মণ! সাধুসেবা, গোগ্রাস, বিষ্ণুর কথা শ্রবণ, বিষ্ণুর অর্চন এবং শেষ প্রহরে জাগরণ, কলিযুগে কার্তিকমাসে এ-সকল অতি দুর্লভ।

জন্মধেহু, নানার্থ কৃত্রিমধেহু সহস্র এবং বৃষরাষিষ্ট দিবাকরে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠমাসে জন্মদান করে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কার্তিকমাসে স্নান করে তৎসমস্ত লাভ হয়। রবিবারে সূর্যাগ্রহণ হলে তৎকালে কুরুক্ষেত্রে সন্নিহত্যা-নামক হুদে স্নান করলে যে ফল হয়, কার্তিকমাসে একদিন স্নানে সেই ফল লাভ হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! মানবগণ কৃষ্ণবল্লভ কার্তিকমাসে পিতৃলোককে উদ্দেশ্য করে অন্নজলাদি প্রভৃতি দান করেন, তৎসমস্তই অক্ষয় ফল প্রদান করে। হে কলিপ্রিয় নারদ! যে মনুষ্য গীতশাস্ত্রের ক্রীড়াতে কার্তিকমাস যাপন করেন, তার আর এ সংসারে পুনরাবৃতি ঘটে না। যে নর কার্তিকমাসে বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ করেন, তিনি পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। যে মনুষ্য কার্তিকমাসে হরির অগ্রে ভক্তিপূর্বক গীত, বাজ ও নৃত্যাদি করেন, তার অক্ষয় পদ প্রাপ্তি হয়। যে মনুষ্য কার্তিকমাসে বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্র ও গজেন্দ্র-মোক্ষণ পাঠ করেন, তার আর পুনর্জন্ম হয় না। হে নারদ! যে ব্যক্তি কার্তিকমাসের শেষ প্রহরে স্তব ও গান করেন, পিতৃগণের সঙ্গে তার শ্বেতদ্বীপে বাস হয়। হে মুনিসত্তম! যে মনুষ্য কার্তিকমাসে বিষ্ণুকে যব নৈবেদ্য দান করেন, তার যব-সংখ্যায় তত যুগ দেবলোকে বাস হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে মনুষ্য কার্তিকমাসে কেশবের অগ্রে সকপূর অঙ্কুর দান করেন, যুগান্তেও তাহার পুনর্জন্ম হয় না। যে-সকল মনুষ্য ভক্তিসহকারে কার্তিকমাসে নিয়ম করে বিষ্ণুর কথা শ্রবণ করেন, তা যদি শ্লোকের অর্দ্ধেক হয় বা শ্লোকের একপাদ ও হয়, তাতে শত গোদানের ফল লাভ হয়।

হে মহামুনে! সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে কার্তিকমাসে কেশবের অগ্রে পুণ্যস্বরূপ শাস্ত্র কথা শ্রবণ করবে। হে মুনিশাদূল! কল্যাণমূর্তিতে হউক অথবা লোভ-বুদ্ধিতে হউক, যে মনুষ্য কার্তিকমাসে হরিকথা শ্রবণ-কীর্তন করেন, তার শতকুল উদ্ধার হয়। যে ব্যক্তি নিত্য শাস্ত্র-বিনোদনদ্বারা কার্তিকমাস যাপন করেন, তিনি সর্বপাপ দানপূর্বক অযুত যজ্ঞের ফল লাভ করেন। কার্তিকমাসে শাস্ত্র-কথালোচিত হইলে মধুসূদন যেক্রপ পরিতুষ্ট হন, তদ্রূপ গো-গজাদি দানদ্বারা তিনি

ঐরূপ পরিতুষ্ট হন না। হে মুনিশাদূল! যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে হরিকথা শ্রবণ করেন, তিনি শতকোটি জন্মের দুর্গতি থেকে নিস্তার পেয়ে থাকেন। হে মুনে! যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে যত্ববান হয়ে নিত্য ভাগবতের শ্লোক শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠ করেন, তার অষ্টাদশ-পুরাণপাঠের ফল লাভ হয়। মনুষ্য ইষ্টাপূর্ত প্রভৃতি সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে কার্তিকমাসে পরম ভক্তিসহকারে বৈষ্ণবগণের সঙ্গে বাস করে হরিকথা শ্রবণ কীর্তনাদি করবেন। যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে ভূমিশায়ী, ব্রহ্মচারী ও হবিষ্যাবী হয়ে পলাশপত্রে ভোজন করত দামোদর শ্রীকৃষ্ণের অর্চন করেন, তিনি সকল পাপ পরিত্যাগ করে বিষ্ণুদশ ও ভজনানন্দে নিবৃত্ত হয়ে বৈকুণ্ঠে হরিসন্নিধানে আমোদিত হন। হরিজাগরণ, প্রাতঃস্নান, তুলসীসেবন, উজ্জাপন ও দীপদান—ব্রতীব্যক্তি কার্তিকমাসে এই পঞ্চ ব্রত সম্পূর্ণ করলে যাতে ভুক্তি-মুক্তি ফলপ্রদ ফল আছে, সব ফল লাভ হয়। বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির, অশ্বখমূলে কিংবা তুলসীকানন প্রভৃতি স্থানে হরিজাগরণ করবে। যদি আপদগত হয়ে স্নানের নিমিত্ত জল প্রাপ্ত না হওয়া যায় অথবা ব্যাধিগ্রস্ত থাকে, তাহলে বিষ্ণু নাম-দ্বারা অপোমার্জন (জলস্পর্শ) করবে। যে ব্যক্তি ব্রতস্থ হয়ে উজ্জাপনবিধি করতে অসমর্থ, সে ব্রত-সম্পূর্ণ নিমিত্ত যথার্থ বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে ভোজন করাবে। যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে দীপদানে অক্ষম, তিনি পরদীপকে প্রবোধিত করবেন অথবা যত্নসহকারে বায়ু প্রভৃতি থেকে সেই দীপকে রক্ষা করবেন। তুলসীবৃক্ষের অভাবে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণের পূজা করবেন। সকল অভাব হলে ব্রতীব্যক্তি ব্রতের সম্পূর্ণতা নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, গো, অশ্বখ ও বটবৃক্ষের সেবা করবেন।

দীপদান-মাহাত্ম্য—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে,—বহু সহস্রকোটি পাপ করেও যদি কার্তিকমাসে বিষ্ণুরালয়ে অর্দ্ধ-নিমেষের জন্ত দীপদান করেন, তাহলে তার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয়। হে বিপ্রেন্দ্র! কার্তিকমাসে কেশবপ্রিয় দীপদানের মাহাত্ম্যাবলী শ্রবণ কর। কার্তিকমাসে বিষ্ণুরালয়ে দীপদান করলে পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না। সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে ও চন্দ্রগ্রহণে নর্যদাতীর্থে দানাদি করলে যে ফল হয়, কার্তিকমাসে দীপদানে তদপেক্ষা কোটিগুণ ফল লাভ হয়ে থাকে। বিষ্ণুরালয়ে যে ব্যক্তি ঘৃত প্রদীপ বা তিলতৈল প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন, তার আর অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রয়োজন কি? অপর মদ্রহীন, ক্রিয়াহীন, শৌচহীন কর্মসকল কার্তিকমাসে জনার্দনকে দীপদান করলে সমস্তই সম্পূর্ণ হয়। যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে কেশবের অগ্রে দীপদান করেন, তার সর্বপ্রকার যজ্ঞ ও সকলপ্রকার তীর্থে অবগাহন করা হয়। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে সেই পর্য্যন্ত পুণ্য-সকল গর্জন করে কার্তিকমাসে যে-পর্য্যন্ত কেশবের অগ্রে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত না হয়েছে।

হে দ্বিজ! পূর্বকালে পিতৃলোকের গাথা শুনে পাওয়া যায় যে, যদি আমাদের কুলে পৃথিবীতে এমন কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে কার্তিকমাসে দীপদানদ্বারা কেশবকে সন্তুষ্টি বিধান করে, তাহলে আমরা চক্রপাণির প্রসাদে মুক্তিলাভ করব। মন্দর পর্বততুল্য অশেষ পাপ করেও যদি কার্তিকমাসে বিষ্ণু-মন্দিরে দীপদান করেন, তাহলে তাহার সমূহ পাপ বিনষ্ট হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কার্তিকমাসে বাসুদেবের গৃহে বা আয়তনে অথবা সম্মুখে দীপদান করলে তাতে মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে মধুসূদনের সমক্ষে দীপদান করেন, তিনি মনুষ্যলোকের মধ্যে ধন ও কীর্তিমান্ হয়ে পুনরায় ভক্ত-রূপেই জন্মগ্রহণ করেন। কার্তিকমাসে এক নিমেষ বা অর্দ্ধনিমেষ দীপ প্রদত্ত হলে যে ফল লাভ হয়, শত শত যজ্ঞ বা তীর্থসেবাদ্বারা সে ফল লাভ হয় না। সকল অন্তঃকারণবিহীন হটক অথবা সর্বপ্রকার পাপে রত হটক, কার্তিকমাসে দীপদান করলে সে পবিত্র হবে, এতে কোন সন্দেহ নাই।

হে নারদ! ত্রিলোকমধ্যে এমন কোন পাপ নাই যে কার্তিকমাসে কেশবাগ্রে দীপদান তা শোধন করতে না পারে। হে মূনে! যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে বাসুদেবের অগ্রে দীপদান করেন, তিনি সর্ববাধা বিবর্জিত হয়ে নিত্যস্থান লাভ করেন। যে মানব, কার্তিকমাসে অথবা কেবলমাত্র দ্বাদশীতে কপূরদ্বারা দীপদান করেন, তার পুণ্যাবলী শ্রবণ কর। হে নারদ! কপূরদ্বারা দীপদাতার কুলে যারা জন্মগ্রহণ করেছে বা জন্মগ্রহণ করবে, এবং যারা অতীত হয়েছে ও যাদের সংখ্যা নাই, সেইসকল ব্যক্তি দেবলোকে সুদীর্ঘকাল যদৃচ্ছাক্রমে ক্রীড়া করে চক্রপাণি ভগবানের প্রসাদে মুক্ত হয়।

হে বিপ্রেন্দ্র! যদি কোন ব্যক্তি কার্তিকমাসে দ্যুতক্রীড়াচ্ছলেও বিষ্ণুরায় আলোকিত করে থাকে, তাহলে আপনার সপ্তকুল পবিত্র হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে বিষ্ণুমন্দিরে দীপদান করে থাকেন, তার সর্বদা ধন, পুত্র, যশঃ ও কীর্তিলাভ হয়ে থাকে। যেমন মথনহেতু বহিঃ কাষ্ঠসকলে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ দীপদানেও ধর্ম দৃষ্ট হয়, এতে কোন সন্দেহ নাই। হে বিপ্রেন্দ্র! নির্ধন ব্যক্তি আত্মবিক্রয় করেও কার্তিকী-পূর্ণিমাতে দীপদান করবেন। হে মূনে! যে যুগে কার্তিকমাসে বিষ্ণুমন্দিরে দীপদান না করে, তাকে বৈষ্ণব বলে মানবে না।

নারদপুরাণে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গদ-মোহিনী-সংবাদে উক্ত হয়েছে—একদিকে সমস্ত দান আর একদিকে কার্তিকমাসে দীপদান সমান না হওয়ায় দীপদানই অধিক বলিয়া কথিত। পদ্মপুরাণে উক্ত হয়েছে, যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে হরি-সন্নিধানে

অথও অর্থাৎ দিবারাত্রব্যাপী দীপদান করেন, তিনি দিব্যকান্তিবিমানাগ্রে বিষ্ণুলোকে নীত হন।

পরদীপ প্রবোধন-মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে,—পিতৃপক্ষে অন্নদান এবং জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে জলদান করলে যে ফল হয়, কার্তিকমাসে পরদীপ প্রবোধন করলে সেই ফল লাভ হবে। কার্তিকমাসে পরদীপ প্রবোধন ও বৈষ্ণবগণের সেবন করলে রাজস্বয় ও অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে নৃপশাদূল! যে-সকল ব্যক্তি কার্তিকমাসে হরিগৃহে পরকর্তৃক প্রদত্ত দীপ প্রবোধন করেন, তারাও যমযাতনা থেকে নিস্তার লাভ করেন। নিজের দীপ দেওয়া যাচ্ছে না, অপরে যদি দীপ দিয়েছেন, সেটাও যদি এগিয়ে দেওয়া যায়, তাতেও ফল হবে। হে বিপ্রেন্দ্র! কার্তিকমাসে পরদীপ প্রবোধনে যে ফল হয়, মহাযজ্ঞ সকলদ্বারা সে ফল হয় না। মুষিকা একাদশীতে পরপ্রদত্ত দীপ প্রজ্জ্বলিত করে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করত পরমগতি প্রাপ্ত হয়েছিল।

শিখরদীপ-মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে উক্ত হয়েছে,—বিষ্ণুমন্দিরের উপরিস্থিত কলসের উপরে দীপ যত যত দিকসকলকে প্রকাশ করে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ, তত তত সঞ্চিত পাপ সব দ্রবীভূত হয়। ব্রাহ্মণকে আসমুদ্রাচল পৃথিবী দান করে যে সমুদয় ফল লাভ করে, তা হরিশিখর দীপদানের ফলের ষোড়শাংশের একাংশ তুল্য হয় না। সবৎসা ক্ষীরযুক্তা গাভী দান করে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা হরির শিখরদীপদানের ষোড়শাংশের একাংশের তুল্যও হয় না। হে মহামুনে! বৈষ্ণবদিগকে সর্কস্বদান করে যে ফল লাভ হয়, তাহা হরির শিখরদীপদানের সোল অংশের একাংশেরও তুল্য হয় না। বৈষ্ণবদিগকে সর্কস্ব দান! মহামুন্সিলের কথা। সর্কস্ব দান করলে খাবে কি করে? “তং মূঢ়বর্ত্তিস্ব স কথম্”, ওরে মূখ, তুই যদি সব ভগবান্ বামনদেবকে দান করে দিবি, তাহলে তুই খাবি কি? আর গুক্রাচার্য্যের নিজের চিন্তাও বোধ হয় একটু ছিল যে, তোর যদি কিছু না থাকে, তাহলে আমি তোর গুরু, আমি কি করে খাব? এমন ধরণের যে গুরু-শিষ্য—“তামুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালক্ষয়ম্।” তাঁহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন। কারও বিশ্বাস নাই, তা হবে না। ভগবানের উপর নির্ভর করতে হবে—ভগবান্ আমাদের নিশ্চয়ই খাওয়াচ্ছেন, পরাচ্ছেন, নিশ্চয়ই খাওয়াবেন, পরাবেন। এ ভাব অন্তরে থাকলে সর্কস্ব দান করা যায়। তা না হলে কিছু রেখে দিতে হবে। সবটা দিলে আমি খাব কি—এমন বুদ্ধি এসে যেতে পারে। ভগবানকে দিলে ত’ লোকমান নাই। সবটাই ত’ রাখছেন তিনি। সবটাই নিয়ে, সবটা গ্রহণ করে, সবটাই রাখছেন তিনি, এটাই ত’ ব্যাপার।

হে মহামুনে! মূল্য গ্রহণ করেও কোন ব্যক্তি যদি শিখর অথবা হরিমন্দির-মধ্যে দীপদান করেন, তাতে তার শতকুল উদ্ধার হয়। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে কেবলমাত্র জ্যোতিঃদ্বারা দীপ্ত বিমানসদৃশ বিষ্ণুমন্দির দর্শন করেন, তাহাদের কুলে কেহ আর নারকী হয় না। স্বর্গে দেবগণ বিষ্ণুগৃহে দীপপ্রদ মনুষ্যকে এই বলে নিরীক্ষণ করেন যে, কবে এই পুণ্যকর্ম্মার সহিত পুনরায় আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হবে? যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে কার্ত্তিকী-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত বিষ্ণুমন্দিরের উপরে দীপদান করেন, তার ইন্দ্রত্বও দুর্লভ নহে। (ক্রমশঃ)

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

জীবন-পন্থের বৃন্তে স্থনির্দিষ্ট কয়েকটি পাপড়ি হইতে আরও একটি পাপড়ি খসিয়া পড়িল। সূর্য্যদেব তাহার বার্ষিক-গতির পথে আরও একবার ধুরিয়া আসিল। বিরক্তিকর, বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়েমি জীবনযাত্রায় ক্লান্ত সংসার-বন্ধ জীবের চাতকের গ্রাস দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবশেষে আবার অবসান হইল। আম্রবৃক্ষ মুকুলিত হইল। শাল্মলী-বৃক্ষ শ্রামল হইল, তাহার ফুলে আবিরের রঙে আকাশে-বাতাসে শ্রীমন্নহাপ্রভুর জন্মোৎসবের আগমন-বার্তা ঘোষণা করিয়া দিল, অর্থাৎ দোলযাত্রা আসিল। ভক্ত্যুন্মুখী সোভাগ্যবান্ জীবের আরও স্মৃতি সঞ্চয়ের এবং স্মৃতিসম্পন্ন মহানোভাগ্যবান্ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভক্তের নিকট স্থান-কাল-পাত্র সুসংযোগে আরও ঘনিষ্ঠভাবে ভগবৎপ্রীত্যর্থ্যে ভগবৎসেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের সুযোগ লাভ ঘটিল। অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্নতনু শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাস্থলী শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমার সময় আসিল। ভক্ত-হৃদয় উজ্জীবিত হইয়া উৎসবের আনন্দে মাতিয়া উঠিল।

শ্রীবলদেব প্রভু তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া তীর্থ পর্য্যটনের মহিমা এবং প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়াছিলেন। গৌরাভিন্নতনু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ধাম-পরিক্রমার আনুষ্ঠানিক প্রচলন করেন, ইহা আমরা ‘ভক্তিরত্নাকর’দি-গ্রন্থে দেখিতে পাই। বর্তমানে গৌর-বাণী-বিনোদধারার অপ্রতিহত গতি ধাম-পরিক্রমারূপ শ্রোতস্বিনীতে ব্রহ্ম-মাক-আশ্রয়ের প্লাবন আনিয়াছে। প্রাকৃত জগৎের সমস্ত বন্ধন কাটাইয়া অপ্রাকৃত গুপ্ত-বৃন্দাবন শ্রীধাম-নবদ্বীপে প্রবেশাধিকার লাভের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নহে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হইতে সাধুসঙ্গাকাজী স্মেধাগণ নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে উপস্থিত হন। অগ্ন্যগ্ন বৎসরের তুলনায় এ বৎসর কয়েকদিন পূর্বে হইতেই শ্রীমঠে ভক্তসমাগম হইতে থাকে।

বিগত ১৫ ফাল্গুন (ইং ২৮/২/২৬) বুধবার সন্ধ্যায় শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ঐ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুগৃহীত সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ঐ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে, সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় এবং শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের সহৃদয় উপস্থিতিতে বিপুল সংখ্যক সন্ন্যাসী, মঠবাসী এবং গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীমঠে শ্রীধাম-পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন এবং পরিক্রমা সূচুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য যোগ্যতানুযায়ী প্রায় সকলেই কিছু কিছু সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ এইদিন বিকাল হইতেই শ্রীমঠে প্রায় তিল ধারণের জায়গা ছিল না; তবুও জনজোয়ারের বিরাম ছিল না। পরিক্রমার উৎসাহে উদ্দীপিত যাত্রিগণ শ্রীমঠের বারান্দায়, ছাদে, এমনকি উন্মুক্ত ভূমিতে পর্য্যন্ত যে কোনভাবেই হউক নিজেদের অস্তিত্বটুকু রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। ব্রহ্মচারিগণ তাঁহাদের সুব্যবস্থার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াছেন।

পরদিবস ১৬ ফাল্গুন (ইং ২৯/২/২৬) বৃহস্পতিবার অতি প্রত্যুষে শ্রীশচীনন্দনের বিজয়বিগ্রহকে সুসজ্জিত পাক্ষীতে করিয়া সঙ্কীর্্তনমুখে বিশাল পরিক্রমামণ্ডলী শ্রীমঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। গঙ্গাদেবীকে স্পর্শ করিয়া শ্রীমায়াপুর-উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তদনুজ্ঞা লইয়া শ্রীগোদ্রম কাননে স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কুপালাভোদ্যে পরিক্রমামণ্ডলী প্রবেশ করেন। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের পুত জীবনচরিত ও তাঁহার অপার্থিব অবদান কীর্তনান্তে তাঁহার কুপাভিক্ষাপূর্বক শ্রীহরিহরক্ষেত্র ও সুবর্ণবিহার পরিক্রমা করিয়া সকলে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের পাদপীঠ শ্রীনৃসিংহপল্লীতে উপস্থিত হন। ক্রমানুযায়ী এইস্থানেও শ্রীধাম-মাহাত্ম্য পাঠ, কীর্তন ও ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণের মুখনিঃসৃত শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সকলেই চমৎকৃত হন। অবশেষে অগণিত ধামবাসী ও পরিক্রমাকারী ভক্তগণ মহাপ্রসাদ সেবনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণ ও বৈষ্ণবগণ ধাম-পরিক্রমার উদ্দেশ্য, বিধি-নিষেধ ও ধামতত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৭ ফাল্গুন (ইং ১/৩/২৬) শুক্রবার শ্রীকোলদ্বীপস্থ সমুদ্রগড়ে রাজা সমুদ্রসেন ও ভীমসেনের উৎকর্ষতা প্রদর্শনে শ্রীল সহ-সভাপতি মহারাজ এবং ভূতপূর্ব শ্রীপত্রিকার সম্পাদক মহারাজ যথারীতি কপট বাগযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া সকলকে নির্মল আনন্দে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। অনন্তর কবি শ্রীল জয়দেবের পাদস্পর্শ-

ধন্য চাঁপাহাটি পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-গদাধর দর্শন করিয়া যাত্রিগণ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করেন। সন্ধ্যায় যথারীতি শ্রীগৌরহৃদয়ের অবদান সম্পর্কে অতুলনীয় আলোচনা হয়।

১৮ ফাল্গুন (ইং ২।৩।৩৬) শনিবার শ্রীকৃষ্ণদ্বীপান্তর্গত রাধাকুণ্ডতট, শ্রীজহ্নু-দ্বীপান্তর্গত বিজ্ঞানগরে শ্রীল সার্কভোম ভট্টাচার্যের পাট, শ্রীজহ্নুমুনির অবলুপ্ত আশ্রম এবং শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট পরিক্রমা সমাপন করিয়া, পরদিবস ১৯ ফাল্গুন শ্রীসীমন্তদ্বীপস্থ প্রোচামায়াস্থান—পোড়ামাতলা, বৈষ্ণবসার্কভোম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিস্থল দর্শনপূর্বক গঙ্গা অতিক্রম করিয়া নিদয়া ঘাট হইয়া শ্রীকৃষ্ণদ্বীপ পরিক্রমা করা হয়। ২০ ফাল্গুন, সোমবার অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্নহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর প্রথম মিলনস্থলী—শ্রীনন্দনাচার্য-ভবন, শ্রীসঙ্কীর্্তনরাসস্থলী—শ্রীবাসভবন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠ, শ্রীচৈতন্যবাণীবিগ্রহ জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, বৈরাগ্যবিগ্রহ শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির, কংসাংশে অবতীর্ণ শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহৃদয়ের আবির্ভাবস্থলী দর্শন, হরিকথা শ্রবণ, কীর্তন ও সর্বসাধারণে খেচরান্ন মহাপ্রসাদ বিতরণান্তে বাৎসরিক পরিক্রমা সমাপ্ত হয়।

২১ ফাল্গুন (ইং ৫।৩।৩৬) মঙ্গলবার শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির শুভাবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ সমগ্র দিবস শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ্য করেন। অপরদিকে নিকপটে শুদ্ধভক্তিধারায় অনুপ্রাণিত হরিভজনেচ্ছু ভক্তগণ অধিকারানুযায়ী শ্রীল আচার্যদেবের নিকট হইতে শ্রীনাম-দীক্ষা গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় শুভক্ষেণে সঙ্কীর্্তনমুখে শ্রীশচীনন্দনের অভিষেক-ক্রিয়া, অর্চন, ভোগরাগ ও আরাটিকাদি সুসম্পন্ন হয়।

পরদিবস ২২ ফাল্গুন (ইং ৬।৩।৩৬) বুধবার শ্রীজগন্নাথমিশ্রের আনন্দোৎসব-উপলক্ষে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে শ্রীমঠের মহাপ্রসাদের তাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই মহোৎসবের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত লক্ষাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও ধামবাসী বৈষ্ণবগণের সর্বপ্রকার আন্তরিক সহানুভূতি, সহায়তা ব্যতীত এই সুবিশাল যজ্ঞ সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভব নহে। সর্বোপরি মহাবদান্ত শ্রীমন্নহাপ্রভুর অহৈতুকী করুণা। তাঁহার অমৃতময়ী করুণাবারি সকলের উপর বর্ষিত হউক ও বর্ষে বর্ষে শ্রীবৃদ্ধিলাভ করুক—ইহাই প্রার্থনা।

—নিম্বজ সংবাদদাতা

বিশেষ নিবেদন

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত বিশুদ্ধ সারস্বত শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকায় ৫১০ শ্রীগৌরাদে ২৬ বামন, ১০ শ্রাবণ, ২৬ জুলাই শুক্রবারে শয়নৈকাদশীর উপবাস এবং পরদিবসে পারণ লিখিত হইয়াছে। কয়েকটি পঞ্জিকায় পরদিবস ১১ শ্রাবণ, ২৭ জুলাই শনিবারে উপবাস ও রবিবারে পারণের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। শুক্রবারে অরুণোদয়বিদ্ধা স্থির করিয়া তাঁহারা পরদিবস উপবাস লিখিয়াছেন। পরন্তু মূহূর্ত্তবিচারে সঠিক গণনায় শুক্রবারে কলিকাতা ও তৎপশ্চিমাঞ্চলে একাদশী-তিথি অরুণোদয়-বিদ্ধা হয় নাই। সুতরাং শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকার গ্রাহকগণ ও বৈষ্ণবগণের বিনা দ্বিধায় ও নিঃসন্দেহে শুক্রবারে শয়নৈকাদশীর উপবাস ও শনিবারে দিঃ ৭।২৭ গতে পূর্বাহ্ন ৯।৩৯ মধ্যে একাদশীর পার্জন করাই কর্তব্য।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীভক্তিবাদান্ত ত্রিবিক্রম

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারোদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যযাত্রা

“পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥” —শ্রীমন্নহাশ্রমের এই ভবিষ্যবাণীর সার্থক রূপায়ণে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবাদান্ত নারায়ণ মহারাজ আগামী ৫ই মে ১৯২৬, রবিবার বিদেশ যাত্রা করিতেছেন। এতদুপলক্ষে ৫ই মে হইতে ১৫ই মে হল্যাণ্ড, ১৬ই মে হইতে ৩১ মে ইংল্যাণ্ড, ১লা জুন হইতে ৬ই জুলাই আমেরিকা এবং ৬ই জুলাই হইতে ১৬ জুলাই কানাডায়—তাঁহার প্রচারস্থলী নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রচার-সহায়করূপে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যালঙ্কার এবং শ্রীপাদ পুণ্ডরীকানন্দদাস ব্রহ্মচারী তদনুগমন করিতেছেন। তাঁহার পাশ্চাত্য-প্রচার-সংবাদ যথাসময়ে শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। শ্রীশ্রীগৌরোত্তর অকৈতব-বাণী অকুণ্ঠভাবে দশদশা-ব্যাপ্ত হউক এবং শ্রীল মহারাজের প্রচার-যাত্রা স্তূপরূপে সম্পন্ন হউক—ইহাই শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ-শ্রীগিরিরাজজী-শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহজীউর নিকট প্রার্থনা।



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিমলশূন্য ॥

অন্ত ধর্ম স্তম্ভরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৮শ বর্ষ	}	১১ ত্রিবিক্রম, প্রহ্মম, ৫১০ শ্রীগোরাঙ্গ ৩১ বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৪০৩, ইং ১৪/৫/৯৬	}	৩য় সংখ্যা
----------	---	---	---	------------

সান্ন্যাসাদং

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রাষ্টকম্

[শ্রীচৈতন্যচরিতে মহাকাব্যে শ্রীমুরারিগুপ্তকৃতম্]

রাজং-কিরীটমণি-দীপ্তি-দীপিতাশ-

মুদ্যদ্-বৃহস্পতি-কবি-প্রতিমে বহন্তম্ ।

ধে কুণ্ডলেহঙ্ক-রহিতেন্দু-সমান-বক্ত্রং

রামং জগত্ত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ১ ॥

সমুজ্জ্বল কিরীটমণিসকলের কিরণরাশিধারা চতুর্দিক উজ্জ্বলকারী, আকাশে
উদ্ভিত বৃহস্পতি ও শুক্রের গ্রায় উজ্জ্বল ও সুন্দর কুণ্ডলদ্বয় পরিধানকারী, নিষ্কলঙ্ক
চন্দ্রসদৃশ বদনমণ্ডলবিশিষ্ট, ত্রিজগতের পূজনীয় শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত ভজনা
করি । ১ ।

উদ্যদ্বিভাকর-মরীচি-বিবোধিতাজ-

নেত্রং সুবিশ্ব-দশনচ্ছদ-চারুণাসম্ ।

শুভ্রাংশুরশ্মি-পরিনির্জিত-চারুহাসং

রামং জগন্নাথগুরুং সততং ভজামি ॥ ২ ॥

ঐহার নেত্রদ্বয় উদীয়মান সূর্য্যের কিরণদ্বারা বিকসিত পদ্মতুল্য, যিনি অতি সুন্দর বিশ্বতুল্য অধর ও চারু নাসিকাবিশিষ্ট, ঐহার মধুর হাস্য চন্দ্ৰের কিরণকে পরাজিত করিয়াছে, সেই ত্রিজগদগুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত ভজনা করি ॥ ২ ॥

তং কশ্যুকঠমজমশুজ-তুল্যরূপং

মুক্তাবলী-কনকহার-ধৃতং বিভাণ্ডম্ ।

বিদ্যাদ্বলাকগণ-সংযুতমশুদং বা

রামং জগন্নাথগুরুং সততং ভজামি ॥ ৩ ॥

কশ্যুকঠ, ইন্দীবরকান্তি, মুক্তা ও স্বর্ণের হার পরিধানপূর্ব্বক বিদ্যা ও বলাকাশোভিত মেঘসদৃশ ত্রিজগদগুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত ভজনা করি ॥ ৩ ॥

উত্তান-হস্ততল-সংস্থ-সহস্রপত্রং

পঞ্চচ্ছদাধিকশতং প্রবরাঙ্গুলীভিঃ ।

কুর্ব্বন্ত্যসিত-কনকদ্যুতির্যশসী সীতা

পার্শ্বে স্থিতা রঘুবরং সততং ভজামি ॥ ৪ ॥

তপ্তকাঞ্চন-কান্তিবিশিষ্টা সীতা নিজ উত্তান-হস্ততলে স্থিত-পদ্মকে স্বীয় পঞ্চবরাঙ্গুলীদ্বারা পঞ্চাধিক-শতপত্রবিশিষ্ট করিয়া ঐহার পার্শ্বে অবস্থিতা, সেই রঘুবরকে আমি সতত ভজনা করি ॥ ৪ ॥

অগ্রে ধনুর্দ্ধরবরঃ কনকোজ্জ্বলাঙ্গো

জ্যোষ্ঠানুসেবনরতো চ যতভূষণাঢ্যঃ ।

শেষাখ্য-ধামবর-লক্ষ্মণনামা যশস্

রামং জগন্নাথগুরুং সততং ভজামি ॥ ৫ ॥

ঐহার অগ্রে ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ, স্বর্ণোজ্জ্বলদেহ, জ্যোষ্ঠের সেবায় অনুক্ষণ নিযুক্ত, সংযমভূষণশোভিত, শেষ-নামক মহাজ্যোতিঃ অধুনা লক্ষ্মণ-নামে বিরাজমান, সেই ত্রিজগদগুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত ভজনা করি ॥ ৫ ॥

যো রাঘবেন্দ্র-কুলসিন্ধু-সুধাংশুরূপো

মারীচ-রাক্ষস-সুবাহু-মুখান্নিহত্য ।

যজ্ঞং ররক্ষ কুশিকাঘর-পুণ্যরাশিঃ

রামং জগজ্জয়ন্তরুং সততং ভজামি ॥ ৬ ॥

যিনি রঘুশ্রেষ্ঠ এবং রঘুবংশসিদ্ধ হইতে উথিত চন্দ্রস্বরূপ, মারীচ-রাক্ষস-স্ববাহ প্রভৃতিকে নিহত করিয়া বিশ্বামিত্রের পুণ্যরাশিরূপ যজ্ঞ রক্ষা করিয়াছিলেন, ত্রিজগদগুরু সেই শ্রীরামকে আমি সতত ভজনা করি ॥ ৬ ॥

হত্বা খরত্রিশিরসৌ সগণৌ কবন্ধং

শ্রীদণ্ডকাননমদূষণমেব কৃত্বা ।

সুগ্রীব-মৈত্রমকরোদ্বিনিহত্য শত্রুং

তং রাঘবং দশমুখান্তকরং ভজামি ॥ ৭ ॥

যিনি গণসহিত খর, ত্রিশিরা এবং কবন্ধকে বধ করিয়া, শ্রীদণ্ডকারণ্যকে দূষণমুক্ত করিয়া, শত্রু (বালি) বধপূর্বক সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন, সেই রাবণাস্তকারী রাঘবকে আমি ভজনা করি ॥ ৭ ॥

ভংক্ত্বা পিনাকমকরোজ্জনকাত্মজায়া

বৈবাহিকোৎসব-বিধিং পথি ভার্গবেন্দ্রম্ ।

জিত্বা পিতৃমূদমুবাহ ককুৎস্থবর্ষ্যং

রামং জগজ্জয়ন্তরুং সততং ভজামি ॥ ৮ ॥

যিনি হরধত্ব ভঙ্গ করিয়া সীতার পাণি-গ্রহণোৎসব করিয়াছিলেন, অযোধ্যা প্রত্যাগমনকালে পথে পরশুরামকে জয় করিয়া পিতার আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন, জগজ্জয়ন্তরু ককুৎস্থশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকে আমি ভজনা করি ॥ ৮ ॥

ইথং নিশম্য রঘুনন্দন-রাজসিংহ-

শ্লোকাষ্টকং স ভগবান্ চরণং মুরারেঃ ।

বৈদ্যস্ত মূর্দ্ধি বিনিধায় লিলেখ ভালে

ত্বং রামদাস ইতি ভো ভব মৎপ্রসাদাৎ ॥ ৯ ॥

ভগবান্ শ্রীগৌরমুন্দর শ্রীরঘুনন্দন-রাজসিংহের উক্তপ্রকার স্তব শ্রবণ করিয়া শ্রীমুরারিগুপ্তের মস্তকে স্বীয় চরণ সংস্থাপনপূর্বক তাঁহার কপালে “ওহে তুমি আমার প্রসাদে রামদাস হও”—ইহা লিখিয়া দিলেন ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

শ্রদ্ধা

১। শ্রদ্ধোদয়ে কি লাভ হয় ?

“তয়া দেশিকপাদাশ্রয়ঃ ॥

সেই শ্রদ্ধা হইলে গুরু-পাদাশ্রয় ঘটে।” —আঃ সূঃ ৫৯

২। কৰ্ম্ম-জ্ঞানীর ‘শ্রদ্ধা’ কি প্রকৃত ‘শ্রদ্ধা’ পদ-বাচ্য ?

“কৰ্ম্ম-জ্ঞানী-জনে যারে, ‘শ্রদ্ধা’ বলে বারে বারে,
সেই বৃত্তি শ্রদ্ধা হইতে নারে ॥

নামের বিবাদ-মাত্র, শুনিয়া ত’ জলে গাত্র,
লোহে যদি বলহ কাঞ্চন ।

তবু লোহ লোহ রয়, কাঞ্চন ত’ কভু নয়,
মণি-স্পর্শে নহে যতক্ষণ ॥

কৃষ্ণভক্তি চিন্তামণি, তাঁর স্পর্শে লোহ-খনি,
কৰ্ম্ম-জ্ঞানগত শ্রদ্ধাভাব ।

হএগা যায় হেমভার, ছাড়িয়া ত’ কুবিকার,
সে কেবল মণির প্রভাব ॥”

—‘শ্রীকৃষ্ণাভ্যুগ-ভজন-দর্পণ’

৩। শ্রদ্ধা কি বস্তু ? শ্রদ্ধা ও শরণাগতিতে পার্থক্য কি ?

“পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতিবলে সাধুদিগের মুখ হইতে হরিকথা-শ্রবণানন্তর হরি-
বিষয়ে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তাহাই ‘শ্রদ্ধা’। শ্রদ্ধার উদয় হইতে হইতেই একটু
শরণাপত্তির উদয় হয়—‘শ্রদ্ধা’ ও ‘শরণাগতি’ প্রায় একই তত্ত্ব।”

—জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

৪। ‘শ্রদ্ধা’ কাহাকে বলে ?

“জ্ঞান, শ্রী ও কৰ্ম্ম—প্রয়োজন-সিদ্ধির উত্তম উপায় নয় ; ভক্তিই একমাত্র
বিশুদ্ধ উপায়,—এবজুত শাস্ত্র-বিশ্বাসের সহিত অনন্ত-ভক্তির প্রতি যে চিত্তবৃত্তি,
তাহারই নাম—শ্রদ্ধা।” —‘শ্রদ্ধা ও শরণাগতি’, সঃ তোঃ ৪।৯

৫। শ্রদ্ধোদয়ের লক্ষণ কি ?

“শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শাস্ত্রার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত না হইলে

জীবের ভয়, তাঁহার শরণাগত হইলে আর ভয় নাই। অতএব শ্রদ্ধা জন্মিবামাত্র শরণাপত্তির লক্ষণে তাহা লক্ষিত হয়।” —‘শ্রদ্ধা ও শরণাগতি’, সং. তো: ৪।৯

৬। কে কৃষ্ণের প্রসন্নতা লাভ করেন?

“কেবল দীক্ষাদি-গ্রহণপূর্বক ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা নয়; অনন্যভক্তিতে যাহার অনন্য শ্রদ্ধা, তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন।” —‘ভক্তির প্রতি অপরাধ’, সং. তো: ৮।১০

৭। কোন পর্য্যন্ত ভক্তির সম্ভাবনা নাই?

“কৃষ্ণকশরণ ব্যতীত অন্য সদগুণ হইলেও যে-পর্য্যন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধা না হয়, সে-পর্য্যন্ত ভক্তি হইবে না।” —‘সদগুণ ও ভক্তি’, সং. তো: ৫।১

৮। শ্রদ্ধা কয় প্রকার? তাহারা কি কি অধিকার উৎপন্ন করে?

“বৈধী শ্রদ্ধা যেরূপ বৈধী ভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে, লোভময়ী শ্রদ্ধাও সেইরূপ রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে।” —‘জৈ: ধ: ২।১ অ:

৯। কাহাদের শ্রদ্ধা নাই?

“যাহাদের স্বকৃতি নাই, তাহাদের শ্রদ্ধা নাই। অধিক করিয়া বলিলেও তাহারা কোন প্রকারে বুদ্ধিবেন না।” —‘সঙ্গত্যাগ’, সং. তো: ১১।১১

১০। কাহারা আচার্য্যগণের উপদেশের মর্ম্ম অনায়াসে বুঝিতে পারেন?

“যাহাদের স্বকৃতি-অনুসারে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে, কৃষ্ণ-কৃপায় তাহাদের ক্রিয়ণ পরিমাণে বুদ্ধিযোগ উদয় হয়। সেই বুদ্ধিক্রমে আচার্য্যদিগের উপদেশের মর্ম্ম অনায়াসে তাহারা বুঝিতে পারেন।” —‘সঙ্গত্যাগ’, সং. তো: ১১।১১

১১। কৃষ্ণকীর্তনের একমাত্র যোগ্যতা কি?

“কৃষ্ণসকীর্তনে শ্রদ্ধাই একমাত্র অধিকার, তাহাতে অন্য কোন বিচার নাই।”

—‘নামগ্রহণ-বিচার’, হং. চি:

১২। শ্রদ্ধা কি ভক্তির অঙ্গ নহে?

“শ্রদ্ধা ভক্তির ‘অঙ্গ’ নয়, কিন্তু অনন্য ভক্তির অধিকারী ব্যক্তির কৰ্ম্মাধিকার-নিবারক বিশেষণ-মাত্র।” —‘শ্রদ্ধা ও শরণাগতি’, সং. তো: ৪।৯

১৩। নিগূর্ণ-উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা বা ভক্তিসত্তাবীজ কি?

“সাধুসঙ্গ-ক্রমে এই শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং শ্রদ্ধা-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলতাও বাড়িয়া উঠে। তখন কি উপায়ে জীব শ্রীভগবানের চরণ পাইবেন, তাহারই অন্বেষণে যত্ববান্ হয়েন। তখন তিনি প্রথমেই দেখিতে পান, তিনি অনর্থের একান্ত বশীভূত ও তাঁহার স্বভাব স্থপ্ত। তিনি তখন কোন বিগত-অনর্থ, জাগ্রত-স্বভাব সাধুর পদাশ্রয় করত একনিষ্ঠ হইয়া ভজন-কার্য্যে প্রবৃত্ত

হয়েন। শ্রদ্ধার এই অবস্থার নামই দৃঢ় বা নিশ্চল-উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা। ইহাই ‘ভক্তিতাবীজ’।” —‘শ্রদ্ধা’, সং: তো: ৯।৫

১৪। ভক্তসেবা পরিত্যাগপূর্বক যে ‘শ্রদ্ধা’, তাহা কি প্রকৃত শ্রদ্ধা ?

“অর্চয়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।”—(তা: ১১।২।৪৭) শ্লোকে যে ‘শ্রদ্ধা’ শব্দ আছে, তাহা শ্রদ্ধাভাস মাত্র; কেন না, ভগবদ্ভক্তকে পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণ-পূজায় যে শ্রদ্ধা, তাহা প্রকৃত-শ্রদ্ধার ছায়া বা প্রতিবিম্ব—তাহা কেবল পরস্পরাগত লৌকিকী শ্রদ্ধা-মাত্র, অনন্যভক্তিতে যে অপ্রাকৃত-শ্রদ্ধা, তাহা নয়, সেই ভক্ত্যভাসের শ্রদ্ধা ও পূজা প্রাকৃত। —জৈ: ধ: ২৫শ অ:

সাধুসঙ্গ

১। মহাশয় ব্যক্তি কিরূপভাবে কৃষ্ণ-ভজনা করেন ?

“এ সংসার সারহীন, এতে মজে অর্ধাচীন,
ইহাতে বিরক্ত মহাশয়।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-ভজে, রাধাক্ষেপে সেবে ব্রজে,
নিরন্তর কৃষ্ণনামাশ্রয় ॥”

—অ: প্র: তা: উপসংহার

২। কোন্ সময় জীবের সাধুসঙ্গের স্পৃহা জন্মে ?

“বহু সূকৃতির ফলস্বরূপ ভগবৎকৃপা-ক্রমে জীবের সংসারবাসনা দুর্বল হইয়া পড়ে; তখন স্বভাবতঃই সাধুসঙ্গে স্পৃহা জন্মে। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথার আলোচনা হইতে হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং ক্রমশঃ অধিকতর চেষ্টার সহিত কৃষ্ণ-বিষয়ক অনুশীলন হইলে ভগবানকে পাইবার লোভ জন্মে। তখন গুরুচরিত্র তত্ত্বজ্ঞ গুরু চরণ আশ্রয় করত ভজন শিক্ষা করিতে হয়। ভজন-বলেই জীবের ভগবৎকৃপা লাভ হয়।” —‘সাধন’, সং: তো: ১১।৫

৩। সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা কি ?

“সাধুদিগের চরিত্রের অনুসরণ ও সাধুদিগের সিদ্ধান্ত-সমূহ শিক্ষা করিবেন।”

—‘তত্ত্বৎকর্মপ্রবর্তন’, সং: তো: ১১।৬

৪। গুরুপদাশ্রয় কি ?

“অন্তরঙ্গ-সাধুর সঙ্গই গুরুচরণাশ্রয়।”

—‘পঞ্চসংস্কার’, সং: তো: ২।১

৫। তীর্থ-ভ্রমণের প্রকৃত ফল কি ? সাধুসঙ্গে কি লাভ হয় ?

“তীর্থ-ফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,

শ্রীকৃষ্ণ-ভজন মনোহর।

যথা সাধু, তথা তীর্থ, স্থির করি' নিজ-চিত্ত,
 সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর ॥
 যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাই যাই,
 কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ ।
 যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
 সেই স্থানে আনন্দ অশেষ ॥”

—‘উপদেশ’ ১৪, কঃ কঃ

৬। সাধুগণ কি কখনও অপস্বার্থপর হন না ?

দেবতাগণ স্বার্থপর হইতে পারেন, কিন্তু সাধুগণ কখনও স্বার্থপর হন না ।
 অতএব মঙ্গল-সাধনের জন্ত যেখানে-যেখানে বিগত প্রীতি-লালসা, যেখানে-যেখানে
 কৃষ্ণকথা প্রসিদ্ধ, যেখানে-যেখানে হরিসঙ্কীর্্তন, যেখানে-যেখানে কৃষ্ণযশঃ শ্রবণেচ্ছা,
 যেখানে যেখানে কৃষ্ণ-বৈষ্ণবে সাধুবাদ, সেই-সেই স্থানে ভজন-প্রয়াসিগণ তৎপর
 হউন ।”

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

(ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রীগুরুদেবে, শ্রীগুরুদেবের প্রিয়তম স্থান শ্রীমথুরামণ্ডলে এবং গোষ্ঠে যাহারা আশ্রয়
 করিয়াছেন—তাহাদের চরণে, সজ্জন বৈষ্ণববৃন্দে, ভুলোকে যাহারা দেবতা, সেইরূপ
 শুদ্ধসত্ত্ব-প্রকৃতি ব্রাহ্মণগণে, নিজমন্ত্রে, শ্রীনামে এবং যুগলকিশোরে দস্ত পরিত্যাগ
 করিয়া রতি করিতে হইবে । যে জিনিষটা বিষয় হইতে, ভোগ্যদর্শন হইতে
 আমাদের উদ্ধার করিতে পারে, তাহাই মন্ত্র । মন্ত্রসিদ্ধ হইলে মনোবশ হইতে
 ত্রাণ হয় । দস্ত পরিত্যাগ করিতে না পারিলে গুরু, গোষ্ঠ প্রভৃতির সেবা করা
 দূরে থাকুক, তত্তদ্বস্তুর প্রভু সাজিয়া ডিক্রী ডিস্‌মিস্‌ করিয়া ফেলিব ।

এ জগতে যাহা দেখা যাইতেছে, আর যাহা দেখা যাইতেছে না তাহা সব
 কর্মের বিকার হেতু । যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মা হইতে সকলই
 পরিবর্তনশীল । যে জিনিষ অদ্বৈত করিতেছি, সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি,
 তাহা দুইদিন পরে ছাড়িয়া দিব । মায়া হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া পরিবর্তিত
 হইয়া যাইতেছে । ভগবান্ এইসব বস্তুতে আছেন, কিন্তু বস্তুগুলি ভগবান্

নহে। জগতের লোক এইসকল বস্তুকে নিত্য মনে করিয়াছে। এই জগৎ নিত্যকাল বর্তমান থাকে না। আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এ জগৎ-সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছি, তাহা সবই পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই জগতের শেষ নাই; অভিজ্ঞতার দ্বারা যত অগ্রসর হওয়া যাইবে, দুইদিন পরে সব বাদ দিতে হইবে। এ জগতের স্বরূপ—অসং অর্থাৎ অনিত্য আর ভগবানের লীলা বা ক্রিয়া নিত্য।

ইহ-সংসারে আমরা যে-সব কৰ্ম্ম করি, তাহা যদি ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হয়, আর সেই ধর্ম্ম যদি নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার সেই বৈরাগ্য যদি তীর্থপদ শ্রীহরির সেবাতেই পর্য্যবসিত না হয়, তাহা হইলে আমরা জীবিত থাকিলেও মৃত অর্থাৎ আমাদের প্রাণধারণ বৃথা। ধর্ম্ম ও বৈরাগ্যের সার্থকতা হইবে—যদি তদ্বারা হরিসেবা হয়, নতুবা ধর্ম্মানুষ্ঠান ও বৈরাগ্যের কোন মূল্য নাই।

আমরা সকলেই মেপে নেওয়ার রাজ্যে বাস করিতেছি। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-জ্ঞানকে মঞ্চল করিয়া পার্থিব রাজ্যে যে-সমস্ত জিনিষ আমাদের নিত্য-মঙ্গলের বাধা জন্মায়, তৎসান্নিধ্যে আমরা আছি। সাধুসঙ্গ ব্যতীত এ সকলের হাত হইতে আমাদের নিস্তার পাওয়ার উপায় নাই; যাহারা এ জগতের অনিত্য, বিনাশ-ধর্ম্মশীল হয় বস্তুর প্রলোভনে প্রলোভিত হইতেছে, তাঁহাদের নিত্যবস্তুর অবিনাশী বিভূত্বের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অনুসন্ধান প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের বর্তমান অবস্থায় সাধুসঙ্গে থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিলে আমাদের কর্ণে এতকাল যে-সকল অসংকথা—অমঙ্গলের কথা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইবে।

শ্রীভগবানের কথা নিত্য পূর্ণজ্ঞানময়—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়; আর দুর্লভ সজ্জনের মুখেই তাঁহার কথা কীর্তিত হয়; সুতরাং এইরূপ সজ্জনের সঙ্গ—সাধুর সঙ্গ দুর্লভ হইলেও অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমরা যে-সকল কথায় শ্রদ্ধা করি, যে-সমস্ত কথা শুনিতে আমাদের ভাল লাগে, তাহা এ জগতের মায়ামুগ্ধ জীবগণের—অনর্থযুক্ত জীবগণের ভ্রম-প্রমাদাদিযুক্ত বিচার-বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে—ইহাতে নিত্যজগতের—আত্মমঙ্গলের কোন কথা নাই, উহা অনিত্য দেহমনের তাৎকালিক তৃপ্তিকর মাত্র। কিন্তু সাধুগণের নিত্যমুক্ত ভগবৎপার্বদগণের কথায় আমাদের রুচি বা শ্রদ্ধা না থাকিলেও তাহা বৈকুণ্ঠের—চেতনরাজ্যের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের কথা; তাহা আমাদের স্বরূপের—নিত্য অণুচেতনের প্রসন্নতা বিধান করে।

শ্রদ্ধা যদি না হয়, তাহা হইলে সাধু বা ভগবদর্শন হয় না। মৎসরতা বা হিংসা আসিয়া উপস্থিত হয়। হিংসা আসে কেন? অতীত লোক আমার উপর উঠিয়া যাইতেছে, এইজন্যই হিংসা হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের গোড়ায়ই ভাগবত-ধর্মকে নির্মৎসর সাধুগণের ধর্ম বলিয়া বলা হইয়াছে। মনুষ্যজাতি যে ধারণা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ-কামনামাত্র; শ্রীমদ্ভাগবতে সেরূপ ধর্মের ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় নাই। তাহাতে নিত্যভাগবতগণের জন্ত ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের কথা আলোচিত হইয়াছে। এই সকল বিষয় যদি বুঝিতে শৈথিল্য করি, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারাই সমস্তদিন কাটিয়া গেল। আমি সেবা গ্রহণ করিব না, আমি সেবা নহি—এই স্ববুদ্ধি যদি উদ্ভিত হয়, তাহা হইলে যে-সকল দুর্বুদ্ধি মাতা-পিতা বা আত্মীয়স্বজনের কাছ হইতে পাইয়াছি ও শিখিয়াছি, সেগুলি কাটিয়া যাইতে পারে। তাহা না হইলে ঐ দুর্বুদ্ধিগুলি আরও পুষ্ট হইতে থাকিবে।

ভগবান্ যে ভোক্তা, ইহা ভুলিয়া গেলেই সংসার। ভগবানের যে ছায়াশক্তি আমাদের বিক্ষিপ্ত করিয়া দেন, অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-কামনায় মুগ্ধ করিয়া দেন, তিনি হইতেছেন দুর্গাদেবী। ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই তিনি এইরূপ মোহন করিয়াছেন, সেই ছায়াশক্তির শরণগ্রহণ করিলে কিছু স্মরণ হইবে না।

সনাতনধর্ম ও শ্রীবিগ্রহ

বস্তুর স্বভাবকে ধর্ম বলে। বস্তু দুই প্রকার—চিৎ ও অচিৎ বা জড়। চিৎ বস্তু বিনাশহীন, অচিৎ বস্তু ধ্বংসশীল ও পরিবর্তনশীল। চিদ্বস্তুর আত্মা বলে। আত্মা অবিনশ্বর ও নিত্য বর্তমান। যাহা নিত্য বর্তমান তাহাকে সনাতন বলে। আত্মধর্মই সনাতন ধর্ম; দেহ-মনোধর্ম সনাতন নহে, তাহা ধ্বংস ও পরিবর্তন-যোগ্য। বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শিখ প্রভৃতি ধর্ম মায়িককালে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। সনাতন ধর্ম আত্মধর্ম হওয়ায় তাহা নিত্যবর্তমান। হিন্দুধর্ম সনাতন ধর্মের অনুগামী ধর্ম। যতদিন ইহা দেহমনে সংযুক্ত ততদিন পরিবর্তন-যোগ্য; দেহমনাভীত আত্মধর্মসম্বন্ধিত হইলেই সনাতন ধর্ম। ভগবান্ বিষ্ণু

অবিনাশী, তৎসম্বন্ধিত ধর্মই নিত্য বা সনাতন ধর্ম। আত্মা অণু ও বৃহৎরূপে নিত্য বর্তমান। এই অণু ও বৃহদাত্মার পরস্পর স্বভাবই সনাতন ধর্ম। এই স্বভাব ক্রমবিকাশশীল হইলেও সর্বাবস্থাতেই সনাতন ও পরমোপাদেয়। তাহাই রসময় ও আনন্দময়। উপনিষদে তাহার বর্ণনা—“রসো বৈ সঃ। রসং হেবাং লঙ্কানন্দী ভবতি। কো হেবাং কঃ প্রাণ্যাং যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হেবানন্দয়তি।” (তৈত্তিরীয় ২।৭)। সেই রসময় বস্তু তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে জড়, জীবাত্মা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানরূপে যুগপৎ প্রকাশিত। প্রাকৃত চিন্তামণির দৃষ্টান্তে তাহা সর্বং খন্ডিতং ব্রহ্মরূপে বিভাত হইয়াও অবিকারী, একমেবাদ্বিতীয়ম্ তত্ত্ব। দার্শনিকগণ স্থায়ী আংশিক অল্পভূতি প্রকাশ করিলেও পরাংপর-তত্ত্বরূপে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তাঁহার পূর্ণতম বিকাশ প্রদর্শন করিয়া পরম মঙ্গলময় স্বরূপে বর্তমান। তাঁহার অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বসিদ্ধান্তে সনাতন ধর্মের পরিপূর্ণতা প্রকাশিত। শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমপরাকর্ষ্যই তাঁহার পূর্ণ পরিচয়।

ধর্মজগতে তথা আধ্যাত্মিক জগতে শ্রীবিগ্রহ ও সনাতন ধর্ম—এই দুই তত্ত্ব-বিষয়ে নানারূপ ভিন্নতা বা বিভেদ। মৌলিক বিচারে এই বিভেদ স্বাভাবিক। যেহেতু বস্তুতে বিভিন্নতা ও একত্বের যুগপৎ সমাবেশ, সেই হেতু আধ্যাত্মিকতায় ইহা জ্ঞাতব্য নহে। এই জগৎ “যশ্চ দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরো। তস্মৈতে কথিতা হর্ষা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥”—বাক্যের বর্তমানতা। “যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যন্তস্মৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।”—বাক্যেও একই প্রতিধ্বনি। “ধর্মশ্চ তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, মহাজনো যেন গতঃ স পস্থা ॥”—বাক্যদ্বারা ইহাই পরিস্ফুট। পরন্তু এই মহাজন কে? বদ্ধজীবের কল্পিত ব্যক্তি হইতে পারে না। স্বয়ং ধর্মরূপী যমদেবের উক্তিতে তাহাই পরিব্যক্ত। “ধর্মং তু সাক্ষাৎগবং প্রণীতং, ন বৈ বিদু-ঋষয়নাপি দেবাঃ, ন সিদ্ধমুখ্যা অশ্বর। মনুষ্যাঃ, কুতো হু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ।” এবমিধ দুজ্ঞেয়ত্ববিধায়, বিজ্ঞতা কাহার?—এই প্রশ্নই স্বাভাবিক। তদুত্তরে ধর্মরাজ-বাক্য—“প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোহয়ং, দেব্যা বিমোহিতমতিবৃত মায়য়া লম্। ত্রয়াং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতি কৰ্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥” কৰ্ম্মকাণ্ডদক্ষ যাজ্ঞিক মহাজনগণও মধুপুষ্পিত স্বর্গগতিতে মোহিত হওয়ায় তাঁহারাও মহাজন পদবাক্য নহেন। পরন্তু “স্বয়ন্তুর্নারদঃ শত্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ। প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥ দ্বাদশৈতে বিজ্ঞানীমৌ ধর্মং ভাগবতং ভট্টাঃ। গুহং বিশুদ্ধং দুর্কৌধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥” ব্রহ্মাদি দ্বাদশজনকে মহাজন বলিয়া যমরাজ প্রকাশ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির এই মহাজন-মধ্যে গণ্য হন নাই, পরন্তু ভীষ্মদেব মহাজন বলিয়া গণ্য হওয়ায় মহাভারতে তাঁহার

মুখ হইতে ধর্মতত্ত্ব উদগীত হইয়াছে । এই ভীষ্মদেবেও সনাতন ধর্মের পরমাত্মা ও বাহুদেবভক্তি পর্য্যন্ত বিশেষরূপে প্রকাশিত, তদুদ্দেশ্য নহে ।

উপনিষৎ তত্ত্ববস্তুকে ‘অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্’ বাক্যে বর্ণন করিয়াছে । তাহাকে সর্বাধিকতম ক্ষুদ্র ও সর্বাধিকতম বৃহৎ—বলায় ব্রহ্মের নিরাকারত্ব খণ্ডিত ও সাকারত্ব এবং আকারের নানাত্ব বা বহুত্ব স্থাপিত হইয়াছে । ব্রহ্ম যাবতীয় রূপ বা আকারের আধার, নিরাকার নহে ।

আমি বিচারেও তত্ত্বটী সাকার প্রতিপন্ন হয় । আকার পদটীই মৌলিক নিরাকার পদটী তদ্বৎ অর্থাৎ আকার পদে নৈঞ তৎপুরুষ প্রয়োগদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে । আকারকে স্বীকার না করিলে নিরাকার পদের প্রতিষ্ঠা বা ধারণা হয় না । মূলতঃ আকারই তত্ত্ব-পরিচায়ক । আত্যন্তিক অভাবযুক্ত বস্তুকে কোনওরূপে প্রকাশ করা সম্ভব নহে । তাহার বর্তমানতা অসম্ভব । ‘নাসতো বিদ্যতে ভাব’—ইহাই গীতার বাক্য । তৈল পদার্থের সর্ষপমধ্যে বিদ্যমানতা হেতু সর্ষপকে পেষণ দ্বারা তৈল প্রাপ্তি সম্ভব । ইটের গুঁড়াকে পেষণ করত কখনই তৈল প্রাপ্তি ঘটে না । আত্যন্তিক অভাবযুক্ত বস্তুর ধারণাও অসম্ভব । আকাশ-কুসুম, শশশৃঙ্গ বা অশ্ব-ভিষ পদত্রয় আত্যন্তিক অভাবযুক্ত নহে । ইহারা মৌলিক বাক্য নহে, যৌগিকবাক্য । আকাশ ও কুসুম, শশ ও শৃঙ্গ এবং অশ্ব ও ভিষ বস্তুর অস্তিত্ব আছে বলিয়া আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ ও অশ্বভিষের ধারণা সম্ভব হইয়া থাকে । সুতরাং শূন্যবাদ বা প্রচ্ছন্ন শূন্যবাদ অসত্য বা মিথ্যাবাদ—ইহাই আচার্য্য শঙ্করের স্বীকারোক্তি ।—

মায়াবাদমসচ্ছাত্তং প্রহরং বোধিমুচ্যতে ।

ময়ৈব বিহিতং দেবি ! কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা ॥ (পদ্মপুরাণ)

নির্বিশেষবাদী বা শূন্যবাদী চরমে শূন্যরূপে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আত্মহত্যা করে । তাহাদের গতি বা পরিণতি ভয়ঙ্কর ও দুঃখজনক । “অব্যক্তা হি গতির্দুঃখম্”—গীতা । তাহা সৎ বা সাধু-পদবাচ্য নহে ; পরন্তু তাহা অসৎ বা অনিত্য । তাহা সনাতন ধর্ম নহে । তাহা সন্ধর্ম না হওয়ায় আদরণীয় বা গ্রাহ্য নহে, পরন্তু বর্জ্য ।

উপনিষদে অপাণি, অপাদো, অচক্ষু, অকর্ণ প্রভৃতি পদদ্বারা নিরাকার বলা হয় নাই ; পরন্তু ব্রহ্মের প্রাকৃত আকার বা রূপ নিরাকৃত হইয়া অপ্রাকৃত আকার উপদিষ্ট হইয়াছে ।

নিরাকার সাধকের ব্রহ্মানন্দ লাভ হয় না । ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ধারণায় নিরাকারত্ব নাই । জ্যোতিঃ বলিলে, একপ্রকার রূপকেই লক্ষ্য করে । এই জ্যোতিঃ-স্বরূপ ধারণায় যে ব্রহ্মানন্দ ঘটে তাহা অতি তুচ্ছ । প্রেমানন্দের সহিত তুলনায়—

সমুদ্র ও গোপ্পদ-খাতস্থিত জলস্বরূপ বলা হইয়াছে। ইহাকে আনন্দময় বলা হয় নাই। আচার্য্য শঙ্করের নিষিদ্ধশেষ বা বিবর্তবাদের ব্রহ্মে কোন গুণ এবং তাহার অনুভবকারী না থাকায় ব্রহ্মকে আনন্দময় না বলিয়া বিষ্ঠাময় বলিলেও কোন আপত্তিজনক হইতে পারে না। শ্রীমন্নহাপ্রভু শঙ্কর বৈদান্তিক বাসুদেব সার্বভৌম তট্টাচার্য্যকে ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়তা খণ্ডন করত ব্রহ্মের অপাদান, করণ, অধিকরণাদিকারকত্ব প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব সশক্তিক স্থাপন করিয়াছেন। “আত্মারামাশ্চ” শ্লোকটী ব্যাখ্যা দ্বারা ব্রহ্মকে সর্ব-গুণাধার হরিরূপে স্থাপন ও সকল প্রকার সাধকের পরম আকর্ষণীয় ও উপাস্তৃত্ব তত্ত্ব বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মের পরিণাম-ভয়ে বিবর্তবাদ স্থাপনের অলৌক প্রয়াস করিয়াছেন। মধ্বাদি আচার্য্য চতুষ্টয় শ্রীশঙ্করের মতবাদকে সম্যকরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। গীতায় উক্ত হইয়াছে—‘মত্তঃ পরতরং নাত্যং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।’ ইহা দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পরাৎপরত্ব স্থাপিত হইয়াছে, ‘ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্’ বাক্যেও শ্রীকৃষ্ণের পরাৎপরত্ব ও ব্রহ্মের আশ্রিতত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। ‘পিতাহম্ অশ্র জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ’, ‘মমযোনির্মহদ্রক্ষ তস্মিন্ গর্তং দদামাহম্’, ‘সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত’, ‘সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি য়াঃ। তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥’—এই সমস্ত বাক্যে এবং ‘যতো ব ইমানি, ভূতানি জায়ন্তে’ শ্রীকৃষ্ণেরই ব্রহ্মত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। ‘সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ’—বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের পরাৎপরত্ব স্থাপিত হইয়াছে; কোনও উপাস্ত্র তত্ত্বের এরূপ বাক্যের প্রতিবন্ধিতা নাই।

‘যেহ্যত্মাদেবতাত্ত্বা যজন্তে শ্রদ্ধয়াষিতাঃ। তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্য-বিধিপূর্বকম্ ॥’ শ্রদ্ধাসহকারে অত্র দেবতা সেবাকারীরা আমারই সেবক কিন্তু তাহাদের এই সেবা অবিধিপূর্বক হয়। ইহার তাৎপর্য্য—‘যথা তরোর্মূলনিষেচনে তৃপ্যন্তি তৎস্বক্ভূজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাক্ষ যথেন্দ্রিয়ানাং তথৈব সর্বাহর্গম-চ্যুতেজ্যা ॥’

অর্থাৎ ব্রহ্মের মূলে জল সিঞ্চনদ্বারা শাখাপল্লবদির সেবা হয়, পাকস্থলীতে অন্নাদি উপহার প্রদান করিলেই চক্ষু-কর্ণাদি সকল ইন্দ্রিয়ের ক্ষয়পূরণ সাধিত হয়, —এই প্রকার অচ্যুত ভগবানের সেবা করিলেই যাবতীয় দেবতারও সেবা তদ্বারা বিহিত হয় বুঝিতে হইবে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সকলের মূল এবং দেবদেবী, মনুষ্য বা তদিতর জীবও তাঁহার আশ্রিত তত্ত্ব শাখাপল্লবস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ যে সকলের মূল তাহা ব্রহ্মাজীও বলিয়াছেন,—‘ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদি-

রাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ।” কৃষ্ণপূজা দ্বারা সকলেরই পূজা সৃষ্টভাবে হইলেও কৃষ্ণাশ্রিত দেবদেবীকে স্বতন্ত্রজ্ঞানে পূজা দ্বারা কৃষ্ণপূজা হয় না বুঝাইবার জন্য ‘অবিধিপূর্বকম্’ উক্ত হইয়াছে । ‘মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা পল্লবের বল, শিরে বারি নহে কার্য্যকর ॥’—ইহাই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে । শ্রীকৃষ্ণ সকলের অভীষ্ট সকলপ্রকার বস্তু প্রদান করিতে সক্ষম, পরন্তু মানব বা অন্য দেবদেবী বা মনুষ্যেতর প্রাণীর সে ক্ষমতা নাই ।

‘একমেবাদিতীয়ম্’ বাক্যটিতেও অঙ্গাদ্বী ধারণা প্রকাশ পায় । শ্রীকৃষ্ণেই নানাতত্ত্বভূক্ত কিন্তু তদাশ্রিত ক্ষুদ্র অংশাদিতে কৃষ্ণত্ব প্রকাশ পাইতে পারে না । আশ্রিত কোন তত্ত্ব গোবর্দ্ধন ধারণ বা মুরলীবাদনদ্বারা ত্রিজগৎকে মোহিত করিতে সক্ষম নহে । সমুদ্রের এক বিন্দুকে সমুদ্র বলিলে সঙ্গত হয় না । ঐ বিন্দুতে তিমিঙ্গিলের আশ্রয় নাই বা তাহাতে পোতাদির গমনাগমন সম্ভব হয় না । তদ্রূপ মানুষের সেবাই ভগবৎসেবা বাক্যটি অসঙ্গত, অবিধি বা ধাপ্পাবাজী । সমন্বয় অর্থে যাহার যে-প্রকার গুণাগুণ বা যোগ্যতা তাহাকে তদ্রূপ আখ্যা প্রদান করা বুঝায় । ছাদে উঠিবার সিঁড়ির সকল ধাপেরই একই উচ্চতা জ্ঞান করা অজ্ঞতা বা মুখতা । সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন সিঁড়ির একই উচ্চতা বুঝায় না । তদ্রূপ মত বা পথগুলির ভিন্নতা ও কার্য্যকারিতার ভেদ জানিতে হইবে । বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সর্বপ্রকার বিদ্যা শিক্ষা প্রদত্ত হয় । ইহার অর্থ—যে কোনও বিদ্যা আয়ত্ত হইলেই সর্ববিদ্যায় পারদর্শিতা নহে । শ্রীভগবানের নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপে ভেদ নাই ; তিনই সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব । ইহাই “নাম চিন্তামণিকৃষ্ণঃ” বাক্যের তাৎপর্য্য । শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোপালরূপী বিগ্রহ—তাহা নিজমুখে মাধবেন্দ্রপুরীকে বলিয়াছেন এবং পুরীর হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া গিয়া কুঞ্জমধ্যে তাঁহার অবস্থান স্থানটী প্রদর্শন করিয়াছেন । শ্রীমন্নমোহনপ্রভুও তাঁহার প্রকটকালেই শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতদ্বারা নিজ বিগ্রহ প্রকাশ করত নিজ বিগ্রহ ও স্বরূপের অভিন্নতা প্রকাশ করিয়াছেন । সাক্ষীগোপাল, ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, মদনমোহন প্রভৃতি বিগ্রহগণও নিজ নিজ লীলায় অতেদত্ত প্রকাশ করিয়াছেন । নীলাচলে দাক্ষব্রহ্ম জগন্নাথকে মহাপ্রভু “প্রতিমা নহ তুমি, সাক্ষাদ্ ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন” বাক্যে বর্ণনা করিয়াছেন । ভক্তিপথেই এই মাহাত্ম্য প্রকাশিত ; কণ্ঠ-জ্ঞান-যোগপথে তাহা প্রকাশিত হয় না ।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চামি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদন্তরম্ ॥

শ্রীভগবানের রহস্য একমাত্র ভক্তিদ্বারা সম্যকরূপে জ্ঞাতব্য । তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান

লাভ করিয়া ভক্ত তাঁহার নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন, অত্ৰ কোন পথে ইহা সম্ভবপর হয় না।—ইহাই যত মত তত পথের স্তূপ তাৎপর্য বা সর্কধর্ম-সমন্বয় বুদ্ধিতে হইবে।

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিব্যেভ ভূয়সী—
মাঠর শ্রুতিতেও ভক্তিপথেরই মাহাত্ম্য বিধোষিত হইয়াছে।

সর্বোপরি ভগবান্ নিজ সর্বশক্তির পরাজয় স্বীকার করত ভক্তের নিকট
ঋণী ও অধীনতা স্বীকার করত ভক্তিপথের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন।—

ন পারয়েহং নিরবতঃসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।

যা মাহভজন্ দুর্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

(ভাঃ ১০।৩২।২২)

হে গোপীগণ, আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নিরবত, বহু জীবনেও
অথবা দেবতাদের গ্রায় অতিদীর্ঘ পরমায়ু ব্যাপিয়া নিজ সংকারদ্বারা আমি
তোমাদের প্রতিদান দিতে অক্ষম। আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে
সক্ষম নহি; অতএব তোমরা নিজ সাধুচেষ্টা দ্বারাই পরিতুষ্ট হও।

এহেন মাহাত্ম্যযুক্ত ভক্তিপথকে কর্ম-জ্ঞানাদি পথের সহিত সমজ্ঞান করা
বিজ্ঞতা নহে, অর্কাচীনতাই প্রকাশ পায়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিক্তিবোদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

বিষয় ও বিষয়ী

মায়ার সংসারে ভোগপরতন্ত্র জীব ইন্দ্রিয়-চেষ্টাসমূহদ্বারা যাহা সংগ্রহ করে,
তাহাই 'বিষয়'। ভাবান্তরে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের নামই—'বিষয়'। ইহাদের
ভোক্তা অভিমানকারী মনই বিষয়াবিষ্ট অশুদ্ধ মন। জীব ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে জাগতিক
বস্তুসমূহকে ভোগ্যরূপে লক্ষ্য করায় ভগবতুপলব্ধিতে বঞ্চিত হইতে বাধ্য হয়।
ভগবান্—বৈকুণ্ঠ বস্তু, আর জগতের বস্তুসমূহ—বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—ভোগ্য।
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-ভোগ্যবস্তুসমূহ ত্যজ্য বিষ্ঠাজাতীয়। ত্যক্তবিষ্ঠায় যেরূপ কুমিকীটের
আনন্দ লাভ হয়, তদ্রূপ পরম উপাদেয় গ্রহণীয় বস্তু কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিয়া
আত্মবিস্মৃত জীব বিষয়-বিষ্ঠায় প্রভূত আনন্দলাভ করে। সাধুসঙ্গ লাভ না করা
পর্যন্ত বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তরূপ জড়ভোগ-রাজ্য অতিক্রম করা অসম্ভব। পরমপুরুষার্থ-

লিপ্সু জনগণের একমাত্র গতি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা জ্ঞাত নহে বলিয়া বহির্বিষয়াসক্ত কামিগণের চিন্তা বিষয়ভোগ দুষ্ট হইয়া থাকে। অন্ধচালিত অন্ধ ব্যক্তিগণ যেরূপ প্রকৃত পথের সন্ধান না জানিয়া গর্তে পতিত হয়, তদ্রূপ ভগবদ্বিমুখ বিষয়াসক্ত জীবগণ অসাধুসঙ্গ করিয়া জড় ইন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণেতর বিষয়ে স্মৃথ পাইয়া উন্মত্ত অর্থাৎ এই ভোগায়তন বিষয় সংসারকেই অত্যন্ত 'প্রেম' অনুভব করিয়া ভবকূপে পতিত হয়। এই প্রসঙ্গে ভাগবতে কণ্ঠপ দিতিকে বলিয়াছেন,—

অহো অথেন্দ্রিয়ারামো যোষিন্মযোহ মায়ায়া ।

গৃহীতচেতাঃ রূপণঃ পতিষ্যে নরকে ধ্রুবম্ ॥ (ভাঃ ৬।১৮।৩২)

“অহো! আমি অত্যন্ত বিষয়ভোগে মগ্ন ছিলাম, এই অবসরে যোষিন্ময়ী ভগবন্মায়াদ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া ধৈর্য্যাদিরহিত হইয়াছি, আমি নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইব।”

স্বরূপভ্রষ্ট জীব ইন্দ্রিয়-পরিচালনজন্তু জ্ঞানরহিত বৃক্ষের ন্যায় বিষয়াভিনিবিষ্ট হইয়া বৃথা সময়ের অপচয় করে। স্বপ্নে যেরূপ সর্পদংশনাদি মিথ্যাবিষয়ের উদ্ভব হয়, সেইরূপ বিষয়ের বাস্তব সত্তা না থাকিলেও বিষয়চিন্তানিবন্ধন জীবের মিথ্যা সংসার-প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যে দেহের জন্তু মানুষ ভোগ কামনা করে, তাহা ক্ষণভঙ্গুর ও অনিত্য এবং শৃগাল-কুকুরাদির ভক্ষ্য। যখন দেহেরই এইপ্রকার অবস্থা, তখন নিজদেহ হইতে ভিন্ন পুত্র, স্ত্রী, ধন, জন, রাজ্য, ভৃত্য ও আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি মমতাস্পদ বিষয়সকলও যে ক্ষণস্থায়ী, যে-বিষয়ে আর বক্তব্য কি? এইসকল অতি তুচ্ছ ভগবদিতর বিষয়ের বহুমানন-প্রবৃত্তি হইতেই বিষয়সঙ্গ-বাহু উদিত হয়। বিষয়সঙ্গ হইতেই বাসনা, বাসনা হইতেই বিবাদ, বিবাদ হইতেই প্রচণ্ড ক্রোধ এবং ক্রোধ হইতেই মানবের মূঢ়তা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাদৃশী তামসিক প্রবৃত্তি মানবের সদসদবিচারের স্মরণ লোপ করায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতের (ভাঃ ৪।২২।৩) “অথেন্দ্রিয়ার্থাভিধানম্” শ্লোকে শ্রীসনৎকুমার পৃথু মহারাজকে বলিয়াছেন,—“ধন ও ভোগ্য-বিষয়াদির চিন্তাই জীবের সর্বপুরুষার্থ নাশের মূল, যেহেতু তদুভয়ের চিন্তাদ্বারা জীব পরোক্ষ ও অপরোক্ষানুভূতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জড়তা প্রাপ্ত হয়।”

ভোক্তা-অভিমানী বিষয়ীর ভোগ্য-জড়দ্রব্য কখনই চিন্ময় বিষয়ভোগ্য নহে। গৃহব্রত বা গ্রাম্যব্যবহারবিৎই ‘বিষয়ী’, তাঁহার সঙ্গই ‘রাজস’। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে উক্ত রহিয়াছে,—

বিষয়ীর অন্ন থাইলে মলিন হয় মন।

মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥

বিষয়ীর অন্ন হয় 'রাজস' নিমজ্জণ ।

দাতা, ভোক্তা—হুঁহার মলিন হয় মন ।

(চৈঃ চঃ অন্ত ৬।২৭৮-২৭৯)

উপরোক্ত পয়ারের অনুরূপে জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—“অবৈষ্ণব বা প্রাকৃত সহজিয়াগণ—বিষয়ী । তাহাদের অভক্তি-প্রদত্ত অন্নের গ্রহণ বা ভোজন-সংসর্গ ফলে সাধক-বৈষ্ণবের সঙ্গদোষ ঘটে এবং তৎফলে সাধকগণ তাহাদের গায় স্বভাব লাভ করে । ‘অবৈষ্ণব’ ও ‘বৈষ্ণব’ নামধারী প্রাকৃত সহজিয়াগণের সহিত বিন্দুমাত্র প্রচ্ছন্ন প্রীতির সহিতও যদি কেহ ছয়প্রকার সঙ্গ (দান, প্রতিগ্রহ, ভোজন, ভোজনে প্রবর্তন, গুটকথা বর্ণন ও জিজ্ঞাস) করে তাহা হইলে অপ্রাকৃত শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির স্থানে জড়েন্দ্রিয়-তর্পণমূলক প্রাকৃত-ভোগ আসিয়া সাধককে কৃষ্ণভক্তিচ্যুত করে । সুতরাং আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপর বিষয় মলিন অশুদ্ধচিত্তজনের পক্ষে অপ্রাকৃত কৃষ্ণস্মরণাদি-সেবন কখনও সম্ভব নহে ।”

শ্রীকৃষ্ণভজন-দ্বারাই জীবের জড়বিষয়ভোগের নিবৃত্তি

সমগ্র কৃষ্ণভজনহীন সংসারই বিষয়-বন্ধনে বদ্ধ ; তাহা হইতে উদ্ধার লাভের গায় সৌভাগ্য আর নাই । ইতর বস্তুর ধ্যানকারী জীবগণের যে-কাল পর্যন্ত বিষয়-ভোগচেষ্টা প্রবল থাকে, তৎকালাবধি তাহাদের কৃষ্ণভক্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না । কৃষ্ণ যেদিকে বর্তমান, তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ভোগীর বিষয় অবস্থিত । গুণতাড়না-ক্রমেই জীবের সংসার-বন্ধন । যদি ভগবৎকৃপা-ক্রমে জীবের হৃদয় সাধুসঙ্গ লাভ ঘটে, তাহা হইলে তাহার বিষয়-ভোগের রুচি পরিবর্তিত হইয়া ভগবৎসেবায় রুচি জন্মে । কৃষ্ণানুশীলন পরিত্যাগ করিলে বিষয়ের স্বাভাবিক-ধর্ম জীবকে অপরাধ-পক্ষে নিমজ্জিত করে । ভগবৎসেবাপর ব্যক্তি যে-প্রকার সুখপ্রাপ্ত হয়, বিষয়াদি লোভে অর্থচেষ্টায় ইতস্ততঃ ধাবমান পুরুষের সে-প্রকার সুখ কোথায় ? যাহারা কৃষ্ণভজন করিয়াও বিষয়সুখ বাঞ্ছা করে তাহাদের গায় অবিবেকী আর কেহই নাই । এতৎপ্রসঙ্গে ইন্দ্র দিতিকে বলিয়াছেন,—

আরাধ্যাত্মপ্রদং দেবং স্বাত্মানং জগদীশ্বরম্ ।

কো বৃণীত গুণস্পর্শং বৃধঃ শ্রান্নরকেহপি যৎ ॥ (ভাঃ ৬।১৮।৭৫)

“নিরতিশয় পুরুষার্থরূপ ও নিরতিশয় প্রিয় দেব জগদীশ্বরকে আরাধনা করিয়া কোন্ বিবেকী বিষয়সুখ বাঞ্ছা করে, যে বিষয়ভোগ নরকেও বর্তমান ।” শাস্ত্রের অন্তরও পাওয়া যায়,—

তোমার ভজনফলে তোমাতে ‘প্রেমধন’।

বিষয় লাগি, তোমায় ভজে, সেই মুখ জন ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২।৬২)

উপরোক্ত পয়ারের অনুভাষে জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—“বিষয়িগণ নিজ নিজ বিষয়লাভের জন্য ফলভোগকামনাময়ী চিত্তবৃত্তি লইয়া বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের সাহায্যপ্রার্থী হয়। বিষয়িগণ ঈশ্বরের নির্মল উপাসনা করিতে গিয়াও ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ নিজের প্রাকৃত স্বার্থদ্বারা চালিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্য ‘মুক্তি’, স্বর্গাদি ভোগ ও ব্যবহারিক অদ্বন্দ্বের আশা করিয়া কৃষ্ণ ও কাঞ্চের শুদ্ধসেবা বিমুখ হইয়া পড়ে।”

কৃষ্ণই একমাত্র ‘বিষয়’ বলিয়া কৃষ্ণভক্ত প্রকৃত ‘বিষয়ী’

সর্বদা জড়বিষয়-চিন্তারত ব্যক্তির চিত্ত যেমন বিষয়েই নিমগ্ন হয়, তেমনই ভগবৎসেবাপরায়ণ ব্যক্তির চিত্তও ভগবানে তন্ময় হইয়া যায়। বাস্তবিকপক্ষে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন দ্বিতীয় বিষয় থাকিতে পারে না, যাহা ‘বিষয়’ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা ‘কুবিষয়’ ও জড়। ভগবৎসেবার অনুকূল বস্তুসমূহকে জড় ‘বিষয়’ বলিয়া ত্যাগ করিলে মারাত্মক ভুল করা হইবে। “শ্রীহরির সেবায় যাহা অনুকূল। ‘বিষয়’ বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।” শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদও ‘মনঃ-শিক্ষা’তে গাহিয়াছেন,—

আসক্তি রহিত,

সম্বন্ধ সহিত,

বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

ভগবৎসেবার অনুকূল বিষয়সমূহকে ভক্তগণ পরম যত্নের সহিত সংরক্ষণ করেন। তাই ত’ ভক্ত অভিমান করেন, “তোমার সংসারে আমি বিষয়-গ্রহরী।” অনাসক্ত-ভাবে বিষয়ের সদ্যবহার করিয়া কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত থাকাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে উপদেশ করিয়াছেন,—

মর্কটবৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞ।

যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞ ॥

অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার।

অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৬।২৩৮-২৩৯)

জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদও বলিয়াছেন,—

যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ, অনাসক্ত সেই কি আর কহব।

আসক্তি রহিত, সম্বন্ধ সহিত, বিষয়সমূহ সকলি ‘মাধব’ ॥

বিষয়-মদাক্ত ব্যক্তিসমূহ পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধি, রায় রামানন্দ প্রমুখ ভক্তাধিরাজ-
গণের সম্পত্তি দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে বিষয়ী জ্ঞান করিয়া নিজেরাই
বিষয় সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন। ফলস্বরূপে ইহাতে প্রাকৃত বিষয়ীদের বিভ্রম না বৃদ্ধি
হয় মাত্র। বিষয়ীদের মধ্যে আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—“রায় রামানন্দাদি
যদি বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে
আমরা বিষয় সংগ্রহে ব্যস্ত থাকিলেও ভক্তমধ্যে গণ্য হইব না কেন? ‘বিষয়ী’
হইলেও সন্ন্যাসীকে উপদেশ করা যায়। তাহা না হইলে মহাপ্রভু কেন
বলিয়াছেন,—

‘গৃহস্থ’ হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের বশে।

‘বিষয়ী’ হঞা সন্ন্যাসীকে উপদেশে ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫।৮০)

অতএব বিষয় সংগ্রহ করিলে ক্ষতি কি?” জড়বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের এই ভ্রান্ত
মতবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতা-
মৃতের (অন্ত্য ৫।৮০) অনুভাষ্যে বলেয়াছেন—“গৃহস্থাশ্রমি-লীলায় শ্রীরামানন্দ প্রভু
প্রাকৃত-লোকের ভোগময়ী-দৃষ্টিতে ‘বিষয়ী’ হইলেও অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণলীলাই তাঁহার
গুরুস্ব মনের সর্বক্ষণ উপাস্ত-বিষয় হওয়ায় তিনি—কৃষ্ণবিষয়ী, ভগবানের
চিদ্বিলাস-বিরোধী নির্বিশেষবাদী তार्কিক নহেন, তিনি ত্যক্ত বিষয় নিগুণ
সন্ন্যাসিগণকে কৃষ্ণ-প্রতীতিহীন জড়বিষয় ত্যাগ করাইয়া কৃষ্ণবিষয়াত্মশীলনে প্রবৃত্ত
করিতে সমর্থ।”

ভক্তিপথের পথিক বৈষ্ণবগণ বিজ্ঞা, ধন, রূপ, যশ ও কুলমদে অন্ধ হইয়া বিষয়াত্ম-
সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন না। বৈষ্ণব যে কৃষ্ণপাদপদ্মে সর্বস্ব সমর্পণ করেন,
তাহা তাহার প্রাপকিক বস্তুসমূহে লোভহীনতার পরিচয়কেই বহন করে। সুতরাং
ঐকান্তিক বৈষ্ণবতান্না হওয়া পর্য্যন্ত কৃষ্ণের তুষ্টি হইতে পারে না, কৃষ্ণের তুষ্টি
হইলেই জড়বিষয়ভোগে জর্জরিত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীমদ্‌মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভিধিপূজা উপলক্ষে

ভক্তি-অর্ঘ্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৯ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের দ্বারা নাম-মহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন এবং রূপ-সনাতনের দ্বারা যথাক্রমে 'ব্রজের রস-প্রেমলীলা'র কথা এবং 'ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাসে'র কথা প্রকাশ করিলেন ।

ঠাকুর নরোত্তম গাহিলেন,—

এই ছয় গোনাঞি যবে ব্রজে কৈলেন বাস ।

রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলেন প্রকাশ ॥

ব্রজের কৃষ্ণ-বলরাম জগজ্জীবের প্রতি সদয় হইয়া গোড়দেশে চৈতন্য-নিত্যানন্দ রূপে প্রকটিত হইলেন,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, আর প্রভু-নিত্যানন্দ ।

যাঁহার প্রকাশে সর্ব জগৎ আনন্দ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৮৭)

এইমত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান ।

তমোনাশ করি' করে বস্তু-তত্ত্বজ্ঞান ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৮৯)

শ্রীমদ্‌মহাপ্রভুর আচার ও প্রচারলীলা সম্বন্ধে স্তবমালায় বর্ণিত আছে,—

হরে কৃষ্ণেতু্যচৈঃ স্মরিতরঙ্গনো নামগণনা...

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোঁষাস্ত্রতি পদম্ ॥

অর্থাৎ দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরাব্লক 'হরে কৃষ্ণ' নাম উচৈঃস্বরে কীর্তন করিতে করিতে যাঁহার জিহ্বা নৃত্য করিতে থাকে, উচ্চারিত নাম-সংখ্যা গণনার নিমিত্ত গ্রন্থিশ্রেণীদ্বারা সুশোভিত কটিসূত্রে যাঁহার বামকর শোভা পাইতেছে, যিনি বিশাল-নয়ন ও আজানুলম্বিতভুজ, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনর্বার আমার নয়ন পথের পথিক হইবেন ?

শ্রীগোঁরাবতারের মূখ্য ও আনুষ্ঠানিক প্রয়োজন সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিলেন,—

এইমত চৈতন্যকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্ ।

যুগ্মধর্ম-প্রবর্তন নহে তাঁ'র কাম ॥ (আদি ৪।৩৭)

দুই হেতু অবতারি' লঞা ভক্তগণ ।

আপনে আশ্বাদে প্রেম-নামসংকীর্তন ॥ (আদি ৪।৩৯)

এইমত ভক্ত ভাব করি' অঙ্গীকার ।

আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার ॥ (আদি ৪।৪১)

অবতারের বাহুকারণ বর্ণন-প্রসঙ্গে বিদগ্ধমাধব বলিলেন,—

অনর্পিতচরীং চিরাং করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ

সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জল-রসাং স্বভক্তিপ্রিয়ম্ ।

হরিঃ পুরটস্থন্দরত্যাতি-কদম্বসন্দীপিতঃ

সদা হৃদয়-কন্দরে ক্ষুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

অর্থাৎ, স্ববর্ণকান্তি-সমূহদ্বারা দীপ্যমান শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়ে ক্ষুষ্টি-লাভ করুন । যে সর্বোৎকৃষ্ট উজ্জল রস জগৎকে কখনও দান করা হয় নাই, সেই স্বভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার জন্ত তিনি কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, স্বয়ং অবতারী ভিন্ন প্রেমধন দান করিবার অধিকার অন্য কোন অবতারের নাই ।

শ্রীগৌরাবতারের মূল-প্রয়োজন এবং গুহ্যকারণ সম্বন্ধে শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী তাঁহার কড়চায় লিখিলেন,—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-

স্বাভ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ ।

সৌখ্যঞ্চাস্তা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ-

তদ্ভাবাত্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধো হরীন্দুঃ ॥

অর্থাৎ—শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা, যাহা শ্রীরাধা আশ্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অন্তর্ভূতি হইতে শ্রীরাধার বা কি সুখ উদয় হয়,—এই তিনটি বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভ-সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন ।

রাধাভাবত্যাতি-স্ববলিত-তনু ধারণ করিয়া শচীনন্দন গৌরহরি মুখ্যরূপে রাধাভাবে বাঞ্ছাত্মক পূরণ করেন এবং গোঁণরূপে নাম-প্রেম প্রচার করেন । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিলেন,—

সেই রাধাভাব লঞা চৈতন্য-অবতার ।

যুগধর্ম্য নাম-প্রেম কৈল প্রচার ॥ (আদি ৪।২২০)

শ্রীগৌরলীলা যে নিত্যকাল চলিতেছে, সে সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিলেন,—

অতাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে ।

যা'র ভাগ্যে থাকে সে দেখয়ে নিরন্তরে ॥ (মধ্য ২৩।৫১৩)

অপূর্ব চৈতন্যলীলার কথা যাহারা স্বীকার করেন না, শাস্ত্র তাহাদিগকে চৈতন্য-বিদ্বেষী অশ্বরগণের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন,—

কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি' মানি । —

চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৮।২)

হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন ।

সর্বোত্তম হইলেও তা'রে অশ্বরে গণন ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৮।১২)

অধুনা কোন কোন অপসম্প্রদায় শ্রীগৌরান্দকে 'নাগর' সাজাইয়া ভজন করেন ।

ইহা গোস্বামিবর্গের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কার্য্য । কারণ শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন,—

'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে ।

শ্রবণেও না করিল বিদিত সংসারে ॥

অতএব যত মহামহিম সকলে ।

'গৌরান্দনাগর' হেন স্তব নাহি বলে ॥

যতপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে ।

তথাপিও স্বভাব সে গায় বৃধজনে ॥ (আদি ১৫।২২-৩১)

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপার বিশেষত্ব কিদৃশ, তাহার প্রচার-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলিলেন,—

চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ' সব বিচার ।

নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার ॥

স্বতন্ত্র-ঈশ্বর প্রভু, অত্যন্ত উদার ।

তা'রে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥ (আদি ৮।৩১-৩২)

শ্রীনাম-নামী অভিন্ন,—এই তত্ত্ব-বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'নাম' ও 'অর্চা'রূপে

আর দুই অবতার স্বীকার করিয়া শচীমাতাকে বলিলেন,—

আর দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ণনারস্তে ।

হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥

মোর অর্চা-মুক্তি মাতা, তুমি সে ধরণী ।

জিহ্বারূপা তুমি মাতা, নামের জননী ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৭।৪৫)

শ্রীল ঠাকুর লোচনদাস জীবের দুঃখতুর্দশা দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া গাহিলেন,—

সংসার ভজিলি, (শ্রী) গৌরান্দ ভুলিলি,

না শুনিলি সাধুর কথা ।

ইহ-পর কাল, দু'কাল খোয়ালি (মন),

খাইলি আপন মাথা ॥

পরিশেষে, শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া আমি আমার ভক্তি-অর্থের পাত্রটি পূর্ণ করিব। এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত কি, তাহা নিরূপিত হইয়াছে,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তুকাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিৎপাসনা ব্রজবধুবর্গেণ যা কল্লিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

অর্থাৎ ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। ব্রজবধুগণ যে-ভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই সর্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই নির্মল শব্দপ্রমাণ এবং প্রেমই পরম-পুরুষার্থ— ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই।

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।

বিচার করিলে চিন্তে পাবে চমৎকার ॥

চৈতন্যলীলামৃতপুর, কৃষ্ণলীলা স্বকপূর,
তুহে মিলে হয় স্মাদুর্ঘ্য।

সাধু-গুরু-প্রসাদে, তাহা যেই আশ্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য ॥

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোহপি যদনুগ্রহাৎ ।

তরেনানামত-গ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধাস্তসাগরম্ ॥

বাহ্যকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকৃপাকণা-প্রার্থী—

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিবৃন্দ

জীবের কৃত্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৪ পৃষ্ঠার পর]

মায়া হ'তে মুক্তি দিতে পারেন একমাত্র মুকুন্দ । মুকুং দদাতি ইতি—মুকুন্দ অর্থাৎ মুক্তি দিতে পারেন বলেই ভগবান্ কৃষ্ণের আর এক নাম 'মুকুন্দ' । শাস্ত্র বলেছেন,—“তুরীয়-কৃষ্ণের নাহি মায়ায় সম্বন্ধ”—(চৈঃ চঃ আঃ ২।৫২) কৃষ্ণ মায়াতীত নিগুণ, আর মায়াদেবী দুর্গা এই দেবীধামের অধিষ্ঠাত্রী ত্রিগুণময়ী । কৃষ্ণের (মুকুন্দের) নিজ ধাম কোথায় ? তাঁর নিজের ধাম গোলোক-বৃন্দাবন । চতুর্দশ ভুবনাত্মক এই দেবীধামের উপরে প্রকৃতির আটটি আবরণ অতিক্রম করে কারণসমুদ্র, তদুপরি সিদ্ধলোক বা নির্বিশেষ ধাম, তার উপরে পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ ; অতঃপর কৃষ্ণলোক—দ্বারকা, মথুরা, গোকুল । তদূর্দ্ধে গোলোক-বৃন্দাবন সর্বোচ্চ ধাম । কারণসমুদ্রের বাহিরে মায়াদেবীর অবস্থিতি । কারণসমুদ্র স্পর্শ করবার ক্ষমতা মায়াদেবীর নেই ।

“মায়া শক্তি রহে কারণাক্সির বাহিরে ।

কারণসমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥” (চৈঃ চঃ আঃ ৫।৫৭)

অতএব ভুবন-পূজিতা মহামায়া দুর্গাদেবী কারণসমুদ্র অতিক্রম করে মায়া-গন্ধ-স্পর্শ-শূন্য পরব্যোম বৈকুণ্ঠ ও তদূর্দ্ধ স্থানে ও সর্বোচ্চ গোলোক-বৃন্দাবনে কি জীবকে নিয়ে যেতে পারেন ? মহামায়ার ছত্রছায়ায় বা আশ্রয়ে লালিত-পালিত হয়ে তাঁকে মনে-প্রাণে ত্যাগ করতে কেহ ইচ্ছা করে না । উৎকৃষ্ট বস্তু পেলে লোকে নিকৃষ্ট বস্তুকে ত্যাগ করে । পরতত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ ও শক্তির কার্য না জানতে পারলে মায়া ত্যাগ করার অভিলাষ জাগে না । কৃষ্ণ-বহিস্মুখতা-দোষে আমরা মায়ায় আকর্ষণ শক্তিদ্বারা সর্বদাই বিক্ষিপ্ত হচ্ছি । কোনও ছেলেকে তার জন্মদাত্রী মাতা ব্যতীত অন্য কোনও মহিলা লালন-পালন করলে সেই মহিলা ছেলেটির কাছে পালিতা-মাতারূপে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং ছেলেটিও পালিতা-মাতার স্নেহ-বন্ধনে এতই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে যে সেই স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করতে সহজে পারে না । তদ্রূপ আমাদের কাছে দেবী মহামায়ার স্নেহ অপরিসীম । পালিতা-মাতা যেমন তার আদরের পালিত ছেলেকে ত্যাগ করতে পারে না,—নানারকম ভাবে ভুলিয়ে কাছে রাখতে চায়, তেমনই মহামায়াও আমাদেরকে ভগবানের পথে, নিত্য আনন্দের পথে, শাস্তির পথে যেতে না দিয়ে সর্বদাই সংসারের কর্মচক্রে নিক্ষেপ করে আপাতরম্য অনিত্য আনন্দের দিকে

আকর্ষণ করে তার প্রভাব (influence) বিস্তার করে চলেছে। ভগবান্ কৃষ্ণের কৃপার অনুভূতি না পাওয়া পর্যন্ত কারও সাধ্য নেই যে মায়ার ছলনা বুঝতে পারে। শরণাগত জনকেই ভগবান্ আকর্ষণ করেন। তাই কৃষ্ণের শরণাগত হওয়া ছাড়া আমাদের অন্য গতি নেই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে,—

“কৃষ্ণ তোমার হও যদি বলে একবার।

মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৩৩)

এক্ষণে মায়াবন্ধতা অপসারণার্থে কৃষ্ণের কৃপা পেতে হ’লে জীবের যোগ্যতা প্রাপ্তির হেতু কি? তদন্তরে শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন,—“ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ”—(ভাঃ ১১।১৪।২১) অর্থাৎ একমাত্র ভক্তির দ্বারাই জীবের সেই যোগ্যতা লাভ হবে, অন্য কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি মার্গে সেই যোগ্যতা পাওয়া যাবে না। একমাত্র কৃষ্ণকে আশ্রয় করলেই ময়া-বন্ধন মোচন হয়ে জীব পরাগতি লাভ করে; যথা—গীতার বাণী—

“মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্য্যঃ পাপযোনয়ঃ।

দ্বিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥”

(গীতা ৯।৩২)

অর্থাৎ —[আমার প্রতি ভক্তি আচারব্রষ্টকে পবিত্র করে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কেননা, আমার প্রতি ভক্তি হুঙ্কলজাত ও অনধিকারী ব্যক্তিকেও সংসার হ’তে মুক্ত করে, ইহাই বলছেন—] হে পার্থ! যারা অন্ত্যজাদি নিকৃষ্ট-জন্মা হয়েছে, স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রগণ, তারাও আমাকে আশ্রয় করে পরমগতি প্রাপ্ত হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হয়েছে,—

“কৃষ্ণ-বহিস্মুখতা-দোষ ময়া হৈতে হয়।

কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হৈতে ময়া মুক্তি হয় ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১৩১)

জীবশক্তি অপ্রাকৃত পূর্ণ চিহ্নিত্বের অসম্পূর্ণ লক্ষণ। ময়াশক্তি অপ্রাকৃতের বিপরীত প্রাকৃত। জীবশক্তি হ’তে উদ্ভূত জীবগণ স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত হওয়ায় পূর্ণশক্তিমান্ ভগবান্ কৃষ্ণের অধীন। অতএব কৃষ্ণের সঙ্গেই জীবগণের নিত্য সম্বন্ধ। ব্রহ্মা স্পষ্টভাবে বলেছেন,—“স নিত্যো নিত্যসম্বন্ধঃ প্রকৃতিশ্চ পরৈব সা।” (ব্রঃ সং ৫।২১) অর্থাৎ “সেই জীব নিত্য এবং ভগবান্ কৃষ্ণের সহিত অনাদি অনন্তকাল ব্যাপী নিত্যসম্বন্ধ-বিশিষ্ট; তিনি পরাপ্রকৃতি।”

জীবগণ চিংকিরণকণ হওয়ায় মায়িক বস্তুর মত অনিত্য নয়। জীব অণু

হওয়ায় পূর্ণ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের অংশ বা দাস। কোন বস্তুর শক্তি (গুণ) বস্তু থেকে অপৃথক্ হলেও সেই শক্তিকে বস্তু বলা যায় না বা সেই শক্তি বস্তু হ'তে পারে না। জীব শক্তিতত্ত্ব হওয়ায় শক্তিমানের সেবা করাই তার ধর্ম। তাই জীবশক্তিকে ভগবান্ কৃষ্ণের নিত্যদাস স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ২।৭ শ্লোকে অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন,— “শিষ্যস্তেহং শাশ্বি মাং ত্বাং প্রপন্নম্”—অর্থাৎ “আমি আপনার শিষ্য, অতএব আপনার শরণাপন্ন, আমাকে শিক্ষা দিন।” উক্ত শ্লোকে অর্জুন নিজেকে ভগবান্ কৃষ্ণের শিষ্য বা দাস বলে স্বীকার করেছেন। আবার অর্জুন কৃষ্ণদাস্ত্রময় স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করত শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সম্পূর্ণ শরণাগত হয়ে বলেছেন,—“করিষ্যে বচনং তব”—(গীতা ১৮ ৭৩) অর্থাৎ “আপনি যাহা আদেশ করবেন, আমি তাহাই পালন করব।”

গীতার উক্ত শ্লোকদ্বয়ে শুদ্ধভক্ত অর্জুন ভগবান্ কৃষ্ণের শিষ্য বা দাসত্ব স্বীকার করে জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিলেন যে, ভগবান্ কৃষ্ণই জীবের নিত্য প্রভু, আর জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস।

পদ্মপুরাণ স্পষ্টতঃ জানিয়েছেন,—“দাসভূতমিদং তস্য ব্রহ্মাত্মসকলং জগৎ”— অর্থাৎ—“ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা, কালী, সূর্য্য, গণেশ প্রভৃতি সকল দেবতা এবং অগ্ন্যাগ্ন সকল জীবই শ্রীকৃষ্ণের দাস বা সেবক।”

“ম-কারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজঃ পরবান্ সদা।

দাসভূতো হরেরেব নাগ্ন্যশ্চৈব কদাচন ॥” (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ—“জীব একমাত্র ভগবান্ শ্রীহরিরই দাস, কদাপি অগ্ন্য কারও দাস বা সেবক নয়।” অতএব, কৃষ্ণ ব্যতীত অগ্ন্য কারও দাসত্ব স্বীকার করতে শাস্ত্র বলেন নি। জীব কৃষ্ণানুগত সত্তাবিশেষ ও কৃষ্ণের নিত্যদাস হ'লেও তটস্থ ধর্ম-বশতঃ ভগবৎসেবার দিকে অথবা জড়ভোগের দিকে যা'বার যোগ্য। কৃষ্ণকে ভুলেই জীবের মায়িক অভিমান উপস্থিত হয়েছে; তাই শাস্ত্র বলেছেন,— “মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ-স্মৃতি-জ্ঞান।” (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২২) “মায়ামুগ্ধ জীব মায়িক দেব-দেবীর প্রতিই আসক্ত হয়ে থাকেন, আর ভাবেন— মায়িক দেব-দেবীগণই তাদের পিতা-মাতা ও অভীষ্টপ্রদাতা। এই মায়ামুগ্ধ জীবগণের ধারণা ভ্রান্ত। কৃষ্ণ মায়ার অধীশ্বর; আর দেব-দেবীগণ ও জীবগণ সকলেই মায়ার বশীভূত। অতএব কৃষ্ণই সর্ব-সেবা ও সর্বেশ্বর। ভগবদাস্ত্র পরিত্যাগ করে মায়ার দাস হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। দুর্গা, কালী, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণের উপাসনায় জীবের স্বরূপ-জ্ঞান আবৃত থাকে। এঁরা কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির ছায়া। ছায়া অন্ধকারময়; তা'তে জ্ঞান-রূপ সূর্য্যের প্রকাশ নেই।

আলোর বিপরীত দিকে ছায়া পড়ে। অপ্রাকৃতের বিপরীত প্রাকৃত হওয়ায় প্রাকৃত দেব-দেবীগণের কৃপাও প্রাকৃত। ছায়ারূপ অন্ধকারময় স্থানের দেবতা অন্ধকারময় তথা অজ্ঞানময় বস্তুই দিতে পারেন।

জীব স্বরূপতঃ বিভূ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের অণু অংশ। তাই জীবের মধ্যে সচ্চিদানন্দ আছে। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলেই জীব আনন্দের সন্ধান করে, আনন্দের দাসত্ব করতে চায়। কিরূপ আনন্দ চায়? যে আনন্দ নিত্য, সেইরূপ আনন্দ চায়। যে আনন্দ ধ্বংসশীল, যে আনন্দ চিরকাল থাকে না, সেই ক্ষণিক আনন্দ তো দুঃখ-অশান্তিরই নামান্তর। তাতে কারও আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয় না। সেই আনন্দ কোথায় আছে? সনাতন পূর্ণ সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ কৃষ্ণের কাছেই সেই নিত্য আনন্দ বিরাজমান। বৈকুণ্ঠ বা চিজ্জগতের হয়ে বিকৃত প্রতিফলন এই জড়জগৎ। বৈকুণ্ঠ হচ্ছে কুণ্ঠাধর্ম-রহিত অর্থাৎ সেখানে কোন প্রকার অভাব নেই। আর এই জড়জগৎ হচ্ছে কুণ্ঠাধর্ম সহিত অর্থাৎ অভাবযুক্ত হয়ে বিদগ্ধমান। জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভাষায়—“বৈকুণ্ঠ ও মায়া—এই দুইটির স্বরূপ বিচার করলে জানা যায় যে, একটি কুণ্ঠাধর্ম-রহিত; উহাতে কোনপ্রকার অভাব নেই। আর একটি কুণ্ঠাধর্মযুক্ত, তাহা অভাবময়।” জড়জগতের অধিকর্তা অপরাশক্তি তথা ছায়ারূপা মায়া। জড়া বা অভাবের কর্তা অভাবীই হবেন। অতএব অভাবী মায়াদেবী কি জীবের অভাব-বোধ দূর করতে পারেন? জড়া বা অভাব দুঃখেরই প্রতীক (Symbol); জড়ের সেবা করে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা নশ্বর, —পরিণামে দুঃখই আনয়ন করে। ফলে জীব জন্ম-জন্মান্তর দুঃখ-জালা-যন্ত্রণাময় সংসারচক্রে আসা-যাওয়া করতে থাকে। কৃষ্ণ-দাসত্ব যে জীবের নিত্যস্বরূপ—এ কথা ভুলে জীব টাকার দাস, স্ত্রী-পুত্রের দাস, পিতা-মাতার দাস, দেশ-দেশের দাস,—এবস্থিধ মায়ার দাসত্ব করাটাই সুখপ্রদ মনে করে। কিন্তু এ সব অনিত্য বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে যে সুখ পায়, সেই সুখও অনিত্য—পরিণামে দুঃখ দেয়। নিত্যবস্তু ভগবানের দাসত্ব বা সেবা করলে যে সকলেই সুখী হয়—এটা আমরা ভাবি না। “তস্মিন্জগত্ প্রীণিতং প্রীণিতং জগৎ”—এই শাস্ত্র-বাণী অল্পসারে ভগবান্ কৃষ্ণ তুষ্ট বা প্রীত হ’লেই জগতের বা জগজ্জীবসকলের তুষ্ট বা প্রীতি হয়। অতএব, কৃষ্ণ ব্যতীত আর কে আছেন, যে তাঁর দাসত্ব করব?

আমরা যে একমাত্র কৃষ্ণের সঙ্গেই নিত্য সম্বন্ধযুক্ত, তা’ ভুললে চলবে না। আমাদের প্রকৃত পরিচয় নিহিত আছে পূর্ণ সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসত্বে।

ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু তারস্বরে ঘোষণা করেছেন,—

“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস ।

কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি, ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮)

জীব স্ব-স্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে তা’র ভগবদাস্ত্র ব্যতীত আর কোন অভিমান থাকে না । যার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধিত বস্তুর প্রতি আমরা আকর্ষিত হয়ে থাকি । আমরা বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে কোথাও গেলে বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-স্বজনের দিকে আমাদের আকর্ষণ থাকে । কেননা ঐ সকলের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আছে । পাখীরা দিনের বেলায় তাদের খাত্তের সন্ধানে বহু দূর চলে যায়, কিন্তু সন্ধ্যা হ’লেই তারা নিজ নিজ বাসায় ফিরে আসে । কারণ বাসার সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ আছে । ভগবান্ কৃষ্ণের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ রয়েছে, কারণ আমরা যে তাঁরই নিত্যদাস । তটস্থ-লক্ষণে আমাদের পরিচয় ভিন্নরূপ হয়ে গেছে । কৃষ্ণের দাসত্ব না করে আমরা মায়া’র দাসত্ব করছি । যারা মায়া’র সঙ্গ করে, তারা বদ্ধ, যারা ভগবানের সঙ্গ করে, তারা মুক্ত বা ভক্ত । (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীনাম-প্রভুর চরণে প্রার্থনা

চেতোদর্পণ-মাজ্জ’নং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধু-জীবনম্ ।
আনন্দানুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাশ্রয়পনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তনম্ ॥

জয় জয় ভুবন-মঙ্গল হরিনাম ।

নিখিল-শাস্ত্রে ঘোষিত তব গুণগ্রাম ॥ ১ ॥

হে নাম ! হৃদি-দর্পণ করহ মাজ্জ’ন ।

ভব-দাবাগ্নি প্রভু করহ নির্বাপণ ॥ ২ ॥

কুমুদ-শুভ্র কিরণ কর বিতরণ ।

চিন্ময় শ্রীবিদ্যাবধু জীবের জীবন ॥ ৩ ॥

অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবা করহ বর্দ্ধন ।

পদে পদে করাও পূর্ণামৃতাস্বাদন ॥ ৪ ॥

সর্ব্ব স্বরূপে কর শীতল উৎপাদন ।

সর্ব্বত্র জয় হউক নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন ॥ ৫ ॥

বহুবিধ নিজনাম করেছ বিস্তার ।
 শ্রীনামে সর্বশক্তি অর্পিছ অপার ॥ ৬ ॥
 সে-নাম স্বরণে নেই কালাদি নিয়ম ।
 সর্বজীবে এ নাম সুলভ অনুপম ॥ ৭ ॥
 না জন্মিল অনুরাগ সেই নামে মোর ।
 দুর্দৈব নাম-অপরাধে হৈলাম ভোর ॥ ৮ ॥
 কবে প্রভু, হবে মতি তৃণাপেক্ষা হীন ।
 তরু-সম সহিষ্ণু হইব সমীচীন ॥ ৯ ॥
 সকলে সম্মান কবে করিব প্রদান ।
 অহর্নিশ কবে গা'ব তব গুণগান ॥ ১০ ॥
 ধন-জন-কবিতাসুন্দরী না করি কামনা ।
 জন্মে জন্মে দেহ প্রভু শুদ্ধভক্তি কণা ॥ ১১ ॥
 শ্রীনন্দ-তমুজ তুমি, আমি নিত্যদাস ।
 স্বকর্ম-বিপাকে মোর ভব-কূপে বাস ॥ ১২ ॥
 কুপা কর প্রভু, এবে পদধূলি সম ।
 চিন্তা মোরে এইরূপে, তব দাসাধম ॥ ১৩ ॥
 কবে প্রভু হবে মোর এমত কীর্তন ।
 শরীরে পুলক, গলদশ-লোচন ॥ ১৪ ॥
 গদগদ স্বর বদনে বাক্য নিঃসরণ ।
 উদ্বেগ-বিষাদ-দৈন্তে কাটা'ব জীবন ॥ ১৫ ॥
 এক্ষণে শ্রীগৌরান্ধ শিখান জীবে নাম ।
 কখনো আপনে আশ্বাদয়ে ভাবগ্রাম ॥ ১৬ ॥
 নিমেষ কাল “যুগবৎ” তুষা অদর্শনে ।
 বারি-বর্ষণসম অশ্রু বরিষে দু-নয়নে ॥ ১৭ ॥
 ত্রিভুবন শূন্য হয় গোবিন্দ-বিরহে ।
 কেমনে বাঁচিব বল, প্রাণ নাহি রহে ॥ ১৮ ॥
 আশ্লেষ, আত্মসাৎ, মর্মাহত, অদর্শন ।
 যাহা বিধান কর, অপর কেহ নন ॥ ১৯ ॥
 লম্পট হৈলেও তুমি মোর প্রাণনাথ ।
 পাদরতা দাসীরে প্রভু কর আত্মসাৎ ॥ ২০ ॥

—শ্রীনিত্যপদ দাসপ্রকচচারী

ষড়্গোস্বামীর অবদান ও বৈশিষ্ট্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৭ পৃষ্ঠার পর]

তিনি তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ ষট্-সন্দর্ভে ক্রমে ক্রমে বিচারপূর্বক জীব ও বিভিন্ন দেব-দেবী হইতে ভগবৎতত্ত্ব যে একটি পৃথক্ বস্তু, তাহা দেখাইয়াছেন এবং তাহা লাভ করিবার উপায় যে একমাত্র ভক্তি, তাহাও স্থাপন করিয়াছেন। “বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ঞজ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাশ্রুতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥” সাধারণ দেব-দেবী হইতে, ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতা হইতে, এমন কি স্বয়ং ভগবানের যে অঙ্গকান্তি ‘ব্রহ্ম’ অভিন্ন তত্ত্ব হইলেও, তাহা হইতেও পরমাত্মারূপী ঈশ্বরের মাহাত্ম্যাধিক্য; অবশেষে কৃষ্ণচন্দ্রই যে একমাত্র স্বতন্ত্র, স্বরাট্, অসমোদ্ধি, স্বয়ং ভগবান্ তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গৌবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥” এমন কি, নারায়ণ এবং বিভিন্ন অবতারাдиও কেহ কেহ তাঁহার অংশ ও কলা-স্বরূপ। “এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্।” তাহার পর শেষ অংশ ক্রমসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—“নাম চিত্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্য-রসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বান্নাম-নামিনোঃ॥” যাঁহার অঙ্গকান্তি কণক-সদৃশ, যাঁহার অবয়ব সর্বশুভ-লক্ষণযুক্ত ও চন্দনচর্চিত, যিনি সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়া শান্ত, সমতায়ুক্ত ও শান্তি-নিষ্ঠাপরায়ণরূপে সহস্র-নামোক্ত কৃষ্ণচৈতন্য-নামে বিখ্যাত, সেই শ্রীমন্নহাপ্রভু আমাকে সমস্ত অপরাধ হইতে পরিত্রাণ করিয়া নিজপ্রেমের কিয়দংশ দান করিয়া আমাকে পোষণ করুন।”

ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—“ভক্তিসন্দর্ভ অধ্যয়ন না করিলে ভাগবত-ধর্মে প্রবেশাধিকার হয় না।” ভবব্যাদির চিকিৎসা-প্রণালীই এই সন্দর্ভে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবৎ-বৈমুখ্য হইতেই সমস্ত রকম ক্লেশের সৃষ্টি। ভগবৎ-সাম্মুখ্যেই ক্লেশের নিরসন। নিত্যানন্দ-লাভের একমাত্র পথই ভক্তি।

প্রীতি-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—ভাবময়ী ভক্তির বিস্তারকল্পে এই প্রপঞ্চে যে অবতারী অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি দুর্জ্জন পর্যন্ত সকলের শরণ্য, সেই চৈতন্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। আবার মাধব-মহোৎসব-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—“যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামে প্রসিদ্ধ, শচীগর্ভ সিন্ধুতে যাঁহার আবির্ভাব ও যিনি প্রেমভক্তি-রসামৃতের সমুদ্র-স্বরূপ, সেই গৌরকান্তি গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে স্থায়ী দীপ্তি বিস্তৃত করুন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরাৎপর তত্ত্ব এবং শ্রীমন্নহাপ্রভুই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। যিনি কৃষ্ণ, তিনিই গৌর। যাঁহার অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ এবং বাহিরে গৌরবর্ণ অর্থাৎ যিনি স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ হইয়াও গৌররূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন, যিনি স্থায়ী অঙ্গ-

উপাঙ্গাদির বৈভব দেখাইয়াছেন, আমরা শ্রীহরিনাম-সকীর্্তনদ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শরণাগত হইতেছি। এইটী হইল তত্ত্ব। এইভাবে শ্রীমন্নহাপ্রভুর শিক্ষাকে, ভাবের ধর্মকে, সূদৃঢ় যুক্তি ও তত্ত্বের সূদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিলেন—শ্রীজীব গোস্বামী। ১৫৪০ শকাব্দে ৮৫ বৎসর বয়সে ইনি লীলা সংবরণ করেন।

“আদৌ শ্রদ্ধা”, “তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।” শ্রদ্ধাই পরমার্থ-লাভের মূল। শ্রদ্ধা কি? “শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সূদৃঢ়-নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয় ॥” কাহারও উপর এই শ্রদ্ধা জন্মিলে তবেই তাঁহার নিকট নতি স্বীকার করা যায়, তৎপরে তাঁহার নিকট আত্মকল্যাণাদি নানাবিষয়ে প্রশ্ন করিবার অধিকার জন্মে। কিন্তু হাজার উপদেশ পাইলেও সেবা ব্যতীত সমস্তই বৃথা হইয়া যাইবে। হরি, গুরু, বৈষ্ণব—তিনটী অভিন্ন তত্ত্ব, তিনটীই সেবা বস্তু। সেবা তিন প্রকার,—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। **শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী** এই সেবার পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ কাশীধামে ১৪২৭ শকাব্দে শ্রীতপন মিশ্রের পুত্ররূপে প্রকটিত হইলেন।

নীলাচল হইতে ঝারিখণ্ডের পথে শ্রীবৃন্দাবন যাইবার সময় কাশীধামে এই তপন মিশ্রের গৃহে শ্রীমন্নহাপ্রভু ১০ দিন অবস্থান করেন। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রত্যহ শ্রীমন্নহাপ্রভুর ভোজনান্তে শয়নকালে তাঁহার চরণ দুইটী ক্রোড়ে করিয়া সেবা করিতেন। প্রভু-সম্মিধানে তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ, পাত্রমার্জ্জন এবং পাদসম্বাহন, আর যতক্ষণ প্রভু চক্ষুর অগোচরে, ততক্ষণ মানসপূজা। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে শ্রীমন্নহাপ্রভু আবার দুইমাস কাশীতে অপেক্ষা করিলেন। আবার রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী শ্রীমন্নহাপ্রভুর তদ্রূপ সেবা করেন এবং সর্বক্ষণ মানসে মহাপ্রভুর সর্বক্ষণের সেবক হইবার বাসনা করেন।

ইহার পর তিনি প্রথম যখন পুরীধামে আগমন করিলেন, তখন প্রায়ই মহাপ্রভুকে রন্ধন করিয়া সেবা করাইতেন। তিনি স্থনিপুণ রন্ধন করিতে পারিতেন। আট মাস পর মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন,—“শোনো, বিয়ে করো না। বৃদ্ধ মা-বাবার সেবা করো। কোন বৈষ্ণবের কাছে ভাগবতের পাঠ নিয়ো, আর একবার নীলাচলে এসো।” নিজের কণ্ঠমাল্য মহাপ্রভু তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন। সর্বসমেত তিনি প্রায় ১০ বৎসর নীলাচলে বাস করেন।

আদর্শ পিতা-মাতার সেবা মহৎ আদর্শ। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরহরি সকলেই এই আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। “মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি। সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥” ভক্ত পিতা-মাতার সেবা করিলে ভগবান্ সেই পিতৃ-মাতৃ-ভক্তের প্রতি আপনিই কৃপা করেন। ভক্তসন্তান পুণ্ডরীক ও বিট্ঠলনাথের

কাহিনী তাহার প্রমাণ। গৃহে আসিয়া একনিষ্ঠ হইয়া চার বৎসর পিতা-মাতার সেবা করিবার পর তাঁহাদের দেহান্ত হইলে উদাসীন হইয়া তিনি শ্রীনীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মোট ২৮ বৎসর গৃহবাসের জীবন সম্পন্ন হইল।

নীলাচলে কিছুদিন থাকিবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন,—“বৃন্দাবনে যাও, রূপ-সনাতনের সঙ্গ কর, ভাগবত পড়, অল্পক্ষণ কৃষ্ণনাম কর।” জগন্নাথের মহোৎসবের প্রসাদী চৌদ্দ-হাত লম্বা তুলসীর মালা মহাপ্রভু রঘুনাথকে উপহার দিয়া আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মধ্যে শক্তি-সঞ্চার করিলেন। ইষ্ট-ভক্তিতে তিনি নিবিষ্ট হইয়া রহিলেন।

বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের আশ্রয়ে থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে লাগিলেন। “ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় মন।” ভাগবতে শ্রীরঘুনাথের অসামান্ত অধিকার। বেদান্ত-দর্শনের প্রাজ্ঞ ভাষ্যই শ্রীমদ্ভাগবতম্। এক একটা শ্লোকবিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে কীর্তন করেন। তাঁহার অষ্ট সাত্বিকের উদয় হয়। যখন কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের শ্লোক আসে, তখন আত্মহারা হইয়া পড়েন। যেমনঃ মধুর গন্তীর কণ্ঠস্বর, তেমনই উচ্চারণের নির্মলতা। তেমনই আবার সঙ্গীতের কলাকৌশল।

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী নিজে কোন গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই। শ্রীকৃষ্ণভজন আর শ্রীভাগবত পাঠ শেষ সময়ে তাঁহার একমাত্র কৃত্য ছিল। এইভাবে সুদীর্ঘ ৭৪ বৎসর তিনি মর্ত্যভূমিতে অবস্থান করিয়া কাষিক, বাচিক, মানসিক সেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্বক ১৫০১ শকাব্দে ভৌম-লীলা সম্বরণ করেন।

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভিপ্সুমক্ষম্ ॥

কৃপান্বধিঃ পরহুঃখহুঃখী সনাতনং ত্বং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥

সমুদ্র-অতল অনন্ত জলরাশির অধীশ্বর। ইহার অপর নাম রত্নাকর। ইহাতে অজস্র মণি-মাণিক্য রত্নরাজিও বিচ্যমান। আবার সমস্ত নদীনালা ইহাতে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া শান্ত হইয়াছে এবং ইহা হইতেই মেঘ সৃষ্টি হইয়া বারিধারা-রূপে রৌদ্রতাপিত জীবজগৎকে জীবনদান করিয়া, শীর্ণ ক্ষীণশ্রোতা নদীসকলকে পুষ্ট কলেবর দানপূর্বক আবর্জনারসকল দূর করত খরশ্রোতে আবার সাগরে আনিয়া মিশাইতেছে। **শ্রীল সনাতন গোস্বামী** হইলেন সেইপ্রকার সমুদ্র, যাঁহা মূর্তিমান্ কৃপার সমুদ্র। ১৪১০ শকাব্দে কর্ণাটের রাজবংশীয় যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ শ্রীকুমারদেবের পুত্ররূপে ইহার আবির্ভাব। মাতার নাম—রেবতী দেবী। পুত্রের পিতৃদত্ত নাম—অমরনাথ। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

হরেনামৈব কেবলম্

শ্রীল শুকদেব গোস্বামিপাদ সাতদিন রাজা পরীক্ষিতকে ভাগবত শুনিয়া শেষে বলে গেলেন, চারযুগের চারপ্রকার সাধন-পদ্ধতির কথা ।

সত্যযুগকে বলা হয় কৃতযুগ । সেই যুগে মানুষের আয়ু ছিল হাজার বছর । তখন ধ্যানের বিধান । ত্রেতাযুগে যজ্ঞের বিধান । দ্বাপরে অর্চন আর কলিকালে নামসংকীৰ্তন ।

“কৃতে যদ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মথৈঃ ।

দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্বিকীৰ্তনাং ॥”

মনে হতে পারে, কলিকালে কম মূল্যবান জিনিস দেওয়া হল । কিন্তু ভাগবত বলছেন, তা নয় । কলিকালের অশেষ দোষ সত্ত্বেও কেবলমাত্র একটি মহৎ গুণ আছে, যেটা সমস্ত দোষ মুছে দেয়, সেটা হল নামসংকীৰ্তন । কেবলমাত্র, কোনও ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চন না করেও কেবল হরিনাম-সংকীৰ্তন করেই জীব মুক্ত হয়ে বেরিয়ে যেতে পারে । —

‘কলেদোষনিধে রাজমুস্তিহেকো মহান্ গুণঃ ।

কীৰ্তনাদেব কৃষ্ণশ্চ মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজ্যং ॥’

এই কারণেই শ্রীমন্নৃসিংহ প্রভু বললেন,—

‘হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথা ॥”

তিনবার হরেনাম, তিনবার নাস্ত্যেব, এর অর্থ হল,—কলিকালে সত্যের ধ্যান নাস্ত্যেব, হরেনামৈব কেবলম্ । ত্রেতার যজ্ঞও কলিকালে নাস্ত্যেব, হরেনামৈব কেবলম্ । দ্বাপরে কলিকালে দ্বাপরের অর্চনও নাস্ত্যেব, হরেনামৈব কেবলম্ ।

তাছাড়া এই বিধান দিবার কারণও আছে । আপনি যে ধ্যান করবেন, সেখানেও বলা হয়েছে, ‘শুদ্ধচিত্তে ধ্যানম্ অভ্যসেৎ’ । চিত্তই তো আমাদের শুদ্ধ হয় না, সর্বদাই দোহুল্যমান, সংকল্প-বিকল্পের মধ্যে । একে রোধ করা অসম্ভব । গীতায় বলেছেন,—‘বায়োরিব স্তব্ধকরম্’ । তাই সেই চিত্তে আপনি ধ্যান করবেন কি করে ?

তারপর যজ্ঞ । যজ্ঞও কলিকালে সম্ভব নয় । কারণ, যজ্ঞে প্রচুর শুদ্ধতা প্রয়োজন । কাল, স্থান, দ্রব্য, যজমান, পুরোহিত ও মন্ত্র—এইসব শুদ্ধির প্রয়োজন । কলিকালে তো বলা আছে, ‘কাল কভু শুদ্ধ নাহি হয় ।’ আর দ্রব্যই বা কলিকালে

শুদ্ধ পাবেন কোথায় ? স্থানও শুদ্ধ পাবেন না, মাটি খুঁড়লে জীব-জন্তুর হাড়গোড় পাবেন । যজ্ঞমান-শুদ্ধি কোথায় ? যজ্ঞমান তো নানান সময়ে নানান অবস্থায় আছে । এখনকার পুরোহিত তো অর্থলিপ্সু, আর মন্ত্র,—মন্ত্র উচ্চারণে একটু এদিক-ওদিক হলেই উন্টো ফল হয় । যেমন—

‘ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব’—ইন্দ্রের উপর জোর দিলে ইন্দ্র বাড়বে, আর শত্রুর উপর জোর দিলে শত্রু বাড়বে । সুতরাং মন্ত্রের ঠিক উচ্চারণ আমাদের হয় না । সেই কারণে যজ্ঞের বিধানও কলিতে চলে না । অর্চনই বা করব কখন ? সময় কোথায় ? ‘অন্নচিন্তা চমৎকারা’; সুতরাং বসে বসে যে দেবতার অর্চন করব, তার সময় নেই । এই কারণেই কলিকালে শ্রীনামের বিধান ।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, নাম করতেও তো সময় লাগবে, তাই বা করবেন কখন ? তার উত্তরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে,—

“খাইতে শুইতে নাম, যথা তথা লয় ।
দেশ-কাল নিয়ম নাই, সর্বসিদ্ধি হয় ॥”

আবারও প্রশ্ন ওঠে,—তাহলে সবসময় নাম করলেও একটু যেন হাল্কা মনে হয় । নামের যেন ভারিহ নেই । আবার আমরা তো কলিকালে যাগ-যজ্ঞও করি । এর উত্তরে—দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা আগে বলি, যাগ-যজ্ঞ আমরা করি বটে, সে হচ্ছে—আমাদের নামে রুচি আনার জন্ত । আমাদের বিশ্বাস হয় না তো,—হৈ হৈ করে কিছু না করলে । এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করার জন্ত আমরা যাগ-যজ্ঞ করে দেখাই । কলিকালে শাস্ত্রকাররা এটা জানতেন । তাই যাগ-যজ্ঞের বিধান থাকলেও, ‘ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ’ করে শুরু করতে হয়, আর শেষকালে ‘কৃষ্ণার্পণমস্তু’ বলে হরিনামের সমাপ্তির বিধান আছে । অর্থাৎ কলিকালের যে শ্রীনাম, সেটি আগে আর শেষে রাখা হল ।

এবার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলি, কলিকালে নামসঙ্কীর্ণনের বিধান দেখলে মনে হচ্ছে খুব হাল্কা ; শুধুই নাম করা, কোনও অতীত নেই, কিন্তু এর ফলটি বিরাট । ফলের মহিমা ও নামের মহিমা অমূল্য ও অনন্ত । ধ্যানের ফল,—যে ধ্যান করছে, তার সিদ্ধি । যজ্ঞ করছে যে যজ্ঞমান, তার স্বর্গলাভ হচ্ছে । অর্চন যে করছে, আনন্দ তারই হচ্ছে ; কিন্তু কলিকালের নামসঙ্কীর্ণনের ফল বলেছেন শ্রীমন্ মহাপ্রভু—

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ঝাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধুজীবনম্ ।
আনন্দানুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণায়ুতাস্বাদনং
সর্বানুন্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ণনম্ ॥

অর্থাৎ নাম চিত্তদর্পণ মার্জন করে । সংসাররূপ মহাদাবাগ্নিকে নির্বাপণ করে । জীবনের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা (কুমুদ প্রস্ফুটিকারী জ্যোৎস্না) বিতরণ করে । আর এই নামই বিচাররূপ বধূর জীবন-স্বরূপ । আনন্দসমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃত আশ্বাদনস্বরূপ, আর যতদূর এই নাম যায়, ততদূর বৃক্ষ-লতাাদি নির্বিশেষে প্রাণী-মাত্রেরই আত্মার শীতলতা প্রদানকারী, সেই শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীৰ্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন । এখানে ওই যে শেষকালে বলা হল একটা ফল—সৰ্ব্বাশ্রয়পনম্—এইটিই বিশেষ । এই সাধন কেবল সাধনকারীকেই ফল দেয় না, এই সাধন যতদূর যাবে বা যেই শুনবে, সে ফল পাবে, তাই এটি ‘শ্রবণমঙ্গলম্’ । অর্থাৎ এ শ্রীনাম-সাধনা ‘বহুজনহিতায় বহুজনস্থখায় চ’ ।

তুলসীদাসজী বলেছেন,—

রামনাম মণিদীপ, ধরা জীহ দেহরি দ্বার ।

তুলসী ভিতর বাহির যো চাহসি উজিয়ায় ॥

হে তুলসি ! তুমি নিজ দেহের দ্বার-স্বরূপ জিহ্বাতে রাম-নামরূপ মণিময় দীপ ধারণ কর, তাহলে তোমার ভিতরে ও বাইরে যেরূপে চাইবে, সেইদিকই জ্যোতির্ময় হবে ।

তাই কলিজীবের জন্ত নির্দিষ্ট মহামন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

কলিসন্তরণ উপনিষদে এই দুটি পংক্তি আছে । অনেকে এই হরে কৃষ্ণ নামের মধ্যে হরি, রাম ও কৃষ্ণ—এই তিন যুগের তিন দেবতা সত্যের হরি, ত্রেতার রাম, দ্বাপরের কৃষ্ণ—এই তিনজনের নামের সম্বোধন পদ আছে বলেন । এর গভীর অর্থ বৈষ্ণবগ্রন্থে ব্যাখ্যাত হয়েছে । এখানে ‘হরে’ শব্দটী ‘হরা’-শব্দের সম্বোধন । রাধার একটা নাম ‘হরা’, সূত্ররূপে ‘রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে’—এই অর্থ হল । কিন্তু আবার প্রশ্ন ওঠে—তাহলে ‘হরে রাম’ রাধার সঙ্গে রাম এল কেন ? এর উত্তর এখানে ‘রাম’ শব্দের অর্থ রামচন্দ্র নয়, রাম অর্থ ‘রময়তি ইতি রামঃ’, অর্থাৎ তিনিও কৃষ্ণ । তাহলে সম্পূর্ণ মহামন্ত্রে আটবার হরে অর্থাৎ রাধা-নাম, আর চারবার রাম, চারবার কৃষ্ণ অর্থাৎ আটবার কৃষ্ণের নাম, অর্থাৎ আটবার অপ্ৰাকৃত নায়ক-শিরোমণির নাম, আটবার অপ্ৰাকৃত নায়িকা-শিরোমণির নাম । এই আটবারের গুঢ় অর্থ হল—পূর্বরাগ থেকে মহাভাব পর্যন্ত আটটি । এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-গোস্বামিবর্গের বহু দার্শনিক মৌলিক গ্রন্থ ও টীকা-ভাষ্যাদির মধ্যে পাই । —ব্রহ্মচারিণী বেলা দেবী

—তর্ক-বেদান্ত-ব্যাকরণতীর্থ, এম. এ. সংস্কৃত ও বাঙ্গালা

শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭৭ পৃষ্ঠার পর]

দীপমালা-মাহাত্ম্য—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে,—যে ব্যক্তি হরিমন্দিরের বাহে ও অভ্যন্তরে দীপপংক্তি রচনা করেন, সে মনুষ্য বিষ্ণুর সাক্ষ্য প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি কেশবালয়ে দীপমালা রচনা করেন, তাঁর বংশপ্রসূত লক্ষ-পুরুষের নরক-দর্শন হয় না। যে মানব বিষ্ণুবিমানের বাহ বা অভ্যন্তরে দীপযুক্ত করেন, তিনি দীপজ্যোতিতে জ্যোতিছোতিত মার্গে বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে বিশেষতঃ বিষ্ণুর উত্থানকালে দ্বাদশী বা একাদশীতে শোভন দীপমালা রচনা করেন, তিনি অযুত সূর্য্যসদৃশ প্রকাশবিশিষ্ট হয়ে তেজস্বারা দিক্‌সকল আলোকিত করত তেজোরশি বিমানে অবস্থিত হয়ে স্বীয়কান্তি-রাশিদ্বারা জগৎ উজ্জ্বলিত করেন। তিনি যতদ্বারা যত প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন, দীপসংখ্যায় তত সহস্র-বৎসর বিষ্ণুলোকে সেবায় নিযুক্ত হন।

আকাশপ্রদীপ-মাহাত্ম্য—পদ্মপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—যে মনুষ্য কার্ত্তিকমাসে আকাশে উচ্চপ্রদীপ দান করেন, সে আপনার সমস্ত কুল উদ্ধার করে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে কেশবকে উদ্দেশ্য করে আকাশে বা জলে দীপদান করেন, তার যে ফল হয় তাহা শ্রবণ কর। এইরূপ দীপদানকারী ধন, ধাত্ত ও সমৃদ্ধিশালী, পুত্রবান্ তথা গৃহে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হয়েন এবং তাঁর লোচনদ্বয় কল্যাণযুক্ত হয়, তিনি বিদ্বান্ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে ব্রাহ্মণগৃহে দীপদান করেন, তাঁর অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়—পণ্ডিতগণ এরূপ বলে থাকেন। অপর চতুষ্পথ, রাজমার্গ, ব্রাহ্মণগৃহ, বৃক্ষমূল, গোষ্ঠ, কান্তার (দুর্গম পথ) এবং গহন দুপ্পবেশ্য স্থানে দীপদান করলেও মহাফল লাভ হয়।

আকাশদীপ-দানমন্ত্র—

“দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।

প্রদীপন্তে প্রযচ্ছামি নমোহনন্তায় বেধসে ॥”

হে দামোদর! কার্ত্তিকমাসে আকাশে তোমাকে লক্ষ্মীর সহিত প্রদীপদান করিতেছি। তুমি অনন্ত বিধাতা, তোমাকে নমস্কার। এখানে দামোদরের যে লক্ষ্মী তিনি হলেন সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী রাধা। এখানে ‘লোলয়া’ মানে লক্ষ্মী। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী রাধা, তাঁর সঙ্গে দামোদরকে প্রদীপ দেওয়া হচ্ছে।

দেশ-বিদেশে কার্ত্তিকমাসের মাহাত্ম্য-বিশেষ পদ্মপুরাণে উক্ত স্থানে,—যে কোন স্থানে কার্ত্তিকমাসে স্নান ও দান করলে অগ্নিষ্টোম-তুল্য ফল হয়। পূজায় তদপেক্ষা

বিশেষ ফল হয়। সাধারণ স্থান অপেক্ষা কুরুক্ষেত্রে কোটিগুণ, গঙ্গায় ততুল্য এবং তদপেক্ষা পুঙ্করে ও দ্বারকায় অধিক ফল হয়। হে ভার্গব! কার্তিকমাসে দ্বারকায় পূজাস্নানদ্বারা কৃষ্ণের সালোক্য প্রাপ্তি হয়। হে মুনিগণ! মথুরা ব্যতিরেকে অযোধ্যা প্রভৃতি অগ্ৰাণ্য পুরীসকল উল্লিখিত ফলের সমান ফল প্রদান করে। মথুরাকে বাদ রেখেছেন। কেন?—মথুরা সবটার অতীত, সেইজন্য। কিন্তু মথুরা সর্বাপেক্ষা অধিক ফল দিয়া থাকেন, যেহেতু ঐ মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের দামোদরত্ব প্রকাশিত। কার্তিকমাসে মথুরায় পূজা ও স্নানাদিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বৃদ্ধি হয়। অতএব মথুরায় ফলের পরাকাষ্ঠা হয়ে থাকে। যেমন মাঘমাসে প্রয়াগ ও বৈশাখ-মাসে জাহ্নবী সেবনীয় হন, তদ্রূপ কার্তিকমাসে মথুরা সেবনীয়। এর তুল্য আর শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা নাই। যে-সকল মনুষ্য মথুরায় কার্তিকমাসে স্নান করে দামোদরের অর্চনা করেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে কৃষ্ণরূপই লাভ করেন, এতে কোন বিচার নাই। হে বিপ্র! মনুষ্যসকলের সম্বন্ধে কার্তিকমাস অতীব দুর্লভ, যেখানে অর্চিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদিগকে স্বীয় রূপ প্রদান করেন। মথুরা ব্যতীত অন্যস্থানে হরি অর্চিত হয়ে সেবাকারীদিগকে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তি প্রদান করেন না, যেহেতু ভক্তি কৃষ্ণের বশ্যকারী অর্থাৎ ভক্তিই কৃষ্ণকে বশীভূত করে থাকেন। পরন্তু যে-সকল মনুষ্য কার্তিকমাসে একবার মাত্র শ্রীদামোদরের অর্চনা করেন, হরিভক্তি তাঁহাদিগেরই সুখলভ্য হয়।

হে বিপ্র! কার্তিকমাসে মথুরায় মদ্রহীন, দ্রব্যহীন ও বিধিরহিত যে অর্চন, শ্রীকৃষ্ণ তাকে সদর্শন বলে মেনে থাকেন। যে পাপের মরণ পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত, তার শুদ্ধের নিমিত্ত কার্তিকমাসে মথুরায় শ্রীদামোদরার্চনাই সুনিশ্চিত প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া কথিত। কার্তিকমাসে এই যে ফল বললাম, এটা কেবল শাস্ত্রপ্রমাণ নয়, কিন্তু সাক্ষাদনুভব প্রমাণ। এই অভিপ্রায়ে বলছেন—কার্তিকমাসে মথুরায় জনার্দনের পূজা করে যোগতৎপর সনকাদি মুনিগণের ভগবদর্শন, ধ্রুব বালক হয়েও শীঘ্র অর্থাৎ পাঁচ মাসের মধ্যে ভগবানকে সম্যকপ্রকারে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হায়! ভারতবর্ষে মথুরা সুলভ এবং প্রতিবর্ষে কার্তিকমাসও সুলভ, তথাপি মুঢ়তাবশতঃ মানুষসকল ভবসঙ্গারে নিমগ্ন হচ্ছে। যদি কোন ব্যক্তি কার্তিকমাসে মথুরায় শ্রীদামোদরার্চন করেন, তবে তাঁর যজ্ঞ, তপস্যা ও অগ্ৰাণ্য তীর্থসেবার কি প্রয়োজন? কার্তিকমাসে মথুরামণ্ডলে নদ, নদী ও সরোবর প্রভৃতিতে সর্বতীর্থ সমাগত হন। যে-সকল মানব কার্তিকমাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরায় একবার মাত্র প্রবেশ করেন, তাঁরা পরম অব্যয় শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন। কার্তিকমাসে মথুরায় হরিপূজা করা দূরে থাকুক, ঐ মাসে হরিপূজককে দেখিয়া উপহাস করিয়াও

যখন দুর্লভ লাভ হয়েছে, তখন মনুষ্য শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে পূজা করলে যে ফল প্রাপ্ত হবেন না, সে-বিষয়ে সন্দেহ কি? এই বিষয়ে একটি প্রাচীন ইতিহাস আছে।—

ধুম্রকেশ-নামে এক মহাপাপী রাজকুমার পিতা-কর্তৃক নির্ধামিত হয়ে দস্যাবৃত্তি করতে করতে ক্রমে বৃন্দাবনে আগমন করে। পরে বেষ্ঠাসক্ত হয়ে তার প্রীতির নিমিত্ত মথুরাপুরীতে চুরি করতে গিয়ে বৃন্দাবনান্তরবর্তী ভগবৎসেবাপর সত্যব্রত-নামক ব্রাহ্মণের চেষ্টা দেখে উপহাস করেছিল। পরদিবস প্রভাতে রাজপুরুষগণ ধরে তাকে বধ করলে সে যমালয়ে গিয়ে যমরাজ-কর্তৃক সম্মানিত হয়। অনন্তর ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করে সে তথা হইতে বৈকুণ্ঠলোকে নীত হয়।

কার্তিকমাসে অর্ঘ্যমন্ত্র—হে দামোদর! আমি কার্তিকমাসে যথাবিধি ব্রতধারণ করে জ্ঞান করেছি। হে অম্বরনাশন! আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। কার্তিকমাসে নিত্য-নৈমিত্তিক যে সমুদয় কার্য্য করা যায়, তৎসমুদয় পাপনাশক। হে হরে! আপনাকে এই অর্ঘ্য প্রদান করলাম। আপনি শ্রীরাধাসহ গ্রহণ করুন। এখানে রাধার নাম উল্লেখ আছে।—

“নিত্যে নৈমিত্তিকে কৃৎস্নে কার্তিকে পাপশোধনে।

গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিতো হরে ॥”

অনন্তর তিলদ্বারা আপনার অঙ্গলেপন করে শ্রীকৃষ্ণ-নারায়ণ ইত্যাদি নামোচ্চারণ-পূর্বক যথাবিধি জ্ঞান ও সন্ধ্যোপাসনা করে গৃহে আগমন করবে। দেবাগ্রে উপবেশনপূর্বক স্বস্তিক নির্মাণ করে তুলসী, মালতী, পদ্ম ও অগস্ত্য প্রভৃতি পুষ্পাদিদ্বারা দামোদরের পূজা করবে। কার্তিকমাসে নিত্য বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভগবৎকথা শ্রবণ করবে এবং দিবারাত্র ধূপ ও ঘৃত বা তিলতৈলদ্বারা প্রদীপ দিয়া পূজা করবে। অগ্ন্যাগ্ন্য মাস অপেক্ষা এই মাসে বিশেষ করে নৈবেদ্যাদি অর্পণ করবে এবং বিশেষরূপে প্রণামাদি করে যথাশক্তি একভক্ত্যাদি অর্থাৎ একবার মাত্র ভোজনরূপ ব্রত ধারণ করবে।

‘তিল’-শব্দ থেকে ‘তৈল’-শব্দ এসেছে। অগ্ন্যাগ্ন্য জিনিষ থেকে যে Extract (নির্ধাস) বের করা হচ্ছে, তাকেও তৈল বলা হয়। কিন্তু তৈল শব্দটা এসেছে তিল থেকে। সেইজন্য ঘৃতপ্রদীপ অথবা তিল-তেলের প্রদীপ দেওয়াটাই ঠিক। বর্তমানে তিল তেলের অভাবে বাদাম তেলও চলছে।

পদ্মপুরাণে নারদ-শৌনকাদি সংবাদে—প্রাতঃকালে গাত্রোথানপূর্বক শৌচাদি কর্ম্ম করে জলাশয়ে গিয়ে জ্ঞান, তদনন্তর দামোদরের অর্চনা করবেন। ব্রতধারী ব্যক্তি কার্তিকমাসে মৌন হয়ে ভোজন করবেন এবং ঘৃত বা তিলতৈলদ্বারা দীপ

দান করবেন। কার্তিকমাসে বৈষ্ণব সকলের সঙ্গে কৃষ্ণকথায় দিনযাপন করে সঙ্কল্পিত ব্রত পালন করবেন। আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষের একাদশী, পূর্ণিমা বা তুলা-সংক্রান্তি-দিবসে কার্তিকব্রত আরম্ভ করবে। কার্তিকমাসে বিষ্ণুসন্নিধানে বা দেবালয়ে কিংবা তুলসী-সমীপে অথবা আকাশে উত্তমদীপ দান করবে। মনুষ্যগণ কার্তিকমাসে দামোদরের প্রীতির নিমিত্ত স্বর্ণ, রৌপ্য, দীপ, মণি, মুক্তা ও ফলাদি প্রদান করবেন।

স্কন্দপুরাণে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গদ-মোহিনী-সংবাদে উক্ত হয়েছে,—হে ভাবিনি! কার্তিকমাসে বিশেষ করে কার্তিকব্রত গৃহে করবে না। সর্বপ্রকার যত্নসহকারে তীর্থে কার্তিকব্রত করতে হবে।

“ন গৃহে কার্তিকে কুর্যাদ্বিশেষণ তু কার্তিকম্।

তীর্থে তু কার্তিকীং কুর্যাৎ সর্বযত্নেন ভাবিনি ॥”

স্কন্দপুরাণের ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি বিশেষতঃ কার্তিকমাসে রাজমাস (বরবটী) ও নিষ্পাব (সিম) ভোজন করে, সে মহাপ্রলয় পর্যন্ত নারকী হয়। ভয়ঙ্কর ব্যাপার! যে মনুষ্য কার্তিকমাসে কলিঙ্গ (কলমীশাক), পটল, বেগুন, বৃত্তাকু (বার্তাকী) এবং সন্ধিত (আসব) পরিত্যাগ না করে, সে মহাপ্রলয় পর্যন্ত নারকী হয়। ধর্মাত্মা মনুষ্য কার্তিকমাসে মৎস্য-মাংস কিছুই ভোজন করবেন না। যদি কোন রোগী ব্যক্তির মাংস ব্যতিরেকে জীবন রক্ষা হয় না—এমত ঘটনা হয়, তাহাকেও মৎস্য-মাংস বর্জন করতে হবে। প্রাজ্ঞ মনুষ্য বিশেষ করে কার্তিকমাসে পরান্ন, পরশয্যা, পরধন ও পরস্ত্রী বর্জন করবেন। ঐ সকল বিষয়ে ইচ্ছাও করবেন না। যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে তৈলমর্দন, শয্যা, পরান্ন ও কাংশ্রপাত্রে ভোজন বর্জন করেন, তাঁর ব্রত পরিপূর্ণ হয়। যে মানব কার্তিকমাস আগত দেখে পরান্ন বর্জন করেন, তিনি দিন দিন কল্লুব্রতাত্মস্থানের ফললাভ করেন।

স্কন্দপুরাণে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গদ-মোহিনী-সংবাদে আরও উক্ত হয়েছে—হে স্কন্দরি! কার্তিকমাসে তৈল, মধু, কাংশ্র, গুরু অর্থাৎ কাঞ্চিকাদি পয়ূসিত অন্নদ্রব্য, সন্ধিত অর্থাৎ আসবাদি দ্রব্য-বিশেষ এবং মৎস্য ও কূর্মাদি মাংস ভোজন করবেন না। যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে মাংস ভোজন করেন, তিনি চণ্ডাল হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীরাধাদামোদরের পূজাবিধি—পদ্মপুরাণে নারদ-শৌনকাদি-সংবাদে উক্ত হয়েছে—যত যত গোপী আছেন তন্মধ্যে শ্রীরাবিকাই বিষ্ণুর প্রিয়তমা। অতএব কার্তিকমাসে শ্রীদামোদরের সন্নিধানে শ্রীরাধারও পূজা করবেন।

ততঃ প্রিয়তমা বিষ্ণো রাধিকা গোপিকাসু চ।

কার্তিকে পূজনীয়া চ শ্রীদামোদরসন্নিধৌ ॥

হে বিপ্রগণ ! যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে শ্রীরাধাদামোদরের অর্চনপূর্বক সত্যব্রত-নামক মূনি-কথিত 'শ্রীদামোদরাষ্টকম্' স্তোত্র নিত্য পাঠ করেন, তাঁহাতেই তিনি বশীভূত হন ।

শ্রীদামোদরাষ্টক—পদ্মপুরাণে নারদ-শৌনকাদি-সংবাদে—

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং লসৎ-কুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্ ।

যশোদা-ভিয়োলুখলাদ্ধাবমানং পরামৃষ্টমত্যাং ততোদ্রুত্যা গোপ্যা ॥

যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ষাঁহার কর্ণে কুণ্ডল আন্দোলিত হচ্ছে, যিনি গোকুলে অতিশয় শোভমান, যিনি শিক্যস্থিত নবনীত হরণ করায় যশোদার ভয়ে উদ্বিগ্নের উপরিভাগ হইতে লক্ষ্যপ্রদান করে অতিশয় বেগে ধাবমান হয়েছিলেন এবং যশোদা ততোধিক বেগে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়ে ষাঁর পৃষ্ঠদেশ ধারণ করেছেন, সেই ঈশ্বরকে আমি নমস্কার করি ।

রুদন্তং মুহুর্নেত্র-যুগ্মং মৃজন্তং করাস্তোজ-যুগ্মেন সাতক-নেত্রম্ ।

মুহুঃশ্বাস-কম্পত্রিরেখাক-কণ্ঠ-স্থিত-গ্রৈব-দামোদরং ভক্তিবন্ধম্ ॥

যিনি জননীর হস্তে যষ্টি দেখে রোদন ও করপদ্মযুগলের দ্বারা মুহুমূর্ছঃ নেত্রদ্বয় মার্জনা করছেন, যিনি সাতকনেত্র ও ষাঁর মুহুমূর্ছঃ শ্বাসনিবন্ধন-কম্পহেতু কণ্ঠস্থ মুক্তাহার আন্দোলিত হচ্ছে এবং ষাঁর উদরে রজ্জুবন্ধন, সেই ভক্তিবন্ধ দামোদরকে আমি বন্দনা করি । (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণরত্ন গোড়ীয় মঠে

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ঙ্গ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজাভ্যুত্থিত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ঙ্গ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আভ্যুগতো ও সভাপতিত্বে এবং সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় শ্রীকৃষ্ণরত্ন গোড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য এভিনিউ, ডি-সেক্টর, হুগাপুরে (বর্ধমান) নবনির্মিত শ্রীমন্দিরে গত ৬ই চৈত্র, ১৪০২ (ইং ২০১৩৯৬) বুধবার, গৌর-প্রতিপৎ-তিথির পুণ্যলগ্নে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরানন্দ-নিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউর প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইলেন ।

এতদুপলক্ষে ৫ই চৈত্র মঙ্গলবার (ইং ১৯৩৯৬) বৈকাল ৪ ঘটিকায় এক বিশাল বর্ণাঢ্য নগর-সঙ্কীর্ণনের আয়োজন করা হইয়াছিল । উক্ত নগর-সঙ্কীর্ণনে

শ্রীসমিতির সেবকবৃন্দের সহিত স্থানীয় বহু স্বধী-সজ্জনগণের সমাগম প্রভূত উৎসাহ সৃষ্টি করিয়াছিল। সন্ধ্যায় শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার অধিবাস-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়।

পরদিবস প্রভাতে মঙ্গলারতির সহিত মাঙ্গল্য-ক্রিয়ার শুভ-সূচনা হয়। সকাল ৬-৩০ মিনিট হইতে নবনির্মিত শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠাপূর্বক ক্রমানুযায়ী শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণব-হোমাদি ক্রিয়া সূচরূপে সম্পন্ন হয়। অতঃপর ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে উপস্থিত পঞ্চসহস্রাধিক শ্রদ্ধালু ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট ধর্মসভা আয়োজিত হয়। উক্ত সভায় 'শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব ও সনাতন ধর্ম' সম্বন্ধে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ এবং সভাপতির ভাষণে শ্রীশ্রীল সভাপতি মহারাজের অসাধারণ বাগ্মিতা এবং সাম্প্রতিক পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে স্মৃতিপূর্ণ গভীর দার্শনিক বক্তৃতায় উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্টের অবসর-প্রাপ্ত **Managing Director** শ্রীযোগেশ্বর প্রসাদ শর্মা।

অগ্ণাত উল্লেখযোগ্য বক্তাগণের মধ্যে ছিলেন বোলপুর মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য মহারাজ (বর্দ্ধমান), শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ পর্যটক মহারাজ, শ্রীযুত হরিপদ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুত বাসুদেব মুখোপাধ্যায় (**Retd. chief engineer of Alloy Steel**) এবং শ্রীজগদীশ দত্তবতে প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

বলাবাহুল্য ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজের বিশেষ আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় এবং দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্টের কর্মকর্তাগণের সহযোগিতায় এই শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠ স্থাপন, শ্রীমন্দির-নির্মাণ ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সূচুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পরিশেষে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীসমিতির তথা শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের সেবাপ্রচেষ্টা, আত্মকূল্যকারী স্বধী ভক্তবৃন্দ ও দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্টের সহযোগিতা বিশেষ প্রশংসার্প্য। তাঁহাদের এইরূপ সহযোগিতার জগু শ্রীসমিতি তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। —নিজস্ব সংবাদ



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোক্কেজে অহৈতুকী ভক্তি বিয়শূন্য ॥

অন্য ধর্ম সূত্বেপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৮শ বর্ষ } ১৪ বামন, ক্ষীরোদশায়ী, ৫১০ শ্রীগোরাঙ্গ
৩২ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৪০৩, ইং ১৫/৬/২৬ } ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রী শ্রী জগন্নাথ ঐকম্

[শ্রীগৌরচন্দ্র-মুখপদ্ম-বিনির্গতম্]

কদাচিত্ কালিন্দীতট-বিশিন-সঙ্গীত-তরলো

মুদাভীরী-নারী-বদন-কমলাস্বাদ-মধুপঃ ।

রমা-শত্ৰু-ব্রহ্মামরপতি-গণেশাচ্চিতপদো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥ ১ ॥

যিনি কখনও কখনও যমুনা-তীরস্থ বন-মধ্যে সঙ্গীত করিতে করিতে ভ্রমরের
গ্রায় আনন্দে ব্রজগোপীদিগের মুখারবিন্দের মধুপান করেন এবং লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা,
ইন্দ্র ও গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীগণ যাঁহার চরণযুগল অর্চনা করিয়া থাকেন, সেই
জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥ ১ ॥

ভুজে সব্যে বেণুঃ শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে
 হৃকূলং নেত্রান্তে সহচরি-কটাক্ষং বিদধতে ।
 সদা শ্রীমদ্বন্দাবন-বসতি-লীলা-পরিচয়ো
 জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥ ২ ॥

যিনি বাম হস্তে বেণু, শিরে শিখিপুচ্ছ, কটিতটে পীতাম্বর ও নয়ন-প্রান্তে সহ-
 চরিগণের প্রতি কটাক্ষ ধারণ করিয়া সর্বদা শ্রীবন্দাবনে বাস ও লীলা করিতেছেন,
 সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥ ২ ॥

মহাস্তোমেষ্টীরে কনক-রুচিরে নীলশিখরে
 বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ-বলভদ্রেন বলিনা ।
 সুভদ্রা-মধ্যস্থঃ সকল-সুর-সেবাবল্লরদো
 জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥ ৩ ॥

যিনি মহাসমুদ্রের তীরে কনকোজ্জল-নীলাচল-শিখরে প্রাসাদান্তরে বলিষ্ঠ
 সহোদর শ্রীবলদেব-সহ সুভদ্রাকে মধ্যে রাখিয়া অবস্থান করত সমস্ত দেবগণকে
 স্বীয় সেবা করিবার অযোগ্য প্রদান করিয়াছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-
 পথের পথিক হউন ॥ ৩ ॥

কুপা-পারাবারঃ সজল-জলদ-শ্রেণি-রুচিরো
 রমা-বাণী-রামঃ সুরদমল-পঙ্কেরুহ-মুখঃ ।
 সুরেন্দ্রেরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখা-গীতচরিতো
 জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥ ৪ ॥

যিনি দয়ার সাগর, সজল জলধরের জায় যাঁহার অঙ্গকান্তি, যিনি লক্ষ্মী,
 সরস্বতীর সহিত বিহার করিতেছেন, যাঁহার বদন-মণ্ডল অমল কমলের জায় শোভা
 পাইতেছে, যিনি সমস্ত দেবগণের আরাধ্য-ধন এবং বেদ ও পুরাণ তত্ত্বাদি শাস্ত্রসমূহ
 যাঁহার চরিত্র গান করিতেছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক
 হউন ॥ ৪ ॥

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিত-ভূদেব-পটলৈঃ
 স্তুতি-প্রাতুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্য্য সদয়ঃ ।
 দয়াসিকুর্বন্ধুঃ সকল জগতাং সিন্ধু-সদয়ো
 জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥ ৫ ॥

রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে থাকিলে পথিমধ্যে ব্রাহ্মণগণ যাঁহার স্তব
 করিতে থাকেন এবং সেই স্তব শ্রবণ করিয়া যিনি পদে পদে প্রসন্ন হন, যিনি

দয়ারসাগর, যিনি নিখিল জগতের বন্ধু এবং যিনি সমুদ্রের প্রতি সদয় হইয়া
তত্পকূলে বিরাজ করিতেছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক
হউন ॥ ৫ ॥

পরব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়-দলোৎফুল্ল-নয়নো।
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিত-চরণোহনন্ত-শিরসি।
রমানন্দা রাধা-সরস-বপুরালিঙ্গন-সুখো।
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥ ৬ ॥

যিনি পরমাচ্ছনীয় পরব্রহ্ম, যাঁহার নেত্র-যুগল নীল-কমলদলের ত্রায় উৎফুল্ল,
যিনি নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন, যিনি অনন্তের শিরে পদার্পণ করিয়া
রহিয়াছেন, যিনি প্রেমানন্দময় এবং যিনি শ্রীরাধিকার রসময়-দেহালিঙ্গন-সুখে সুখী,
সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥ ৬ ॥

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনক-মাণিক্য-বিভবং
ন যাচেহং রম্যাং সকল-জন-কাম্যাং বরবধূম।
সদা কালে কালে প্রমথ-পতিনা গৌ চ-চরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥ ৭ ॥

আমি রাজ্য চাহি না, স্বর্ণ-মাণিক্যাদি বিভব চাহি না, সর্বজনের স্পৃহণীয়
সুন্দরী নারীও চাহি না, কেবল এই চাহি যে, প্রমথনাথ মহাদেব সর্বক্ষণ
যাঁহার চরিত্র গান করেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক
হউন ॥ ৭ ॥

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং শুরপতে !
হর ত্বং পাপানাম্ বিততিমপরাং যাদবপতে !
অহো দীনেহনাথে নিহিত-চরণো নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥ ৮ ॥

হে শুরপতে ! শীঘ্র আমাকে এ অসার সংসার হইতে উদ্ধার কর ; হে যদুপতে !
আমার দুঃসহ পাপভার বিমোচন কর । দীন ও অনাথ ব্যক্তিগণকেই যিনি স্বীয়
শ্রীচরণ সমর্পণ করিয়া থাকেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক
হউন ॥ ৮ ॥

জগন্নাথষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ ।
সর্বপাপ-বিশুদ্ধাত্মা বিষ্মলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯ ॥

যিনি সংযত ও শুদ্ধ-চিত্তে এই পরম পবিত্র জগন্নাথাপটক পাঠ করেন, তাঁহার আত্মা সৰ্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে এবং তিনি বিষ্ণুলোকে অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করেন ॥ ২ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৮৭ পৃষ্ঠার পর]

৭। জীবের লুপ্ত-স্বভাব কিরূপে জাগ্রত হইতে পারে ?

“নিজ-স্বভাব যাহার অত্যন্ত লুপ্তপ্রায়, তাহাকে কে জাগ্রত করে ? কৰ্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-চেষ্টা তাহা করিতে পারে না, সুতরাং যাহার কোন ভাগ্যক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গবল-ক্রমেই জীবের লুপ্তপ্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইতে পারে। এই বিষয়ে দুইটি ঘটনার প্রয়োজন। যিনি স্ব-স্বভাব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্বভক্ত্যুন্মুখী-স্বকৃতিক্রমে কিয়ৎপরিমাণ শরণাপত্তি-সঙ্গী প্রভৃতি লাভ করেন—ইহাই একটা ঘটনা। সেই স্বকৃতি-বলে তাঁহার কোন উপযুক্ত সাধুর সঙ্গ হয়—ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা।”

—‘দশমূল-নির্ধাস’, স: তো: ২।২

৮। মানব-স্বভাবের মূল কি ?

“সঙ্গ হইতে স্বভাব। যে ব্যক্তি যাহার সঙ্গ করে, তাহার তদ্রূপ স্বভাব হইয়া উঠে। পূর্ব-জন্মের সঙ্গরূপ কর্মের দ্বারা জীবের যে স্বভাব গঠিত হয়, তাহা আধুনিক জন্মের সঙ্গের দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া থাকে ; সুতরাং সঙ্গই মানব-স্বভাবের মূল।”

—‘সাধুসঙ্গের প্রণালী বিচার’, সমঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) স: তো: ১৫।২

৯। বৈষ্ণবপ্রায় বা বালিশ ব্যক্তিগণের উন্নতির একমাত্র কারণ কি ?

“পক্যোগিগণ ভক্তিযোগারূঢ় উত্তম ভক্ত এবং অপক্যোগিগণ ভক্তি-যোগারূ-রূক্ষ কৰ্ম-ধর্মসাপেক্ষ মধ্যম ভক্ত ; কৰ্মাসক্ত ভক্তপ্রায় ব্যক্তিগণ কোমলশ্রদ্ধ কনিষ্ঠভক্ত বৈষ্ণবপ্রায় বা ‘বালিশ’মধ্যে পরিগণিত—ইহাদের হৃদয়ে ভক্ত্যাভাস-মাত্র উদ্ভিত হইয়াছে ; শুদ্ধভক্তির কিঞ্চিৎমাত্র উদয় হইলে ইহারা কৰ্মাসক্তি ত্যাগ করিয়া কৰ্ম-ধর্ম-সাপেক্ষ মধ্যম ভক্ত হইতে পারেন। সাধুসঙ্গই এই সকল উন্নতির একমাত্র কারণ।”

—আ: বি: ভা: টি:

১০। কাহার সঙ্গ করা উচিত ? কিরূপ সঙ্গদ্বারা পরমার্থানুশীলনে উন্নতি হয় ?

“আহার হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির উদয় হইয়াছে, তিনি অনন্ত কৃষ্ণভক্ত ; মধ্যম হইলেও সঙ্গযোগ্য। *** সাধক নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তকে আশ্রয় করিলেই উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন।” —আঃ বিঃ ভাঃ টাঃ

১১। শুদ্ধভক্তের সহিত বাহ্য-ব্যবহারেও কিরূপভাবে সঙ্গ করা উচিত ?

“বাজারে দ্রব্য ক্রয় করিবার সময়ে যেরূপ নূতন ব্যক্তির সহিত কেবল বাহ্য-ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে করিবে। শুদ্ধভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারেও প্রীতি প্রদর্শনপূর্বক সঙ্গ করিবে।”

—‘সঙ্গত্যাগ’, সং তোঃ ১১।১১

১২। বৈষ্ণবগণের নিকট বসিয়া থাকিলে কি সময় নষ্ট হয় না ?

“শ্রীরামানুজাচার্যের চরম উপদেশ এই—“তুমি আপনাকে কোন চেষ্টায় যদি শুদ্ধ করিতে না পার, তবে বৈষ্ণবদিগের নিকট গিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলেও তোমার মঙ্গল হইবে।” —‘সঙ্গত্যাগ’, সং তোঃ ১১।১১

১৩। বৈষ্ণবসঙ্গে মঙ্গল-লাভের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় কি ?

“বৈষ্ণবগণের সংস্কৃত ভক্ত-চরিত্র দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যে মন ফিরিয়া যায়, বিষয়াসক্তি খর্ব হয়, ভক্তির অঙ্কুর হৃদয়ে উদিত হয় ; এমত কি, আহার-ব্যবহার-সম্বন্ধেও ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণবোচিত হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-সঙ্গে থাকিতে থাকিতে অনেক লোকের স্ত্রীসঙ্গ-রুচি, অর্থ-পিপাসা, ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছা, কন্দ-জ্ঞানের প্রতি আদর এবং মৎস্ত-মাংস-মত্ত-তামাক-ধূমপান ও তাম্বুলসেবন-স্পৃহা ইত্যাদি অনর্থ দূর হইয়াছে—ইহা আমরা দেখিয়াছি। বৈষ্ণবের অব্যর্থকালত্ব-ধর্ম দেখিয়া অনেকে আলস্য, নিদ্রাধিক্য, বৃথা-জল্পনা, বাক্যাদির বেগ প্রভৃতি অনর্থসকল অনায়াসে দূর করিয়াছেন। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণব-সংসর্গে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে কাহারও কাহারও শাঠ্য ও প্রতিষ্ঠাশাও দূর হইয়াছে। একটুকু আদরের সহিত বৈষ্ণব-সঙ্গ করিলে সংস্কার ও আসক্তি প্রভৃতি সকল সঙ্গই দূর হয়—ইহা আমরা সচক্ষে দেখিয়াছি। যুদ্ধে জয়-পিপাসাসক্ত, রাজ্যলাভের জন্ত বিশেষ কুশল, প্রচুর ধন-সঞ্চয়ের জন্ত অত্যন্ত ব্যাকুল ব্যক্তিগণের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব-সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি হইয়াছে। এমত কি, ‘বিতর্কে জগৎকে পরাজয় করিয়া দিগ্বিজয় লাভ করিব’—এরূপ দূরভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগের চিত্ত স্থির হইয়াছে। বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত সংস্কারাসক্তি-শোধনে উপায়ান্তর দেখি না।

—‘সঙ্গত্যাগ’, সং তোঃ ১১।১১

১৪। সাধুগণ কি করেন ?

“সাধুগণ অন্তহৃদয়ে চক্ষু দান করেন।”—‘ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ’, ভাঃ মঃ ১৫।১৭

১৫। সাধুগণের স্বভাব কি ?

“অপরের দোষ সাধুগণ কদাচ গ্রহণ করেন না। পরের যে সামান্য গুণ থাকে, তাহাকে বহুল করিয়া তাঁহার সম্মান করেন।

—‘ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ’, ভাঃ মঃ ১৫।২৬

১৬। সাধুর সংখ্যা কি খুব বেশী ? বাহুবেশ দেখিয়া সাধু নির্ণয় করা সম্ভব কি না ?

“কলিকালে সাধুর বিচার একেবারে উঠিয়া যাইতেছে। হুঃখের বিষয় এই যে, যাহাকে-তাহাকে বাহু বেশ দেখিয়া ‘সাধু’ বলিয়া সঙ্গ করত আমরা ক্রমশঃ সকলেই ‘কপট’ হইয়া পড়িতেছি—আমাদের এই কথাটা সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। সাধু অনেক পাওয়া যায় না। সাধুর সংখ্যা আজকাল এত অল্প হইয়াছে যে, বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াও, বহু দিন অনুসন্ধান করিয়াও একটা প্রকৃত সাধু পাওয়া দুর্লভ হইয়াছে।”

—‘সাধুসঙ্গের প্রণালী বিচার’ সং তোঃ ১৫।২

১৭। শুদ্ধবৈষ্ণব ও বঞ্চকের পার্থক্য-নিরূপণে গোজামিল দেওয়া উচিত কি ?

“বিশুদ্ধ ভক্তির ও শুদ্ধভক্তের পৃথক্ থাক্’ নিরূপণ করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ভক্তদিগের শাখা-নির্ণয়ের পন্থা দেখাইয়াছেন। তদুপেই আমরা এখনও শুদ্ধবৈষ্ণব ও বঞ্চকদিগকে পৃথক্ করিয়া লইতে পারি। এ বিষয়ে ‘গোলে হরিবোল’ দেওয়া উচিত নয়। সংসঙ্গ ব্যতীত কখনও জীবের মঙ্গল নাই ; সুতরাং শুদ্ধ বৈষ্ণবকে পৃথক্ করিয়া দেখাই উচিত।”

—‘সমালোচনা’, সং তোঃ ১০।৫

১৮। বন্ধাবস্থায় সংসঙ্গ কি ভক্তির অঙ্গ ?

“বন্ধাবস্থায় সংসঙ্গ কেবল হরি-বিষয়ে রুচির উৎপাদক মাত্র, ভক্তির অঙ্গ নহে।”

—তঃ সূঃ, ৩৩ সূঃ

১৯। ভক্তিপ্রদা স্মৃতি কি ?

“সাধুসঙ্গই একমাত্র ভক্তিপ্রদ-স্মৃতি।”

—জৈঃ ধঃ ১৭শ অঃ

২০। কপটতার সহিত সাধুসঙ্গের অভিনয় কিরূপ ?

“অনেকে মনে করেন যে, যাহাকে ‘সাধু’ বলিয়া স্থির করা যায়, তাঁহার পদসেবা, তাঁহাকে প্রণতি, তাঁহার চরণামৃত সেবন, তাঁহার প্রসাদ সেবা এবং তাঁহাকে কিছু অর্থ দান করিলেই সাধুসঙ্গ হয়। সেই সমস্ত কার্যের দ্বারা সাধুর সম্মাননা হয় বটে এবং তাহাতে কোন-না-কোন-প্রকার লাভও আছে।

কিন্তু তাহাই যে সাধুসঙ্গ, তাহা নয় । *** কেবল শুদ্ধভক্ত-সাধুগণের স্বভাব ও সচ্চরিত্র বহু যত্নে অনুসন্ধানপূর্বক তাহা নিকটপটে অনুকরণ করিতে পারিলে বিস্তৃত কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় । বিষয়িগণ সাধুর নিকট প্রণতিপূর্বক বলিয়া থাকেন —‘হে দয়াময়, আমাকে কৃপা করুন, আমি অতিশয় দীন-হীন, আমার সংসার বুদ্ধি কিরূপে দূর হইবে?’ বিষয়ীর এই বাক্যগুলি কপট-বাক্য-মাত্র । তিনি মনে মনে জানেন যে, কেবল অর্থলাভই লাভ ও বিষয়-সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য । তাঁহার হৃদয়ে শ্রী-মদ অহংরহঃ জাগ্রত আছে । কেবল প্রতিষ্ঠালাভের বাসনা ও সাধুগণের শাপের দ্বারা আমার বিষয় ক্ষয় না হয়,—এই ভয় হইতে তাঁহার নিকট কপট দৈন্ত ও কপট-ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয় । যদি ঐ সাধু তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করেন—‘ওহে, তোমার বিষয়-বাসনা দূর হউক এবং ধন-জন তোমার ক্ষয় হউক’, তখনই ঐ বিষয়ী বলিবেন—‘হে সাধু মহারাজ ! আপনি আমাকে এরূপ আশীর্বাদ করিবেন না । এরূপ আশীর্বাদ কেবল শাপমাত্র, সর্বদা অহিতজনক বাক্য ।’ এখন দেখুন সাধুগণের প্রতি বিষয়িগণের এরূপ ব্যবহার নিতান্ত কপটতা মাত্র । জীবনে অনেক সাধুজনের সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আমাদের কপট-ব্যবহারে আমরা সাধুসঙ্গের কোন ফল লাভ করি না । অতএব সরল শ্রদ্ধার সহিত আমরা সংপ্রাপ্ত সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিরন্তর যত্নপূর্বক অনুকরণ করিতে পারিলে সাধুসঙ্গের দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করি । এই কথাটী সর্বদা স্মরণ রাখিয়া প্রকৃত সাধুর সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্বভাব-চরিত্র অবগত হইব এবং যাহাতে আমাদের স্বভাব-চরিত্র তদ্রূপ গঠন করিতে পারি, তজ্জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিব । ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের শিক্ষা ।”

—‘সাধুসঙ্গের প্রণালী বিচার’, সং: তো: ১৫।২

২১ । সংসঙ্গ বরণ না করিয়া দুঃসঙ্গ-বর্জন হয় কি ?

“কেবল অসংসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না । যত্নপূর্বক সংসঙ্গ করাই আমাদের কর্তব্য ।”

—‘সাধুসঙ্গের প্রণালী বিচার’, সং: তো: ১৫।২

২২ । অসদ্-গুরুর দুঃসঙ্গ-বর্জনপূর্বক সদ্গুরুর সংসঙ্গ-বরণ কি অত্যাশ ?

“অযোগ্য কুলগুরুকে তাঁহার প্রার্থনীয় অর্থ ও সম্মান দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত সদ্গুরু অন্বেষণ করা আবশ্যিক ।” —‘গুরুবজ্র’, হং: চি:

২৩ । সঙ্গের জন্ত কিরূপ বৈষ্ণব অনুসন্ধান করা কর্তব্য ?

“স্বাভাবিক বৈষ্ণব-সঙ্গ করিতে হইবে, তিনি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠতর বৈষ্ণবকে অন্বেষণ করিয়া লইবেন ।”

—শ্রীম: শি: ১০ম প:

২৪ । সাধু কি সকল সময়েই পৃথিবীতে থাকেন । সাধুসঙ্গ দুর্লভ কেন ?

“সাধুগণ চিরদিনই জগতে আছেন, কেবল অসাধুগণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়া সাধুসঙ্গ দুর্লভ হয়।” —জৈ: ধ: ৭ম অ:

২৫। সাধুর নিকট প্রজন্ম করা কি উচিত? কাহাকে প্রকৃত সাধুসঙ্গ বলে?

“সাধুর নিকট গিয়া ‘এ দেশে বড় গরম, সে দেশে শরীর ভাল থাকে, ঐ বাবুটি বড় ভাল, এ বৎসর চাউল, ধান্য কিরূপ হইবে?’—ইত্যাকার মায়া-বিকারের প্রলাপ বকিলে সাধুসঙ্গ হয় না। সাধু স্বানুভাবানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া হয় ত’ প্রশ্নকারীর কথার ছ’একটি উত্তর দেন, কিন্তু তাহাতে কি সাধুসঙ্গ হয় বা কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ হয়? সাধুর নিকট যাইয়া প্রীতি-সহকারে তাঁহার সাহিত্য ভগবৎকথার আলোচনাই সাধুসঙ্গ, তাহাতেই ভক্তি লাভ হয়।”

—‘সাধুজন-সঙ্গ’, সং: তো: ১:০৪

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রীহরিকীর্তনকারীর অণু সাধন নাই। সর্বক্ষণ হরিকীর্তন করিতে হইবে, কীর্তন যদি হয়, তাহা হইলে তৎপ্রভাবে স্মরণ হইবে। সর্বতোভাবে সেই বস্তুর সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ আছে। ধ্যানের দ্বারা যে অনুভূতি আসে, তাহা গৌণ। যাহা শ্রবণ করি নাই, তদ্বিষয়ে যে মনগড়া কীর্তন, তাহা প্রাকৃত। যাহা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রবণের সৌভাগ্য হয়, তাহার অনুকীর্তন করিলেই অপ্রাকৃত স্মরণ আনিবে। বাস্তব দেহের স্মরণশূন্যতা বাস্তবদেহ প্রাপ্তির বাধা।

প্রকৃতিস্থ হইয়াও তাহার গুণে বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়া-সন্নির্ঘেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না। অপ্রাকৃত জগতে দেহ-দেহীর ভেদ নাই। দেহ-দেহীতে ভেদ হইলেই অসুবিধা। বাস্তব দেহেরই অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

শ্রীহরি রসময়—সর্বপ্রকার রসের সমুদ্র। দ্বাদশ রসে তাঁহার সেবা হয়। এক ব্যক্তির সহিত অপর ব্যক্তির সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হইলে সম্বন্ধটি রসাত্মক হয়—আনন্দের উদয় করায়। শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—পাঁচ প্রকার মুখ্যরস স্থায়ীভাবে সেবা ও সেবকের মধ্যে বিद्यমান। হাস্য, অদ্ভুত ইত্যাদি গৌণরস। গোলোকে রসের উৎকর্ষ ও চমৎকারিতা, ইহ জগতে রসের অপকর্ষ রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ রস-সমুদ্র—পূর্ণ আনন্দ, পূর্ণজ্ঞান ও নিত্য অস্তিত্ববিশিষ্ট।

বাস্তব বস্তু যাহা, তাহা না জানিবার দরুণই যত অহুবিধার উদয় হইয়াছে। এই অহুবিধার যাবতীয় ক্লেশের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দরকার। মনুষ্য জন্মে তাহা সম্ভব। আমরা একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যদি সাধুর নিকট শ্রীভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ করি, তাহা হইলে ইহজগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের দ্বারা আমরা বড়শীবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় আকৃষ্ট হইব না। তখন ভগবানের নিত্য আকর্ষণে আকৃষ্ট থাকিব।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বৈকুণ্ঠনাম পাওয়া যায়। তাঁহার আভাসে সংসার মুক্তি। ভগবানের নাম করিলে আর মাতৃকুক্ষিতে যাইতে হয় না। শব্দব্রহ্মের—শ্রুতির-বেদের আশ্রয় যিনি গ্রহণ করিলেন না, তাঁহার আবার সংসারে আসিতে হইবে—পুনরাব্রুতি হইবে। বৈকুণ্ঠ-শব্দকে কুণ্ঠশব্দের সহিত এক করিতে হইবে না। কুণ্ঠজগতে শব্দ-শব্দোত্তে ভেদ, বৈকুণ্ঠ-শব্দ ও বৈকুণ্ঠ-শব্দোত্তে ভেদ নাই। ইহজগতের শব্দ-শাস্ত্রবিদের নিকট বৈকুণ্ঠ-শব্দের সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

ভক্তি হইবে যাহাতে, তাহার রাস্তা করা দরকার। সাধুর প্রকৃষ্টমঙ্গ ব্যতীত ভক্তিলাভের আর উপায়ান্তর নাই। কিন্তু আজকালকার লোক সাধু বলিতে বুঝে—যিনি একটু প্রাণায়াম, গঙ্গাপান, ব্রহ্মচর্য্য-পালনাভিনয় বা পাথরপূজা করিয়া বেড়ায়, তাহারই নাম সাধু। কিন্তু প্রকৃত সাধু কখনও অসাধু-বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন না। চেহারায় সাধু থাকিলেই সাধু হওয়া যায় না, সত্যসত্যই সাধু হওয়া আবশ্যক। ভগবানের বিক্রম, তাঁহার শক্তির পরিচয় জানা দরকার। সাধু তাহা বলিয়া দিতে পারেন। অসাধু ভগবান্ নয় যে জিনিষ—নির্বোধ ব্যক্তিকে তফাৎ করিবার জ্ঞান ভগবান্ যে-যে বিচার দিয়াছেন, তাহাকেই সাধুর বিচার বলিয়া ভুল বুঝাইয়া দেয়। যাহারা চিকিৎসালয়, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া মরা মানুষকে বাঁচাইয়া দিতে পারে, তাহারাই জগতে সাধু বলিয়া পরিচিত। নিজের বা অন্যের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি কখনও সাধুর কার্য্য নয়, উহা পিশাচীর কার্য্য। ভুক্তি-মুক্তিকামী উভয়েই অসাধু। আমার ইন্দ্রিয়তর্পণকারী কখনই সাধু নয়, তাঁহার সাধুর বেশধারী হইলেও আমাদের অণু রাস্তায় ফেলাইয়া দেয়। সাধুসঙ্গেই ভগবানের শক্তি জানা যায়; অসাধুর সঙ্গে তাহা জানা যায় না। অসাধু নিজ শক্তির দস্ত করে বলিয়া ভগবন্তক্তেরা বলেন—আমাদের নিজের কোন স্বতন্ত্র শক্তি নাই। আমরা ব্রহ্মজাতীয়। ভগবান্ পরম শান্তিমান, তিনি আমাদেরকে যে শক্তি দেন, তাহা লইয়া আমরা শক্তির পরিচয় দিয়া থাকি। তাঁহার দেওয়া শক্তি তিনি আকর্ষণ করিয়া লইলে আমাদের কিছুই থাকে না। তাঁহাকে সেবা করিবার জ্ঞান উহার আনুগত্যের পরিবর্তে তাঁহার কাছ হইতে কিছু পাইবার অভিপ্রায়ে যখন আমরা ভক্তির ভাণ প্রদর্শন

করি, তখন তাঁহার কৃপা হইতে বিতাড়িত হইয়া বঞ্চনাই গ্রহণ করিতে হয়। যখন আমাদের বিচার হয়—ভগবান্ কেন ভক্তিদান না দিয়া, অথ কিছু দিয়া যান—আমাদের কেনই বা অবিচার আসে, তখনই দেখি, আমাদের অমঙ্গল কাটিয়া আসিয়াছে। আমাদের কপটতা না থাকিলে ভগবান্ আমাদের অজ্ঞতামূলক প্রার্থনীয় অপূর্ণতা দূর করিয়া পূর্ণবস্ত্র প্রদান করেন,—

“আমি বিজ্ঞ, সেই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।

স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥”

—এই বিচারটী বুঝিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল হয়। প্রাকৃত সংসারাসক্ত লোক কখনও ভক্ত হইতে পারে না। প্রাকৃত-সহজিয়া যাহারা, তাহারা ইহলোকের মঙ্গলের জন্ত ব্যস্ত। তাহারা এই প্রাকৃত জগতের অমঙ্গলকে মঙ্গল মনে করিয়া নিত্য মঙ্গলময় ভগবানের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া আনুকরণিক হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা ভক্তের সঙ্গ করে না, ভক্তকে যম মনে করে। ভক্তি ভিক্ষুকের বেশে তাহার নিত্য মঙ্গলের জন্ত তাহার দ্বারে উপস্থিত হইলে, তাঁহার সঙ্গে দেখাও পর্য্যন্ত করিতে চায় না। ভয়—“আমি আত্মীয়-স্বজনের ভোগের কার্যে লাগাইবার জন্ত যে অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি, পাছে তাহা সাধুরা আসিয়া গ্রহণ করে।”

ভগবানের ভক্তেরাই ভাগবত বা ভগবদ্ভক্তির কথা আলোচনা করিয়া মঙ্গল-বিধান করিতে পারেন। অভক্তেরা ভগবদ্ভক্তির কোন সন্ধান রাখে না। তাহারা ভগবন্মায়ার দ্বারা জাত আধিকারিক দেবতা পূজার ব্যবস্থা দিয়া মানুষের অসুবিধা করিয়া দেয়। ঐ সকল অসুবিধার হাত হইতে অবসর লইতে হইবে। অথ বাজে কথায় যাহাতে দিন না কাটে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

“জড়াসক্তির প্রাবল্যই আমাদিগকে শ্রীজগন্নাথসেবায় বাধা প্রদান করে। জগদদর্শন—প্রাকৃত দর্শন থাকা পর্য্যন্ত আমাদের অপ্রাকৃত জগন্নাথ-দর্শনে রুচি জন্মে না। সমগ্র জগৎকে জগন্নাথের সেবায় নিযুক্ত করাই রথযাত্রা উৎসবের তাৎপর্য্য।”

“যাহারা চাতুর্মাশ্য-ব্রত পালন না করিয়া কেবলমাত্র ‘উর্জাদর’ করিয়া থাকেন, তাহারা চাতুর্মাশ্যের ভক্তিরূপে লাভ করিতে পারেন না। ইহার দ্বারা চাতুর্মাশ্যের প্রতি অনাদরই প্রকাশ পায়।”

—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিঃ) হইতে
পাশ্চাত্যে শ্রীগৌরবাণী-প্রচারোদ্দেশ্যে যাত্রায়
শ্রীশ্রীল সভাপতি-মহারাজের শুভেচ্ছা-জ্ঞাপন

All Glory To Shri Shri Guru And Gouranga

Phone : 461596

SHRI GOUDIYA VEDANTA SAMITI (Regd.)

SHRI SHYAM SUNDAR GOUDIYA MATH
MILANPALLY

P. O. Siliguri-734405 ● Dist. Darjeeling
(North Bengal)

Ref. No.....

Dated 25. 4. 96

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডব্রজি পূর্ব্বকেষম্—

পূজ্যপাদ মহারাজ ! আপনার ১২।৪।৯৬ তাং এর কৃপালিপি বহুবিলম্বে
গতকল্য আমার হস্তগত হইয়াছে। আশা করি পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদের
অহৈতুকী করুণায় আপনি সর্বাঙ্গীন কুশলে আছেন।

বিদেশী ভক্তগণের পুনঃ পুনঃ আগ্রহে আপনি পাশ্চাত্যের হল্যান্ড, ইংল্যান্ড,
আমেরিকা ও কানাডায় শ্রীমন্নহাপ্রভুর প্রেমধর্মের বাণী প্রচারোদ্দেশ্যে শুভযাত্রা
করিতেছেন জানিয়া যারপরনাই আনন্দিত ও উৎসাহিত হইলাম। তদেশীয় ভক্তগণ
আপনাদের ৩ জনের যাতায়াত ব্যয়ভার বহন করিতেছেন এবং টিকেট ও ভিসা
হইয়া গিয়াছে জানিলাম। সিঙ্গাপুর ও হংকংও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমবাণী
হইতে বঞ্চিত হইবে কেন ?

আপনি শুদ্ধভক্তিকথা প্রচারের জগুই বিদেশে যাইতেছেন, সুতরাং আপনার
লাভালাভ চিন্তা না করিলেও, তদেশবাসিগণের পক্ষে ইহা স্বর্ণ সুযোগ ও বিশেষ
সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী-নৃসিংহদেব,
সর্বোপরি সর্বাভীষ্টপ্রদাতা শ্রীগিরিরাজ মহারাজজীর অহৈতুকী শুভাশীষ আপনার
উপর বর্ষিত হউক। আপনি তাঁহাদের বাণী প্রচারদ্বারা অবশুই তাঁহাদের
মনোহীষ্ট সংরক্ষণে সক্ষম হইবেন, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আপনার এই
বুদ্ধবয়সে পাশ্চাত্যে শ্রীগৌরবাণী প্রচারের ধৈর্য্য ও উৎসাহ নিঃসন্দেহে সংসাহস,
ইহাকে দুঃসাহস বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

আপনি স্বগণের সহিত জয়যুক্ত হউন। আপনাদের শুভযাত্রার নির্দ্ধারিত দিন
০৫।৯৬ তারিখ জানিয়াছি। আমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডব্রজি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ
করিবেন। ইতি—

শ্রীবৈষ্ণবদাসাভাস প্রণত—

শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্মের সহজ-বিকাশ ?

মাষ্টার-ডিগ্রী ছাত্রের শিক্ষককে বর্ণপরিচয়-ছাত্রের শিক্ষক বলিলে অতীব অসঙ্গতি ও মূর্থতা প্রকাশ পায়। যতপি এম. এ. ছাত্রের শিক্ষক মহাশয়ের বর্ণপরিচয় শিক্ষা দিবার যোগ্যতা অবর্ত্তমান নহে, তথাপি তাঁহাকে বর্ণপরিচয়-শিক্ষাদাতা বলা চলে না। ইহাতে তাঁহার খ্যাতি প্রকাশ পায় না, বরং অখ্যাতিই ঘোষিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের বা মহাপ্রভুর ধর্মকে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর ধর্মের সহিত সমান বিচার করিলে অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। দেশের রাজাকে ভিত্তারীর দশ নগর অধিকারী বিচার করা নিশ্চয়ই মহামূর্থতা। উদারতা বা **Religious tolerance** এর নামে সর্বধর্মের মাহাত্ম্য এক বলিয়া ঢকাবান করা কিরূপ অবিচার, তাহা স্বধী ব্যক্তি বাতীত অন্তের অনুভাব্য নহে।

গ্রামাচ্ছাদন ও ভোগবিলাসের সুযোগ-সুবিধা পাইলে ধর্মাস্তরিত হইবার উৎসাহ কেন না হইবে? সুন্দরী যুবতীর সহিত প্রেমের সুযোগ, উচ্চ বেতনের চাকুরী, বসবাসের জন্ত বিলাসবহুল অট্টালিকা, জীবিকা নির্বাহের জন্ত ৩৪ বিধা কৃষিজমি, পুত্র-কন্যার বিবাহের ভার ও দায় হইতে অব্যাহতি, তাহাদের বিচারজনের বিনামূল্যে ব্যবস্থা, পরিবারের সকলের ব্যাধির চিকিৎসার সুযোগ পাইলে বর্ত্তমান দুর্শ্ল্য ও বেকার-বাজারে কোন্ ধর্ম উত্তমরূপে প্রসার লাভ করিবে না? ভারতে অরণ্যবাসী ও অনুরত মনুষ্যের প্রাচুর্য্য থাকায়, এ হেন সুযোগ-সুবিধা লাভ করত ধর্মাস্তরিত হইয়া বেশভূষায়, আহার-বিহার ও ভোগবিলাসে তাহারা কেন না আকৃষ্ট হইবে? বুদ্ধিমান ও ধনাঢ্য বৈদেশিকগণ এহেন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করত ভারতকে কবলিত করিতেছে, ইহা উপলব্ধি করত বহির্দেশের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অনেক প্রতিষ্ঠানকে ধর্মপ্রচারে চেষ্টাষিত দেখা যায়। তাঁহারা দেশবাসীর নিকট উৎসাহ, প্রশংসা ও প্রচুর সহানুভূতিও লাভ করিতেছেন। কোন কোন বুদ্ধিমান বৈষ্ণবও এই কার্যে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছেন। কেহ বা সমগ্র বিশ্বে অতুল্য খ্যাতিও লাভ করিতেছেন। তাঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বহু সম্প্রদায় বিদেশে ধর্মপ্রচার করিতে যত্নবান্। বিদেশ হইতে প্রচুর অর্থসংগ্রহ করত সু-উচ্চ দেবমন্দির, সুবৃহৎ নাট্যমন্দির, সুরম্য সেবকখণ্ড ও সুদৃশ্য পুষ্পোত্থান, শ্রামল সুকোমল তৃণাচ্ছাদিত চত্বরপ্রাঙ্গন এবং নানাবিধ কোয়ারাযুক্ত বিচরণক্ষেত্র প্রভৃতি ভোগীকুলের আকর্ষণীয় পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া তৎসহ রসনার তৃপ্তিকর উত্তম উত্তম সুস্বাদু প্রসাদ ক্রয়-বিক্রয়ের স্বন্দোবস্ত ও বিলাসবহুল ভবনে ২৪ রাত্রি বাস করিবার সুযোগ দান করত ধনী সম্প্রদায়কে বৈষ্ণবধর্মে আকৃষ্ট করিতেছেন।

প্রতিদানে ধনীর নিকট মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অনেকেই বেশ মোটা অঙ্কে এককাসীন দান দিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। কেহ বা বহুমূল্যের বৈষ্ণবগ্রন্থ ও শ্রীহরিনামের কোণামালা সংগ্রহ করত হরিনামগ্রাহীরূপে তালিকাভুক্ত হইয়া থাকেন। এক্ষেত্রে আহাৰ ও ইন্দ্রিয় সংযমের কঠোরতা তাহাদের প্রতি বাধ্যতামূলক হয় না। শ্রদ্ধায় ও হেলায় নাম গ্রহণ করলেই যখন চলিতে পারে তখন আচার-বিচার ও সংযম-বিষয়ে কঠোরতা রক্ষা করিবার আবশ্যিকতা তাহাদিগকে উপদেশ করা হয় না। এইভাবে পরমোদারতা-সহকারে অনেক প্রতিষ্ঠান শ্রীমন্নহাপ্রভুর ধর্ম-যাজনকে সহজসাধ্য করিয়া লইয়াছেন।

শিক্ষিত বেকার যুবককে যোগ্যতানুসারে বেতন, পোষাক-পরিচ্ছদ ও বাসস্থান, কমিশন-চুক্তিতে ধর্মগ্রন্থ বিক্রয় এবং হীন যোগ্যতাসম্পন্ন যুবকদিগকে রন্ধনকার্য, কৃষিকার্য ও গোপালন-বিভাগে নিযুক্তির ব্যবস্থাও আছে। শিক্ষানবীশ হিসাবে তাহাদিগকে মন্দির ও গৃহাদি সম্মার্জন, বাসনপত্র মার্জন, স্নানাগারাদি পরিষ্কার কার্যে নিযুক্ত করত দক্ষতা শিক্ষাদান করা হয়। মোটকথা প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক্ত হিসাবে নিয়োগ করিয়া তন্মধ্যে নির্দিষ্ট সময়জন্ত হরিনাম জপ, আরাট্রিক দর্শনাদি বাধ্যতামূলক ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। বেকারযুগে এবিধ ধর্মীয় আবরণে অর্থোপার্জনের স্বযোগে বহু বেকার যুবক যোগদান করিয়া জীবনধারণ করিতেছে। প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ শিল্প-কর্মশালায়ও যুবকদের কর্মসংস্থান হইয়া থাকে। মেধাবী যুবকদিগকে ধর্মবিষয়ক সিদ্ধান্ত ও যুক্তিতর্ক শিক্ষা প্রদান করিতে **Training class**-এর ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্রসিদ্ধান্তে ও যুক্তিতর্কে পারদর্শী হইলে দেশবিদেশে প্রচারে নিযুক্ত করা হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে “মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া”—বাক্যকে বহুমানন করিয়া যুক্তবৈরাগ্যই সাধনোপযোগী বিচারে বেশভূষাদির বৈরাগ্যের বাধ্যতা দেখা যায় না। প্রচারকার্যের প্রয়োজনানুসারে বেশভূষা গ্রহণ করাই ব্যবস্থিত হয়। এ বিষয়ে শাস্ত্রের বচন এবং মহাজনের বাক্যও গুণাইয়া থাকেন।—

অনাসক্তস্ত বিষয়ান্ যথার্থমুপযুক্ততঃ ।

নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

“শ্রীহরিসেবায় যাহা অল্পকূল, বিষয় বলিয়া তাহা ত্যাগে হয় ভুল ॥” ইহাতে সাধারণ ব্যক্তি নির্বাক হইলেও শাস্ত্রের কঠোর নিষেধ এবং শ্রীমন্নহাপ্রভুর কঠোর আচরণ ও আদেশ কি নিরর্থক? গৃহীদের পক্ষে অবশ্য সেক্রপ কঠোরতা নাই, পরন্তু তত্ত্বগৃহের পক্ষে কোনরূপ শিথিলতা নাই। যেক্রপ “শ্রীসঙ্গী এক অসাদু”—এ বাক্য গৃহত্যাগীকেই অবশ্য পালন করিতে হইবে। গৃহীকে বৈধ সঙ্গ করিতে ইহাতে

নিষেধ বুঝায় না। এ বিষয়েও নানারূপ তর্ক থাকিয়া যায়। যেমন, গৃহীবাঙ্কি যদি স্ত্রীসন্তোগাদি করিয়াও বৈষ্ণব হইতে পারেন তবে ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক স্ত্রীসংসর্গ বর্জন করিবার প্রয়োজন কি? এতদ্বস্তরে বিচার্য্য এই যে—সকল গৃহীই একপ্রকার অধিকারী বুঝায় না। গৃহীর মধ্যে ষাঁহারা পরমহংস বা গোস্বামী তাঁহারা অবশ্যই গোদাস না হইয়া ইন্দ্রিয়জয়ী বুঝিতে হইবে। নতুবা তাঁহারা গুরু বা আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না। যাহা হউক শিক্ষিত যুবকদের এইরূপ প্রতিষ্ঠানে জীবিকার্জন এবং অনেকে বিবাহবন্ধনদ্বারা মহাপ্রভুর ধর্মে যুক্ত হইতেছেন।

অনেকেই বলেন,—বর্তমানকালে দেশবাসী ধর্মে উদাসীন ও বিরূপ। কিন্তু চতুর্দিকে যেভাবে তীর্থযাত্রায় উৎসাহ দেখা যায়, তাহাতে দেশবাসী উদাসীন বলা যায় না। ট্রেনে ও বাসে তীর্থভ্রমণকে লক্ষ্য করিলে তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তীর্থস্থলগুলিতে অধুনা নানাবিধ আরামপ্রদ অবস্থানের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ধনীদের জন্ত শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গৃহ, বিলাসিতাপূর্ণ দুগ্ধফেননিভ শয্যাাদি ও রুচিকর নানাদেশীয় নানাবিধ খাদ্যের বন্দোবস্তপূর্ণ বাসগৃহ ও হোটেল সকল তীর্থেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। দুর্গম ও সূদূরবর্তী কেদারবন্দীতীর্থ বর্তমানে সুগম ও সুখাবহ হইয়াছে। সরকারের চেষ্টায় রাস্তাঘাট ও যানবাহনের প্রাচুর্য্য ও উন্নত বন্দোবস্ত প্রকাশ পাইয়াছে। সে-कारणे এহেন তীর্থস্থানও চিত্তাকর্ষক উপভোগ্য পর্য্যটন স্থানরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সার্বজনীন পূজা-পার্বণে চিত্তাকর্ষক মণ্ডপাদি ও বৈজ্ঞানিক শিল্পকলার বিকাশে সাধারণের অর্থ অবারিতভাবে ব্যয়িত হইতেছে। ইহাতে দেশবাসীকে ধর্মে অবিশ্বাসী ও উদাসীন ভাবা সঙ্গত হয় কি?

বিচার্য্য বিষয়—শ্রীমন্ন্যমহাপ্রভুর ধর্ম বলিতে গ্রাসাচ্ছাদন ও ভোগবিলাসের সুযোগ-সুবিধাকে বুঝায় কি? সকল ধর্মমধ্যে গ্রাসাচ্ছাদনের বিষয়টি অল্পবিস্তর ব্যবস্থিত আছে। ইহাকেই প্রাধান্য দিলে মহাপ্রভুর ধর্মের অবমাননা হয়। যে ধর্ম ইহলৌকিক সুখ বা ভোগবাদকেই মুখ্যভাবে উদ্দেশ্য করে, তাহা নিম্নস্তরের ধর্ম বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। কর্মযোগ বলিলে বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানমূলক পারলৌকিক অর্থাৎ স্বর্গসুখপর ধর্মকে মুখ্যরূপে বুঝায়। জ্ঞানমার্গের ও কর্মমার্গের পরিণাম—ধ্বংস ও ক্লেশ-উপলব্ধিহেতু ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখচেষ্টা-বর্জিত মুক্তি অর্থাৎ মায়িক ধ্বংসশীল বস্তুতে অনীহা প্রকাশ পায়। উন্নত অধিকারীর সঙ্গ ঘটিলে তথা হইতে যোগ ও ভক্তিপথের যোগ্যতা লাভ হইতে পারে। শ্রীমন্ন্যমহাপ্রভুর ধর্ম বলিতে ভক্তিপথকেই নির্দেশ করিলেও তাহা উত্তমা ভক্তি এবং কৃষ্ণভজনকে বুঝায়। রাগানুগা ভক্তি ও ব্রজপ্রেমই তাহার মুখ্য

পরিচয়। ইহাই তিনি স্বীয় পাদপ্রবর শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।—

অগ্ন্যভিলাষিতাশূণ্যং জ্ঞানকন্ধ্যাতনাবৃতম্ ।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরূপম্ ॥

অগ্ন্যভিলাষিতা বলিতে ইহলৌকিক গ্রাসাচ্ছাদন ও ভোগসুখাদিকে বুঝিতে হইবে। এইগুলিকে প্রধানরূপে উদ্দেশ্য করিয়া হরিনাম করা মহাপ্রভুর ধর্মের মহিমা নহে। পরন্তু এই অগ্ন্যভিলাষিতাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করাকেই প্রাথমিক কর্তব্য বলা হইয়াছে। এমন কি কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদির স্পর্শও নিবারিত হইয়াছে। এতদ্বারাও মহাপ্রভুর ধর্ম প্রকাশ পায় না বলিয়া আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলন উক্তি। এই উক্তির মধ্যেও পুষ্পকলিকার দ্বারা প্রস্ফুটিত পুষ্পকে বর্ণন-স্বরূপ বুঝান হইয়াছে। রামাদি কোন বিষ্ণুতত্ত্বের উপাসনাকেও সমতা প্রদত্ত হয় নাই। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলন বলিতে পরকীয়া মধুরসাত্ত্বিক ভক্তিতে— ‘যে যথা মাং প্রপত্তন্তে’ বাক্যের গৌরব গ্লান করত প্রতিদান দিতে অসমর্থ ও ঋণী বলিয়া কৃষ্ণ নিজমুখে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন সেই—

ন পারয়েহং নিরবতসংযুজাং স্বনাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ ।

যা মাহুতজন্ম দুজ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধনা ॥

বাক্যটাই মহাপ্রভুর ধর্মের চমৎকারিতা-প্রকাশক। শ্রীমতীর প্রেমবৈচিত্র্য মহাভাব যাহার মহিমা—তাহাই শ্রীমন্নহাপ্রভুর ধর্ম বলিয়া বুঝা উচিত। ইহাতে জড়েন্দ্রিয়-তর্পণপর কোন ব্যাপার নাই। ইহা অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহের ধর্ম, হল্লাদিনীশক্তির বিলাস জানিতে হইবে। সুতরাং ইহাকে জড়েন্দ্রিয়-তর্পণমূলক ধর্মে পরিণত করিলে শ্রীমন্নহাপ্রভুর ধর্ম যাজন হয় না। এই ধর্ম কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুনদ্বারা শিক্ষা প্রদান করা যায় না। ইহা বদ্ধজীবের কোন প্রাকৃত দক্ষতার বিষয়ও হইতে পারে না।

—ত্রিভুজস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

পাপ ও অপরাধ

‘পাপ ও অপরাধ’ বাহ্যিক বিচারে একইরকম মনে হইলেও তাহার মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিद्यমান। ‘মুড়ি-মিছরি’র এক দরের’ গ্রায় পাপ ও অপরাধ উভয়ের ফলও একই—ইহা বলিয়া তত্ত্ববিদগণ মুখ্যমির পরিচয় প্রদান করেন না। জগদীশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ কর্মকরণই ‘পাপ’ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। আর সাধু ও ভগবানের প্রতি (পাপ, পাতক ও মহাপাতকাদি) কৃত হইলে তাহাকে ‘অপরাধ’ বলে। গুরু-বৈষম্যের অনাদর ও অসম্মান করিলে অপরাধ হয়। স্মৃতি ও লিঙ্গ-শরীরকে কেন্দ্র করিয়াই পাপের সৃষ্টি, আর অপরাধ—জীবের আত্মনিষ্ঠ পতন বিশেষকেই লক্ষ্য করে। পাতকের গুরুতা-লঘুতা-ক্রমে সকল পাপে গুরুতা-লঘুতা সংযুক্ত হয়। গুরুতা ও লঘুতা অনুসারে পাপ, পাতক, অতিপাতক ও মহাপাতক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়। সামান্য প্রায়শ্চিত্তেই পাপসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কোটি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা অপরাধ দূরীভূত হয় না। বিন্দুমাত্র পাপের ক্ষয় হইলেই জড়ীয় স্থলের অবসান হইয়া থাকে। স্থলের শেষে গুরুতর দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। পাপকার্য্য করিলে মনের মধ্যে গুরুতর ভার চাপিয়া থাকে। “পাপের গোলা বড় ভার।” পাপের ফলাপেক্ষা অপরাধের ফল অত্যন্ত ভীষণ ও আত্ম-নাশক। ‘অপরাধ’ সর্বাপেক্ষা কঠিন বলিয়া তাহা প্রত্যেকের সর্বতোভাবে বর্জন করা একান্ত আবশ্যক।

পুণ্যাদির সমাগমে পাপ বিনষ্ট হয়, কিন্তু অপরাধ করিলে পাপাপেক্ষা সর্বতো-ভাবে অধিকতর অমঙ্গল লাভ করিতে হয়। ইহ জগতে জৈন-মতপাদি—কেবল-মাত্র পাপী, পরন্তু মায়াবাদী সহজিয়াগণ ভগবান্ ও ভক্তবিদ্যেবী, স্তবরাং নিত্য-কালের জন্ত ঘোরতর অপরাধী। অপরাধ-বশে জীবের নিত্য সৌভাগ্য ও চরম কল্যাণ নিত্যকালের জন্ত নষ্ট হয়। “পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে ঘৃণা করিও না”—এই নীতিকে বহুমানন করিতে গিয়া যাহারা নিজের পাপস্পৃহাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে এবং অপরকেও পাপকার্য্য করিতে ইন্ধন যোগায়, তাহাদিগকে কেবলমাত্র পাপী বলা যাইবে না, তাহারা ঘোরতর অপরাধী। পাপী ব্যক্তির কার্য্যকরণই ‘পাপ’। ‘পাপ’ পাপীব্যক্তি হইতে পৃথক্ অবস্থান করে না। অতএব পাপীকে ঘৃণা না করিয়া কিরূপে পৃথক্ভাবে পাপকে ঘৃণা করা যাইতে পারে?

বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া অত্যাগপূর্ব্বক অর্থ, ক্ষমতা, সময়, সামগ্রীর ব্যয় করিলে অপচয়রূপ পাপ লাভ ঘটে। নেড়’, বাউলাদি তেরোটি অপসম্প্রদায় দৈব-বর্ণাশ্রম লোপ করিবার মানসে জগতে যে মতবাদ প্রচলন করেন, তাহা যে কেবল পাপমূলক

ও ধ্বংসাত্মক—তাহা নহে, তাহা অবশ্যই ঘোরতর অপরাধ-পর্যায়ভুক্ত। সহজিয়া, কর্তাভজা প্রভৃতির যে অবৈধ স্ত্রী-সংসর্গ সর্বদা লক্ষিত হয়, তাহা নিতান্ত ধর্মবিরুদ্ধ ও জগন্নাশমূলক কার্য-বিশেষ। বেদবিহিত ব্যবস্থার অন্তুষ্ঠান, নির্দিত বিষয়ের আচরণ এবং ইন্দ্রিয়-দমন না করিলেই পাপ হয় ও তাহার ফলে নরকপাত ঘটে। পাপকর্ম কখনও চাপা থাকে না। সমুদ্র শুকাইয়া যাওয়া যেমন অসম্ভব, পাপ কাজ গোপন থাকাও তেমনই অসম্ভব। “Murder will out.”

মহাভারত দানপর্বে দশবিধ পাপের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। প্রাণিহত্যা, চৌর্য্য ও পরদারহরণ—এই তিনপ্রকার পাপ ‘কার্যিক’, অসৎপ্রলাপ, পারুষ্য, পৈশুণ্য এবং মিথ্যাকথা কথন—এই চারিপ্রকার পাপ ‘বাচিক’ এবং পরধনে লোভ, সর্বজীবে দয়াশূন্যতা ও কর্মের ফল হউক—এই ত্রিবিধ পাপ ‘মানসিক’। উদুখল, জাঁতা, চুল্লী, জলকলস ও মার্জ্জনী বা বাঁটা এই পঞ্চমুনা অর্থাৎ পাঁচটি প্রাণিহিংসার স্থান গৃহস্থের গৃহে বর্তমান থাকে বলিয়া গৃহস্থগণ অন্তুক্ষণ পাপ করিতে বাধ্য। “পঞ্চমুনা কৃতং পাপং পঞ্চযজ্ঞৈর্য্যাপোহতি (স্মৃতিশাস্ত্র)।” শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—“অগ্নে দেব ও মনুষ্যের সাধারণ অধিকার, কিন্তু যে মানব ভগবানকে না দিয়া নিজে ভোজন করে, সে পাপ-ভাগী হয়।”

পাপক্ষয়ে অমোঘ সাধনের নামই প্রায়শ্চিত্ত। পাপক্ষালনের জন্ত স্মার্তগণের কর্মকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্তের প্রথা বৃথা ও ভণ্ডামি মাত্র। কর্মকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্তে ‘পাপ’ ধ্বংস হইলেও পাপের মূল ‘পাপবীজ’ ধ্বংস হয় না। হরিকথার শ্রবণ-কীর্তন-যূপকাঠেই পাপসমূহের বলি হয়। প্রভাকর যেরূপ হিমরাশিকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ কেবলাভক্তির দ্বারা বাসুদেবপরায়ণ ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণ (আত্মযজ্ঞিকভাবে) সর্বপাপ, পাপ-প্রবৃত্তি ও তন্মূল অবিজ্ঞা সমূলে বিনষ্ট করিতে সক্ষম হয়। এই প্রসঙ্গে (ভাঃ ১১।১৪ ১৯) শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—“হে উদ্ধব! যেমন প্রজলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মমাৎ করে, তদ্রূপ মৎসম্বন্ধিনী ভক্তি নিখিল পাপকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকে।” শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ লঘুভাগবত-মুতের “বর্তমানঞ্চ যং পাপম্” শ্লোকে বলিয়াছেন,—“শ্রীগোবিন্দের কীর্তনরূপ অনল-প্রভাবে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যে-সকল পাপ, তৎসমস্তই দগ্ধ হইয়া যায়।” সকল শাস্ত্রাদিতে “শ্রীহরিনাম-গ্রহণই পাপিগণের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিমুক্তপ্রণাসী ব্যক্তিগণের পক্ষে তীর্থপাদ শ্রীভগবানের নাম-সংকীর্তন অপেক্ষা পাপমূল-নাশক শ্রেষ্ঠ বস্তু আর নাই, কারণ নাম-সংকীর্তনাদি হইতে চিত্ত আর কর্মে লিপ্ত হয় না। ভক্তিমানের হৃদয়ে দৈবাৎ কোন পাপ উৎপন্ন হইলেও তাহা স্থায়ী বাসনা বাঁধিতে পারে না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ‘জৈবধর্মে’

বলিয়াছেন,—“তাহার হৃদয়ে ভক্তি আছে, তাঁহার দৈবাৎকৃত কোন পাপ তাঁহার হৃদয়ে স্থির হইতে পারে না, শীঘ্রই বিনষ্ট হয়।”

আজকাল অনেক গৌরভক্তব্রহ্মবগণকে বলিতে দেখা যায়,—“গৌরসুন্দর যেহেতু কলিকালে হরিনাম দিয়া পাপিগণকে উদ্ধার করিয়াছেন, সেইহেতু আমরা যদি সর্বক্ষণ পাপ করিয়াও থাকি তিনি অবশ্যই আমাদিগকে তাঁহার ভক্তের মধ্যে গণ্য করিবেন।” এই সর্বনাশা চিন্তাধারার ফলে গৌরভক্তব্রহ্মবগণের পাপ কখনও দূরীভূত হয় না, তাহারা অনন্তকালের জন্য নিরয়ে বাস করিতে বাধ্য হয়। এতৎ প্রসঙ্গে জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ‘শ্রীচৈতন্যভাগবতের’ বিবৃতিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য। শ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতি—“বৈষ্ণবগণ কেহ কেহ মনে করেন যে, বৈষ্ণবগণ তাহাদের গুণেই পাপে লিপ্ত হইবার যোগ্য। পাপিগণকে যখন গৌরসুন্দর কোল দিয়াছেন, তখন তাহারা সেই পাপ সমর্থন করিবে না কেন? এবং যাবতীয় পাপসমর্থনকারী ব্যক্তিই বৈষ্ণব-গুরুর কার্য্য করিবে। এখানে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, গৌরসুন্দর সকলেরই উদ্ধার করিবেন, কিন্তু বৈষ্ণবের নিন্দাকারী ও নাম বলে পাপাচারী আচার-ভ্রষ্ট জনগণের উদ্ধার কখনও করিবেন না। পাপের অনুমোদনকারী পাষণ্ডিগণ যতই কেন না আপনাদিগকে ‘বৈষ্ণব’, ‘গুরু’ প্রভৃতি বলিয়া মিছাভক্ত সাজুক, দুরাচার বৈষ্ণবনিন্দক পাষণ্ডিগণের আত্মবঞ্চনা বাতীত অন্য কোন সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের রূপায় ভগবদ্বিদ্বেষী অসুরগণও অনুগ্রহ পাইয়াছে, কিন্তু ভক্তদেবী পাষণ্ডী দুষ্কৃতি পাপী কখনও গৌরসুন্দরের রূপার উপর নির্ভর করিবে না, আত্মস্তরী হইয়া আপনাকে গৌরভক্তব্রহ্ম বলিয়া পরিচয় দিবে এবং নরকের পথের পথিক হইবে।”

যতপ্রকার অপরাধ আছে তাহার মধ্যে নামাপরাধ জঘন্যতম এবং অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। নামাপরাধ ভজনপথের প্রধান কটক-স্বরূপ। সেবাপরাধও সর্বতোভাবে বর্জনীয়। দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে ‘সাধু মহাত্মাগণের নিন্দা’ প্রধান অপরাধ। যে বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ করা হয়, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে অপরাধীর অপরাধ কিছুতেই দূরীভূত হইবে না। শ্রীনাম কোমুদীতে উক্ত হইয়াছে,—“মহাজন-বিষয়ে অপরাধ হইলে তৎফলভোগ কিম্বা তদীয় অনুগ্রহেই অপরাধের নিবৃত্তিকারক হইয়া থাকে।”

শুদ্ধ নামাশ্রিত ব্যক্তির পাপবুদ্ধি ত’ দূরের কথা, পুণ্যাঙ্গি কার্য্যও রুচি থাকে না; এমন কি মোক্ষও তাঁহাদের নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হয়। যতপি পাপসমূহ নামদ্বারাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তথাপি পুরুষ যে নাম বলে পরমপুরুষার্থরূপ

সচ্চিদানন্দধনমূর্তি শ্রীভগবানের চরণাবিন্দসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই নামবলেই পরমঘৃণাস্পদ পাপবিষয়ের সাধন পরমদোরাগ্ন্যস্বরূপই হইয়া থাকে এবং তন্নিবন্ধন নামকে নিকৃষ্টই করা হয় বলিয়া অতুষ্টিত পাপাপেক্ষাও কোটিগুণে অধিক অপরাধ নিশ্চয়ই উপস্থিত হইয়া থাকে। জৈবধর্মের ২৫শ অধ্যায়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—“পঞ্চবিধ পাপ কোটিগুণিত হইলেও নামাপরাধের তুল্য হয় না।” নামের ভরসায় যে-সকল পাপ করা যায়, তাহা যম-নিয়মাদি দ্বারা শুদ্ধ হয় না। কেন না, তাহা নামাপরাধের মধ্যে গণিত হওয়ায় নামাপরাধ-ক্ষয়ের যে পদ্ধতি আছে, তাহাতেই তাহাদের ক্ষয় হয়। “নামাপরাধী পুরুষগণ পুনরায় নিরন্তর নামকীর্তন করিলে ঐ নামসমূহই তাহাদিগকে পাপমুক্ত করিয়া থাকে”—এই বাক্যানুসারে কেবলমাত্র নিরন্তর নামকীর্তনেই প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে।

নামাপরাধ থাকিলে অনেক জন্ম ধরিয়া কৃষ্ণভজন করিলেও ‘কৃষ্ণপ্রেম’ লাভ হয় না। দশবিধ নামাপরাধ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকীর্তন করিলে অতি অবশুই কৃষ্ণপদ-প্রাপ্তি হয়।—

বহু জন্ম কৃষ্ণ ভজি ‘প্রেম’ নাহি হয়।

অপরাধ-পুঞ্জ তার আছয়ে নিশ্চয় ॥

অপরাধ শূন্য হয়ে লয় কৃষ্ণনাম।

তবে জীব কৃষ্ণপ্রেম লভে অবিরাম ॥

* * *

অপরাধ ছাড়ি’ কর কৃষ্ণসংকীর্তন।

অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৭।১৩৮)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

ষড়্গোস্বামীর অবদান ও বৈশিষ্ট্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১১ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমন্নমোহপ্রভু ঐ সময়ে কাশীতে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁহার ২৭ বৎসরের গার্হস্থ্য লীলার অবসান ঘটাইয়া অতিকষ্টে কাশীতে পৌঁছাইয়া মহাপ্রভুর নিকট ব্যথিত তাপিত জীবের মুখপত্ররূপে তিনটি প্রশ্ন করিলেন, “কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি মোর কৈছে হিত হয় ॥” মহাপ্রভু বলিলেন,—“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥” ধীরে ধীরে সমস্ত তত্ত্ব দুই মাস ধরিয়া শ্রীসনাতনকে শিক্ষা

দিলেন। সাধ্য, সাধন, সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন, কৃষ্ণতত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, জীব, জগৎ, ঈশ্বরতত্ত্ব সমস্ত—যাহা ‘সনাতন-শিক্ষা’ নামে পরিচিত। প্রভু বলিলেন,—তোমাকে যাহা কিছু শিখাইলাম, তোমার হৃদয়ে তাহা স্মুরিত হোক, আর তোমাকে কিছু চিন্তা করিতে হইবে না। জ্ঞান, বুদ্ধি, ভাব সমস্ত তোমাকে কৃষ্ণ যোগাইয়া যাইবেন। কার্য্য আরম্ভ করিলেই দেখিবে,—কৃষ্ণ তোমার চিতে উদ্ভিত হইয়া সমস্তই লিখাইয়া লইবেন। “যবে তুমি লিখ কৃষ্ণ করাবেন স্মুরণ।” আর বিশেষ চারিটি কাজ হইল,—মথুরামণ্ডলে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার কর, বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রচার কর, বৈষ্ণব-আচার ও ভক্তি-স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন কর। শুকবৈরাগ্য ছাড়িয়া জীবকে যুক্ত-বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে বল। শ্রীমন্নহাপ্রভু শ্রীসনাতনের মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক তাঁহাকে শক্তিসম্ভার করিলেন।

সাধারণ জীব সংসারে সামান্য কাম্যকর্ম্ম-সকল লইয়াই ব্যস্ত থাকে ; যাহার ফলস্বরূপ তাহারা অনেক জ্ঞানী-গুণী হইয়াও, এক একজন কর্ম্মবীর-জ্ঞানবীররূপে সাধারণ আধিকারিক দেব-দেবীর আরাধনা করিয়া, পুনরায় কর্ম্মফলে আবদ্ধ হইতেছে। তাহাদের প্রকৃত শ্রেয়োলাভ হইতেছে না ; ফলস্বরূপ শান্তিলাভ হইতেছে না এবং কিছুতেই হতাশা কাটিতেছে না। শ্রীসনাতন গোস্বামী সকল-প্রকার কাম-কামী এবং সকলপ্রকার অধিকারীদের জন্যই যুক্তি এবং বিচার প্রদর্শনপূর্ব্বক দেখাইলেন যে, ভজনক্রিয়ার আরম্ভ যেখান হইতেই হউক না কেন, চরমে কৃষ্ণভজনই মূলকথা। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে তিনি দেখাইলেন,—গোপকুন্ডার কামাক্ষ্যাদেবীর কুপালাভপূর্ব্বক কিভাবে ধীরে ধীরে একের পর এক দেবগণের আশীর্বাদ লাভ করিয়া চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইলেন।

বিভিন্ন ভাব ও ধারা লইয়া বিভিন্ন নদ-নদী বিভিন্ন পথে সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হয় ; তজ্জন্য তাহাদের সকলের অস্তিত্বও বজায় থাকে। সমুদ্রের সন্তুষ্টি বিধানই যেন তাহাদের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। তদ্রূপ বিভিন্ন অধিকারী জীব যেভাবেই থাকুন না কেন, শ্রীসনাতনের সংস্পর্শে আসিলেই, শ্রীকৃষ্ণভজন করাই যে তাঁহাদের একমাত্র কর্তব্য, ইহা বুঝিতে পারিবেন। ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতা, বিভিন্ন আধিকারিক দেবদেবী এবং বিভিন্ন অবতারাди পর্য্যন্ত সমস্তই শ্রীকৃষ্ণেরই বিভিন্ন অংশ এবং বিভূতি, সেইজন্ত ইহাদের প্রত্যেকেই তিনি যথাযোগ্যভাবে সম্মান করিতে শিখাইয়াছেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র স্বয়ং স্বতন্ত্র স্বরাট, তাহাও বুঝাইয়াছেন। ১৪৮০ শকাব্দে তিনি তাঁহার অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করেন।

শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।

স্বয়ং রূপঃ কদা মহং দদাতি স্বপদাস্তিকম্ ॥

শ্রীরূপ রস-কূপ ! সমুদ্র অগাধ জলরাশির অধীশ্বর, অফুরন্ত মণি-মাণিক্যের ভাণ্ডার ; কিন্তু তাহাতে অগণিত হাড়র, কুম্ভীর, তিমি, তিমিঙ্গিলরূপী হিংস্র জীব-জন্তুও বর্তমান । সেইজন্য সমুদ্রের নীচ হইতে বহু বিপদসঙ্কুল শ্রোত এবং ভয়ঙ্কর জলজন্তুসকল অতিক্রম করিয়া রত্নরাজি আহরণ করাও সহজসাধ্য নহে । অনন্ত জলরাশি থাকিলেও তাহা একেবারেই অপেয় । আবার বিভিন্ন নদ-নদীর জলধারা ইহাতে আসিয়া মিশিবার ফলে ইহার মৌলিকতাও নাই । নদ-নদীর জল যদিও বা স্নান ও পান করিবার যোগ্য হয়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে সূর্যের প্রখর তাপে নদী-নাগার জল শুষ্ক হইয়া যায় অথবা প্রচণ্ড উত্তপ্ত হওয়ার কর্দমাক্ত জল স্নান ও পানের একান্ত অযোগ্য হইয়া পড়ে । প্রচণ্ড তাপদগ্ধ তৃষিত মানব সেইজন্য এই নদী, পুকুরিণী বা সমুদ্রের নিকট হইতে মোক্ষাস্থজি বিশেষ কিছু ফল পায় না । এই সময় বৃক্ষাচ্ছাদিত শীতল কূপোদক ওই তৃষার্ত ব্যক্তিকে শান্তি দান করিতে পারে । ইহাতে আবার যদি একটু কপূর মিশ্রিত করা হয়, তাহা পরম উপাদেয় বা তুষ্টিকারক হয় । তাহাতে আবার কোন মিশ্রণের সম্ভাবনাও নাই, সম্পূর্ণ মৌলিক স্নানীতল অবস্থায় ইহা প্রাপ্ত হইয়া যায় । শ্রীরূপগোষামী প্রভু এইপ্রকার সম্পূর্ণ পরিশ্রুত ভক্তিরস-পূর্ণ কূপ । তাহা আবার মধুর রসের মাধুর্য্যে বৈশিষ্ট্যযুক্ত । শ্রীসনাতন গোষামীর অনুজ এই শ্রীরূপ গোষামী । ১৪১১ শকাব্দে ইহার আবির্ভাব । ২২ বৎসর গৃহে থাকিবার পর ইনি গৃহত্যাগপূর্ব্বক শ্রীমন্নহাপ্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন । তাহার পর শ্রীমহাপ্রভুকর্তৃক শিক্ষান্তে এবং তাঁহার আদেশে তিনি শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং সুদীর্ঘ ৫৩ বৎসর সেইস্থানেই অতিবাহিত করেন ।

ভক্তিগুণে শ্রীহরিনামই সাধকের জীবনে সাধন এবং সিদ্ধের নিকট উহাই সাধ্য বস্তু, কিন্তু একজন সাধক ও সিদ্ধের আচার-আচরণ কোনমতেই এক নহে । শ্রীল রঘুনাথদাস গোষামী একজন সাধকের “আদৌ শ্রদ্ধা” অবস্থার যে-সমস্ত প্রক্রিয়া দেখাইয়া ক্রম শুরু করিয়াছেন, শ্রীরূপগোষামী তাঁহার সিদ্ধাবস্থার চরম লক্ষণগুলি পূর্ণভাবে প্রকাশ করিলেন । ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ শাস্ত্রে পাওয়া যায় ; কিন্তু “অগ্ৰাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্মাভিনাবৃতম্ । আনুকূল্যেন কৃষ্ণানু-শীলনং ভক্তিরূপম্ ॥”—ইহা তটস্থা ও লক্ষণরূপে বিভাগ করিয়া ভক্তির এমন পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নিরূপণ করিলেন—যাহার বুঝি আর বিকল্প নাই । শ্রীদাস গোষামী যেখানে সর্ব্বত্র শ্রীরূপ গোষামীর আনুগত্যে সেবা-অভিলাষ করিতেছেন, শ্রীরূপ গোষামী তথায় বলিতেছেন,—“হা দেবি ! কাকুভর-গদগদয়াত্ব বাচ্য, যাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবতুট্টাতি । অশ্রু প্রসাদমবধুশ্রু জনশ্রু কৃতা, গান্ধর্ব্বিকে তব গণে গণনাং

বিদেহি ॥” তিনি কবে শ্রীমতী বার্ষভানবী দেবীর আদেশে তাঁহার কুঞ্জের দ্বারী হইয়া কোন কৃষ্ণ ব্যক্তিকে সেই কুঞ্জে প্রবেশ করিতে বাধা দিবেন এবং সেই কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি কুতাজলিপুটে, চাটুবাণ্ডে তাঁহার নিকট কুঞ্জপ্রবেশের অনুমতি ভিক্ষা করিবেন—ইহাই শ্রীমতী গান্ধারিকার নিকট তাঁহার প্রার্থনা। অতএব এস্থলে আমাদের নিকট বিচার্য যে, ইহা কোন্ অধিকারের কথা এবং সেই অবস্থায় কিরূপ প্রার্থনা জানাইয়াছেন? আমাদের সে ক্ষেত্রে কিরূপ প্রার্থনা স্পর্ধাসূচক এবং কিরূপ প্রার্থনা স্বাভাবিক সাধনা?

যাহা শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট স্বাভাবিক দৈন্ত্য, তাহাই অনর্থগ্রস্ত জীবের পক্ষে স্বাভাবিক স্পর্ধা। শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন দৈন্ত্যের প্রতিমূর্তি। “রামানন্দ-দ্বারে কন্দর্পের দর্পনাশে। দামোদর-দ্বারে নিরপেক্ষ পরকাশে ॥ হরিদাস-দ্বারে সহিষ্ণুতা জানাইল। সনাতন-রূপ-দ্বারে দৈন্ত্য প্রকাশিল ॥ জিতেন্দ্রিয়, নিরপেক্ষ, সহিষ্ণুতা, দৈন্ত্য। এ চারি অবধি ব্যক্ত কৈল শ্রীচৈতন্য ॥” এ দৈন্ত্য গুণবস্ত-জনের নিকট স্বাভাবিক অনঙ্কার হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্র উন্নতোজ্জল-রসের বর্ণনা বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার বিশেষ রচনাবলী হইল,—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, লঘুভাগবতামৃত, হংসদূত, উদ্ধব-সন্দেশ, কৃষ্ণ-জন্মতিথিবিধি, লঘু ও বৃহৎ গণোদ্দেশদীপিকা, স্তবমালা, বিদম্বমাধব, ললিতমাধব, দানকেলী কোমুদী, উজ্জলনীলমণি, প্রযুক্তাখ্য-চন্দ্রিকা, মথুরামহিমা, পদ্মাবলী, নাটক-চন্দ্রিকা প্রভৃতি।

শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীই শ্রীকৃষ্ণ-মঞ্জরী; তিনি সকল গোস্বামিবর্গের, এমনকি শ্রীসনাতন গোস্বামীরও গুরু। শ্রীসনাতন গোস্বামীও তাঁহার আনুগত্যে সেবা করেন এবং তাঁহাকে শিক্ষাগুরু হিসাবেই মান্য করেন। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই পরাৎপরতত্ত্ব,—ইহা বিভিন্নভাবে অগ্ন্যন্ত গোস্বামিগণ-কর্তৃক প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী সেই কৃষ্ণতত্ত্বের উন্নতোজ্জল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রসবৈশিষ্ট্যসকল বিশ্লেষণ করিয়াছেন। দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণ দ্বারকায় পূর্ণ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন মাধুর্য্যাচ্ছাদিত। মথুরায় তিনিই ঐশ্বর্য্য সামান্য শিথিল করিয়া জন্মাদি-লীলাদ্বারা অল্প একটু মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া পূর্ণতররূপে প্রকটিত হইলেন। আবার তিনিই ব্রজ-গোকুলে তাঁহার সমস্ত প্রাভব-বৈভবাদি প্রকাশ ও বিলাসকে আচ্ছাদিত করিয়া সম্পূর্ণ মাধুর্য্যরসের দ্বারা পূর্ণতম-রূপে প্রকটিত হইলেন। ইহা বিদম্বমাধব এবং ললিতমাধবে তিনি বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত গৃঢ় অভিপ্রায় যাহা, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী জগতে ব্যক্ত করিলেন। “অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ, সমর্পয়িতুন্ম উন্নতোজ্জল-রসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ন্ম।” নিজের একান্ত গোপন সম্পদের যে চরম

ঔৎকর্ষ স্বয়ং ভগবান্ দান করিতে আসিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীরূপ প্রকাশ করিয়া দিলেন। “হরিপুরট-সুন্দরহ্যতিঃ কদম্ব-সন্দীপিতঃ, সদা হৃদয়কন্দরে ক্ষুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥” মহাপ্রভু রথযাত্রায় শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন,—“যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরঃ”, শ্রীরূপ তাহারই সমার্থক শ্লোক রচনা করিলেন—“প্রিয়ঃ সৌহৃৎ কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ।” আবার একদিন নীলাচলে শ্রীরূপ নাটক লিখিতেছেন, মহাপ্রভু আসিয়া দেখিলেন,—“তুণ্ডে তাণ্ডবিনী-রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলকয়ে।”

মহাপ্রভু প্রথমে শ্রীরূপের হস্তাক্ষরের স্তুতি করিলেন,—শ্রীরূপের হস্তাক্ষর যেন মুকুতার পাতি, আর এমন অপূর্ব শ্লোক! শ্রীহরিদাস, শ্রীরামানন্দ রায় এবং শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন,—প্রভু! তোমার কৃপা ছাড়া কাহারও পক্ষে এ জিনিস সম্ভব নয়। শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন,—“যোগ্য পাত্র দেখি’ মোর কৃপা উপজিল।” এই কথা মহাপ্রভু আর কোথাও কাহাকেও বলেন নাই। শ্রীরূপমঞ্জরী যোগ্যপাত্র, তাঁহার একান্ত নিজজন। সত্যই ত’ সেই কবির কাব্য-রচনার প্রয়োজন কি, তাহা যদি অত্নের হৃদয় আন্দোলিত হইয়া আনন্দে তাহাকে অভিভূত না করে? সেই ধনুর্ধারীর বাণ নিক্ষেপেই বা প্রয়োজন কি, তাহা যদি অত্নের হৃদয়ে লগ্ন হইয়া তাহার মূর্ছা না ঘটায়?

শ্রীরূপকে মহাপ্রভু আলিঙ্গন করিলেন এবং শ্রীরূপের দ্বারা সকল ভক্তের চরণ বন্দনা করাইলেন। বলিলেন,—দেখ, গ্রন্থ কেমন মধুর, সাবলীল ও সালঙ্কার হইয়াছে। কবিত্ব থাকিলেই ত’ রসপ্রচার হইবে। দোলযাত্রার পর শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরূপকে বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করিলেন। বলিলেন,—শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শাস্ত্রদৃষ্টো লুপ্ততীর্থের উদ্ধার কর, কৃষ্ণসেবা, ভক্তিরস প্রচার কর।

শ্রীবৃন্দাবনে মাধুকরী ভিক্ষা, অনির্দিষ্ট তরুতলবাস, করঙ্গ আর কন্বা শয়ল। সর্বক্ষণই নামসঙ্কীর্ণন এবং ভজনাবেশে প্রেমোন্মত্ত। শ্রীসনাতন গোস্বামীর অন্তর্ধান-তিথির ২৭ দিন পরে ১৪৮৬ শকাব্দে তিনি নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

—শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

জীবের কৃত্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৭ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণ ও জীবে ভেদাভেদ কেন ? কৃষ্ণ হতে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব নেই বলে বিভিন্নাংশ জীব কৃষ্ণ হতে ভিন্ন হলেও অভিন্ন। জীব ও কৃষ্ণ পরস্পর ভেদ এবং অভেদ ; জাতিতে অভেদ, কিন্তু পরিমাণগত ভেদ। ভগবানের অগুণাক্তি চিহ্নকণ জীব কখনও পূর্ণ চিত্তস্ত ভগবান্ হতে পারে না। কৃষ্ণ স্বাধীন, স্বতন্ত্র,—আর জীব তাঁর অধীন। জীব মায়াবশযোগ্য, আর ভগবান্ কৃষ্ণ মায়াধীশ। এস্থলেই জীব ও কৃষ্ণে ভেদ। এইভাবে কৃষ্ণ ও জীবের মধ্যে যুগপৎ ভেদাভেদ সম্বন্ধ রয়েছে।

একমাত্র মায়াধীশ কৃষ্ণ ব্যতীত এই মায়িক জড় জগতের প্রভু কেউ হতে পারে না। জীব যদি মায়াধীশ কৃষ্ণের দাস-অভিமான উদ্বুদ্ধ থাকে, তাহলে মায়া তাকে স্পর্শ করতে পারে না। মায়া হতে জীব সৃষ্টি হয় নি। তাই জীব এ জগতের বস্তু নয়। মায়ার সঙ্গে জীবের বস্তুতঃ কোন সম্বন্ধ নেই। জীব কৃষ্ণেরই নিত্য দাস—এতে সন্দেহ নেই। শাস্ত্র বলেন,—

“নাস্তি দাস্যং পরং শ্রেয়ো নাস্তি দাস্যং পরং পদম্।

নাস্তি দাস্যং পরো লাভো নাস্তি দাস্যং পরং সুখম্॥”

(হরিভক্তিকল্পলতিকা)

অর্থাৎ—“কৃষ্ণদাস্তোর ন্যায় এমন মঙ্গল আর কিছু নেই, কৃষ্ণদাস্তোর ন্যায় এত লাভ আর কিছুতে হয় না এবং কৃষ্ণদাস্তোর ন্যায় এত সুখও আর কিছুতে নেই।”

অজবস্তু জীবের আত্মার) জননী নাই

জীব অজ অর্থাৎ জীবের জন্ম নেই। মনকে যদি জীব বলা যায় তাহলে তার উপর অজত্ব আরোপ করা যায় না। কারণ মনের সৃষ্টি হয়েছে। জীব বা আত্মা কখনও মনের সঙ্গে এক নয়। জীবের জন্ম নেই বলা হয়েছে কেন ? পূর্ণ সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ কৃষ্ণের অংশ দ্বিবিধ, যথা—স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। স্বাংশ বিষ্ণুত্ব অর্থাৎ স্বাংশরূপে তাঁর রাম, নৃসিংহ, বামন, কৃষ্ণ, বরাহদেব প্রভৃতি অবতার প্রকাশিত। আর জীবগণ বিভিন্নাংশ হেতু তাঁর নিত্য দাস এবং তিনিই জীবগণের নিত্য প্রভু। তাঁর বিভিন্নাংশগত তত্ত্বস্বরূপ জীবসমূহ দুই প্রকার—নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। নিত্যমুক্ত দশাপ্রাপ্ত জীবগণ মায়া-সম্বন্ধ-শূন্য হয়ে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের আশ্রিত। আর নিত্যবদ্ধ জীবগণ কৃষ্ণ-বহির্ভূতাবশতঃ

মায়া প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে নিজ সুখদবোধে আকর্ষণ করে স্ব-স্ব-কৰ্ম্মানুসারে বাসনানুযায়ী বিভিন্ন দেহ ধারণ করে মায়িক জগতে পরিভ্রমণ করছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্তৃক সনাতন-শিক্ষায় আমরা জানতে পারি,—

“স্বাংশ বিস্তার চতুর্বাহ অবতারগণ।

বিভিন্নাংশ জীব তাঁ’র শক্তিতে গণন ॥

সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত’ প্রকার।

এক নিত্যমুক্ত, এক নিত্য সংসার ॥

নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণ-চরণে উন্মুখ।

কৃষ্ণ পার্শ্বদ নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ ॥

নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহিস্মুখ।

নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২-১২)

ভগবানের চিহ্নতির অতি সূক্ষ্ম অণু অংশ বিভিন্নাংশ জীব। আবার এই জীবশক্তি তটস্থা শক্তি হওয়ায় চিহ্নতি ও মায়াশক্তির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। মায়াশক্তির সাথে জীবশক্তির কোন সম্বন্ধ নেই। কেননা মায়াশক্তি চিহ্নতির ছায়া হওয়ায় জড় বা অচেতন। আর জীব চিহ্নতি বা পরা প্রকৃতির পরমাণু হওয়ায় চেতনময় ও জ্ঞান-গুণসম্পন্ন বস্তু। জীবের কৃষ্ণ-বহিস্মুখতা-দোষ হলেই মায়াশক্তি জীবকে আকর্ষণ করে মায়িক জগতে নিক্ষিপ্ত করে। কিন্তু নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ (নিত্য সংসার) দুই প্রকারের জীব আছেন। নিত্যমুক্ত জীবগণ অনাদিকাল হতে কৃষ্ণোন্মুখতা-বশে মায়াশক্তি দুর্গাদেবীর আকর্ষণে কোন সময়েই বদ্ধ হন নি। অর্থাৎ অনাদিকাল হতে কখনও কৃষ্ণ-বহিস্মুখ হন নি। সেই নিত্যমুক্ত কৃষ্ণ-পার্বদগণ সর্বদা কৃষ্ণ-সেবায় মগ্ন আছেন, যেমন—গরুড়াদি। আর কৃষ্ণ-বহিস্মুখ অপরাধী নিত্যবদ্ধ জীবগণ মায়ার দ্বারা পরাভূত হয়ে অনাদিকাল ধরে সংসারী হয়ে দুঃখ ভোগ করছে। নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ—উভয়প্রকার জীবের মধ্যে মায়াতীত নিত্যমুক্ত জীবগণের জন্মদাত্রী বা জননী কি মায়াদেবী হতে পারেন? মায়াদেবীর সাধ্য নেই যে, কৃষ্ণ-পার্বদ নিত্যমুক্ত জীবগণকে স্পর্শ করেন। আর মায়াবদ্ধ জীবগণ মায়িক কালের পূর্ব হতেই কৃষ্ণ-বহিস্মুখতারূপ অপরাধ করায় অনাদি বহিস্মুখ বলে শাস্ত্রে তিরস্কৃত হয়েছেন।

“কৃষ্ণ ভুলি’ সেই জীব অনাদি বহিস্মুখ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭)

ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, চিজ্জগৎ ও মায়িকজগতের সন্ধি-সীমায় অবস্থান-

কালে জীবের জড় ভোগবাসনা উদ্ভিত হওয়ায় জীব মায়াবদ্ধ হয়েছে। নিত্যবদ্ধ জীবগণ মায়াকে ভোগায়তনরূপে গ্রহণ করার পূর্বেই কৃষ্ণের বিভিন্নাংশরূপে উদ্ভিত হয়েছিল। তাই নিত্যবদ্ধ জীবগণেরও জননীরূপে মায়াকে স্বীকার করা যায় না।

পূর্ণতম সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ কৃষ্ণ অজ বা জন্মরহিত। তিনি স্বয়ং বলেছেন,— “অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মমায়য়া ॥” (গীতা ৪।৬)

অর্থাৎ—আমি জন্মরহিত, অব্যয়স্বরূপ, সর্বভূতগণের ঈশ্বর হয়েও নিজ শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে বা স্বীয় চিচ্ছক্তিকে স্বীকারপূর্বক যোগমায়ার আশ্রয়ে আবিভূত হই।

ভগবান্ অজ বলেই তাঁরই বিভিন্নাংশ শক্তি জীবও অজ। ভগবান্ বিভূ সচ্চিদানন্দ, আর জীব অণু সচ্চিদানন্দ; এজন্ম উভয়ের উপাদান একই জাতীয় এবং উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধও নিত্য। কিন্তু মায়াশক্তির উপাদানগুলি সচ্চিদানন্দ বস্তু নয়। মায়াশক্তির পরিণাম পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়াদি উপাদানদ্বারা জীবের আকারযুক্ত দেহ গঠন হলেও ঐ দেহ নিত্য নয়; তবে দেহের উপাদানগুলির নিত্যতা আছে। দেহ ধ্বংস বা নাশ হয়ে গেলে উক্ত উপাদানগুলি অন্য আকারে প্রকৃতিতে থাকে; আবার প্রলয়কালে তথা ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হলে উপাদানগুলি অন্য আকারে মহত্ত্বে থাকে। এজন্ম দেহের আকার ও ব্রহ্মাণ্ডের বাস্তবতা নেই। তবে মায়াশক্তি চিচ্ছক্তির ছায়া হওয়ায় মায়াশক্তির বাস্তবতা আছে। মায়ার উপাদানগুলির কোন অংশই জীবের (আত্মার) উপাদানগুলির মধ্যে নেই। জীব (আত্মা) মায়া থেকে উদ্ভূত হলে মায়ার উপাদান জীবের মধ্যে অবশ্যই থাকত। কিন্তু তা কোন অংশেই নেই। তাই মায়ার সঙ্গে জীবের স্বরূপতঃ কোন সাদৃশ্য নেই এবং সম্বন্ধও নেই। যাঁরা মায়াশক্তি বা ভুবন-পুঞ্জিতা দুর্গা-দেবীকে জীবের (আত্মার) জননী বলেন, তাঁদের ধারণা ভ্রান্ত। কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ, শক্তি ও নিত্যদাস জীবের জননীই বা কিরূপে থাকবে? শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর “জৈবধর্ম্য” গ্রন্থে লিখেছেন,—“জীবের সত্তায় মায়ার গন্ধ নেই। জীব-স্থিতিতে মায়ার অধিকার নেই—জীব অণু হলেও মায়ার পরতত্ত্ব।”

মায়া ও জীব জড়ীয়কালের পূর্ব হতেই আছে। জীব কৃষ্ণের নিত্যশক্তিগত তত্ত্ব। তটস্থ শক্তিসম্ভূত জীব কৃষ্ণ-বৈমুখ্যবশতঃ মায়াবদ্ধ হয়ে যে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি প্রাপ্ত হয়েছে, তাহা অপরা প্রকৃতি বা মায়া হতেই জাত। গীতায় ভগবান্ বলেছেন,—বদ্ধজীবের বিকারসকল অর্থাৎ দেহ-ইন্দ্রিয়গুলি এবং গুণসকল অর্থাৎ

শোক-দুঃখ-মোহাদি জড়া প্রকৃতি সত্ত্বত, জীবের স্বধর্মগত তত্ত্ব নয় ; যথা—
 “বিকারাংশ গুণাংশৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সত্ত্বান্” (গীতা ১৩।২০) । ভুবন-পূজিতা
 দুর্গাদেবী ভগবানের জড়া প্রকৃতি । ভগবদীক্ষণশক্তি সঞ্চারিত হয়ে সেই শক্তি-
 বলে দুর্গাদেবী জড় বিশ্ব ও চিৎ স্বরূপ জীবের পঞ্চভূতাত্মক দেহাদি সৃষ্টির গৌণ
 কারণ মাত্র । পরমেশ্বর কৃষ্ণই তার মূল কারণ । জড়াপ্রকৃতি দুর্গাদেবী জড়বস্তু
 সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ হওয়ায় তিনি জড় বস্তুগুলির জড়া জননী বলে পরিচিত হতে
 পারেন, কিন্তু চিৎকণ জীবসমূহের জননী নন ।

চিৎস্বরূপ জীবের জড় দেহ প্রাপ্তি ও মায়াবদ্ধ দশা

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টলীলায় পরমাত্মাস্বরূপ, জীবশক্তি ও মায়াক্রিয়াকার্য্য
 পরিলক্ষিত হয় । মধুর রসের বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ । তাঁর
 লীলার সহায়কারী দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীবলরাম মূল সঙ্কর্ষণ । শ্রীবলরামই সঙ্কর্ষণ,
 কারণাক্ষিশায়ী গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও শেষদেব—এই পঞ্চরূপ ধরে কৃষ্ণ-
 লীলার সহায়তা করেন । শ্রীবলদেবের অংশাংশ পুরুষাবতারত্রয় তথা কারণাক্ষিশায়ী
 গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী—এঁরা মায়ী ও জীবের সঙ্গে কৃষ্ণাজায় মহাসঙ্কর্ষণের
 আশ্রয়ে জগৎসৃষ্টিাদি সেবা-কার্য্য করেন । পুরুষাবতারত্রয় ব্যতীত আর একজন
 করুণাবতার শেষদেব আছেন । এঁরা সকলেই মায়ার গুণের খেঁচে উর্দ্ধে অবস্থিত ।
 এঁরা মায়ার সঙ্গে থাকলেও মায়ার গুণ এঁদের স্পর্শ করে না । শেষদেব দশ মূর্তি
 ধারণ করে সর্বেশ্বরদ্বয়ের দ্বারা কৃষ্ণ-সেবা করেন ।

“ছত্র, পাত্ৰকা, শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ ।

আরাম, আবাস, যজ্ঞত্বত্র, সিংহাসন ॥

এত মূর্তি-ভেদ করি’ কৃষ্ণ-সেবা করে ।

কৃষ্ণের শেষতা পাঞা ‘শেষ’ নাম ধরে ॥”

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১২৩-১২৪)

ইনিই আবার অনন্তদেব নামে সহস্র ফণার এক ফণায় পঞ্চাশ কোটি যোজন
 এই ব্রহ্মাণ্ডকে নিজ মস্তকের উপর ক্ষুদ্র সর্ষপের গ্রায় ধারণ করে আছেন ।

“পঞ্চাশৎ কোটি-যোজন পৃথিবী-বিস্তার ।

যার এক ফণে রহে সর্ষপ-আকার ॥ (চৈঃ চৈঃ আঃ ৫।১১৯)

“ব্রহ্মাণ্ড-প্রমাণ পঞ্চাশৎ কোটি-যোজন । ” (চৈঃ চঃ আঃ ৫।৯৭)

পৃথিবী বলতে এস্থলে ব্রহ্মাণ্ডকেই বলা হয়েছে । ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দশ স্তর আছে ।
 এই চতুর্দশ স্তর হচ্ছে পঞ্চাশ কোটি যোজন । ব্রহ্মাণ্ডের সর্বনিম্নে শেষস্তর
 পাতালে অবস্থানপূর্ব্বক মহাবীৰ্য্য প্রভাবশালী শ্রীঅনন্তদেব শেষনাগ পালনেচ্ছায়
 অবলীলাক্রমে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে আছেন ।

“এবং প্রভাবো ভগবাননন্তো হ্রস্বতবীৰ্য্যোৰুণাভুভাবঃ ।

মূলে রসায়ঃ স্থিত আত্মতত্ত্বো যো লীলয়া স্মাং স্থিতয়ে বিভক্তি ॥”

(ভাঃ ৫।২৫।১৩ ধৃত চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৫৭)

অর্থাৎ—“এতাদৃশ বীৰ্য্যসম্পন্ন অপরিমেয়-বলশালী মহাশক্তিপ্রভাববান্ সেই ভগবান্ অনন্তদেব নিজেই নিজের আধার হয়েও রসাতলের মূলদেশে অবস্থিত থেকে এই পৃথিবীর রক্ষণ বা পালনের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে উহাকে ধারণ করেছেন ।”

“সহস্র-বদনে য়েহো শেষ-সঙ্কর্ষণ ।

দশ দেহ ধরি’ করে কৃষ্ণের সেবন ॥” (চৈঃ চঃ আঃ ৬।৭৬)

নিরুপাধিক বিস্তৃত সত্ত্ব শেষদেব অনন্তদেব-নামে কোথায় বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে আছেন, তাহা নোপাধিক দেবগণও জানেন না । আমরা মায়িক জড়ভোগী হয়ে তাঁকে কি জানতে পারি ?

শাস্ত্রমতে তিনি চতুর্দশ ভুবনই অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে পাতালে অবস্থান করছেন । ভাঃ ৫।২৫।১ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—“তস্য মূলদেশে ত্রিংশদ্যোজনসহস্রান্তর আস্তে য়া বৈ কলা ভগবতস্তামসী সমাখ্যাতা অনন্ত ইতি”—অর্থাৎ—“পাতালের তলদেশে ত্রিংশৎসহস্রযোজন অন্তরে ভগবানের এক তামসী কলা আছেন, তাঁর নাম—‘শ্রীঅনন্ত’ । (বস্তুতঃ এই মূর্তি—বিস্তৃতসত্ত্বময়ী ; তমোগুণাবতার রুদ্রের অন্তর্ধ্যামিরূপে বিশ্বের সংহারাদি করেন বলে এই মূর্তি—তামসী নামে আখ্যাত ।) সুতরাং এই ব্রহ্মাণ্ডস্থিত সূর্য্য, চন্দ্র, সমুদ্র, পর্ব্বত প্রভৃতি সকলই শ্রীঅনন্তদেবের মস্তকে সর্ষপের মত শোভমান ।

পুরুষাবতারত্রয় ও শেষদেব—এঁরা সকলেই কৃষ্ণ-ভক্ত ও কৃষ্ণের ইচ্ছায় কার্য্য করেন ।

“ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে ।’

সেইভাবে অনুগত তাঁ’র অংশগণে ॥

তাঁ’র অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ ।

ভক্ত বলি’ অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ ॥

* * *

সঙ্কর্ষণ-অবতার কারণাক্ষিপায়ী ।

তাঁহার হৃদয়ে ভক্ত-ভাব অনুযায়ী ॥

* * *

পৃথিবী ধরেন যেই শেষ-সঙ্কর্ষণ ।

কাগ্যব্যহ করি’ করেন কৃষ্ণের সেবন ॥

এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার ।

নিরন্তর দেখি সবার ভক্তির আচার ॥”

(চৈঃ চঃ আঃ ৬।৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯০-৯৪)

আদি পুরুষাবতার কারণাক্ষিশায়ী বিষ্ণু জড়রূপা প্রকৃতির বা মায়াশক্তির অন্তর্ধামী । ইনি একা অনন্তকোটি জগৎ সৃষ্টির কারণ । কারণাক্ষিশায়ী বিষ্ণুর অংশ গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু বহু মূর্ত্তি ধারণ করে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক মূর্ত্তিতে প্রবেশ করেছেন । ইনি প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে নিজ স্বৈরাঙ্গ জলে ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধেক পূর্ণ করে তথায় সেই জলে শেষোপরি শয়ন করতেন । ইনি প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ধামী পরমাত্মা । গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে এক পদ্মের জন্ম হয় । সেই পদ্মই ব্রহ্মার জন্মস্থান । গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু হতেই ব্রহ্মা প্রকটিত হন ।

“তাঁ’র নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম ।

সেই পদ্ম হৈল ব্রহ্মার জন্ম-সদম ॥

সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন ।

তৈঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন ॥”

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১০২-১০৩)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

ভবঘুরের ভণিতা

বহুরের শুরুতেই এমন কাণ্ড ! হাপি-নিউ-ইয়ারের প্রথম দিনে একটু হাপি হতে চিড়িয়াখানায় গেলাম—আর সেইখানেই যত হাপা । আর বলবেন না—দুজন দুর্জন শিবা নামের একটা বাঘকে মালা পরাতে গিয়েছিল । আর পায় কে—শিবা একজনকে ফালাফালা, আর অণ্টটাকে ছাল ছাড়িয়ে দিয়েছে । আর আমরা যারা এতক্ষণ ধরে দুই টারজানের জানের লড়াই হা করে দেখছিলাম, পরে সেই আমাদের হাপি-তাপিও দেখার । গণপিটুণীতে হাত দাক্ষণ পাকিয়ে ফেলেছি—তাই এখন শিবাকে পাকড়াও করে, চোখ তুলে, দাঁত উপড়ে, শেষে কেরোসিনে চান্ন করিয়ে দেশলাই মেরে দিলেই হল । কিন্তু ভাগ্যিস ! পুলিশ ছিল, আর ছল আকাশ উচু তার-কাঁটার বেড়া—নতুবা বাছাধন একেবারে টোস্ট হয়ে যেত ।

বাঘের সাথে মানুষের কাইট অবশ্য এই প্রথম না। ঠাকুরদার মুখে ছোটবেলায় এমন কাহিনী বহু শুনতাম। এক সংস্কৃত পণ্ডিত তার মূর্খ-পড়শীদের হাজার নিবেদন সত্ত্বেও একলা বনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার গৌ ধরেছিল। কারণ ব্যাঘ্র—বিশেষরূপে ঘ্রাণ নেবেন মাত্র। কিন্তু সেই ‘বিশেষ’ মানে যে একেবারে কল্জের ঘ্রাণ—তাতো আর পণ্ডিতের ব্যাকরণে খোলতাই করা নেই। ব্যাস্ পণ্ডিত বিশেষরূপে শেষ হয়ে গেলেন। আবার এক বুড়ো বাঘের কথাও গল্পে পড়েছি। সে সোনার বালা হাতে নিয়ে রাস্তার ধারে বসে থাকত। আর সেই বালা দেখিয়েই ডেইলী প্যাসেঞ্জারদের আকর্ষণ করত—একেবারে নিজের পাকস্থলী পর্যন্ত।

কিন্তু শিবা না ছিল সেই সোনার বালাওয়ালা বুড়ো বাঘ, আর না ছিল ওরা সেই সংস্কৃত পণ্ডিত। তবে? বুঝলাম—“জীবে প্রেমের যে ফুরফুর বাতাস—তাতো ওদেরও ভিতরে স্রব্ধ করে উঠেছিল। আর তাতেই মালা নিয়ে এ্যাড্‌ভ্যাঞ্চার—শেষে হলো ম্যাসাকার। তবে আর যাই হোক—শিবের কিন্তু নিউ ইয়ার্‌টা বেশ ভালই জমেছিল। এটাও বা জীবে প্রেম নয় কেন? এমন আত্মাহুতি তো প্রেম থেকেই হয়!

আসলে প্রেমের বাজারই এখন রমরম। তার উপর ‘জীবে প্রেমের’—সুপার কাটিতি। ‘প্রেম’ যেন টেবিল-সন্ট—যার যেমন দরকার, একটু ঝাঁকিয়ে বের করে নেও। তারপর অস্থলে ঝোলে সর্বত্র মিশিয়ে বেশ মুখরোচক করে তোলো। এখন শুধু রোচকতা নিয়ে কারবার, শেষে বদহজম হয় হোক।

আরও মজার লাগে যখন দেখি, মুরগী-মসলা, কি পাঁঠা-প্রিপারেশন্‌ সব ঝেড়ে দিতে দিতে বাবুরা (মহারাজরা) ‘জীবে প্রেমের’ বুলি আওড়ান। আর ডিম, মাছ? ওরা তো এখন নিরেমিষ। এখন বিজ্ঞানের বিশেষ যুগ চলছে। শাস্ত্র নয়, কম্পিউটারই এখন ঠিক করে দেবে কোন্‌টা আমিষ আর কোন্‌টা নিরামিষ। ‘জিভে প্রেম’ যুগসই না হলে ‘জীবে প্রেম’ কেমন জানি পান্সা পান্সা।

ঈশ্বর-সেবার এমন সহজ রাস্তা চৈতন্যেও মালুম হয়নি, যা বিবেকে হয়েছে। আর তার এমন হাইব্রিড্‌ ফলন যে, মানুষ একেবারে চেটেপুটে সেবা করছে। আমিও বাদ যাইনি—প্রেমে ডগমগ হয়েছি। কিন্তু বাধ সাধলেন ঠাকুরদা। বললেন, —“হা রে, প্রেম ছাড়া আর কি কোনও শব্দ নেই তোদের ডিক্সনারীতে? স্নেহ, বন্ধুত্ব, সম্মান, সহানুভূতি, দয়া—এসব কি কন্‌সিন্‌কালেও শুনিস্‌ নি? সবার সাথেই যদি প্রেম হতো, পিতা-পুত্র, স্ত্রী-কন্যা, প্রভু-ভূতা সব এক হয়ে যেত। আর ‘প্রেম’ অত্যন্ত গুরু-গম্ভীর কথা। সব জায়গায় তা লাগিয়ে ওঁকে খেলো করে দিস্‌ নে। প্রেম আর স্নেহ কোনদিন এক না। স্নেহের মধ্যে

প্রেম নেই, তবে আবার প্রেমের মধ্যে স্নেহ, বন্ধুত্ব সব আছে। যেমন ১০০ এর মধ্যে ৯০, ৮০, ২০ সব আছে, কিন্তু ২০-এর মধ্যে ৫০ নেই, বা ৫০-এ ১০০ নেই। তেমনই, প্রেম হচ্ছে পূর্ণ—এইজন্ম একমাত্র ভগবানের জন্মই তা রিজার্ভড্ হয়ে আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে এসব খুব সুন্দরভাবে বলা আছে। এমন কি সেই ভগবানের সাথে যারা প্রেমে আবদ্ধ, তাঁদের মধ্যে পরস্পর ‘মৈত্রী’রই সম্পর্ক—সেখানেও ‘প্রেম’ বলা হয় না। আর সেখানে আমরা সাধারণ জীব—যারা ভগবান্ তো দূরে থাক, নিজের খবর পর্যন্ত জানি না—কে আমি, কোথা থেকে এসেছি, কেন এসেছি, কোথায় যাবো, সেই আমাদের উপর ‘দয়া’ মাত্রই চলে—প্রেম তো নয়ই। নিজের সুখের জন্ম যা কিছুই হোক না কেন—শ্রেফ ‘কাম’—প্রেমের ঠিক উল্টো।”

তা জানলাম,—মুড়ি-মিছুরী একাকার করতে নেই। চিলে কাণ নিয়ে গেছে শুনে ওর পিছনে ভাগা যে কত বোকামি, তা নিজের কাণ মলে বুঝতে হয়। তবুও কি মোহ যায়? কারণ, মেজরিটির যুগ চলছে। দশচক্রে ভগবান্ ভূত। সেখানে যুক্তি শক্তিহীন। গণ-গড্ডালিকার শ্রোতে মিশতে না পারলে সংখ্যালঘু হয়ে যেতে হবে। আর সাধ করে কেই বা সেই লঘুত্বের হাঙ্গামা পোহাতে চায়?

‘দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা’ বলেও ফেমাস্ আর এক আইটেম্ আছে। তাতে সেবক-মশাই লাল হয়ে যায়—কিন্তু নারায়ণদের আর দারিদ্র্য ঘুচে না। কিন্তু ওদের জন্ম সবারই দরদ—প্রেম। তবুও ওদের ভাগ্য ফেরে না। আর এই সেবাও কেমন সহজ—নারায়ণদের একবেলা ভরপেট খিচুড়ি থাইয়ে দিলেই হল। পিছন দিকের নারায়ণরা আবার একটু বেশী হতভাগা। ওদের কাছে আসার আগেই মাল হাণিস্। শুরু হয়ে যায় থেয়োথেয়ি—ওদিকে সেবকজী গায়েব। আর হবেই বা না কেন? ওদের খাঁ মিটাতে গেলে নিজেরাই যে খালি হয়ে যাবে।

কিন্তু বৈকুণ্ঠের নারায়ণ এদের থেকে একেবারে তফাত্। তিনি ষড়ৈশ্বর্যের একচ্ছত্র মালিক—সমস্ত জীবের প্রভু। আর ওঁর সেবা করাও আবার চাটি খানিক কথা নয়। কেবল কলা-বাতাসায় তাঁর নাপসন্দ—ফুল্ সারেগুর্ না হলে সেবা নেবেনই না—রিজেক্ট হয়ে আসবে—তা তিনি যতই টাটা, বিড়লা হোন না কেন। তার উপর তিনি অন্তর্ধামী—ভাবগ্রাহী জনার্দন, সব টের পেয়ে যান। ডুবে ডুবে জম খাওয়ার কোন উপায়ই নেই। সেখানে ওঁর দারিদ্র্য মানে কাঁঠালের খাঁটি আমসত্ত্ব।

আর এখানে ব্যাপারটাই অগ্ররকম। সমন্বয়ের উদার বাঁঝালো হাওয়া বইছে। ‘যত্র জীব তত্র শিব’—করে স্বয়ং শিবঠাকুরকেও বুড়ো আঙুল না দেখালে

সময় নিৰ্ভেজাল হয় না। আর তাই সিপাইকে রাজার সাথে ল্যাঙ্গে-গোবরে করে ফেলেছি। আর বোকা সিপাইও এতে গলে গিয়ে বুকের ছাতি ফুলিয়ে একসা। অবশ্য বেশী পারে না—তাতে ব্যাঙকাটা হয়ে যাবে। আর তাও রাজার শৌর্য-বীর্যের কাছে আসলে—টুপি মাটিতে ধরাশায়ী, আর ছাতি ফুল হয়ে সেই আমসি।

ওদিকে নারায়ণের দাসেরা কিন্তু একেবারেই আলাদা। ওঁরা বলেন,—“জীব মাত্রই নারায়ণের সেবক, কিন্তু জীবকে নারায়ণ জানে সেবা মস্ত অপরাধ— একেবারে রাজদ্রোহিতা।” আর ওঁরা প্রতি কথায় গীতা-ভাগবত থেকে কেমন কোটেশান্ দেন, বলেন,—“শাস্ত্র প্রমাণ না হলে সব ফালতু। শ্রুতি-স্মৃতি যদি প্রমাণই না হবে, তবে তোমার বচনেরই বা কি প্রমাণ?” সত্যি—লাখ কথার এক কথা বটে।

দয়া আর সেবার মধ্যেও ওঁদের কেমন চুলচেরা বিচার। একজন ধনীই পারে ধন দিয়ে নিৰ্ধনকে দয়া করতে। আর নিৰ্ধন কার-মনো-বাক্যে ধনীকেই সেবা করবে। তাই বলে ধনী মানে ওঁরা কিন্তু টাকার কুমীর কিংবা নিৰ্ধন বলতে ঐ ব্যাঙের আধুলি বলেন না। কারণ এ জগতের যে ধন—তা না থাকলে জালা, থাকলে আরও জালা। ধন হোতো—কৃষ্ণপ্রেম যায়সা। ওঁরা বলেন,—“শরীরে ফোড়া হলে ফুঁ দিয়ে ব্যথা সারান হাস্তকর। মলম কিংবা পেনিসিলিন্ মেরে কয়েকদিন হেসে লাভ নেই, পরে আরও কাঁদতে হবে। একেবারে বীজ আউট না হলে সব বেকার।”

তাই কেবল ফুড্-রিলিফেই কেলা ফতে হয় না। কৰ্মবীরদের বাহাদুরীতে যে কষ্টলাঘব হয়, তা পানাতরা পুকুরে ঢিল ছোড়ার মত—কাজের কাজ কিস্তি হয় না। পারমার্থিক সমাধান ছাড়া এর দাওয়াই নেই-ই। আর সে সমাধান ধীর হয়েছে—তিনি নিঃসন্দেহে মহাভাগ্যবান্। তখন জগতের তাবৎ ধনজনের এক-চেটিয়া ভোক্তা হিসাবে ভগবান্কে জানতে পারেন। ‘আমি, আমার’—ভূয়ো মালিকানা ছেড়ে তিনি একেবারে ঝাড়া হাত-পা। কৃষ্ণপ্রেম-ধনের লোভে জগতের বেবাক আকর্ষণ রীতিমত ফিকে। শাস্ত্রে বলছেন—ওঁরাই খাটী ধনী। আর এদেরকে নিৰ্ধন ঠাওরে যদি কেউ দয়া করতে যায়, তবে নিৰ্ধাত তাকে বেকুব বনে যেতে হবে। বরং ওঁদের সেবা করার সৌভাগ্য হলে সেই হৃদয়-কোঠরের দুই একটা রত্ন যদি মিলে যায়, তবেই ব্যস, কয়েক গুপ্তি বর্তে যাব। আর একেই তো বলে দয়ার মত দয়া।

ভগবানের সাথে যাদের সেই প্রেম হয়েছে—সমস্ত দেব-দেবী ওঁদের উপর শ্রাটস্ ফায়েড্। আর এখানকার স্থাবর-জঙ্গম—বহুপেয়ে-চারপেয়ে-দুপেয়ে যাবৎ

প্রাণী তাঁদের কাছে বশীভূত। সেই ঝারিখণ্ডের বনে মহাপ্রভুর কথা থাকলই বা ফাইল চাপা—উনি স্বয়ং ভগবান, সব পারেন। কিন্তু মুনি-ঋষিরাও সেই গা হুম্‌হুম করা বনে-জঙ্গলে যে হরিভজ্ঞন করতেন, শুধু তার প্রভাবেই বাঘে-হরিণে মিলেমিশে এক ঘাটে জল খেত। এর জন্ত মালা নিয়ে আলাদা করে পশুভজ্ঞন করতে হয়নি। ঐ মালা আসলে শিবের জন্ত গলায় ছুরি ধরার সমানই হয়েছে। বেচারি শিবা—‘জীব শিব’ থিওরীটা একদম বুঝলো না।

—জ্ঞান-কর্ম-রহিতানন্দ দাস

শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১২ পৃষ্ঠার পর]

ইতীদৃক্ স্ব-লীলাভিরানন্দ-কুণ্ডে স্ব-ঘোষণা নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।

তদীয়েশিতজ্জেষু ভকৈর্জিতত্বং পুনঃ প্রেমতন্তং শতাবৃতি বন্দে ॥

যিনি এইপ্রকার শৈশব-লীলাধারা গোকুলবাসী জনমাত্রকে আনন্দ-সরোবরে নিমগ্ন করিতেছেন এবং ভগবদৈশ্বর্য-জ্ঞানপর ভক্তসকলে আমি তত্ত্বকর্তৃক জিত—ইহাই প্রকাশ করছেন, আমি প্রেমহেতু পুনর্বার সেই ঈশ্বরকে শতবার বন্দনা করি।

বরং দেব! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিঃ বা ন চাত্মং বৃণেহং বরেশাদপীহ।

ইদন্তে বপুর্নাথ! গোপাল-বালং সদা মে মনস্তাবিরাস্তাং কিমন্তে: ??

হে দেব! আপনি সকল বরদানে সমর্থ, আপনার নিকট মোক্ষ অর্থাৎ চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষের অবধি বৈকুণ্ঠলোক কিংবা অণ্ড শ্রবণাদি ভক্তিপ্রকার সকলকে বর বলে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করি না। যদি বলেন,—তবে তুমি কি বর গ্রহণ করবে? তার উত্তরে, প্রার্থনা এই যে—হে নাথ! এই বৃন্দাবনে এইরূপে বর্ণিত এই বালগোপালরূপ বপু আমার মনে সর্বদা আবিভূত হউক, অর্থাৎ সর্বদা অন্তর্ধামিত্ব-রূপে অবস্থিত হয়ে থাকলেও সাক্ষাতের ত্রায় সর্বান্ন সৌন্দর্যাদি প্রকাশদ্বারা প্রকট হউন। অণ্ড মোক্ষাদিতে আমার প্রয়োজন নাই।

ইদন্তে মুখাস্তোজমব্যক্ত-নীলৈবৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ-রক্তৈশ্চ গোপ্যা।

মুহুশ্চুস্থিতং বিশ্ব-রক্তাধরং মে মনস্তাবিরাস্তামলং লক্ষ লাতৈঃ ॥

হে দেব! আপনার বপুর্ মध्ये বিশেষতঃ তদীয় বদনকমলের মাধুর্য আর কি বলব, যা পরমশ্যামল, স্নিগ্ধ, রক্তবর্ণ অলকাসমূহে আবৃত, গোপী যশোদা আপনার

যে মুখপদ্মস্থ বিশ্বকলতুলা রক্তবর্ণ অধর বারম্বার চুষন করছেন, তাহাই আমার মনোমধ্যে আবির্ভূত হউক । অণু মোক্ষলাভে আমার কোন প্রয়োজন নাই ।

নমো দেব ! দামোদরানন্ত ! বিষ্ণো ! প্রসীদ প্রভো ! দুঃখ-জালাক্লিমগ্নম্ ।

রূপাদৃষ্টি-বৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-গৃহাণেশ ! মামজ্ঞমেধ্যাক্ষিদৃশ্যঃ ॥

হে দেব ! হে দামোদর ! হে অনন্ত ! হে বিষ্ণো ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । হে প্রভো ! হে ঈশ ! আমি দুঃখপরম্পরারূপ নাগরে নিমগ্ন হয়ে অতিশয় পীড়িত হচ্ছি । রূপাদৃষ্টি-বৃষ্টিদ্বারা আমাকে উদ্ধার করুন এবং আমার নেত্রগোচর হউন, আমার দর্শন দান করুন ।

কুবেরাশ্রজ্যো বন্ধ-মূর্ত্তিব যদ্বত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজ্যৌ কৃতৌ চ ।

তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ ন মোক্ষে গ্রহো মেহস্তি দামোদরেহ ॥

হে দামোদর আপনি যেমন বন্ধমূর্ত্তিতে অর্থাৎ গো-রজ্জুতে উদূথলে বন্ধনগ্রস্ত হয়ে কুবের পুত্রদ্বয়কে অর্থাৎ নলকুবর ও মণিগ্রীবকে মুক্ত ও তাদিগকে ভক্তিভাজন করেছেন, তদ্রূপ আমাকেও স্বীয় প্রেমভক্তি প্রদান করুন । এই প্রেমভক্তিতেই আমার একমাত্র আগ্রহ, মোক্ষের প্রতি আমার কোন আগ্রহ নাই ।

নমন্তেহস্ত দাস্যে ক্ষুরদীপ্তিধাম্নে ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে ।

নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয় প্রিয়ায়ৈ নমোহনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যাম্ ॥

হে দেব ! আপনার তেজোময় উদর-বন্ধনরজ্জুতে এবং বিশ্বের আধারস্বরূপ ত্বদীয় উদরে আমার প্রণাম থাকুক । আপনার প্রিয়তম রাধিকাকে নমস্কার । আপনি অনন্ত লীলাশালী, হে দেব ! আপনাকে নমস্কার ।

কৃষ্ণের এমন কতকগুলো গোপনীয় লীলা গর্গসংহিতাতে বর্ণিত হয়েছে যা ভাগবতের মধ্যে নাই । কিন্তু গর্গসংহিতা **Authentic** গ্রন্থ, প্রামাণিক গ্রন্থ । কেননা, কৃষ্ণের সমস্ত জিনিষটা গর্গঋষি জানতেন । তা সে হেন বৈষ্ণবোত্তম ব্যক্তি যবে এসেছেন, আনন্দ ত' হওয়ারই কথা । বৈষ্ণব দর্শন করে যদি কারও হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত না হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার চিত্ত অত্যন্ত বজ্রসম কঠিন ।

কয় রকমের লোক আছে ?—হয় রকমের লোক আছে, অন্ততঃ যাদের ভগবদর্শন, গুরু-বৈষ্ণব দর্শন করে চিত্ত বিগলিত হয় না । “বৈষ্ণব দেখিয়া পড়িব চরণে হৃদয়ের বন্ধু জানি’ ।”—কথাটা ত' আছে । এখানে শ্লোকের মধ্যে সেই কথাটা বলা আছে ।—

হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বৈষ্টি বৈষ্ণবান্নভিনন্দতি ।

ক্রুদ্ধতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥

এই ছয়জনের অধঃপতন হয়। হস্তি—যদি বৈষ্ণবকে কেউ হত্যা করে। নিন্দন্তি—যদি কেউ নিন্দা করে। বৈষ্ণবের কি নিন্দা হয়?—বৈষ্ণবের নিন্দা হয় না, কেননা বৈষ্ণবের নিন্দা বলে ত' কিছু নাই। যিনি অবৈষ্ণব তার নিন্দা হয়। বৈষ্ণবের আবার নিন্দা কি করে হবে? তথাপি আছে একটা কথা—ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্যবশে যদি কেউ কিছু উন্টোপাণ্টা করে, নিন্দা হয়ে যায়। কিন্তু সেটা বৈষ্ণবকে স্পর্শ করবে না। আইন আছে, **Discipline** আছে, সেই আইন মোতাবেক তাঁর বিচার হয়, সাজা হয়। বৈষ্ণবের কেউ নিন্দা করতে পারে না, অবৈষ্ণবদেরই সমালোচনা হয়। “স মহাত্মা স্মৃহ্লভঃ”—সেই মহাত্মা যদি না হন তিনি, তাহলে বিচার ভ্রান্তি হবে, হতেই পারে। সেখানে ত' রেহাই নাই। বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব বলাই অপরাধ।

কয়দিন দামোদর-ব্রত সম্বন্ধে সাত্তত বৈষ্ণবস্বৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস থেকে ব্রতের বিধি-নিষেধাত্মক আলোচনা করেছি। আজ দামোদরাষ্টক বিশেষভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা। জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামিপ্রভু তিনি দামোদরাষ্টকে যে ভূমিকা লিখেছেন, যার নাম ‘শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টক সম্বন্ধে দুই-একটা কথা’—সেটা আমরা প্রথম আলোচনা করছি।—

“অচিন্ত্যানন্তশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মাতা যশোদার দামবন্ধন স্বীকার করিয়া তাঁহার বিশুদ্ধ-বাৎসল্য-প্রেমরস-নির্যাস সম্পূর্ণরূপে আশ্বাদন করেন এবং জগতে নিজের ভক্তাধীনতার চরম পরিচয় প্রদান করেন। সেই পরম মনোহর শ্রীদাম-বন্ধন-লীলা তিনি কার্তিক শুক্লা প্রতিপদে প্রকটিত করেন। পরমধন্য কার্তিক-মাস ‘দামোদর’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবার ইহাই প্রধান হেতু। বৈষ্ণব-স্বৃতি-শাস্ত্র শ্রীহরিভক্তিবিলাস-প্রণেতা আচার্য্যপাদ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী কার্তিক-কৃত্য প্রসঙ্গে কার্তিকমাসে প্রতিদিন শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের পূজা এবং ‘শ্রীদামোদরাষ্টক’-নামক স্তোত্র পাঠের বিধি নির্দেশ করিয়াছেন। যথা :—

রাধিকাং প্রতিমাং বিপ্রাঃ পূজয়েৎ কার্তিকে তু যঃ।

ভস্ম তুষ্যতি তৎপ্রীতৈঃ শ্রীমান্ দামোদরো হরিঃ ॥

‘দামোদরাষ্টকং’-নাম স্তোত্রং দামোদরার্চনম্।

নিত্যং দামোদরাকর্ষি পঠেৎ সত্যব্রতোদিতম্ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬।১২৭-১২৮)

যিনি কার্তিকমাসে শ্রীরাধিকার প্রীত্যর্থে তাঁহার পূজা বিধান করেন, শ্রীদামোদর হরি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন।

শ্রীদামোদরাষ্টক স্তোত্র পদ্মপুরাণে শ্রীনারদ-শৌনকাদি-সংবাদে শ্রীসত্যব্রত মুনি-

কর্তৃক কথিত হইয়াছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ইহার টীকায় বলিয়াছেন যে, এই স্তোত্র নিত্যসিদ্ধ, ইহা শ্রীমতাব্রত মুনি হইতে প্রকটিত হইয়াছেন এবং ইহা শ্রীদামোদর-কৃষ্ণকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ। তিনি স্বানুভূতিপূর্ণ বিস্তৃত ব্যাখ্যায় এই স্তোত্রের দামোদরাকর্ষিত প্রকৃষ্টরূপে পরিষ্কৃত করিতেছেন।

দামোদরাষ্টক প্রকাশ করিবার অভিলাষ বহুদিন হইতেই পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। বিশেষতঃ প্রতি কার্তিকমাসে দামোদর-ব্রত উদযাপনকালে আমরা সকলে মিলিত হইয়া সম্বরে যখন এই দামোদরাষ্টক কীর্তনে প্রবৃত্ত হইতাম, তখনই ইহা সকল সাধক-হৃদয়ে প্রস্ফুটিত করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবলা হইয়া উঠিত। বহু ভক্তসাধক আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া অনুরোধও করিয়াছেন। এতদিন পরে শ্রীদামোদরাষ্টকের সংস্কৃত মূল, সংস্কৃত অবয়ব ও শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের 'দিগ্দর্শিনী'-নামী সংস্কৃত টীকা প্রকাশিত হইল। সংস্কৃত ভাবানভিজ্ঞ পাঠকবর্গের জন্ত মূলশ্লোকের বঙ্গানুবাদ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর উক্ত টীকার বঙ্গানুবাদও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বর্তমান যুগে সংস্কৃত ভাষার প্রচলনের প্রতি বহু কলিহত মনোবিগণের বিষবৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। আমরা তাহা সত্ত্বেও 'দামোদরাষ্টকম্'-নামক সংস্কৃত গ্রন্থখানি সমগ্র দেশের হিত-কামনায় প্রকাশ করিলাম। বাংলাভাষার সাহিত্যিকগণের ইহা সর্বতোভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, বাংলা ভাষার উন্নতি করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যেরও উন্নতি অবশ্যস্বাভাবী। যাহারা সংস্কৃত সাহিত্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া বাংলা ভাষার উন্নতি কল্পনা করেন, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। এই শ্রেণীর সাহিত্যিকগণের ভাষায় উচ্ছৃঙ্খলতাই আমরা সর্বতোভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকি। বাংলা ভাষার স্বতন্ত্রতা সংস্কৃত ভাষার অধীন অর্থাৎ স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র নহে, পরতন্ত্র-স্বতন্ত্র। আমরা এই নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থখানি বিশ্বসমাজে উপস্থিত করিতেছি।

ইহার দার্শনিক বিচার, রচনা-কৌশল, লীলা-বিকাশের চমৎকারিতা প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলে ব্যাসদেবের রচিত এই অষ্টকটী সাহিত্য-জগতে একটি আদর্শ-স্বরূপ। জগদগুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ আটটি শ্লোক-সম্বলিত এই গ্রন্থে 'দিগ্দর্শিনী' টীকা বিশদরূপে রচনা করিয়া সাধন-রাজ্যের তারতম্যমূলক বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে বাৎসল্য ও মধুর রসের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বতোভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

গোস্বামিপাদ প্রাকৃত-সহজিয়াগণের যত্র-তত্র এবং যথা-তথা রাসলীলা

আলোচনা করার অবৈধত্ব প্রদর্শনকল্পে অষ্টম শ্লোকের শেষভাগে লিখিয়াছেন,—
 “ততশ্চ তয়া সহ রাসক्रीडादिकं परमश्रुतिश्चेनाন্তে वर्णयितुमिच्छन् तच्च परम-
 गोप्यत्वेनानভিব্যঞ্জयन्—‘মধুরেণ সমাপয়েদিতি’ ভায়েন কিঞ্চিদেব সংক্ষেতে-
 নোদিশন্ প্রণমতি ।” টীকার এই অংশের বঙ্গানুবাদ এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে ।
 ইহাতে সহজিয়া সম্প্রদায়ের অনধিকার-চর্চা সংক্ষেপে বিচার স্বপ্নভাবে প্রদত্ত
 হইয়াছে ।

সহজিয়াগণ অপাত্রবিধায় রাসলীলা আশ্বাদনে কোনও রূপে মহাপাত্র বলিয়া
 গণ্য হইতে পারে না । আমরা জানি, ভক্তি ত্রিলোকাতীত । ইহা ত্রৈলোক্যের
 রায়ের মধ্যে বা বিচারের মধ্যে আসিতে পারে না । তাহারা মনে করে, জড়
 ‘চিং’ হইয়া যায় এবং প্রাকৃত চক্ষুদ্বারাই সাধন-প্রভাবে ভগবানকে দেখা যায়—
 ইহাই প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিচার । তাহারা বলে,—কাঁসা রস-সংযোগে যেরূপ
 মোনা হয়, প্রাকৃত শরীরও ভজন-প্রভাবে অপ্রাকৃত হয় । তখন সেই প্রাকৃত চক্ষুর
 দ্বারাই ভগবানকে দর্শন করিতে পারা যায় । প্রাকৃত সহজিয়াদের এই উক্তি
 শ্রীল দামোদর গোস্বামী ‘বৃহত্তাগবতামৃত’-গ্রন্থে ও শ্রীদামোদরাষ্টকের ‘দিগ্‌দশিনী’
 নামক টীকায় সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিয়াছেন ।

মানস-দর্শন ও প্রত্যক্ষ-দর্শন

এই প্রসঙ্গে চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্লোকের টীকা বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যিক ।
 উক্ত শ্লোকদ্বয়ের বিচার হইতেই প্রাকৃত-সহজিয়াগণ মনে করিতে পারেন,—মানস
 ধ্যান-দর্শন অপেক্ষা চাক্ষুষ দর্শনেরই প্রাধান্ত্য গোষ্বামিপাদ বর্ণনা করিয়াছেন ।
 বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গোষ্বামিপাদ ব্রহ্মার ধ্যানজ দর্শন অপেক্ষা
 গোপকুমারের চাক্ষুষ দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন । ইহাতে গোপকুমারের
 প্রাকৃত চক্ষুর দর্শনকে গোষ্বামিপাদ বিচার করেন নাই । গোপকুমারের বৈকুণ্ঠ-জগতে
 অর্থাৎ অপ্রাকৃত ভূমিকায় উপস্থিতির পর চাক্ষুষ দর্শনের কথা বর্ণিত হইয়াছে ।
 বৈকুণ্ঠ জগতে বা অপ্রাকৃত ভূমিকায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অবস্থিতি নাই । সুতরাং
 গোপ-গোপীগণের প্রত্যক্ষীভূত ভগবৎ-সান্নিধ্য সর্বতোভাবে অপ্রাকৃত ও
 অতীন্দ্রিয় । ইহা প্রাকৃত সহজিয়াগণের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষীভূত ব্যাপার নহে ।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীদামোদরাষ্টক উজ্জ্বলত, কার্তিকব্রত বা দামোদরব্রত
 উপলক্ষে প্রত্যহই কীর্তনের বা আলোচনীয় । যাহারা দামোদর মানে শ্রীদামোদরের
 প্রীতি-কামনা করিবেন, তাহারা অবশ্যই এই ‘দামোদরাষ্টকম্’ গ্রন্থখানি প্রত্যহ
 সমুদয় অংশ পাঠ করিবেন ; ইহাই হরিতত্ত্ববিলাসের বিশেষ নির্দেশ । এই
 দামোদরব্রত বিভিন্নভাবে পালিত হইবার নির্দেশ শাস্ত্র হইতে জানিতে পারা যায় ।

চাতুর্দশ-ব্রতের মধ্যেই উজ্জ্বলত। ইহা একাদশী, দ্বাদশী ও পূর্ণিমা-পক্ষে আরম্ভ হয় এবং একাদশী, দ্বাদশী ও পূর্ণিমাতেই উহার সমাপ্তি ঘটিয়া থাকে। তবে এই তিথিসমূহ কোনক্রমেই বিদ্ধা গৃহীত হইবে না। শ্রীসনাতন গোস্বামী বলেন,— বৈষ্ণব-ব্রত মাঝেই বিদ্ধা পরিত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং চাতুর্দশ এবং উজ্জ্বলব্রতের আরম্ভ ও সমাপ্তি-কালের তিথিসমূহও বিদ্ধা ত্যাগ করিয়া পালন করিতে হইবে। চাতুর্দশ-ব্রত ও উজ্জ্বলব্রতে সূর্য্যোদয়বিদ্ধা ত্যাগই হরিভক্তিবিলাসের অভিমত।

আমরা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কার্তিক-ব্রত সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ উদ্ধার করিতেছি। এই প্রবন্ধে ব্রত-সমাপ্তির ক্রিয়াসমূহ কোন্‌দিনে করিতে হইবে, তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। একাদশী-তিথি হইতে ষাঁহারাত্র ব্রত আরম্ভ করিবেন তাঁহাদের পক্ষে যেরূপ বিধি, দ্বাদশী ও পূর্ণিমা-পক্ষেও সেইরূপ বিধি বুঝিতে হইবে। প্রবন্ধ, যথা—

কার্তিকব্রত-পালন বৈষ্ণবদিগের একটি প্রধান কর্তব্য। “আশ্বিনশ্রু তু মাসশ্রু শুক্লে একাদশী ভবেৎ। কার্তিকশ্রু ব্রতানিহ তশ্চাম্ কুর্ধ্যাদতদ্রুতিঃ।”—এই বচনানুসারে প্রতি বৎসরে বিজয়া-দশমীর পরদিবস যে একাদশী হয়, সেই দিবস হইতে ব্রত আরম্ভ, আর উথান-একাদশীতে ঐ ব্রত সমাপ্ত হইবে। এই এক মাসের মধ্যে যে ব্রত পালন করা হয়, তাহার নাম ‘নিয়ম-সেবা’। নিয়ম-সেবার বিধি এই,—সেই মাসের প্রতিদিবসে রাত্রির শেষ-যামে শুচি হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে মঙ্গলারতি করিবে। প্রাতঃস্নান করিয়া দামোদরার্চন করিবে। রাত্রে ঘৃত-দীপ বা তিল-তৈলের দীপ ভগবান্মন্দিরে, তুলসীতলে এবং আকাশে প্রজ্জ্বলিত করিবে। কার্তিকমাসে নিরামিষ্য এবং ভগবানের প্রসাদান্ন ভোজন করিবে। পরান্ন, পরশয্যা, তৈল, মধু ও কাংশ্র পাত্র ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে। প্রসাদ-সেবান্তে বৈষ্ণবসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শ্রবণ বা পঠন করিবে। নিরন্তর হরিনাম-কীর্তন ও স্মরণ করিবে। এই প্রকার বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক উক্ত মাস যাপন করত উথান-একাদশীতে নিরম্ব উপবাস ও কৃষ্ণকথায় রাত্রিজাগরণ করিবে। পরদিন প্রাতে শুচি হইয়া হরি-কীর্তনান্তে আত্মীয় বৈষ্ণবগণকে সেবা করাইয়া অবশেষে স্বয়ং প্রসাদসেবন করিবে। সেই দিবস রাত্রিশেষে ব্রত সমাপ্ত করিবে।

উজ্জ্বলব্রতে শ্রীরাধাদামোদরের প্রীতিবিধানই প্রধান উদ্দেশ্য। শ্রীমতী রাধারানীকে উজ্জ্বলেশ্বরী বলা হয়। তজ্জন্তু শ্রীশ্রীদামোদরের প্রীতি-বিধানার্থ সত্যব্রতমুনি “নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয় প্রিয়ায়ৈ” বাক্যটি সংযোজিত করিয়া রাধাদামোদরের পূজা সম্পাদনই দামোদর-ব্রতের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া জ্ঞাপন করেন। (ক্রমশঃ)

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরান্দো জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-

মহোৎসবে আহ্বান

(পুরীধামের প্রথানুসারে)

[২৯তম বর্ষ]

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

ফোন : এন্-ভি-ডি—৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া ;

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৩ (ইং ১৫।৬।২৬)

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিঃসৃতধারায় সমিতির বর্তমান সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আত্মগত্যে সমিতির সেবকবৃন্দের উত্তোগে অগ্ন্যগ্ন বৎসরের তায় এই বৎসরেও উক্ত মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে আগামী ৩১শে আষাঢ়, ১৪০৩ (ইং ১৬।৭।২৬) মঙ্গলবার হইতে ২ই শ্রাবণ, ১৪০৩ (ইং ২৫।৭।২৬) বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীৰ্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের বিশেষ সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহযাজনমুখে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুকভক্ত্যানুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী স্বকৃতি অর্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন সেবাপঞ্জী প্রদত্ত হইল।

শুকভক্তকুপালেশপ্রার্থী—

সত্যেন্দ্র,

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—৪ সেবাপঞ্জী :—

১। ৩১শে আষাঢ় (ইং ১৬।৭।২৬), মঙ্গলবার—পূর্বাহ্ন ৭ ঘটিকার নগর সঙ্কীৰ্তনমুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠান্তে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন এবং শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন ।

২। ১লা শ্রাবণ (ইং ১৭।৭।২৬), বুধবার—শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ; অপরাহ্ন ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সঙ্কীৰ্তন-যোগে শোভাযাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন ; পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যায় আরাট্রিক, সঙ্কীৰ্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ।

৩। ২রা শ্রাবণ (১৮ই জুলাই), বৃহস্পতিবার হইতে ৪ঠা শ্রাবণ (২০শে জুলাই) শনিবার পর্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত সঙ্কীৰ্তন ও আরাট্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ।

৪। ৫ই শ্রাবণ (ইং ২১।৭।২৬), রবিবার—হেরাপঞ্চমী-দিবসে শ্রীলক্ষ্মীবিজয়-উৎসব । পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে মধ্যাহ্ন ১১টা পর্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও নগর-সঙ্কীৰ্তন । অপরাহ্ন ৪টা হইতে সঙ্কীৰ্তন ; সন্ধ্যায় আরাট্রিক, তদনন্তর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ।

৫। ৬ই শ্রাবণ (২২শে জুলাই), সোমবার হইতে ৮ই শ্রাবণ (২৪শে জুলাই) বুধবার পর্যন্ত প্রত্যহ শ্রীমঠে সঙ্কীৰ্তন ও আরাট্রিকান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-মুখে বক্তৃতা ।

৬। ৯ই শ্রাবণ (ইং ২৫।৭।২৬), বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ন ৩টা হইতে সঙ্কীৰ্তন ও শোভাযাত্রাযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা ; পরে শ্রীমঠে আরতি, সঙ্কীৰ্তন, শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও সাধারণ-মহোৎসব ।

জ্ঞেয়্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত সমিতির-সাধারণ 'সম্পাদক'-এর নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য ।

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরম ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিল্লশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৮শ বর্ষ	{	১৬ বামন, প্রহ্মায়, ৫১০ শ্রীগোরাঙ্গ	{	৫ম সংখ্যা
		৩১ আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৪০৩, ইং ১৬/৭/২৬		

সামুবাদং

শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহার্য্যষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোপ্বামি-বিরচিতম্]

নমঃ শ্রীকুঞ্জবিহারিণে

ইন্দ্রনীলমণি-মঞ্জুল-বর্ণঃ ফুল্লনীপ-কুসুমাক্ষিত-কর্ণঃ ।

কৃষ্ণাভিরকুশোরসি হারী সুন্দরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ১ ॥

ইন্দ্রনীলমণির গায় অতি মনোহর ঝাঁহার বর্ণ, বিকশিত কদম্ব-কুসুমদ্বারা ঝাঁহার
কর্ণযুগল সুশোভিত, ঝাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থলে গুঞ্জাহার শোভা পাইতেছে, সেই
পরমসুন্দর কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ১ ॥

রাধিকা-বদনচন্দ্র-চকোরঃ সর্ববল্লববধু-ধৃতিচোরঃ ।

চর্চরী-চতুরতাঞ্চিত-চারী-চারুতো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ২ ॥

যিনি শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্রের চকোর-স্বরূপ, যিনি নিখিল ব্রজরমণীর ধৈর্য্যচ্যুতি করিয়া থাকেন এবং যিনি চর্চরী-তালে সুন্দর নৃত্য-কৌশল বিস্তার করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ২ ॥

সর্বতঃ প্রথিত-কৌলিকপর্ব-ধ্বংসনেন হৃত-বাসব-গর্ব্বঃ ।

গোষ্ঠ-রক্ষণকৃতে গিরিধারী-লীলয়া জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৩ ॥

যিনি সর্বত্র বিখ্যাত গোপদিগের ইন্দ্রপূজারূপ কৌলিক-পর্বের ধ্বংসহেতু অতি ব্রুক দেবরাজের গর্ব্ব হরণ ও গোষ্ঠ রক্ষার জন্য গোবর্দ্ধন-ধারণ করিয়াছেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৩ ॥

রাগমগুল-বিভূষিত-বংশী-বিভ্রমেণ মদনোৎসব-শংসী ।

সুয়মান-চরিতঃ শুকশারী-শ্রেণিভির্জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৪ ॥

সমূহ রাগ-রাগিণী-বিভূষিত বংশীর মধুরস্বরে যিনি প্রেমসীমন্দের প্রতি মদনোৎসব ঘোষণা করিতেছেন এবং বংশী-রব শুনিয়া অনুরক্ত শুক-শারীগণ যাহার চরিত্রের প্রশংসা করিতেছে, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৪ ॥

শাতকুন্ত-রুচিহারি-দুকূলঃ কেকিচন্দ্রক-বিরাজিত-চুলঃ ।

নবায়োবন-লসদ্ব-জনারী-রঞ্জনো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৫ ॥

যাহার পীতাম্বর স্রবর্ণের কান্তি অপেক্ষাও উজ্জল, যাহার চূড়া ময়ূরপুচ্ছে বিরাজিত এবং যিনি নবর্যোবনে সুশোভিত ব্রজনারীগণের চিত্তরঞ্জনে তৎপর, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৫ ॥

স্বাসকীকৃত-সুগন্ধি-পটীরঃ-স্বর্ণকাঞ্চি-পরিশোভি-কটীরঃ ।

রাধিকোন্নত-পয়োধর-বারী-কুঞ্জরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৬ ॥

সুগন্ধি চন্দনাদিদ্বারা যাহার অঙ্গ অহুলিপ্ত, স্বর্ণময় কাঞ্চিদ্বারা যাহার কটিদেশ সুশোভিত এবং যিনি শ্রীরাধিকার উন্নত বক্ষোজরূপ হস্তিবন্ধন-শৃঙ্খলে কুঞ্জর-স্বরূপ, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৬ ॥

গৈরধাতু-তিলকোজ্জল-ভালঃ কেলিচঞ্চলিত-চম্পক-মালঃ ।

অদ্ভি-কন্দর-গৃহেষাভিসারী সুলভবাং জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৭ ॥

যাহার ললাট গৈরিক ধাতুদ্বারা তিলকাক্ষিত হওয়ায় অতি উজ্জল হইয়াছে, যাহার বক্ষঃস্থলে বিলাসময়ী চম্পকমালা দোহল্যমান হইতেছে, গোপাঙ্গনাগণের

সহিত অঙ্গি-কন্দররূপ সঙ্কেত-স্থানে যিনি গমন করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৭ ॥

বিভ্রামোচ্চল-দৃগঞ্চল-নৃত্য-ক্ষিপ্ত-গোপললনাখিল-কৃত্যঃ ।

প্রেমমত্ত-বৃষভানু-কুমারী-নাগরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৮ ॥

যিনি স্বরবিলাসে চঞ্চল-কটাক্ষপাতদ্বারা গোপ-ললনাদিগের নিখিল কার্য্য বিদূরিত করিয়াছেন এবং যিনি প্রেমোন্মত্ত বৃষভানুসুতা শ্রীরাধিকার চিত্তরঞ্জে রসিক নায়ক-স্বরূপ, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৮ ॥

অষ্টকং মধুর-কুঞ্জবিহারি-ক্রীড়য়া পঠতি যঃ কিল হারি ।

স প্রযাতি বিলসৎ পরভাগং তস্য পাদকমলার্চন-রাগম্ ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণশীলাময়ী অতিমধুর ও মনোহর এই পড়াষ্টক যিনি পাঠ করেন, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-পূজনে বিলক্ষণ অনুরাগ লাভ হয় ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৮ পৃষ্ঠার পর]

ভজনক্রিয়া

১। ভজন-নৈপুণ্য কি ?

“সাধনযোগেনাচার্য্যপ্রসাদেন চ তুর্গং তদপনয়নমেব ভজননৈপুণ্যম্ ॥”

অর্থাৎ “সাধনযোগে এবং আচার্য্য-প্রসাদে শীঘ্র (সেই) অনর্থ চারিটী দূর করাই ভজন-নৈপুণ্য ।”

—আঃ সূঃ ৭৫

২। ভজন-ক্রিয়া কি কি ?

“সকল আত্মাতেই ভক্তির বীজ আছে । সেই বীজকে অঙ্কুর ও ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত করিতে হইলে তাহার মালীগিরি করা আবশ্যক । ভক্তি-শাস্ত্রের, আলোচনা, পরমেশ্বরের উপাসনা, সাধুসঙ্গ ও ভক্তনিষেবিত স্থানে বাস ইত্যাদি কতকগুলি কার্য্যের আবশ্যকতা আছে । ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় ভূমি পরিষ্কার, কণ্টক ও কঠিন কঙ্করাদি দূরীকরণরূপ কার্য্যসমূহ নিতান্ত প্রয়োজন । ভক্তি-বিজ্ঞান জানিলে ঐ সকল কার্য্য সূচাকরূপে হইতে পারে” ।

—প্রঃ প্রঃ ৬ষ্ঠ প্রঃ

৩। কাঁহার আশ্রয় ঘটিলে ভগবৎপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ?

“মহাভাগবতের আশ্রয়ই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ—ইহা জানিয়া দৃঢ়রূপে তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্তী হইবে।” —‘শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ’ ১০, সঃ তোঃ ৭।৩

৪। সদ্গুরুকরণ-ব্যাপারে কুলগুরু গ্রহণের অপেক্ষা আছে কি না ?

“গুরুকরণের পূর্বেই গুরু-শিষ্যের পরীক্ষা শাস্ত্রে নির্দেশ করিয়াছেন। এইস্থলে কুলগুরুর অপেক্ষা নাই।” —‘গুরুবজ্জা’, হঃ চিঃ

৫। বৈষ্ণবসেবায় উপেয়-বুদ্ধি কি ?

“বৈষ্ণবসেবায় ‘উপায়-বুদ্ধি’ পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি ‘উপেয়-বুদ্ধি’ সর্বদা করিবে। বৈষ্ণবসেবা করিয়া অণু কোন ফল পাওয়া যায়—এরূপ বুদ্ধিকে ‘উপায়-বুদ্ধি’ বলে। অণু বহু স্কন্ধতির ফলেই বৈষ্ণব-সেবা কৃত হয়—এই বুদ্ধিকেই ‘উপেয়-বুদ্ধি’ বলে।” —‘শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ’ ২, সঃ তোঃ ৭।৩

৬। ভজন-প্রয়াসীর নিদ্রাভঙ্গের সময় হইতে কর্তব্য কি ?

“নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া গুরুপরম্পরা-প্রথানুসারে ভগবৎ-ভাগবতের নাম উচ্চারণ করিবে।” —‘শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ’ ১৬, সঃ তোঃ ৭।৩

৭। ভজন-প্রয়াসীর দৈনন্দিন কর্তব্য কি ?

“প্রতিদিন এক ঘটিকা গুরুর সদ্গুণ-সকল বিশ্বাসপূর্বক বর্ণন করিবে।” —‘শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ’ ৪৪, সঃ তোঃ ৭।৪

৮। গুরু ও বৈষ্ণবে কিরূপ সেবাবৃত্তি-বিশিষ্ট হইতে হইবে ?

“স্বীয় গুরুদেবের ও বৈষ্ণবের কৈঙ্কর্য্যে সমান সম্মান করত তাঁহাদের সর্বদা সেবা করিবে। পূর্বাচার্য্যাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিবে।” —‘শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ’ ৪, সঃ তোঃ ৭।৩

৯। বৈষ্ণবের তিরস্কার কিরূপভাবে গ্রহণ করিতে হইবে ?

“যদি বৈষ্ণব তিরস্কার করেন, তাহা হইলে অপকার স্মরণ না করিয়া মৌন হইয়া বসিবে।” —‘শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ’ ৫৩, সঃ তোঃ ৭।৪

১০। ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তির চিত্তবৃত্তি ও আচরণ কিরূপ হইবে ?

“ঈশ্বরের নিকট সর্বদা দৈন্ত্য, আচার্য্যের নিকট নিজের অজ্ঞতা, বৈষ্ণবের নিকট স্বীয় পারতন্ত্র্য এবং সংসারের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিবেন।” —‘শ্রীঅর্থ-পঞ্চক’, সঃ তোঃ ৭।৩

১১। অনর্থ দূর করিবার কৌশল কি ? ব্রজভজনের রহস্য কি ?

“কৃষ্ণ যে-সকল অসুরকে বধ করিয়াছেন, স্বীয় চৈতন্যরাজ্যে সেই সকলের উৎপাত দূর করিবার অভিপ্রায়ে হরির নিকট সदैন্ত্য ক্রন্দন করিয়া বলিলে হরি

সেই সকল অনর্থ দূর করেন। আর যে-সকল অসুরকে বলদেব নাশ করিয়া থাকেন, সেই অনর্থগুলি সাধক নিজ-চেষ্টায় দূর করিবে,—ইহাই ব্রজ-ভজনের রহস্য।”

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

১২। ভজনের ক্রম কি ?

“ভক্তিমূল্য স্মৃতি হইতে প্রবোধয়।

শ্রদ্ধা হইলে সাধুসঙ্গ অনায়াসে হয় ॥

সাধুসঙ্গ-ফলে হয় ভজনের শিক্ষা।

ভজন শিক্ষার সঙ্গে নামমন্ত্র-দীক্ষা ॥

ভজিতে ভজিতে হয় অনর্থের ক্ষয়।

অনর্থ খর্ব্বিত হইলে নিষ্ঠার উদয় ॥

নিষ্ঠা নামে যত হয় অনর্থ বিনাশ।

নামে তত রুচি ক্রমে হইবে প্রকাশ ॥

রুচিযুক্ত নামেতে অনর্থ যত যায়।

ততই আসক্তি নামে ভক্তজন পায় ॥

নামাসক্তি-ক্রমে সর্বানর্থ দূর হয়।

তবে ভাবোদয় হয় এইত নিশ্চয় ॥” —ভঃ রঃ, ‘প্রথম যাম-সাধন’

১৩। ক্রমপথ পরিত্যাগ করিলে কি অনর্থ উপস্থিত হয় ?

“অধিকার না লভিয়া সিদ্ধ দেহ ভাবে।

বিপর্যায়-বুদ্ধি জন্মে শক্তির অভাবে ॥

সাবধানে ক্রম ধর’ যদি সিদ্ধি চাও।

সাধুর চরিত দেখি’ শুদ্ধ বুদ্ধি পাও ॥” —ভঃ রঃ, ‘প্রথম যাম-সাধন’

অনর্থ-নিবৃত্তি

১। ‘অনর্থ’ কি ?

“সংসারী লোকদিগের মায়াভোগরূপ পৌরুষই তাহাদের অনর্থ।”

—কৃঃ সঃ ৯।১৫

২। অনর্থ কয় প্রকার ও কি কি ?

“অনর্থ চারি প্রকার—অর্থ্য স্বরূপ-ভ্রম, অসতৃষ্ণা, অপরাধ ও হৃদয়-দৌর্বল্য।”

—‘দশমূল-নির্ধাস’, সঃ তোঃ ৯।৯

৩। চারি প্রকার অনর্থের স্বরূপ কি ? কিরূপে অনর্থ-নিবৃত্তি সম্ভব হয় ?

“আমি শুদ্ধ, চিৎকণ, কৃষ্ণদাস’—ইহা ভুলিয়া স্ব-স্বরূপ হইতে বদ্ধ জীব দূরে প্রস্থিয়াছেন, সেই স্ব-স্বরূপের অপ্রাপ্তিই জীবের প্রথম অনর্থ। জড়বস্তুতে অহং-

মমাদি বুদ্ধি করিয়া অসৎ বিষয়-সুখাদির তৃষ্ণাকে অসতৃষ্ণা বলি ; পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, স্বর্গৈষণা—এই তিন প্রকার অসতৃষ্ণা । আর অপরাধ—দশবিধ ; ** হৃদয়-দৌর্বল্য হইতেই শোকাদির উদ্ভব । এই চারি প্রকার অনর্থ—অবিচ্ছাদক-জীবের নৈসর্গিক ফল, সাধুসঙ্গে শুদ্ধকৃষ্ণানুশীলনদ্বারা ঐ সমস্ত অনর্থ ক্রমে দূর হয় ।” —জৈঃ ধঃ ১৭শ অঃ

৪। ক্ষুদ্র অনর্থ কি বৃহৎ নামস্বর্য্যকে বা চেতনকে ঢাকিতে পারে ?

“বন্ধজীবের অনর্থগুলি মেঘের গ্রায় নামস্বর্য্যকে ঢাকিয়া অন্ধকার করে ; বস্তুতঃ বন্ধজীবের চক্ষুকেই ঢাকে ; নামস্বর্য্য বৃহৎ, অতএব তাঁহাকে ঢাকিতে পারে না ।” —‘নামাভাস-বিচার’, হঃ চিঃ

৫। কেন জীবের ভগবৎসুখতা হয় না ?

“যতদিন জীবের সংসার-সুখের আশা ক্ষয়োন্মুখ না হইয়া পড়ে, ততদিন কোন-ক্রমে তাহাদের ভগবৎসুখতা উদয় হয় না ।” —‘সাধন’, সং তোঃ ১১।৫

৬। কতকাল পর্য্যন্ত বিষয়-তৃষ্ণা থাকে ?

“যতদিন পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত-তত্ত্বে শুদ্ধরতির উদয় না হয়, ততদিন বিষয়-তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে বিগত হয় না ; অবসর পাইলেই বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়গুলি ধাবমান হয় ।” —‘অসৎসঙ্গ’, সং তোঃ ১১।৬

৭। হৃদয়-দৌর্বল্য থাকিলে কি ক্ষতি হয় ?

“হৃদয়-দৌর্বল্য-বশতঃ অনেক সময়ে ভজন-প্রতিকূল ক্রিয়া বা সঙ্গ ত্যাগ করা যায় না । অসৎকার্য্যে বা অসৎসঙ্গে ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ জন্মে, তাহাতে ভজন অশুদ্ধ হয় । অতএব হৃদয়-দৌর্বল্য ত্যাগ করত ভজনে উৎসাহ-প্রকাশ এবং নিরপেক্ষতা রক্ষা করাই বিশুদ্ধ ভজনের সহায় ।” —‘বিশুদ্ধ ভজন’, সং তোঃ ১১।৭

৮। হৃদয়-দৌর্বল্য হইতে কি কি অনর্থের উদয় হয় ?

“আলস্য ও ইতর বিষয়ের বশীভূততা, শোকাদিদ্বারা চিত্ত-বিভ্রম, কুতর্কের দ্বারা শুদ্ধভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনীশক্তি কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কার্পণ্য, জাতি-ধন-বিদ্যা-জন-রূপ ও বলের অভিমানে দৈত্য-স্বভাব অস্বীকার, অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বা উপদেশের দ্বারা প্রচালিত হওয়া, কুসংস্কার-শোধনে অযত্ন, ক্রোধ-মোহ-মাৎসর্য্য-অদহিযুতা-জনিত দয়া পরিত্যাগ, প্রতিষ্ঠাশা ও শাঠ্যের দ্বারা বৃথা বৈষ্ণবাভিমান, কনক-কামিনী ও ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষে অগ্ন জীবের প্রতি অত্যাচার—এই প্রকার কার্য্য-সকলই হৃদয়-দৌর্বল্য হইতে উদ্ভিত হয় ।” —‘দশমূল-নির্ধাস’, সং তোঃ ১২

৯। অসতৃষ্ণা কি ?

“জড়দেহের দ্বারা বিষয়-পিপাসাই অসতৃষ্ণা ; স্বর্গস্থ, ইন্দ্রিয়স্থ, ধন-জন-স্থ—সকলই অসতৃষ্ণা। স্বীয় স্বরূপ যত স্পষ্ট হইবে, ইতর বস্তুতে বৈরাগ্যও সেই পরিমাণে অবশ্য হইবে। সঙ্গে-সঙ্গে নামাপরাধ-পরিহারে বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। নামাপরাধ পরিত্যাগপূর্বক নাম করিতে করিতে প্রেমধন অতি শীঘ্রই লাভ হয়।”

—‘দশমূল-নির্ঘাস’, সঃ তোঃ ৯৯

(ক্রমঃ)

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

এই মায়িক জগতে লোক প্রতিক্ষণ ত্রিতাপে জর্জরিত। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ তাপ। আধ্যাত্মিক তাপ দুইপ্রকার—জরাদি রোগজনিত শারীরিক, প্রিয়ব্যক্তির বিয়োগজনিত মানসিক। জরায়ুজ প্রাণী হইতে তাপ, অণুজ প্রাণী হইতে তাপ, এইপ্রকার আধিভৌতিক তাপ। আধিদৈবিক—দেবতাদের হাত হইতে যে তাপ উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রাদি দেবতা হইতে উৎপন্ন তাপ—বজ্রপতন, শীত ইত্যাদি। হিংস্র-স্বভাব যক্ষ, পিশাচাদি অপদেবতা হইতে অন্তঃজনক আপদ-বিপদ-ভাপাদি হইয়া থাকে। কিজন্তু এইসকল তাপ আসে, কি করিলেই বা তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কি উপায়ে হিত হয়, তাহা কিছুই জানি না। মহাপ্রভু যদি কৃপা করিয়া জানান, তবেই জানিতে পারি।

এখন আমরা মানুষের দেহ পাইয়াছি। পিতামাতা এই দেহ পালন করিয়াছেন, আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন ইত্যাদি। মৃত্যুর পর মনুষ্যদেহ লাভ করিতে পারি, আবার কর্ম্মানুসারে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, প্রস্তর, বিভিন্ন ভূচর, খেচর ও জলচর-সমূহের যে কোন জন্মও লাভ হইতে পারে। এখন যেমন আমরা প্রবাসে দুইচারি দিন বাস করি, সেইপ্রকার দেবীধামের এক একটা জন্ম প্রবাসতুল্য। পাকস্থলী আছে, খাইতে হয় ; পাকস্থলী, অন্ন ইত্যাদি খাওয়া হজম করে এবং যাহা হজম হয় না, তাহা বাহির করিয়া দেয়। জড়জগতের এই সকল

খাণ্ডের সহিত আমাদের প্রবাসতুল্যই ক্ষণিক সম্বন্ধ। যে কয়েকদিন ইহজগতে জীবন, সেই কয়দিন খাণ্ডের প্রয়োজন। জীবন চলিয়া গেলে পাঞ্চভৌতিক দেহ পড়িয়া থাকে ; কিন্তু তাহা খাণ্ড গ্রহণ বা হজম করিতে পারে না। কৃষ্ণের সহিত আমাদের এইপ্রকার অনিত্য সম্বন্ধ নহে।

ইহ জগতে আমরা কিভাবে সেবা করি ? চারিপ্রকার সম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া সেবার কার্য। পত্নী পতির, জনকজননী সন্তানের, বন্ধু বন্ধুর এবং ভৃত্য-সমূহ প্রভুর সেবা করিয়া থাকে। স্বরূপজ্ঞানের অভাবে ইহজগতে অনিত্য সম্বন্ধ-কার্য। স্বরূপে এইসকল সম্বন্ধই কৃষ্ণের সহিত। কৃষ্ণ প্রভু—নিত্য প্রভু ; আমরা তাঁহার নিত্য কেনা গোলাম। তাঁহার সেবার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াই আমাদের এই দুর্দশা—ত্রিতাপতপ্ত আমরা। তাঁহার সেবার বিরুদ্ধে অভিযান-জগুই আমাদের এই সাময়িক সম্বন্ধযুক্ত মায়িক জগতে আসিতে হইয়াছে।

বাস্তব বস্তু যাহা, তাহা না জানিবার দরুণ যত অসুবিধার উদয় হইয়াছে। এই অসুবিধার, যাবতীয় ক্লেশের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দরকার। মনুষ্য-জন্মে তাহা সম্ভব। আমরা একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যদি সাধুর নিকট শ্রীভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করি, তাহা হইলে ইহ জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের দ্বারা আমরা বড়নীবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় আকৃষ্ট হইব না। তখন ভগবানের নিত্য আকর্ষণে আকৃষ্ট থাকিব।

বৈকুণ্ঠ-শব্দকে কুণ্ঠ-শব্দের সহিত এক করিতে হইবে না। কুণ্ঠজগতে শব্দ-শব্দীতে ভেদ। বৈকুণ্ঠে শব্দ ও শব্দীতে ভেদ নাই। ইহজগতের শব্দশাস্ত্রবিদের নিকট বৈকুণ্ঠশব্দের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। ভগবানকে যিনি দেখাইয়া দিতে পারেন—২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের সেবা করেন, তাঁহার নিকট ভগবানের সেবার কথা জানিতে হইবে। শ্রীভগবানের সেবাগার ও সেবা-শিক্ষাগারই এই মঠ-মন্দির।

যদি শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ করা হয়, তাঁহার নিকট শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া নিরন্তর কীর্তন করা হয়, তাহা হইলে অপস্মৃতি বিদূরিত হয় এবং নিরন্তর কৃষ্ণের স্মৃতি হইয়া থাকে। কীর্তন প্রভাবেই স্মরণ হয়। বদ্ধদশায় নির্জ্ঞান ভজনের ছলনায় কৃত্রিম লীলাস্মরণে লোক অসুবিধায় পড়ে, ব্যভিচারী হইয়া যায়। কৃষ্ণ-ভজনে কৃত্রিমতার স্থান নাই। সরলান্তঃকরণে নিরন্তর সংকীর্তন করিতে হইবে।

প্রেমিকভক্তের কৃপাতেই প্রেমপ্রাপ্তি

ধনীব্যক্তি ধন বিতরণ করিতে, বিদ্বান্ ব্যক্তি বিদ্যা দান করিতে, জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞান শিক্ষা দিতে সমর্থ। যিনি যে বস্তুর অধিকারী তিনি সেই বস্তু অগ্ৰহে প্রদান করিতে সক্ষম। বস্তুর অধিকারী না হইলে তাঁহার দ্বারা সেই বস্তু প্রদান করা সম্ভবপর নহে। ভক্ত ব্যতীত অগ্ৰে (কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি) ভক্তি প্রদান করিতে অসমর্থ। “ভক্তিস্তু ভগবন্তু কৃমস্বেন পরিজায়তে।” ভক্তগণের মধ্যে আবার যিনি প্রেমভক্তিতে অধিকারী তাঁহার দ্বারাই প্রেমভক্তি বিতরিত হইয়া থাকে। অনর্থগ্রস্ত ভক্ত কখনও প্রেমভক্তি প্রদান করিতে যোগ্য হইতে পারেন না।

শ্রীমদ্ব্যসপ্রভু প্রেমকল্পতরু। তাঁহার লীলায় সর্বত্রই প্রেম-বিতরণ প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার গমনাগমনে সমস্ত দেশে প্রেমভক্তি বিতরিত হইয়াছিল। তদ্রূপ প্রেম বিতরণ-লীলা অগ্ৰ কোন তত্ত্বের যোগ্যতার বহির্ভূত ব্যাপার। কোনরূপ tutorial class এ দৈহিক অঙ্গভঙ্গিমা শিক্ষার বিষয় নহে। পরন্তু যদি কোথাও কোন প্রেমিকভক্তের সঙ্গলাভ করিবার ভাগ্য ঘটে, তবেই প্রেমভক্তি লাভ করা সম্ভব হইতে পারে।

নৈবাং মতিস্তাবদুরুক্রমাজ্জিৎ স্পৃশত্যানর্থাপগমো যদর্থঃ।

মহীয়সাং পাদরজোহস্তিষেকং নিক্ষিকনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

(ভাঃ ৭।১।৩২)

অর্থাৎ যতদিন মানব কোনও নিক্ষিকন মহতের পাদপদাধুলিতে অভিষিক্ত না হয়েন, ততদিন তাহার মন কখনও অনর্থবিনাশকারী কৃষ্ণপাদপদ্মে যুক্ত হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে ৫।৫।২ শ্লোকেও দেখা যায়,

মহৎসেবাং দ্বারমাহবিমুক্তেন্তমোদারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।

মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ বিমগ্নাঃ সুহৃদঃ সাধবো য়ে ॥

পণ্ডিতগণ মহতের সেবাকে সংসারমুক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গকে তমোদার অর্থাৎ মরকটদ্বার বলিয়াছেন। মহৎ বলিতে যাহারা সমচিত্ত, প্রশান্ত, অক্ৰোধী, সুহৃদ, সাধু—তাঁহাদিগকেই বুঝায়। শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাণীর মাহাত্ম্য অধিক ক্ষেত্রেই লজ্জিত হওয়ায় অর্থাৎ অধিকার বহির্ভূত আচরণ করিতে যাওয়ায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুফলের পরিবর্তে ভয়াবহ পরিণাম প্রকাশ পাইতেছে। সম্মিলন বা ভক্ত্যনুষ্ঠান সভা-সমিতিতে সুফলের পরিবর্তে কুফল বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ পরমোন্নত মহতের তুল্যভাৱ এবং দ্বিতীয়তঃ যোষিত

সমাগমের প্রবল প্রাচুর্য। সম্মেলনাদির উদ্দেশ্য সাধু থাকিলেও প্রধানতঃ তাহা বিপর্যাস্ত হইয়া পড়ে। বর্তমানে তীর্থস্থানগুলিতে প্রকৃত স্বেচ্ছা সাধুর অবর্তমানতা এবং ধনাঢ্য ভোগীকুলের প্রচুর সমাবেশ হেতু তীর্থভ্রমণের প্রকৃত ফল যেরূপ বিলুপ্তপ্রায় দেখা যায়, সেইরূপ ভক্ত্যনুষ্ঠানেও জনসমাগমে শুদ্ধভক্তির পরিবর্তে অবাঞ্ছিত অগ্ৰাভিলাষিতার পরিণাম অতীব মর্শ্বন্তদ পরিস্থিতি। কালপ্রভাবে অগ্ৰাভিলাষিতা ও ভোগবাদের যেরূপ প্রবল বিস্তার হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষমতাসম্পন্ন সাধুচেষ্টা স্তান হইয়া পড়িতেছে। কালের প্রবলশক্তির নিকট অত্যন্ত সাধুত্ব পরাভূত হইয়া অনর্থকই প্রাবল্য প্রকাশ করিতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার-লীলায় স্মৃতির অধিকারই সর্বত্র জয়যুক্ত হইয়াছে। নবদ্বীপে প্রচারের প্রারম্ভিক ক্ষেত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগোষ্ঠীর মধ্য হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও যোষিদ্রুপিনী মায়াবিজয়ী শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে তাঁহার আদেশ পালনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকটলীলার মাত্র পাঁচশত বর্ষ অতিক্রান্ত হইতে না হইতে কালশক্তির প্রভাবে সর্বত্র কুশিক্ষার বিস্তার হওয়ায় যোষিৎপ্রভাব ও ভোগবাদের তাণ্ডবতা বর্তমান সমাজে যেভাবে বিস্তৃত হইয়াছে তাহাতে উদ্ভূত পরিস্থিতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কালাপেক্ষাও ভয়াবহ, তাহা স্বধীগণ অবগুই অনুভব করিবেন। নাস্তিকত, ধর্মধ্বংসিতা, অগ্ৰাভিলাষিতা, ভোগবাদ প্রভৃতি প্রচণ্ডবেগে ভক্তিকে আচ্ছন্ন করিতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ধর্মাচরণের নামে অধর্মাচরণ ও ধর্মবিরোধ বর্তমানে ভারতের মঙ্গল বলিয়া বিবেচিত দেখা যায়। “নামসঙ্কীর্ণনং যশ্চ সর্বপাপপ্রণাশনম্, প্রণামো দুঃখশমনং, তং নম্যামি হরিং পরম্”—শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের এই উপাস্ত শ্লোকটি বর্তমানে সর্বতোভাবে উপেক্ষিত। কোনও শিক্ষাকেন্দ্রে এই পরমকল্যাণ হরির বা তাঁহার নামের শিক্ষা প্রদত্ত হয় না, পরন্তু তাহা অসত্যতা ও ঘৃণার বলিয়া বর্জিত হইয়াছে। এরূপ পরিস্থিতিতে প্রেমধর্ম-যাজন ও প্রচারণ কতদূর সফল হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। আহার-নিদ্রা-ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্ত দেশবাসী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সর্বতোভাবে তন্ময়। তাহাদের কর্ণে পরমার্থের বাণী প্রবেশ করিতে পারে না। ভোগকামনাই তাহাদের একমাত্র ধ্যেয় ও সাধ্য; অগ্ৰদিকে তাহারা কর্ণপাত করিতে সক্ষম নহে।

এ হেন কালে কি-প্রকার বলীয়ান্ আদর্শের প্রয়োজন, তাহা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ স্বয়ংই তখন অবতরণ করেন।—

যদা যদা হি ধর্মশ্চ গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মশ্চ তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ (গীঃ ৪।৭)

সুতরাং এইরূপ পরিস্থিতিতে অবস্রকার শক্তিমানের নেতৃত্বই একান্ত আবশ্যক । শ্রীমন্নহাপ্রভুর প্রচার-লীলার ভঙ্গিতে দৃষ্ট হয়,—অগ্রজ বিশ্বরূপ প্রভুর অনুসন্ধানছলে তিনি সমগ্র দাক্ষিণাত্যকে প্রেমাস্রিত করিয়াছিলেন । পুরীধামে ভক্তগণের নিকট বহুকণ্ঠে বিদায় গ্রহণ করত তিনি প্রেমে আবিষ্ট হইয়া গমন করিতে লাগিলেন ।—

মত্তসিংহপ্রায় প্রভু করিলা গমন ।

প্রেমাবেশে যায় করি' নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্ ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্ ॥

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্ ।

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্ ॥

—এই শ্লোক পড়ি' পথে চলিলা গৌরহরি ।

লোক দেখি' পথে কহে—বল 'হরি হরি' ॥

সেই লোক প্রেমমত্ত হঞা বলে 'হরি' 'কৃষ্ণ' ।

প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শন-সতৃষ্ণ ॥

শ্রীমন্নহাপ্রভুর প্রেমাবিষ্টতা কত প্রবল তাহা বিচার করিলে অনুভূত হয় যে ইহা একমাত্র তাঁহাতেই সম্ভব, অন্য কোথাও এরূপ আবিষ্টতা সম্ভবপর হইতে পারে না । তাঁহার অঙ্গীকৃত “রাধাভাব” অন্য কাহারও অঙ্গীকারের বিষয় নহে ।

শাস্ত্রে বৈষ্ণব-প্রধানের লক্ষণ বর্ণনে দৃষ্ট হয়—

“যাহারে দেখিলে মুখে আইসে হরিনাম ।

তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ॥”

প্রধান বৈষ্ণবকে দর্শন করিলে মুখে হরিনাম বাহির হইতে পারে, কিন্তু মহাপ্রভুকে দর্শন করত সকলে প্রেমোন্মত্ত হইয়া পড়িত । কেবল মনুষ্য নহে, মনুষ্যোত্তর প্রাণী, বৃক্ষ-লতা, এমন কি প্রস্তর পর্য্যন্তও প্রেমে বিগলিত হইয়াছে । তাহাদের মায়িক অস্মিতা দূরীভূত হইয়া অর্থাৎ মায়ামুক্ত হইয়া প্রেমবিকার প্রকাশ করিয়াছে । দাক্ষিণাত্যবাসিগণ এইরূপ সৌভাগ্যলাভ করত প্রেমভরে ‘হরি’ ‘কৃষ্ণ’ উচ্চারণ করিতে করিতে মহাপ্রভুকে সতৃষ্ণ-নয়নে দর্শন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদগমন করত দেহগেহকলত্রাদির চিন্তা নির্বাসিত করিয়া চুষককৃষ্ণে আকৃষ্ট হইয়া বাহজ্ঞানহারা এবং অবিচ্ছিন্ন দর্শনাকাজক্ষায় নেত্রচকোরদ্বয়কে গৌরচন্দ্রে

সংলগ্ন করিয়াছিলেন । সেই সকল ভক্ত স্বেচ্ছায় মহাপ্রভুর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইতেন না । মহাপ্রভু স্বীয় দর্শন ও পুনরপি আলিঙ্গনদ্বারা তাঁহাদিগকে যেভাবে প্রেমোন্মত্ত করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা,—

কতক্ষণে রহি' প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া ।

বিদায় করিল তারে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥

সেইজন নিজগ্রামে করিয়া গমন ।

‘কৃষ্ণ’ বলি’ হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ ॥

যারে দেখে তারে কহে—কহ কৃষ্ণনাম ।

এইমত ‘বৈষ্ণব’ কৈল সব নিজগ্রাম ॥

—এইরূপ শক্তি সঞ্চারিত ব্যক্তি কেবল যে নিজগ্রামবাসীকেই বিমুগ্ধ করিলেন, তাহা নহে ; গ্রামান্তর হইতে আগত ব্যক্তিগণও তাঁহার গায় বৈষ্ণব ও প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন ।—

গ্রামান্তর হৈতে দেখিতে আইল যত জন ।

তাঁর দর্শন-কুপায় হয় তাঁর সম ॥

শ্রীমদ্ব্যহাঙ্গপ্রভুর কুপাশক্তি ইহাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না ; পরন্তু তাহা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বিস্তৃত হইয়াছিল ।—

সেই যাই গ্রামের লোক বৈষ্ণব করয় ।

অগ্রগ্রামী আসি’ তারে দেখি’ বৈষ্ণব হয় ॥

সেই যাই অগ্রগ্রামে করে উপদেশ ।

এই মত ‘বৈষ্ণব’ হৈল সব দক্ষিণ-দেশ ॥

এইমত পথে চলিতে শত শত জন ।

‘বৈষ্ণব’ করেন তাঁরে করি’ আলিঙ্গন ॥

মহাপ্রভু যে গ্রামে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন, তথাকার অবস্থার বর্ণনা,—

যেই গ্রামে রহি’ ভিক্ষা করেন যার ঘরে ।

সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে ॥

প্রভুর কুপায় হয় মহাভাগবত ।

সেই সব আচার্য্য হঞা তারিল জগৎ ॥

এইমত কৈল যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে ।

সর্বদেশ ‘বৈষ্ণব’ হৈল প্রভুর সশব্দে ॥

এস্থলে বিচারের একটা বিশেষ গুঢ়তা আছে, তাহা সহজে সাধারণের বোধগম্য হয় না । যথা—উল্লিখিত পয়ার—“প্রভুর কুপায় হয় মহাভাগবত ।” কেবল

চাম্বুধ-দর্শনকারী সকলেই মহাভাগবত বা প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিল—তাহা বুঝিতে হইবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ দর্শনকারীই মহাভাগবত বা তীব্র প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন বুঝিতে হইবে। সাধারণ দর্শনকারী সকলে বুঝিতে হইবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ—মহাপ্রভুরই সঙ্গী এবং তাঁহার জলপাত্রাদিবাহক কৃষ্ণদাস সরল ব্রাহ্মণ। সমগ্র দাক্ষিণাত্য যাহার দর্শনে ও উপদেশে মহাভাগবত ও প্রেমাপ্লুত হইল, সেই প্রেমকল্লতরুর সাহচর্যে থাকিয়া এবং অলৌকিক লীলা দর্শন করিয়াও কৃষ্ণদাসের পক্ষে ভট্টথারিদের যোষিৎপ্রভাবে বিমোহিত হওয়া কি-প্রকারে সম্ভবপর হইয়াছিল? এস্থলে সিদ্ধান্ত :—

“ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে। সেই ত’ ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে ॥”
 ব্রহ্মাজীর প্রতিও ইহাই পরিব্যক্ত—“তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্ত তে মদনুগ্রহাৎ ॥”
 শ্রীল স্বরূপদামোদরের উক্তি তেও তাহাই প্রকাশিত,—

স্বরূপ কহে,—যাতে জানিল তোমার মন।

তাতে জানি,—হয় তোমার কৃপার ভাজন ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১।৭২)

দাক্ষিণাত্যে প্রেম বিতরণ-লীলাটী শ্রীমন্মহাপ্রভু-লীলার একটি অভিনব অধ্যায়। এই লীলা তাঁহার নবদ্বীপ-লীলাতেও প্রকটিত করেন নাই।—

নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।

সেই শক্তি প্রকাশি’ নিস্তারিল দক্ষিণদেশে ॥

প্রভুকে যে ভজে, তারে তাঁর কৃপা হয়।

সেই সে এ-সব লীলা সত্য করি’ লয়।

অলৌকিক লীলায় যার না হয় বিশ্বাস।

ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ ॥

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী দাক্ষিণাত্যে প্রকটিত এই প্রেমদান-লীলাকে অলৌকিক এবং ঐশ্বরিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা ভগবানে ভক্তিমান্ ব্যক্তিই অনুভব ও বিশ্বাস করেন, অন্তের বোধগম্য হয় না।

“ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ॥”

অর্থাৎ—আমি সাধুদিগের প্রিয়, তাহাদের অনন্তশ্রদ্ধাজনিত ভক্তিদ্বারাই তাহারা আমাকে জানিতে ও লাভ করিতে সমর্থ; অন্তে নহে। যথা—

দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।

উলুকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৮৫)

“শ্রীকৃষ্ণস্ত শ্রীচৈতন্যাবতারে ভাগবতাদয়ঃ যথা স্পষ্টং প্রমাণং তথা ব্যক্তং তৎপ্রভাবাদিকমপি তত্র প্রত্যক্ষং প্রমাণম্। তদপি সূর্য্যাকিরণমূলকবৎ অভক্তা-

স্তং ন পশ্যন্তি ন জানন্তি । যথা চক্ষুশ্চক্ষুঃ এবং সূর্য্যাকিরণং পশ্যন্তঃ ধর্ম্মকর্ম্মাদিনা তৎসুখম্ অনুভবন্তি, পেচকস্ত বৃক্ষকোটরমবলম্ব্য কেবলমন্ধকার-দুঃখমনুভবতি তথা চৈতন্যকৃষ্ণপ্রভাবাদিকং জানন্তঃ ভক্তা এব হরিসঙ্কীর্ণনযজ্ঞৈস্তং যজন্তঃ পরম-মনির্ব্বচনীয়ং সুখমনুভবন্তি, অভক্তাস্ত গৃহমবলম্ব্য কেবলং সংসারদুঃখমনুভবতি ।”
—চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ।

সজ্জনগণ সূর্য্যোদয়ে ধর্ম্মকর্ম্মাদি আচরণ করত সুখী হয়েন, পেচক কিন্তু সূর্য্য-কিরণ অরোচকত্বহেতু বৃক্ষকোটরে অবস্থান করত কেবল অন্ধকার বা দুঃখই ভোগ করে । এই প্রকার শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া ও অলৌকিক প্রভাব দর্শন করিয়া ভক্তগণ সংকীর্ণনযজ্ঞে তাঁহার ভজন করত পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন, অভক্তগণ কিন্তু স্বীয় দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রীচৈতন্যবিমুখ হইয়া সংসারে আসক্ত হইয়া কেবল সংসার-জালায় দহমান হয় ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্তিবেন্দোত্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

মায়ামুক্তগণেরই বহু দেবযজন

ভোগবাসনাদ্বারা বিনষ্টবিবেক কৃষ্ণবিমুখ জীবগণ অনাদিকাল হইতে ফলকামী হইয়া অর্থাৎ ভোগানুকূল-বিষয় পশু, পুত্রাদি প্রাপ্তির জন্তু সকাম হইয়া স্বীয় কৃচির অনুকূল স্বভাবক্রমে নানা দেবদেবীর উপাসনায় রত আছেন । স্ব-স্ব-বিচারে যেক্রপ কামনার উদয় হয়, তত্তৎ কাম পরিতৃপ্তির জন্তু উপাত্ত বস্তুর বিভিন্নরূপ কল্পিত হয় । যদিও অল্পবুদ্ধি দেবতাস্তর-ভক্তগণের আরাধনার ফল নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য, তথাপি উহা শীঘ্র লাভ হয় বলিয়া তাহারা উহাতেই আসক্ত হইয়া পড়েন । সর্ব্বেশ্বর ভগবানের উপাসনা করিলে নিত্যকল লাভ হইলেও উহা বিলম্বে হয়, এই বুদ্ধিতে ভোগবাসনাযুক্ত সদস্য বিবেকরহিত জীবসমূহ শীঘ্র ফললাভের প্রত্যাশী হইয়া ভগবান্ ভিন্ন অগ্ন দেবতার প্রতি অনুরক্ত ও ভক্তিসম্পন্ন হইতে গিয়া সংসারে অশেষ জালাযন্ত্রণা লাভ করেন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণমালা পরিধানপূর্ব্বক ত্রিতাপজালা ভোগ করিয়া থাকেন । সকাম শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত কিন্তু কৃষ্ণ-রূপায় ক্রমশঃ কাম্যবিষয়ে নিষ্পৃহ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক-ভজন লাভ করিতে পারেন । শ্রীহরিভজনকারী ইহ জগতে অত্যন্ত বিরল ।

নারদ পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে,—“মানবসমূহ সত্ত্বের সহিত রজোগুণের মিশ্রণে সূর্যোপাসনা, সত্ত্বের সহিত তমোগুণের মিশ্রণে গণেশোপাসনা, রজোগুণের সহিত তমোগুণের মিশ্রণে শক্তির উপাসনা এবং কেবল তমোগুণে শিবোপাসনা করিয়া থাকেন।” সত্ত্বরজোমিশ্র স্বভাবদম্পর ব্যক্তিগণ লৌকিক ধর্মকে প্রাপ্য জ্ঞান করেন। সত্ত্বতমঃ স্বভাবে অর্থপ্রাপ্ত্যাশায় গণেশের উপাসনা, রজস্তমঃ স্বভাবে কাম পরিতৃপ্তির জন্ত শক্ত্যুপাসনা এবং তমঃস্বভাবে মোক্ষাকাজ্যবশে শিব-উপাসনায় রুচি হইয়া থাকে। বিষ্ণুর উপাসনায় কোন কামনা নাই। ভোগপর উদ্দেশ্যেই কামনার উদয় হয়। কামদেব বিষ্ণুর কামনা অর্থাৎ তাঁহার অভিলাষ পূরণরূপ সেবাই জীবের নিত্যধর্ম। নিত্যধর্মের বিস্মৃতি হইতেই বিষ্ণুস্বরূপ পরিবর্তন করিয়া নিজকাম পরিতৃপ্তির জন্ত সমশীল দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্তি ঘটে, এই প্রদক্ষে শাস্ত্রে উল্লেখ রহিয়াছে,—

রজঃ স্তমঃ প্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ ।

পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজ্ঞেপসবঃ ॥ (ভাঃ ১।২।২৭)

“রজস্তমঃ স্বভাবযুক্ত জনগণ শ্রী-বিত-পুত্রকামী হইয়াই সমস্বভাববিশিষ্ট ফলদাতা পিতৃ-ভূত-প্রজাপতি প্রভৃতি ইতর দেবতাগণকে যজ্ঞ করিয়া থাকেন।” শাস্ত্রের অগ্ৰত্ৰণ্ড পাওয়া যায়,—

স চাপি ভগবদ্বর্ষ্যং কামমূঢ়ঃ পরাঙ্গুথঃ ।

যজতে ক্রতুভির্দেবান্ পিতৃশ্চ শ্রদ্ধয়াহিতঃ ॥ (ভাঃ ৩।৩২।২)

“মূঢ় ব্যক্তিসমূহ ভগবদারাধনারূপ আত্মধর্ম হইতে বিমুখ ও কামমূঢ়তাবশতঃ কর্মমার্গে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বিবিধবাক্যের দ্বারা প্রাকৃত দেবতা ও পিতৃপুরুষগণের পূজা করিয়া থাকেন।” অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের অগ্ৰত্ৰণ্ড (ভাঃ ২।৩।২-১০) উক্ত আছে,— ব্রহ্মবর্চনকামস্ত যজ্ঞেত ব্রহ্মণঃ পতিম্ ।

ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্ত প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্ ॥

দেবীং মায়ান্ত শ্রীকামন্তেজস্কামো বিভাবস্তুম্ ।

বসুকামো বসুন্ ক্রদ্রান্ বীর্য্যকামোহথ বীর্য্যবান্ ॥

অন্নাত্মকামস্তদিতিং স্বর্গকামোহদিতৈঃ স্ততান্ ।

বিশ্বান্ দেবান্ রাজ্যকামঃ সাধ্যান্ সংসাধকো বিশাম্ ॥

আয়ুকামোহশ্বিনো দেবো পুষ্টিকাম ইলাং যজ্ঞেং ।

প্রতিষ্ঠাকামঃ পুরুষো রোদসী লোকমাতরো ॥

রূপাভিকামো গন্ধর্ব্বান্ স্ত্রীকামোহপ্সর উর্ব্বশীম্ ।

আধিপত্যকামঃ সর্বেষাং যজ্ঞেত পরমেষ্ঠিনম্ ॥

যজ্ঞং যজেদ্ যশস্কামঃ কোষকামঃ প্রচেতসম্ ।
 বিত্বাকামস্ত গিরিশং দাম্পত্যার্থ উমাং সতীম্ ॥
 ধর্ম্যার্থ উত্তমঃশ্লোকং তত্ত্বং তত্বন্ পিতৃন্ যজেৎ ॥
 রক্ষাকামঃ পুণ্যজনানোজস্কামো মরুদগণান্ ॥
 রাজ্যকামো মনুন্ দেবান্ নিখতিং ত্বভিচারন্ যজেৎ ।
 কামকামো যজেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরম্ ॥
 অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
 তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

“ব্রহ্মতেজ-কামী ব্রাহ্মণদিগের পতি ব্রহ্মার আরাধনা করেন। ইন্দ্রিয়বল-কামী ইন্দ্রকে ভজনা করেন। প্রজাকামী ব্যক্তি প্রজাপতিদিগকে ভজনা করেন। শ্রী-কামী ব্যক্তি মায়াদেবীর পূজা করেন। তেজঃকামী সূর্য্যকে, বহুকামী ব্যক্তি বহুদিগকে এবং বীৰ্য্যকামী বীৰ্য্যবান্ পুরুষ রুদ্রকে যজন করিয়া থাকেন। অন্নাদিকামী পুরুষ অদিতিকে উপাসনা করেন। স্বর্গকামী ব্যক্তি অদিতিপুত্র দেবগণকে, রাজ্যকামী ব্যক্তি বিশ্বদেবতাকে এবং স্বাধীনতাপ্রয়াসী প্রজাগণ সাধ্যাগণকে উপাসনা করেন। আয়ুষ্কামী ব্যক্তি অশ্বিনীকুমারকে, পুষ্টিকামী পৃথিবীকে এবং প্রতিষ্ঠাকামী পুরুষ লোকদিগের জননী ছাড়া পৃথিবীকে পূজা করেন। রূপকামী গন্ধর্ব্বগণের, স্ত্রী-কামী উর্কশী অপসরার এবং আধিপত্যকামী ব্যক্তি সকলের প্রধান পরমেশ্বির আরাধনা করেন। যশঃকামী ব্যক্তি যজ্ঞপতি বিশ্বকে, কোষকামী ব্যক্তি প্রচেতাগণকে, বিত্বাকামী শিবকে এবং দাম্পত্যকামী উমাদেবীকে ভজনা করেন। ধর্ম্মার্থকামী উত্তমঃশ্লোক বিশ্বর, প্রজাবিস্তৃতিকামী পিতৃগণের এবং রক্ষাকামব্যক্তি যক্ষগণের পূজা করেন। ওজঃকামী ব্যক্তি মরুদগণকে, রাজ্যকামী ব্যক্তি মনু ও দেবগণকে, অভিচারকামী নিখতিকে এবং কামকামী সোমকে ভজনা করেন। অকামপুরুষ পরমপুরুষ ভগবানকে ভজন করেন। ভগবান্ সকল কাম দিতে পারেন, অপর দেবতাগণ তাঁহার কৃপায় সামান্ত ফল দেন, তখন উদার ব্যক্তি তাঁর ভক্তির সহিত পরমপুরুষকে অকাম, সর্বকাম বা মোক্ষকাম হইয়া যজন করেন।”

ভূতপূজকগণ—তমোগুণপ্রধান, তাঁহার বলি প্রভৃতির দ্বারা যক্ষ, রাক্ষস ও বিনায়কাদির পূজা করিয়া জীবিতোত্তরকালে ভূতলোকে গমন করিয়া থাকেন। পিতৃব্রতগণ—রজোগুণপ্রধান, তাঁহার শ্রাদ্ধাদি কৰ্ম্মপ্রভৃতির দ্বারা পিতৃপুরুষদিগকে যজন করিয়া মরণের পরে পিতৃলোকেই গমন করিয়া থাকেন। দেবপূজকগণ—

সবুগুণপ্রধান, তাঁহারা দশপৌর্ণমাশ্চাদি-কর্মের দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণকে পূজা করিয়া জীবনান্তে অনিত্য দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণদাস জীবের স্বরূপধর্ম সুপ্ত হওয়ায় জীবোপাধিদ্বয় স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরদ্বারা সুখদুঃখ ভোগের নিমিত্ত তাহারা এই সকল লোক অর্থাৎ নখর গতি লাভ করিয়া থাকেন। কামের জন্ত যাহারা বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার উপাসনা করেন, কাজিফত বিষয়মাত্র পাইয়া তাহাদের কাম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কাম থাকিলেও কৃষ্ণভজন করিলে অচিরে নিকামফল পাওয়া যায়।

বিষ্ণুসেবা ব্যতীত অন্যদেবতার অর্চন—মহাপরাধমূলক

ও অমঙ্গলজনক

মহাভারতের হরিবংশে পাওয়া যায়,—

যন্ত বিষ্ণু পরিত্যজ্য মোহাদন্তমুপাসতে ।

স হেমরাশিমুৎসজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি ॥

“যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে হেমরাশি ত্যাগপূর্বক ধূলিরাশি গ্রহণের ইচ্ছা করে।” স্কন্দপুরাণের সেতুখণ্ডে —“যদি মোহাৎ তু বিবুধান্ স চাণ্ডালো ভবেদ্ ধ্রুবম্” অর্থাৎ “যদি কেহ মোহবশতঃ অন্য দেবতার পূজা করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই চণ্ডাল হয়।”

মোহাদ্ যো ব্রাহ্মণো ভূত্বা হজ্জানাজ্ জ্ঞানপূর্বতঃ ।

অর্চয়েদ্বিধ্বাংশেচতুর্নু বিনা বিষ্ণুমধোগতিঃ ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)

“যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়াও মোহবশতঃ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার অর্চন করে, তাহাদের অধোগতি হয়।” পদ্মপুরাণে ভৃগু ভগবানকে বলিয়াছেন,—“হে পুরুষোত্তম। যাহারা তোমা ব্যতীত অপর দেবতার অর্চন করে, তাহারা পাষণ্ড প্রাপ্ত হইয়া সর্বজন নিন্দিত হয়।” স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা-নারদ সংবাদে পাওয়া যায়,—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোহন্যদেবমুপাসতে ।

তাত্ত্বামৃতং স মৃঢ়াত্মা ভুঙ্ক্তে হলাহলং বিষম্ ॥

“বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া যে অন্যদেবতার উপাসনা করে, সেই মৃঢ়াত্মা অমৃত ত্যাগপূর্বক হলাহল বিষপান করে।”

যথা ধৃত্বা শুনঃ পুচ্ছং ততুর্মিচ্ছেৎ সরিৎপতিম্ ।

তথা ত্যক্তা হরিং সেব্যমন্যোপাসনয়া ভবম্ ॥ (পদ্মপুরাণ)

“লোক যেরূপ কুকুরের লেজ ধারণ করিয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে, তদ্রূপ শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া মূঢ় ব্যক্তি অন্তের উপাসনাদ্বারা সংসার উত্তীর্ণ

হইতে ইচ্ছা করে ।” শ্রীভগবানের আরাধনা ব্যতীত অণু সমস্ত কিছু নশ্বর ও তুচ্ছ বলিয়া (ভাঃ ৬।২।২২) “অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং স্বেনৈব” শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, “যে ব্যক্তি স্থনিশ্চিতরূপে স্বীয়লাভে পরিপূর্ণকাম ও প্রশান্ত শ্রীগোবিন্দ বিনা অপরকে উপাসনা করে, সেই মূর্খ নিশ্চয়ই কুকুরের লাদুল অবলম্বনে কিছু অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করে ।” বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে দৃষ্ট হয়, “যদি বৈষ্ণব অথবা ব্রাহ্মণ ভগবান্ ভিন্ন অপর অবৈষ্ণব দেবতার অর্চন করেন, তাহা হইলে তিনি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন ।”

ব্রাহ্মণোহপি মুক্তিঞ্চানী দেবমণ্যং ন পূজয়েৎ ।

মোহেন কুরুতে যন্ত সত্ত্বশাণ্ডাতাং ব্রজেৎ ॥ (নারদীয়পুরাণ)

“মুনি ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণ অণু দেবতার পূজা করিবেন না । যিনি মোহবশতঃ অণু দেবতার পূজা করেন তিনি নিশ্চয়ই পাপগুণী । যে ব্রাহ্মণ শঙ্করাদি অপর দেবতার নিম্নালা জ্ঞানপূর্বক একবারও ভক্তি করেন, সে নিশ্চয়ই চণ্ডাল হয় এবং সহস্রকোটি কল্পকাল নরকাগ্নিতে দগ্ধ হয় ।” স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে,—

স কৰ্ত্তা সৰ্ব্বধৰ্ম্মানাং ভক্তো যন্তব কেশব ।

স কৰ্ত্তা সৰ্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যত ॥

“হে কেশব, যিনি তোমার ভক্ত, তিনি সর্বধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ; হে অচ্যুত, যিনি তোমার ভক্ত নহেন অর্থাৎ অণু দেবতার ভক্ত, তিনি সর্বপাপের অনুষ্ঠানকারী ।” কুন্দ্রয়ামলে পাওয়া যায়,—

ইতরেষাঞ্চ দেবানাং মনসা যদি পূজনম্ ।

বিষ্ণুভক্তস্ত কুরুতে হুপরাধাং পতত্যাধঃ ॥

“বিষ্ণুভক্ত যদি মনে মনেও অপর দেবতার পূজা করেন, তাহা হইলে অপরাধ-হেতু পতিত হন ।” পদ্মপুরাণের উক্তিটিও স্মরণযোগ্য,—

বৈষ্ণবো নান্যবিবুধানর্চয়েতাংশ্চ নো নমেৎ ।

ন পশ্বেত্যন্ন গায়েচ্চ ন নিন্দেনস্মরেতথা ॥

“বৈষ্ণব অণুদেবতার পূজা করিবেন না, তাঁহাদিগকে প্রণাম ও দর্শন করিবেন না, তাঁহাদিগের গান, নিন্দা, স্মরণ ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবেন না ।”

শ্রীহরি—সর্বময়, তাঁহার সেবায় সকল দেবতা সেবিত হন

শ্রীভাগবত (৪।৩।১৪) “যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি” শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, “মূলে জলসেকদ্বারা বৃক্ষের স্কন্ধ, ভুজ ও উপশাখাসকল যেরূপ তৃপ্ত হয়, প্রাণে আহার প্রদানদ্বারা ইন্দ্রিয়সকলের যেরূপ তৃপ্তি হয়, সেইরূপ ভগবান্ অচ্যুতের পূজাতে সকল দেবতারই পূজা হইয়া থাকে ।” মহাভারতের ভীষ্মপর্বের উত্তর-গীতাতে পাওয়া যায়,—

দেবাদীনাঞ্চ পূজ্যোহং বর্ণাদীনাং ধনঞ্জয় ।

মৎপূজনেন সৰ্ব্বাৰ্চা শ্রাদ্ধবং নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥

“আমি দেবাদের ও বর্ণাদের পূজ্য । আমার পূজাতে নিশ্চয় সকলের পূজা হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ।” শ্রীভাগবতে (১১।৫।৪১) “দেবর্ষিভূতাপ্তনৃনাং পিতৃণাম্” শ্লোকে নবযোগেন্দ্র নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন,—“হে রাজন ! যিনি অপর কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শরণ্য মুকুন্দের সৰ্ব্বতোভাবে শরণাগত হন, তিনি দেবতা, ঋষি, ভূত, আপ্ত, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট ঋণী হন না ।”

অর্চিত্তে দেবদেবেশ অঙ্কশঙ্কগদাধরে ।

অর্চিত্তাঃ পিতরোদেবা যতঃ সৰ্ব্বময়ো হরিঃ ॥ (স্কন্দপুরাণ)

“পদ্ম-শঙ্ক-গদাধর দেবদেবেশ শ্রীভগবান্ অর্চিত্ত হইলে দেবগণ ও পিতৃগণ অর্চিত্ত হন, যেহেতু হরি সৰ্ব্বময় ।”

দেবতান্তরের ভজন ভগবদ্ভক্তি উদয়ের কারণ নহে । কিন্তু কোনও ভাগ্যক্রমে ভাগবত-সঙ্গলাভই ভক্তির উদয়ের একমাত্র কারণ জানিতে হইবে । কারণ দেবতা-গণের নিজেদেরই যখন নিঃশ্রেয়োলাভ ঘটে নাই, তখন তাঁহারা কি করিয়া অপরকে নিঃশ্রেয়োলাভ করাইতে পারিবেন ? অনেক জন্মের গোবিন্দভজন-প্রভাবে যে ব্যক্তি এই সংসারে পুনঃ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া সৎগুরু নিকট শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্র গ্রহণপূর্বক অনন্ত হইয়া অপর নানাবিধ দেবতাবৃন্দকে কায়মনোবাক্যে পরিত্যাগ করিয়া পতিনিষ্ঠরূপে একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করেন, তিনি পাংশুরাশি অর্থাৎ অপরিমিত ধূলিরাশির ত্রায় বিবিধ যোনি ভ্রমণ-গতাগতি-জন্মমরণ-সংসারবন্ধন-প্রবাহ সৰ্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া হেমরাশি অর্থাৎ স্বর্ণ-নিধিপ্রাপ্তির ত্রায় শ্রীগোবিন্দের নিজদাস পদবী প্রাপ্ত হন ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈদ্য বোধায়ন মহারাজ

“জড়াসক্তির প্রাবল্যই আমাদেরকে শ্রীজগন্নাথসেবায় বাধা প্রদান করে । জগদর্শন—প্রাকৃত দর্শন থাকা পর্য্যন্ত আমাদের অপ্রাকৃত জগন্নাথ-দর্শনে রুচি জন্মে না । সমগ্র জগৎকে জগন্নাথের সেবায় নিযুক্ত করাই রথযাত্রা উৎসবের তাৎপর্য্য ।”

“যাঁহারা চাতুর্মাশ্র-ব্রত পালন না করিয়া কেবলমাত্র ‘উর্জ্জাদর’ করিয়া থাকেন, তাঁহারা চাতুর্মাশ্রের ভক্তিফল সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারেন না । ইহার দ্বারা চাতুর্মাশ্রের প্রতি অনাদরই প্রকাশ পায় ।”

—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

অমল শ্রীপুরুষোত্তম-মাস

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস সম্বন্ধে অভিযোগ

অভিযোগটা এইপ্রকার—“শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীপুরুষোত্তম-মাসের নামোল্লেখ নাই। অধিমাংস নামে যে রূপ কৃত্য দেখা যায়, তাহা নিতান্তই কৰ্মকাণ্ডীয়, অতএব এই মাসটা বৈষ্ণবগণ-কর্তৃক অপালনীয়।” অত্যাচারী সাত্ত্বিক-শাস্ত্রে উল্লিখিত শ্রীপুরুষোত্তম-মাসের যথার্থতা উক্ত অভিযোগকারিগণের সামনে উপস্থাপিত করিলেও তাঁহারা বলিয়া উঠেন,—“তাহা কি শ্রীল সনাতন-গোস্বামী জানিতেন না?” ইহাতে তাঁহাদের নীরেট মাংসর্ঘ্যই প্রকাশিত হয়। পরমাদরলীয় শ্রীভক্তি-বিনোদ-বিচারধারার বিরোধিতা না করিলে অপমানস্প্রদায়িকতা প্রমাণিত হয় না। “মাংসর্ঘ্য চণ্ডাল কেনে ইহা বসাইলা। পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা ॥”—এইরূপ অপবিত্র, মলময় মলিন-স্থানে শ্রীপুরুষোত্তম-মাস মলমাসরূপেই প্রতিভাত হন।

স্মার্তগণের বিরোধিতামুখে নিজেদের বৈষ্ণবতার পরিচয় দিতে আবার ইহারা বলেন,—“স্মার্তপ্রধান রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংগৃহীত মলমাংস-কৃত্যসমূহ যথা—দান, ব্রত, স্নানাদি শুধুমাত্র ফলকামি-কৰ্ম্মিগণের অত্যাভিলাষকে পুষ্ট করিবার জগুই—তাহার সহিত বৈষ্ণবগণের সম্পর্ক কোথায়?” ভূতের মুখে রাম নাম যে রূপ—তদ্রূপ ইহাদের স্মার্তবিরুদ্ধাচরণ। বাস্তব বিচারে ইহারা নিতান্তই স্মার্তপদাবলেহনকারী—ইহাও ক্রমে এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে।

বস্তুতঃ “কোন প্রকার সদ্যুক্তিই বুঝিব না” বলিয়া তাঁহাদের ব্রত। সেস্থলে পুরুষোত্তম-ব্রত কিরূপে পালনীয় হইতে পারে? অবশেষে নিয়লিখিত অকাট্য, শাণিত যুক্তিধারার সম্মুখীন হইলে ‘যেন তেন প্রকারেণ’ তড়িৎ মীমাংসায় উপনীত হইতে বলিয়া উঠিলেন,—“তবে গুরুবর্গের আদেশে এইরূপ কৃত্য হইলে অবশ্য কিছুই বলিবার নাই।” আহা! কিরূপ গুরুভক্তি! ধরাশায়ী হইয়াও দুই ব্যক্তি যে রূপ বলে,—“মাথা মাটিতে ঠেকিলে কি হইবে, নাক কি হৃদর আকাশমুখী হইয়া আছে।”—তদ্রূপ।

শ্রীসজ্জনতোষণীদ্বত শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য

গুরুভক্তিশ্রোতের পুনঃ প্রবর্তক জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তৎকালীন একমাত্র পারমাথিক-পত্রিকা শ্রীসজ্জনতোষণীতে সর্বপ্রথম “শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-

মাহাত্ম্য” সর্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন। তৎপ্রকাশিত উক্ত শব্দপ্রমাণ-সমূহই বর্তমান প্রবন্ধের মূল কাঠামো।

“শ্রীনারদীয় পুরাণে অধিমা-স-মাহাত্ম্য একত্রিংশৎ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। দ্বাদশ মাসের আধিপত্য ও আপনার অপমান বিচার করিয়া অধিমা-স বহু কষ্টে বৈকুণ্ঠে গমন করত নিজদুঃখ শ্রীনারায়ণকে জানাইয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠপতি কৃপা করিয়া অধিমাসকে সঙ্গে লইয়া গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অধিমাসের আৰ্ত্তি শ্রবণ করত দয়াদ্র হইয়া বলিলেন,—

অহমেতৈর্বথা লোকে প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ।

তথায়মপি লোকেষু প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

অস্মৈ সমর্পিতাঃ সর্বৈ য়ে গুণা ময়ি সংস্থিতাঃ ।

মৎসাদৃশমুপাগম্য মাসানামধিপো ভবেৎ ॥

জগৎপূজ্যো জগদ্বন্দ্যো মাসোহয়ং তু ভবিষ্যতি ।

সর্ব মাসাঃ সকামাশ্চ নিকামোহয়ং ময়া কৃতঃ ॥

অকামঃ সর্বকামো বা যোহধিমাংসং প্রপূজয়েৎ ।

কর্মাণি ভক্ষ্যমাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যংশয়ম্ ॥

কদাচিন্মম ভক্তানামপরাধেতি গণ্যতে ।

পুরুষোত্তম-ভক্তানাং নাপরাধঃ কদাচন ॥

য এতন্নিম্নহামৃঢ়া জপ-দানা-দি-বর্জিতাঃ ।

সংকর্ম-স্নান-রহিতা দেব-তীর্থ-দ্বিজদ্বিষাঃ ॥

জায়ন্তে দুর্ভাগা দুষ্টাঃ পরভাগ্যোপজীবিনাঃ ।

ন কদাচিৎ স্তুতং তেষাং স্বপ্নেহপি শশশৃঙ্গবৎ ॥

যেনাহমর্চিতো ভক্ত্যা মাসেহস্মিন্ পুরুষোত্তমে ।

ধন-পুত্র-স্বখং ভুংক্ত্বা পশ্চাদ্ গোলোকবাসভাক্ ॥

ইহার অর্থ এই যে—হে রমাপতে! আমি যে-রূপ এই জগতে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত, এই অধিমা-সও লোকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত হইবে। আমাতে যে-সমস্ত গুণ আছে, সেই সমস্তই এই মাসে অর্পিত হইল। এই মাস জগৎপূজ্য ও জগদ্বন্দ্য। অতঃ সকল মাস সকাম। এই মাসটী নিকাম। যিনি অকাম হইয়া বা সর্বকাম হইয়া এই মাসের পূজা করেন, তিনি সকল কর্ম ভক্ষ্যমাং করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হন। আমার ভক্তদিগের কদাচিৎ অপরাধ হয়, এই পুরুষোত্তম-মাসের ভক্তগণের কখনই অপরাধ হইবে না। যে-সকল মহামুঢ় এই অধিমাসে জপ-দানা-দি-বর্জিত, সংকর্ম ও স্নানা-দি-রহিত এবং দেব-তীর্থ ও

দ্বিজগণের প্রতি বিদেহ করে, সেই সকল দুষ্ট দুর্ভাগা পরভাগ্যোপভীবি হইয়া স্বপ্নেও কিছুমাত্র সুখ পায় না। এই পুরুষোত্তম-মাসে যিনি আমাকে ভক্তিপূর্বক অর্চন করেন, তিনি ধন-পুত্রাদি সুখ ভোগ করিয়া অবশেষে গোলোকবাসী হন।”

শ্রীমজ্জনতোষগীধৃত শ্রীপুরুষোত্তম-মান-মাহাত্ম্যের ইহাই মূল অংশ। পরবর্তীতে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় উক্ত মান প্রসঙ্গে পৌরাণিক কাহিনী, জ্ঞানবিধান, উপাসনাপদ্ধতি, কর্তব্যাকর্তব্য-বিচারসমূহ ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে বর্তমান প্রবন্ধে বক্তব্য বিকাশের জন্য শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় অংশই উদ্ধৃত হইবে।

পুরুষোত্তম অর্থে শ্রীলীলাপুরুষোত্তম

প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে—অধিমাসের অধিদেবতারূপে যে পুরুষোত্তম নির্ণীত হইলেন তাঁহার পরিচয় কি? কারণ লীলা-পুরুষোত্তম, একল পুরুষোত্তম, মর্যাদা-পুরুষোত্তমাদি রূপে নানাপ্রকার বিচার শাস্ত্রে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। সেই শঙ্কাকে নিরস্ত করিতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উক্ত শ্রীনারদীয় পুরাণ হইতেই শ্রীপুরুষোত্তম-মানে উপাসনাপদ্ধতি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

“শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ষুগলোপাসনাই কর্তব্য, যথা—

আগচ্ছ-দেবদেবেশ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।

রাধয়া সহিতাশ্চ গৃহাণ পূজনং মম ॥

পুনঃ,— গোবর্দ্ধন-ধরং বন্দে গোপালং গোপকৃপিনম্।

গোকুলোৎসবমীশানং গোবিন্দং গোপিকাপ্রিয়ম্ ॥

কৌণ্ডিনেন পুরা প্রোক্তমিমং মন্ত্রং পুনঃপুনঃ।

জপন্যাসং নয়েন্তু ভক্ত্যা পুরুষোত্তমমাপ্নুয়াৎ ॥

ধ্যায়েন্নবঘনশ্রামং দ্বিভূজং মুরলীধরম্।

লসৎ পীতপটং রম্যং সরাদং পুরুষোত্তমম্ ॥

ধ্যায়ং ধ্যায়ং নয়েন্যাসং পূজয়ন্ পুরুষোত্তমম্।

এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা স্বাভীষ্টং সর্বমাপ্নুয়াৎ ॥

‘গোবর্দ্ধন-ধরং’—প্রভৃতি মন্ত্রটী পূর্বে কৌণ্ডিন্য-মুনি পুনঃপুনঃ জপ করিয়া ছিলেন। এই মন্ত্র ভক্তিপূর্বক শ্রীপুরুষোত্তম-মানে জপ করিয়া পুরুষোত্তম প্রাপ্ত হইবে। নবঘন, দ্বিভূজ মুরলীধর, পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত নিয়ত ধ্যান করিতে করিতে পুরুষোত্তম-মাসকে যাপিত করিবেন। যিনি ভক্তিপূর্বক একরূপ করেন, তিনি সকল অভীষ্ট লাভ করেন।”

সুতরাং গোবর্দ্ধনধারী, গোপিকাপ্রিয়, গোকুলোৎসব—শ্রীকৃষ্ণ যিনি শ্রীমতী

রাধারাণীর সহিত নিত্যবিলাসকারী, সেই শ্রীলীলাপুরুষোত্তমই অধিমাসের একচ্ছত্র অধিনায়ক। “স্বয়ং ভগবান্ আর লীলাপুরুষোত্তম। এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৪০)। রূপানুগ ভক্তচক্রকূলের মধ্যমণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার “শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিদ্যু”তে দ্বারকাধ্যান, মহিবীবৃন্দের পূজা আগমাদি শাস্ত্রে বিহিত থাকিলেও নিজভাবের প্রতিকূল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাই শ্রীচক্রবর্ত্তী-চরণানুগগণ স্বরাট্ট শ্রীপুরুষোত্তম-মাসের শুভবিজয়ে পরম নিশ্চিন্ত হইয়া তদধিপতি শ্রীগান্ধারী-গিরিধারীর উপাসনায় নিযুক্ত হন।

অগ্ন্যাগ্ন্য মাসাপেক্ষা অধিমাসই সর্ববশ্রেষ্ঠ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অধিমাসের সর্বোৎকর্ষতা প্রতিপাদন করিতে বলিয়াছেন,—“হে জীব! কেন অধিমাসে হরিভজনে আলস্য কর? এই মাস শ্রীমদ্ গোলোকনাথ-কর্তৃক সর্বোপরি স্থাপিত হইয়াছে। এমনকি পুরুষোত্তম-মাস কার্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি, মহাপুণ্য মাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই মাসে বিশেষ ভজন-বিধির সহিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণার্চন কর, সমস্ত লাভ হইবে।”

এতদ্ব্যন্থে অগ্ন্যাগ্ন্য দ্বাদশমাসের দ্বাদশদেবতার পরিচয়ও আলোচ্য।

দ্বাদশ মাসের দেবতা—এই বার জন। মার্গশীর্ষে কেশব, পৌষে নারায়ণ ॥
মাঘের দেবতা মাধব, গোবিন্দ ফাল্গুনে। চৈত্রে বিষ্ণু, বৈশাখে শ্রীমধুসূদনে ॥
জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে বামন দেবেশ। শ্রাবণে শ্রীধর, ভাদ্রে দেব হৃষীকেশ ॥
আশ্বিনে পরশুনাথ, কার্তিকে দামোদর। ‘রাধা-দামোদর’ অগ্ন্য ব্রজেন্দ্র-কোঙর ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৯৮-২০১)

শ্রীমনাতন-শিক্ষায় শ্রীমদ্ব্যাহ্যপ্রভু এইরূপে দ্বাদশমাসে দ্বাদশদেবতার কর্তৃত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লিখিত দ্বাদশদেবতা দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের প্রত্যেকের তিনমূর্ত্তি করিয়া প্রকাশ বিগ্রহতত্ত্ব। সুতরাং ফাল্গুন ও কার্তিকমাসের অধিদেবতারূপে যথাক্রমে যে গোবিন্দ ও দামোদর নির্ণীত হইলেন—তাঁহারা কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন নহেন।

“এ অগ্ন্য গোবিন্দ—নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৯৬)

“রাধাদামোদর” অগ্ন্য ব্রজেন্দ্র কোঙর ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।২০১)

এমতাবস্থায় যখন দ্বাদশমাসের অধিদেবতা নির্দিষ্ট হইলেন, তখন এই অধিমাসের অধিদেবতা কে?—এইরূপ প্রশ্ন স্বাভাবিকরূপে উত্থাপিত হয়। স্বয়ং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমই অধিমাসের অধিকর্ত্তা—তাহা শ্রীনারদীয় পুরাণোক্ত স্বয়ং ভগবদুক্তি। তিনি জগৎপতি হইলেও বিশেষ করিয়া তিনি গোকুল-মহোৎসব।

তাই বৈকুণ্ঠ, অযোধ্যা, দ্বারকা, মথুরার উজ্জলতাকেও নিস্প্রভ করিয়া গোকুলের সর্বোৎকর্ষতা শিরোধার্য্য। তদ্রূপ তিনি সর্বমাসাধিপতি হইলেও বিশেষ করিয়া অধিমা-স-নায়ক—তাই ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ মাস। ব্রজেন্দ্রনন্দন সব দ্বাপরযুগেই অবতীর্ণ হন না এবং আবির্ভূত হইলেও অম্বরগণের নিকট অবোধ্য হইয়া আশ্ফালনের বিষয়বস্ত হন। তদ্রূপ শ্রীপুরুষোত্তম-মাস সর্ব বৎসরে প্রকাশিত না হইয়া রূপাপূর্বক নির্দিষ্ট সময়ে যদিও বা উদিত হন, কিন্তু মৎসরকুল তাঁহাকে মলমাস, মলিন্মুচ (চোর) নামে আশ্ফালন করিয়া স্বীয় সর্বনাশ আবাহন করেন।

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসই একমাত্র নিকাম মাস

এতদপ্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—“বৎসরকে দ্বাদশভাগে বিভাগ করিয়া দ্বাদশমাসে স্মার্তশাস্ত্র সর্ব সংকর্ষ নিরূপণ করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমগত সমস্ত কর্মই যখন দ্বাদশমাসে বিভক্ত হইল, তখন অধিমা-স-কর্মহীন মাস হইয়া গেল। অধিমাসে কোন সংকর্ষ নাই।”—অর্থাৎ কোন দেবকৃত্য নাই। আমোদ-প্রমোদ-ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্ত বৃত্তৃক্ষ কর্মজড়-স্মার্ত-সম্প্রদায়ের সহস্র কামনার যাগ্‌যজ্ঞের খাসরুদ্ধকর ধোঁয়া, যূপকাষ্ঠাবদ্ধ বলিহত প্রাণীর আর্তনাদে সমগ্র বৎসরটাই যার-পর-নাই ভারাক্রান্ত। সেই কার্পণ্য-দোষোপহত চিত্তে শ্রীপুরুষোত্তম-পাদপদ্মের গুণগাথা কীর্তন, ধ্যান-ধারণার প্রেরণা কিছুমাত্র উদিত হয় না। তাই পুরুষোত্তম-মাস প্রাহুর্ভাবে ভোগোন্মত্তকুল তাহাদের ভোগের ইন্ধন-সরবরাহকারী দেবতাগণের অহুর্দানে নিকাম হইয়া পড়েন—অর্থাৎ কাম্যকর্মহীন হইয়া পড়েন। অপরদিকে কৃষ্ণাত্মনীর অতুল আবহাওয়ায় সঙ্কীর্ণ-যজ্ঞাগ্নি অধিকতররূপে প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকে। অমলপুরাণের হৃৎকর্ণরমায়ন ভাগবত সন্দেশ পরিবেশন ও সেবনের মহাসমারোহে শ্রীলীলাপুরুষোত্তমের দাসাত্মদাসগণ নিমগ্ন হইয়া পড়েন।

শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্মান্তর্গত ‘দান-জ্ঞানাদি’ কর্মকাণ্ডীয় নহে

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসের কৃত্যসমূহে যে দান-জ্ঞানাদির উল্লেখ দেখা যায়, তাহা কিছুমাত্র কর্মকাণ্ডীয় নহে। রূপবৎসল শ্রীহরি ভোগোন্মত্তগণের সেবোন্মত্ত-স্বকৃতি উৎপাদনোদ্দেশ্যে অধিমাসকে স্বয়ং অধিকার করিয়া গোলোক হইতে ভুলোকে প্রকট হন। “এক লীলায় করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত”—ইহা না বুঝিয়া মিছাভক্তের দল শুধু শুদ্ধাভক্তির বিরোধিতাকেই সারাৎসার করিয়াছেন। তত্ত্ব-শিরোমণি শ্রীল বিখনাথ চক্রবর্তিপাদ তাঁহার “মাধুর্য্যকাদম্বিনী” গ্রন্থে ভক্তির

নিরপেক্ষতা আলোচনা প্রসঙ্গে দান-ব্রতাদি অহুষ্ঠান-সমূহকেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।
 যেচ্ছাময় স্বরাট ভগবানের যেরূপ স্থলদৃষ্টিতে ভূভার-হরণাদিকে উপলক্ষ্য করিয়া
 ভুলোকে অবতরণ—তদ্রূপ শাস্ত্রবাক্যানুসারে দান-ব্রত-তপ-যজ্ঞাদিকেও অনন্তাপেক্ষি
 ভক্তির দ্বার বলিলে প্রত্যবায় হয় না । তথাপি ‘দান’-শব্দে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যে
 দান, ‘ব্রত’-শব্দে একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি, ‘তপ’-অর্থ শ্রীকৃষ্ণ-প্ৰীত্যর্থ অখিল
 ভোগত্যাগকেই লক্ষ্য করিলে তাঁহারা প্রেমান্বভূত নিঃস্বর্ণা ভক্তিমুখী হন ।
 নতুবা সাধারণ দান-ব্রতাদি জ্ঞানান্বভূত সগুণ সাত্ত্বিক ভক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়াই
 নিরস্ত হয় ।

শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত পালনকারিগণ অকামী বা সৰ্বকামী হইলেও তাঁহারা তাঁহাদের
 কৰ্মসমূহ ভস্মসাৎ করিয়া অবশেষে যে তাঁহারা শ্রীপুরুষোত্তমকেই প্রাপ্ত হন,
 তৎসম্বন্ধে সংশয়হীন হইতে স্বয়ং শ্রীমুখপদ্ম-বিনিঃসৃত বাণীই যথেষ্ট ।—

অকামঃ সৰ্বকামো বা যোহধিমাসং প্রপূজয়েৎ ।

কৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কৃৎস্না মামেবৈষ্ণব্যসংশয়ম্ ॥ (শ্রীনারদীয় পুরাণ)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের দ্বার অগ্ন্যাত্ম সাত্ত্ব শাস্ত্র ও

মহাজনাদেশও অনুসরণীয়

“বড়িষামিষ” দ্বায়ে সাধারণ কৰ্ম্মজড় স্মার্তগোষ্ঠীকে আকর্ষণপূর্বক ক্রমে সাধু-
 সঙ্গের প্রভাবে তাঁহাদিগকে একমাত্র হরিতোষণপর করিয়া তদ্বিলাসের যোগ্যতা-
 প্রদান উদ্দেশ্যেও শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের শ্রীহরিভক্তিবিলাস রচনা । তাই
 তাঁহার এই স্ববৃহৎ-প্রচেষ্টায় বৈষ্ণব এবং অবৈষ্ণবপর উভয় স্মৃতিবচনের সমাবেশ
 দেখা যায় । তন্মধ্যে বৈষ্ণব-স্মৃতিশাস্ত্রেরই প্রাধান্য, তথাপি সৰ্বসংশয়চ্ছেত্তা
 বৈষ্ণবের শ্রীচরণপ্রসঙ্গেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে শ্রীল গোস্বামী ঠাকুর স্বয়ংই
 দ্বাদশবিলাসে জানাইয়াছেন,—

সংপৃষ্ঠা বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ বিষ্ণুশাস্ত্র-বিশারদান্ ।

চীর্ণব্রতান্ সদাচারান্তহুক্তং যত্নতশ্চরেৎ ॥

স্বনিয়মনিষ্ঠ, সদাচারী, বিষ্ণুশাস্ত্র-বিশারদ বৈষ্ণবগণ, বিপ্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া
 যত্নপূর্বক তাহা আচরণ করিবে—ইহাই শ্রীগোস্বামি-আজ্ঞা । স্মতরাং গ্রন্থ-প্রণেতা
 অগ্ন্যাত্ম সাত্ত্বিক বা সাত্ত্ব শাস্ত্রোক্তিসমূহ কুতর্ক-বিজৃম্বিত-হেতুবাদদ্বারা অবজ্ঞা
 করিয়া একমাত্র হরিভক্তিবিলাসনিষ্ঠ হইবার নির্দেশ কখনই প্রদান করিতেছেন না ।
 নতুবা শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থে অনুল্লিখিত শ্রীরাধাষ্টমী, শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথি,
 শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী, শ্রীঅদ্বৈত-সপ্তমী তিথিসমূহ পালনও হরিভক্তিবিলাসবিরোধী
 বলিয়া গণ্য হইত ।

অভিযোগকারিগণ স্ত্রবিধাবাদী

উপরিউক্ত চিরসত্য যুক্তিসমূহ শ্রবণ করিয়া মানিয়া লইলে তাঁহাদের নিজেদের অজ্ঞানতার মুখিক বাহির হইয়া পড়িবে। তাই বরং “শ্রীসনাতন গোস্বামী কি তাহা জানিতেন না?”—এইরূপে তাঁহার পৃষ্ঠে অজ্ঞানতার মোহর লাগাইবার ভয় প্রদর্শন করিলে প্রতিপক্ষ ঘায়েল হইতে পারেন। আহা! কিরূপ তাঁহাদের “শ্রীহরিভক্তিবিলাস”-প্রতি নিষ্ঠা! (জানিতে ইচ্ছা হয় তাঁহাদের চা, তাহাকু-সেবনাদি নানান্ হুরাচারসমূহ শ্রীহরিভক্তিবিলাস-অনুমোদিত কিনা।) তাহা হইলে উক্ত গ্রন্থের ষোড়শ-বিলাসে ‘অধিমাংস’ নামে যে-সকল কৃত্যসমূহ উল্লেখিত আছে, তাঁহারা তাহা কোন্ বিচারে পরিত্যাগ করিলেন? উত্তর—উহারা অবৈষ্ণবপর এবং কর্মকাণ্ডীয় বিধায় পরিত্যজ্য। অতএব দেখা যাইতেছে, গোস্বামিপাদের প্রতিটী কথা নির্বিচারে তাঁহারা মানিয়া লইতেছেন না—অর্থাৎ উক্ত গ্রন্থের কট্টর অনুসারী নহেন। ইহা অত্যন্ত আশার কথা। তাহা হইলে, যে বিচারের বশবর্তী হইয়া তাঁহারা একরূপ গোস্বামি-বাক্য লঙ্ঘন করিতেছেন, সেই বিচার অবলম্বন করিয়াই অগ্ৰাণ্ড সাত্বত-শাস্ত্রোক্ত শুদ্ধভক্তিয়াজ্ঞানমূলক অনুষ্ঠানের প্রতি আদর প্রকাশ করিতেছেন না কেন? বস্তুতঃ ইহারা অত্যন্ত স্ত্রবিধাবাদী। তাই অধিমাংসকে ‘শ্রীপুরুষোত্তম-মাংস’ বলিয়া সম্মান দিতে অসমর্থ। কারণ ‘শ্রীপুরুষোত্তম-মাংস’ বলিলে আবার একটী সম্পূর্ণ মাংসব্যাপী ব্রত অবলম্বনের কামেলা পোহাইতে হয়।

অভিযোগকারিগণ স্মার্তপদাবলেহী

তাঁহারা বরং এই অধিমাংসকে মলমাংসরূপেই চিহ্নিত করিতে বন্ধপরিকর। বন্দ্যঘটীয় স্মার্ত রঘুনন্দন মহাশয় অধিমাংসকে শ্রীপুরুষোত্তম-মাংসরূপে সম্মান প্রদর্শনে পরাঙ্গুখ হইয়া মলমাংসরূপেই তাহাকে অভিহিত করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন। অভিযোগকারিগণ উক্ত স্মার্তবর্ষের সংগৃহীত মলমাংস-কৃত্যসমূহ (কেবল মুখে) গর্হণ করিয়া শুধুমাত্র (!) উক্ত ‘মলমাংস’-নামটীর প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা “মলমাংসে কোন দেবকৃত্য নাই”—ইহাতে প্রাধান্য দিয়া দেবাদিদেব শ্রীলীলাপুরুষোত্তমের স্বয়ং শ্রীমুখোক্তিও শ্রীহরিভক্তিবিলাসপরায়ণতার নামে উল্লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। ইহাতে সত্যই স্তম্ভিত হইতে হয়। স্বয়ং শ্রীমুখারবিন্দ-নির্গত আদেশাত্মযায়ী অধিমাংসকে “পুরুষোত্তম-মাংস”-রূপে বিভূষিত করিবার রীতিটী তবে কাহাদের জন্ত?

গুরুবর্গের আদেশের দোহাই সর্বদা শুদ্ধাভক্তিপন্থী নহে

অভিযোগকারিগণ অবশেষে স্বীয় গুরুবর্গের আদেশে এইরূপ শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রতানুষ্ঠান হইলে তাঁহারা সর্বপ্রকার আপত্তি উঠাইয়া লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। “টুমিও ভাল, আমিও ভাল”—এইরূপ শিশুস্থলভ সমঝোতাবারা তড়িৎ মীমাংসায় উপনীত হইতে ব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়-স্বারস্বতগণ কোন প্রকারেই রাজী নহেন। জগতের মনগড়া শাস্ত্র, অহুদিত-বিবেক-গোষ্ঠীর অনুকূলে প্রকাশিত তামসিক, রাজসিক শাস্ত্র হইতে যেরূপ সংশাস্ত্র সম্পূর্ণ পৃথক্, ওদ্রুপ সাধারণ-কুলগুরু, শিষ্যোপজীবী-গুরু, অশ্রোত-পন্থায় গুরু, কাম্যগুরু, জ্ঞানিগুরু, যোগিগুরু ইত্যাদি হইতে সদৃগুরুও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সেখানে সংশাস্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া গুরু অথবা সদৃগুরুকে অতিক্রম করিয়া শাস্ত্র—উভয়ই বিদ্বৎ-সংজ্ঞা লাভ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁহার পদাঙ্কানুসারী দাসগণ-কর্তৃক পরিত্যজ্য হইয়াছেন। সুতরাং গুরুবর্গের আদেশের দোহাই দিয়া মীমাংসার অবৈধ ও অশাস্ত্রীয় প্রচেষ্টাবারা অভিযোগকারিগণ যে তথাকথিত উদারনীতি অবলম্বনের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও কোনক্রমেই মানিয়া লওয়া যায় না। তাহা হইলে আশ্রয়-বিচাররহিত যাবৎ সাহজিক অপসম্প্রদায়, নির্বিশেষবাদী জগজ্জঙ্ঘালসমূহকে তাহাদের তত্ত্ব বিচারে উৎসাহ প্রদান করা হয়। প্রকৃত বাস্তবসত্য নির্দ্বারপ্রাণে সংশাস্ত্রের উপযোগিতা কিরূপ অপরিহার্য, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত শাস্ত্রপ্রমাণে পরিলক্ষিত হয়।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতৌ । (গী: ১৬২৪)

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা ।

ঐকান্তিকী হরেত্কটিকংপাতায়ৈব কল্পতে ॥ (ব্রহ্মযামল)

সাধু-শাস্ত্র-গুরু বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,

ভাসিব প্রেমসিন্ধু মাঝে ।

—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর

শ্রীগৌড়ীয় মঠের যথার্থ রূপানুগত

শ্রীমন্নহাশ্রমের মনোভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদ তাঁহার অপ্রাকৃত “শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু” গ্রন্থে পঞ্চরাত্র হইতে একজন অননুভবের অখিলচেষ্টা বর্ণন-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—“লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মূনে। হরিনেবানুকূলৈব সা কার্য্য্য ভক্তিমিচ্ছতা ॥” জগতে যত প্রকার লৌকিক ক্রিয়া বর্তমান অথবা যাবৎ বৈদিক অনুষ্ঠান প্রচলিত, তাবৎ তাহা সবার উপর একমাত্র

শ্রীহরির একচ্ছত্র অধিকার । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণগোষামীর দাস্ত-নাভেচ্ছ ব্যক্তিমান্বই সেই সকলপ্রকার কৃত্য শ্রীহরিসেবার আনুকূল্যেই সংঘটিত করেন । তাই জগতের কর্মজড় স্মার্তকুল বা তৎপদাবলিহিগণ যখন অধিমাসকে মলমাস বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণানুগগোষ্ঠী সেই তাঁহাকে সাত্বত-শাস্ত্রানুসারে শ্রীপুরুষোত্তম-মাস রূপে সাদরে বরণ করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রভুর আনুগত্যে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পুরুষোত্তম-পাদপদ্মে তাঁহাদের স্বীয় আর্তি-জ্ঞাপনমুখে তাঁহার দাসানুদাসগণের চরণাশ্রয় প্রার্থনা করেন,—

মন্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন ।

পরিহারেহপি লজ্জা মে, কিং কবে পুরুষোত্তম ।

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ প্রশান্ত-নিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ ।

কদাহমৈকান্তিক-নিত্যকিঙ্করঃ শ্রদ্ধয়িত্বামি সনাথ জীবিতঃ ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত)

— শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীক্ষেত্র নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথের

মনোরথ-প্রকাশ-মাহাত্ম্য

শ্রীক্ষেত্র পুরীর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার কথা একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চমকপ্রদ প্রসঙ্গ । সেই রথযাত্রার প্রসঙ্গ শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে রথোপরি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শনের জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ঐ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোষামী মহারাজ শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা সমিতির মূলমঠ ও তৎশাখামঠে প্রচলন করিয়াছেন । পদ্মপুরাণে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে,—

আষাঢ়শ্চ দ্বিতীয়্যাং রথং কুর্যাদবিশেষতঃ ।

আষাঢ় শুক্লৈকাদশ্যাং জপ-হোম-মহোৎসবম্ ॥

রথস্থিতং ব্রজন্তং তং মহাদেবি মহোৎসবে ।

যে পশ্যন্তি মুদা ভক্ত্যা বাসন্তেবাং হরেঃ পদে ॥

আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার অনুষ্ঠান করিয়া শুক্লা একাদশীর দিন পুনর্যাত্রা করিবেন। এই সময় জপ ও হোমাদি অনুষ্ঠান করা বিধেয়। রথযাত্রার সময় যাহারা শ্রীভগবান্ জগন্নাথকে রথাক্রুত দর্শন করেন তাঁহাদের বিষ্ণুলোকে বাস হইয়া থাকে।

শ্রীজগন্নাথ—সর্বজগতের নাথ, অর্থাৎ প্রভু—মণিব। তিনি ‘স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন’ কৃষ্ণ। ঋগ্বেদ—‘ও কৃষ্ণ বৈ সচ্চিদানন্দধনঃ, কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ, কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ, কৃষ্ণো হা উ কৰ্ম্মাদিমূলঃ, কৃষ্ণঃ স হ সর্বৈকার্ধ্যঃ, কৃষ্ণঃ কাশং-কদাদীশ-মুখপ্রভুপূজ্যঃ, কৃষ্ণহনাদিস্তস্মিন্নজ্ঞাণান্তর্বাহে যল্লন্মঙ্গলং তল্লভতে কৃতীঃ’ মন্ত্রে স্তব করিয়াছেন। ব্রহ্মসংহিতার,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।

অনাদিরাদির্গৌবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর, সৎ, চিৎ ও আনন্দময় তাঁহার শ্রীবিগ্রহ, তিনি অনাদির ও আদি, সর্বজগতের আনন্দপ্রদ—বিশেষতঃ গো, গোপ, গোপী ও গোবর্দ্ধন-সমন্বিত শ্রীবৃন্দাবনের সকল কারণের তিনিই একমাত্র কারণ।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের মাহাত্ম্যে,—তিনি কঠোর তপস্ত্বাধারা সপ্তকল্প পরিমিত পরমায়ু লাভ করিয়াছেন। যখন মহাপ্রলয়ে সমস্ত জীবজগৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তখনও তিনি জীবিত ছিলেন। মহাপ্রলয়ে যখন পৃথিবী জলমগ্ন হইল, তখন তিনি প্রলয়ের জলে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীক্ষেত্র সন্নিকটবর্তী হইলে নীল-পর্বতোপরি অক্ষয়বট তাঁহার নয়নগোচরীভূত হইল। কারণ, শ্রীভগবানের নাম, ধাম, লীলা, পরিকর সবই নিত্য। ‘নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্’ বলিয়া তাঁহার পরিচয়। তথাপি সাধারণভাবেই মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের মনে এই বটবৃক্ষের স্থিতি সম্বন্ধে বিস্ময় জাগিল। তখন তিনি বাল-কণ্ঠোচ্চারিত এক আশ্চর্য্য শব্দ শ্রবণ করিলেন। সেই বৃক্ষের উপর হইতে কে যেন বলিতেছেন,—‘হে মার্কণ্ডেয়! শোক করিও না, আমার নিকট আসিয়া তুমি তোমার দুঃখ অপনোদন কর।’ পুনরায় সেই স্বর শ্রুত হইলে তিনি বৃক্ষের নিকটস্থ হইয়া তন্মূলদেশে ভগবান্ নীলেন্দ্রিয় মণিময় নীলমাধব মূর্তি দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ও স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কহিলেন,—বৎস! বৃক্ষোপরি যে সর্বকালাত্মা বালকরূপী মূর্তি শায়িত আছেন, তুমি তাঁহার বদন দিয়া উদরমধ্যে গমন করিয়া তথায় অবস্থান কর। মার্কণ্ডেয় ইহাতে আরও চমৎকৃত ও কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া বৃক্ষোপরি আরোহণপূর্বক পত্রসম্পৃষ্ট এক শ্যামসুন্দর বালকমূর্তি অবলোকন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম ও স্তব-স্তুতি করিলেন। তাঁহার বহ্যায়তন-বিশিষ্ট বদনযোগে

উদরে প্রবেশ করিলেন। তথায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, দেব, দৈত্য, মানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, জীবজন্তু, পাহাড়-পর্ব্বত, সরিৎ-সিন্ধু, বৃক্ষলতা প্রভৃতি দেখিতে পাইলেন। মার্কণ্ডেয় বহুকাল বালকের উদরমধ্যে ইতঃস্ততঃ পর্য্যটন করিয়াও কিছুতেই কুক্ষিসীমা প্রাপ্ত হইলেন না। পরিশেষে উদর হইতে বহির্গত হইয়া নিম্নে অবতরণপূর্ব্বক শ্রীভগবানের আদেশে তথায় চিরকাল অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শ্রীইন্দ্রহ্যম্ম রাজার বিবরণ

সত্যযুগে ব্রহ্মার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ পরম ভাগবত মহারাজ ইন্দ্রহ্যম্ম সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। মালব দেশের অবন্তিনগর তাঁহার রাজধানী। এই অবন্তি-নগর অমরাবতী পুরী নামেও পরিচিত। ইন্দ্রহ্যম্ম কুবেরতুল্য ধনী ও পরাক্রমশালী এবং অনেক সদ্গুণে ভূষিত হইয়া পৃথিবীর বহু স্তম্ভসম্মুখে যুক্ত ছিলেন।

একদা মহারাজ ইন্দ্রহ্যম্মের রাজমন্দিরে এক তৈথিক ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়াছিলেন। মহারাজের সেবা-যত্নে পরিতুষ্ট হইয়া মুনিবর কহিলেন,—“হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি একবার অরণ্যপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীনীলমাধবের দর্শন পাই। এ স্থান এখনও গুপ্ত। সেখানে এক বৎসর কাল বাস করিয়া দেখিয়াছি যে, দেবতাগণ সদা সর্ব্বদা সেখানে আবাসন করিয়া শ্রীনীলমাধবদেবের পূজা করিয়া স্ব-স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করেন। আপনাকে অতি উত্তম বৈষ্ণব মনে করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনিও সেই পুরুষোত্তম নীলমাধবের দর্শন করিতে পারেন। সেখানে রোহিণী-নামক একটা কুণ্ড আছে। সে কুণ্ডে স্নান করিলে মুক্তিপদ লাভ হয়।” ঋষির এই কথা শুনিয়া রাজা আনন্দ-সহকারে তাঁহার পূজা করিয়া নীলমাধবের অবস্থানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তত্বতরে ঋষি কহিলেন,—“হে রাজন্! লবণ-সমুদ্রের উত্তর উপকূলে উদ্ভদেশ (ওড়িশ্যা) সাধুতীর্থ-সমন্বিত শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে নীলমাধব পূজিত হন। ঐ স্থানেই এক ক্রোশ বিস্তৃত বটবৃক্ষ আছে। সেখানে নারদাদি ঋষিগণ সর্ব্বদা হরিগুণগান করেন। শবরাদি জ্ঞানির সেখানে বাস। ঐস্থানে পদার্পণ মাত্রেই সংসারের ক্লেশ ও জন্ম-মরণাদি দ্বন্দ্ব দূর হইয়া যায়।” এইরূপ নীলমাধবের সংবাদ দিয়া ঋষিবর অন্তর্দান করিলেন।

নীলমাধবের অন্বেষণ

মহারাজ ইন্দ্রহ্যম্ম শ্রীনীলমাধবের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শনের জন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনি স্বীয় পুরোহিতের ভ্রাতা বিতাপতিকে নীলমাধবের সন্ধানে প্রেরণ করিলেন। বিতাপতি নীলমাধবের খোজে উড়িশ্যার বনপথে ভ্রমণ করিতে

করিতে গভীর অরণ্যাক্ষলে এক শবর-পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। পথশ্রান্ত বিতাপতি শবরাধিপতি বিশ্ববসুর গৃহে আশ্রয় লইলেন। বিতাপতির কথোপকথনে বিশ্ববসু জানিতে পারিলেন—ইনি ভগবৎভক্তি-পরায়ণ মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের পুরোহিতের ঐনিষ্ঠ ভ্রাতা। সম্ভ্রান্তি মহারাজের শ্রীনীলমাধব-দর্শনের ব্যাকুলতায় তৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়া নীলমাধবের সন্ধানে ভ্রমণ করিতেছেন। বিশ্ববসুর আতিথেয়তায় বিতাপতি কয়েকদিন তাঁহার গৃহে কণ্ঠা ললিতার সেবা-পরিচর্য্যায় অবস্থান করিলেন। বিতাপতির রূপ ও গুণে মুগ্ধ হইয়া বিশ্ববসু স্বীয় কণ্ঠা ললিতার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন।

বিতাপতি ললিতার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া মহারাজের নীলমাধবের দর্শন-ব্যাকুলতায় সাত্বনার জ্ঞাত অতুষ্ণ চিন্তামগ্ন হইলেন। বিতাপতি বিশ্ববসুর অবস্থানকালে লক্ষ্য করিতেন,—তিনি সন্ধ্যায় যেন কোথায় গিয়া গভীর রাত্রে বাড়ীতে ফিরেন, সে-সময়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অগুরু, কপূর, চন্দনাদির গন্ধে ভরপুর থাকিত। বিতাপতি জানিতে পারিলেন, বিশ্ববসু প্রতিদিন রাত্রে নীলমাধবের পূজায় যান। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরুর ইচ্ছায় বিতাপতি যেন আশার স্রোতে কুলের সন্ধান পাইলেন। তিনি বিশ্ববসুকে নীলমাধব দর্শন করাইবার জ্ঞাত প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু বিশ্ববসু সম্মত হইলেন না। অবশেষে কণ্ঠার বিশেষ অনুরোধে বিশ্ববসু নীলমাধবকে দেখাইতে রাজী হইলেন বটে, তবে একটা সর্ত্ত হইল—বিশ্ববসু বিতাপতির চক্ষু বাঁধিয়া লইয়া যাইবেন এবং নীলমাধব দর্শনের পরে পুনরায় চক্ষু বাঁধিয়া লইয়া আসিবেন, যাহাতে তাঁহার পথের সন্ধান না থাকে। বিতাপতি তাহাতেই সম্মত হইলেন। বিতাপতির মহধর্ম্মিণী ললিতা বুদ্ধিমতী মহিলা। তিনি স্বামীর বস্ত্রাঙ্কলে কিছু সরিষা বাঁধিয়া পরামর্শ দিলেন—যাইবার পথে ঐগুলি ছড়াইবার জ্ঞাত। ললিতার পরামর্শে সরিষা নিক্ষেপদ্বারা নীলমাধবের পথ-নির্দেশক বীজ বপন হইল। নীলমাধবের সন্নিহিতে বিশ্ববসু বিতাপতির চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া দিলে নয়নাভিরাম শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া বিতাপতি স্তব করিতে লাগিলেন,—

নমস্তে দেবদেবেশঃ নমস্তে পরমেশ্বরঃ ।

কৃতার্থোহং কৃতার্থোহং ত্রাল্লাষ্ঠানা সংশয়ঃ ॥

ইন্দ্রাদিভিঃ সুরৈবস্তু নারদাণ্যে মুনীশ্বরঃ ।

অগোচর-স্বভাং বন্দে তং দেবং দৃষ্টবানহম্ ॥

‘হে দেবদেবেশ ! পরমেশ্বর ! আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ।’—এই বলিয়া তাঁহার গুণাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় নীলমাধবের সম্মুখে বিতাপতিকে রাখিয়া বিশ্ববসু পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিতে গেলেন। বিতাপতি দেখিলেন

যে, একটি ঘুমন্ত কাক স্থানীয় একটি কুণ্ডে পতিত হইয়া দেহত্যাগপূর্বক চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করিয়া অপ্ৰাকৃত ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিল।

অলৌকিক এই দৃশ্য দর্শন করিয়া বিজাপতিও কুণ্ডে বাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগের সঙ্কল্পে বৃক্ষোপরি আরোহণ করিলেন। সেই সময় আকাশবাণী হইল—
'বিজাপতি ! তুমি যে নীলমাধবের দর্শন পাইয়াছ সর্বপ্রথমে সেই খবর মহারাজ ইন্দ্রহ্যকে জানাও।' আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া বিজাপতি ইন্দ্রহ্যয়ের নিকট নীলমাধবের মহিমা বর্ণন করিলেন। ইন্দ্রহ্য তাহা শুনিয়া শ্রীক্ষেত্রে নীলমাধব দর্শন ও স্বীয় পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অমাত্য-পরিষদ, প্রজাবর্গ, সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে চিরজীবন তথায় বাস করিবার জন্ত যাত্রা করিলেন। নারদও তাঁহাদের সাহায্যার্থে শুভাগমন করিলেন। দেবর্ষি নারদের নিকট মহারাজ ইন্দ্রহ্য জানিতে পারিলেন,—অবন্তি দেশের গঙ্গা পশ্চিম দিকে বিস্তাচল পর্বত হইয়া পূর্বদিকে সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। এই গঙ্গাসাগরের সঙ্গমস্থানে অতি পবিত্র 'চক্রতীর্থ' বর্তমান। কেহ কেহ এই স্থানকে একান্তকানন বলিয়া থাকেন। তাঁহারা পশ্চিমধ্যে ভুবনেশ্বর, কপোতেশ্বর, বিশ্বেশ্বর মহাদেব দর্শন করিলেন।

যে-দিন বিজাপতি ভগবান্ নীলমাধব মূর্তি দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করেন, সেই দিব্যশেষে প্রবল ঝটিকাঘোরে সমুদ্রের বালুকারাশিবারা নীলাচল আবৃত ও নীলমাধব প্রোথিত হইয়াছিলেন। সকল শুভকাৰ্য্যই বাঁধাবিঘ্ন-পরিপূর্ণ, মহারাজ ইন্দ্রহ্যয়ের এই মহদভ্রষ্টানেও বিষম বিঘ্ন ঘটিয়াছে।

অবন্তিনগর হইতে বিজাপতি ও মহারাজ ইন্দ্রহ্য গিয়া দেখেন,—নীলমাধব আর সেখানে নাই। রাজা নীলমাধবকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন যে, বিশ্ববন্ধু নীলমাধবকে অগত্যা সরাইয়া রাখিয়াছেন। তখন ক্রোধে রাজা শবরপত্নী অবরোধ করিয়া বিশ্ববন্ধুকে বন্দী করিলেন। সে-সময় পুনরায় আকাশবাণীতে ভগবান্ কহিলেন,—“ইন্দ্রহ্য ! বিশ্ববন্ধুকে ছাড়িয়া দাও এবং নীলাদ্রির উপর একটি মন্দির নির্মাণ কর। দারুব্রহ্মরূপে তুমি সেখানে আমার দর্শন পাইবে। নীলমাধব-রূপে তুমি আমার সাক্ষাৎ পাইবে না।” জগতের কল্যাণের নিমিত্তই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণ সময়ে সময়ে আত্মগোপন করিয়া মিলনের উৎকণ্ঠাকে অধিকতর বর্দ্ধিত করেন।

মহারাজ ইন্দ্রহ্য নীলমাধবের দর্শন না পাইয়া অনশন-ব্রতাবলম্বনে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। তখন শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে স্বপ্নাদেশ করিলেন,—‘সমুদ্রের নিকট ‘বন্ধিমূহান’-নামক স্থানে দারুব্রহ্মরূপে ভাসিতে ভাসিতে আমি উপস্থিত হইব, তুমি চিন্তা করিবে না।’ (ক্রমশঃ)

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী, প্রেমরত্ন

শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৮ পৃষ্ঠার পর]

আমরা গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের পালনীয় ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে উজ্জাদরের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই উজ্জাদর বলিলে চাতুর্দশ-ব্রতকেই সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন,—৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে চাতুর্দশ-ব্রত উল্লেখ না থাকায় আমরা উজ্জব্রত পালন করিব; চারিমাস ব্রত উদ্‌যাপন করিবার ক্রেশ স্বীকার করিব না। এইপ্রকার ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তিসকল শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশয় দিয়া থাকেন। শ্রীমন্নমোদর প্রভু স্বয়ং বহুক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া চাতুর্দশ-ব্রত উদ্‌যাপন নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। যাহারা মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষার অনুসরণ করিতে অসমর্থ, আমরা তাঁহাদিগকে শুদ্ধ-বৈষ্ণব-শ্রেণীভুক্ত করিতে পারি না। আমরা এস্থলে বলিতে চাহি,—ষড়ঙ্গ শরণাগতিতে নবধা ভক্তির অন্তর্গত “আত্মনিবেদনে”রই প্রাধান্য দেখা যায়। ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, শরণাগতির জন্ত পঞ্চাঙ্গ নিষিদ্ধ হইয়াছে? ষড়্বিধ শরণাগতির চরম শরণাগতি ‘আত্মনিবেদন’ উল্লিখিত হইলেই বুঝিতে হইবে, অগ্ন্যাগ্ন শরণাগতিগুলিও সাধকের পক্ষে নির্দিষ্ট হইয়াছে। উহা অঙ্গাদীভাবে একই সাধন বলিয়া গৃহীত হইবে।

শ্রীদামোদরাষ্টকের নিত্যত্বহেতু ইহা কার্তিকমাস বা দামোদর মাস ব্যতীত চাতুর্দশ-ব্রত প্রত্যহ আলোচিত হওয়া আবশ্যিক। এমন কি, অগ্ন্যাগ্ন মাসে ও বৎসরের প্রতিদিনই ইহা আলোচনার যোগ্য। দামোদরাষ্টক বিশুদ্ধভাবে কীর্তিত হইলে স্বয়ং দামোদরদেব প্রীত হইবেন—এই উদ্দেশ্যেই আমরা ইহা বিশেষ যত্ন-সহকারে সঞ্চালন করিয়াছি।”

আমরা যে তিলক রচনা করি তা কিছু মন্ত্র পাঠ করেই করি। তার মধ্যে এক এক মাসের এক একজন অধিদেবতা আছেন।

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে ।

বক্ষঃস্থলে মাধবং তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে ॥

বিষ্ণুং দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্ ।

ত্রিবিক্রমং কঙ্করে তু, বামনং বামপার্শ্বকে ॥

শ্রীধরং বামবাহৌ তু, হৃদীকেশং কঙ্করে ।

পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভং, কট্যাং দামোদরং শ্রুসেং ॥

তৎপ্রক্ষালন-তোয়ন্ত বাসুদেবার মূর্ধনিনি ॥

এর ভিতরে কার্তিকমাসের অধিদেবতা দামোদর আছেন। এখন এই দামোদর কে? আর রাধাদামোদরই বা কে? জিনিষটা বুঝবার বিষয়। সিন্ধুতটস্থলে এটাই পাওয়া যায়—ইনি হলেন চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বিষ্ণুবিগ্রহ। আর রাধাদামোদর হলেন আলাদা। বৃন্দাবনীয় সেই মূর্তি নহেন। এটাও বুঝতে হবে। কার্তিকমাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দামোদর। কেবল দামোদর বললে ভুল হবে, তাহলে অর্দ্ধেককে বাদ দেওয়া হবে। সেজন্য রাধারানীকে সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। “নমো রাধিকায়ৈ স্বদীয়-প্রিয়ায়ৈ” অর্থাৎ রাধাদামোদরই হচ্ছেন কার্তিকমাসের অধিষ্ঠাতা, অধিষ্ঠাত্রী। একে বলা হয় উর্জ্জ্বত। উর্জ্জ্বেশ্বরী হচ্ছেন রাধারানী। সুতরাং এখানে সাধারণ মাসের যে দামোদর—লক্ষ্মীদামোদর, তিনি নন। এ সম্বন্ধেও আলোচনা আছে।

‘কার্তিকশ্রাদ্ধদেবী’ রাধারানীকে বলা হয়েছে। উর্জ্জাদেবী রাধারানী তাহলে কার্তিকমাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিষ্ণুর ২৪ অবতার আছেন অস্ত্রভেদে। প্রথম আদিবৃহৎ হচ্ছেন—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ। আবার তার থেকে চার চার মূর্তি বেরিয়ে এসেছেন। ২৪ মূর্তির বর্ণনা আছে চৈতন্যচরিতামৃতে। সেখানে কার্তিকমাসের যে অধিদেবতা তিনি কিন্তু এই দামোদর নন। তিনি হলেন সেখানে চতুর্ভুজ নারায়ণ। আর এখানে যে রাধাদামোদরের কথা বলা হয়েছে, তিনি হলেন দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর দামোদর এবং তাঁর মূল লক্ষ্মীর কথা বলা হয়েছে। “লক্ষ্মীসহস্রশত-সত্তমসেব্যমানম্”—শত সহস্র লক্ষ্মীদেবী যাঁহাকে স্তব করছেন, সেই রাধারানীর কথা এখানে বলা হয়েছে। এটা কিভাবে বুঝতে পারা যায়? আকাশপ্রদীপ দেওয়া হচ্ছে, প্রণাম-মন্ত্র আছে,—

দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।

প্রদীপস্তে প্রযচ্ছামি নমোহনন্তায় বেধসে ॥

‘লোলয়া’ কাকে বলছেন?—লক্ষ্মীদেবীকে। এখানে সর্বলক্ষ্মীময়ী রাধা, তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম করছেন, তাঁর উদ্দেশ্যে আকাশপ্রদীপ দিচ্ছেন। যদি কেবল লক্ষ্মীদেবীকে বলা হয় তাহলে ঠিক মানে হবে না। গোষ্ঠামীবর্গের তাৎপর্য, শাস্ত্রের তাৎপর্য তাহলে উন্টোপাণ্টা হয়ে যায়। নাম এক, কিন্তু কার্য অগুরকম। কার্তিকমাসের যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তিনি হলেন দামোদর, তিনি হলেন চতুর্ভুজ। আর এখানে যে রাধাদামোদরের কথা বলা হচ্ছে, তিনি হলেন পূর্ণ মাধুর্যসের অধিদেবতা এবং রাধারানী হলেন অধিদেবী।

আলোচনার ক্ষেত্রে কথাটা এসেছিল দামোদর সম্বন্ধে। দামোদর সম্বন্ধে যে

একটা ধারণা—বাল্যকালের যে লীলা সে লীলা হলেও যখন স্তব করছেন সত্যব্রতমুনি তখন তিনি রাধারাগীকে, বাদ দিতে পারেন নাই। রাধারাগীকে সঙ্গে নিতে হয়েছে ‘নমো রাধিকায়ৈ ত্রদীয়-প্রিয়ায়ৈ’। তাহলে সেই দামোদরই বা কে? একটা বাচ্চা ছেলে হামাগুড়ি দিচ্ছে, ছুঁছুঁমি করছে, মেজন্তু মা তাঁকে কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। এই এক দামোদর। আবার দামোদর যে ভগবানের নাম, এ বহু প্রাচীন নাম, এ নাম কখন সৃষ্টি হয়েছে তা কেউ বলতে পারবে না। কেননা, প্রাকৃত কালসৃষ্টির পূর্বে থেকে এই নাম ত’ রয়েছে। গর্গঙ্খি যখন নামকরণ করতে যাচ্ছেন তখন খুব মুশ্কিলে পড়ে গেছেন। বলদেবের নামকরণ ত’ তাড়াতাড়ি হয়ে গেল—বলদেব, সঙ্কর্ষণ, বলরাম। সঙ্কর্ষণ নাম কেন হল? উভয়কুলের—বসুদেবকুল ও নন্দকুলের সংযোগরক্ষাকারী বলে বলদেবের নাম হল সঙ্কর্ষণ। বলদেব নাম হল বলাধিক্যহেতু—‘বলাদ্বলম্’। কৃষ্ণের নামকরণ করতে গিয়ে গর্গঙ্খি ধ্যানস্থ হয়েছেন। যাঁর নামকরণ করতে যাচ্ছি, তিনি হলেন অনন্ত বিশ্বের পুরাণপুরুষ। তিনি ধ্যানে দেখেছেন—এই যে বাচ্চা ইনি হলেন সুপ্রাচীন, অতি প্রাচীন। এঁর থেকে আর কেউ প্রাচীন ব্যক্তি নাই। আবার দেখলেন কি?—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহশ্চ গুরুতোহনুযুগং তনুঃ ।

শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

নন্দমহারাজ! তোমার এই ছেলেটা পূর্বে গুরুমূর্তিতে এসেছেন ব্রহ্মচারীবশে তপস্শ্রামূর্তিতে। রক্তমূর্তি অর্থাৎ যজ্ঞমূর্তিতেও তিনি এসেছেন। পীতবর্ণেও এঁর আবির্ভাব আছে। সম্প্রতি ইনি “কৃষ্ণতাং গতঃ”—কৃষ্ণমূর্তিতে এসেছেন, কৃষ্ণরূপতা প্রাপ্ত হয়েছেন, কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। পীতমূর্তিতে পরে আসবেন। এখন পীতমূর্তির কথা কিছু বলছেন না, তবে গোপনীয় কথাটা প্রকাশ করে দিয়েছেন। পীতমূর্তিতে আসবেন কলিকালে, এটা গোপনীয় ছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ প্রকাশ করে দিয়েছেন। নৃসিংহদেবকে যখন স্তব করছেন প্রহ্লাদ মহারাজ সেই সময় বলে ফেললেন,—

ইথং নৃতির্ষগৃষিদেব-বাবতাতরৈ

লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্ ।

ধর্ম্যং মহাপুরুষ পাসি যুগান্তবৃত্তম্

ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোহথ স ত্বম্ ॥

এই কলিকালে ইনি ছন্নাবতার। নিজে ভগবান্—এটা কাউকেও জানতে দেবেন না, বুঝতে দেবেন না। প্রচ্ছন্নমূর্তি। এইজন্য বলছেন ‘ছন্নঃ কলৌ’। শাস্ত্রে বহু গোপনীয় জিনিষ আছে, দেখা যাচ্ছে গুরু শিষ্যকে নিষেধ করছেন—এ তথ্য অত্যন্ত গোপ্য, কাউকেও বলবে না, বললে পরে তোমার ক্ষতি হবে,

আমারও ক্ষতি হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে। কেন? প্রকাশ না হলে জগতের লোক জানবে কি করে? ভগবান্ তিনি নিজেও নিজেকে ভগবান্ বলে পরিচয় দিতে পারছেন না, এও তাঁর সুন্দর দৈন্ত্যভাব। জগতে শিক্ষা দিচ্ছেন এইভাবে, নিজেকে ভগবান্ বলতে চাইছেন না। দুই এক জায়গায় চৈতন্যমহাপ্রভু নিজেকে ভগবান্ বলে বললেন বাচ্চা বয়সে। সব লোক গঙ্গাস্নান করতে যাচ্ছে, নিমাইও যাচ্ছে। অনূঢ়া কথারা গঙ্গাপূজা করতে যাচ্ছে। তাদের ঠাকুরপূজার সন্দেশ-কলাদি সব খেয়ে ফেলছেন। ওরা স্নান করে উঠে এসে দেখে সব শেষ। কি হল? আর কি হল! সেই নিমাই তখন বলছেন,—

প্রভু বলে,—আমা পূজ, আমি দিব বর।

গঙ্গা, দুর্গা দাসী মোর, মহেশ কিস্কর ॥

তোমরা কিজন্তু পূজা করছ আমি জানি না, সব জানি। ভাল ভাল বর হবে বলে। আমি বর দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা যার রূপা পেতে চাচ্ছ তারা আমার দাস-দাসী। আবার সেই নিমাই যখন বড় হয়েছেন, যখন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, তখন বলছেন—ছিঃ! ছিঃ! মানুষকে কখনও ভগবান্ বলে? তোমরা কেন এসব বলছ? শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিষ্ণু, কখনও এরকম বলতে নাই। তখন তত্ত্বদর্শনটা আর একদিকে শিক্ষা দিচ্ছেন। আমাকে কখনও ভগবান্ বলা না, মানুষ কখনও ভগবান্ নয়। আমাকে ভগবান্ বলছ কেন তোমরা? খুব আপত্তি হচ্ছে সেখানে। সেখানে তিনি তাঁর লীলাটা লুকাচ্ছেন, স্বরূপটা লুকাচ্ছেন এবং শাস্ত্রীয় তত্ত্বদর্শনটা ঠিক ঠিক প্রকাশ করছেন। এ কথাটাও রয়েছে। “অবতার কভু নাহি বলে আমি অবতার।” ভগবান্ নিজে কখনও নিজেকে ভগবান্ বলে বাহাদুরি করছেন না। এটা তাঁর দৈন্ত্য। ভক্তের কাছে তিনি বশতা স্বীকার করছেন, ভক্তের প্রেমডোরে তিনি বাঁধা। ভক্তবশ্ত ভগবান্। তিনি ইচ্ছা করলে সব কিছু করতে পারেন, আবার তাঁর ভক্তকে দিয়েও সবকিছু করতে পারেন। “কাকেরে গরুড় করে ঐছে দয়াময়।”—কথাটা আছে। কাককেও গরুড় করতে পারেন তিনি। ভগবদিচ্ছায় সবকিছু সম্ভব। লীলাক্ষেত্রে তিনি এগুলো করেন।

দামোদর কৃষ্ণ—যিনি বাচ্চাশিশু, হামাগুড়ি দিচ্ছেন। তাঁর সব কিছু দেখে শুনে কুবেরের দুই ছেলে—নলকুবর ও মণিগ্রীব হাতজোড় করে স্তব করছেন। স্তব শুনছেন আর হাসছেন ঐ বাচ্চাশিশু। তখনও পর্যন্ত দড়িসহ উদ্বল টানছেন। স্তব করছেন দুই কুবেরপুত্র। ওরা স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত তখন। যে

স্বপ্নগুলি করছেন সেগুলি ঠিক ঠিক ভগবানের। বলছেন কি?—আমরা বৃথা সময় নষ্ট করেছি। প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছেন ভগবানের কাছে—আমাদের এই বাক্য তোমার গুণ-কীর্তনে, শ্রবণযুগল তোমার গুণ-শ্রবণে, হস্তদ্বয় তোমার প্রীতিজনক কার্যে এবং মন তোমার পাদপদ্ম-স্মরণে রত থাকুক। আমাদের এই যে মস্তক তোমায় প্রণাম করুক, তোমার ভক্তকে প্রণাম করুক, তোমার শ্রীমূর্তিকে প্রণাম করুক। আমাদের এই চক্ষু তোমার মূর্তিস্বরূপ সাধুগণের দর্শনে নিযুক্ত করলাম।

বাণী গুণাত্মকত্বেন শ্রবণো কথায়ান্, হস্তো চ কর্মস্থ মনস্তব পাদয়োনিঃ।

স্বত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে, দৃষ্টিং সত্যং দর্শনেহস্ত ভবন্তনুনাং ॥

কৃষ্ণ তখন বলছেন, হ্যাঁ, শুনলাম সব। ওরা বলছেন যে,—আমরা তোমার ভক্ত নারদঋষিকে খুব শত্রু বলে মনে করেছিলাম। খুব রাগ হয়েছিল নারদঋষির উপর। এখন দেখছি—ওঁর মত এমন দয়ালু আর জগতে কেউ নাই। কেন? আমাদের পরে নারদঋষি অভিসম্পাত দিয়েছিলেন—তোমরা স্থাবরত্ব লাভ কর, শতজন্ম পরে তোমাদের উদ্ধার হবে। প্রথমে অনেক সময় বেশী ছিল। তারপরে যখন আমরা কান্নাকাটি করতে লাগলাম, তখন বললেন,—কৃষ্ণ-অবতারে তোমরা উদ্ধার লাভ করবে। অনেক সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল। যমলার্জুন বৃক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ কর। যমলার্জুন বৃক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে বললেন কেন? অত্যা বৃক্ষ হয়েও ত' জন্মগ্রহণ করতে পারত। কিন্তু তা নয়, যমলার্জুন বৃক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে বললেন। এর তাৎপর্য কি? এর তাৎপর্য শুনেছি আমাদের গুরুপাদ-পদ্মের শ্রীমুখ থেকে। ব্যাখ্যাতে গুরুপাদপদ্ম বলেছেন,—অজ্জুন গাছ বিশেষ উপকারী গাছ। ডাক্তার, কবিরাজগণ জানেন এই গাছটা কিরকম উপকারী। এর ছাল ভিজিয়ে খেলে **Heart lungs** ভাল হয়। এই নলকুবর ও মণিগ্রীবের **heart-lungs** সব নষ্ট হয়ে গেছে। সেইজন্ম **heart stimulating** যে ওষুধ সেটা পাওয়ার জন্ম এদের অজ্জুনবৃক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে বলেছেন। ঠিক হোক তোমাদের **heart lungs**। **Heart** কোথায় গেল?—সব শেষ। কেন?—অহঙ্কারের দ্বারা। চাররকম অহঙ্কারের কথা ভাগবতে লেখা আছে।—

জন্মৈশ্বর্যশ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।

নৈবাহিত্যাভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্ ॥

এই চাররকম অহঙ্কারে এদের সব শেষ হয়ে গেছে। যমলার্জুন বৃক্ষ হলে পরে এদের এটা **satisfied** হবে **fully** এবং এরা আবার **heart lungs** ফিরে পাবে। নারদঋষি খুব বড় কবিরাজ। আবার তাঁর থেকেও বড় কবিরাজ স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র।

“হৃদয় পীড়িত যা’র, কৃষ্ণ চিকিৎসক তা’র,
ভব-রোগ নাশিতে চতুর।”

কথাটা আছে। যাদের **heart lungs**-এর অসুখ হয়েছে, তাদের অজুর্ন গাছের ছাল ভিজানো জল খাওয়াতে হবে। এখানেও এই কথাটা বলা আছে। এদের স্বরূপ-বিস্মৃতি এসেছে। সেই ভাবটাকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্ত পরম করুণাময় নারদঋষি ওদের যমলাজুর্ন বৃক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ কর—অভিসম্পাৎ করেছেন। আর সময়টাও ছিল খুব বেশী। তাই বললেন, আচ্ছা, কৃষ্ণ যখন আসবেন তখন তাঁর পাদস্পর্শে তোমরা উদ্ধার লাভ করবে। এখন বুঝতে পারছি, নারদঋষি কেমন দয়ালু, কেমন রূপালু, কেমন করুণাময়। নলকুবর ও মণিগ্রীব যে স্তব করেছেন তার মধ্যে এইরকম প্রার্থনা আছে। কৃষ্ণ বললেন, দেখ, আমার প্রতি যাদের প্রেমাকুর উৎপন্ন হয়েছে, তাদের আর এ সংসারে আসতে হয় না। অর্থাৎ ভগবানের বিশেষ করুণায় ওদের আর দেবত্ব থাকল না, একেবারে ভক্তত্ব। তখন সেই বালগোপাল বলছেন—যাও, তোমরা উত্তরের দিকে যাও। ‘উত্তরস্তাং দিশি’ বলা আছে। বৈকুণ্ঠের পথ, সেদিকে **march** কর। ওদের আর দেবজন্ম পেতে হয় নাই।

কৃষ্ণ স্বয়ং বললেন,—আমার প্রতি যাদের প্রেমাকুর উৎপন্ন হয়েছে তাদের আর পুনরায় সংসার দশা হয় না, তাদের আর এ ধরাধামে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না। “নাম লৈতে প্রেম দেয়, এমন দয়াল ত’ নাই রে।” গৌর-নিতাই-এর ক্ষেত্রে একথা বলা আছে। কৃষ্ণ ত’ কম ঘান না। এরা ত’ স্বর্গের দেবতা, তথাপিও কৃষ্ণ এদের চরমগতি দিয়ে দিলেন। আমার প্রতি তোমাদের প্রেমাকুর উৎপন্ন হয়েছে। এমন দয়ালু কৃষ্ণের ভজন করব না ত’ কার ভজন করব? বাচ্চাবয়সে কৃষ্ণযাত্রার যে গান শুনেছিলাম তার দুটো একটা লাইন মনে আছে আমার। ঝুলি নিয়ে যাচ্ছেন কৃষ্ণচন্দ্র রাধারাণীর চিকিৎসা করতে। কৃষ্ণ বলছেন,—“আমি চাই না কিছু পয়সা কড়ি, বিনা পয়সায় বিক্রী করি। আমি যাই গো ছুটে তারই বাড়ী, যে ডাকে মোরে। আছে সব রোগের ঔষধি আমার এই ঝুলির ভিতরে॥” সত্যই তিনি ত’ সব করতে পারেন। তাঁর পক্ষে সবটাই সম্ভব। একই ধরণের দেহ নিয়ে তিনি সব কিছু করতে পারেন। তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করে দিচ্ছেন।

ভাণ্ডীরবনে গোচারণের সময় বাচ্চা কৃষ্ণ ত’ নন্দবাবার কোলে ছিলেন। সেইখানে ত’ বিবাহ হয়ে গেল রাধারাণীর সঙ্গে ওঁর। ব্রহ্মা এলেন, বিবাহ সম্পাদন করলেন। কি ব্যাপার! একটা লৌকিক রীতি দেখালেন ওখানে। তাঁরা যে বস্তু সে ত’ আছেন, কিন্তু ঘটনাগুলো ত’ ঘটছে। শাস্ত্রে বর্ণনা আছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

সাধুসঙ্গে শ্রীহরিনাম-সংকীৰ্ত্তনযোগে

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাক্ষপুত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানাদিসহ

শ্রীব্রজ ও দ্বারকাধাম তীৰ্থাদি দৰ্শন

তারিখ—১৪ই কার্তিক, ১৪০৩ (ইং ৩১/১০/৯৬) বৃহস্পতিবার

“গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।

সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণমি-ভকত-সঙ্গে ॥”

তীর্থদর্শন ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্ততম এবং সাধুসঙ্গে তীর্থ-যাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ। ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে, ইহা নিখিল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভ্রমণচ্ছলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল নহে, সাধুসঙ্গই তীর্থদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। মহাজন-বাক্যে দেখিতে পাই,—“যে-তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাই যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।”

শ্রদ্ধেয় সজ্জনসুধীবৃন্দ !

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজক-কাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও শ্রীমঠের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীবৃন্দের পরিচালনায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, তীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণন ও কীর্ত্তনাদিমুখে লাক্ষারী সুপার ডিলুস্ব বাসযোগে সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে ভোর ৫ ঘটিকায় শুভযাত্রা করা হইবে।

অতএব, ধর্মপ্রাণ সজ্জন-ব্যক্তিগণকে এই পরিক্রমার উল্লিখিত নিয়মাবলী অনুযায়ী যোগদান করিতে আহ্বান জানান হইতেছে। পরিক্রমাপঞ্জী ও নিয়মাবলী পরপৃষ্ঠায় জ্ঞাতব্য।

গুরুভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—

সভাস্বন্দ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ দর্শনীয় স্থানসমূহ :—

১) শ্রীনবদ্বীপধাম, ২) গয়া, ৩) বুদ্ধগয়া, ৪) কাশী, ৫) প্রয়াগ, ৬) চিত্রকূট, ৭) আত্রা, ৮) মথুরা, ৯) শ্রীবৃন্দাবন, ১০) গোবর্দ্ধন, ১১) রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড, ১২) গোকুল, ১৩) জয়পুর, ১৪) গলতা, ১৫) পুষ্করতীর্থ, ১৬) সাবিত্রীদেবী, ১৭) দ্বারকা, ১৮) বেট দ্বারকা, ১৯) গোপীতলাও, ২০) গোমতীগঙ্গা, ২১) পোরবন্দর (সুদামাপুরী), ২২) সোমনাথ, ২৩) প্রভাসতীর্থ, ২৪) নাথদ্বারা, ২৫) কল্লবৃক্ষ, ২৬) অযোধ্যা, ২৭) নৈমিষ্যারণ্য, ২৮) হরিদ্বার, ২৯) হৃষীকেশ, ৩০) লহমনঝুলা, ৩১) কুরুক্ষেত্র, ৩২) দিল্লী প্রভৃতি হইয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন ।

যাত্রীগণের দুইবেলা মহাপ্রসাদ ও বাসভাড়া প্রভৃতির জন্য প্রত্যেককে ৩৩০০ টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে । বাসের সামনের ২৫টি আসনের জন্য আসনপ্রতি অতিরিক্ত ৩০০ টাকা বেশী দিতে হইবে । এই পরিক্রমায় আনুমানিক ৩২/৩৫ দিন সময় লাগিবে ।

চলিতে অসমর্থ ব্যক্তিগণকে রিক্সাদি ভাড়া নিজকে বহন করিতে হইবে । প্রত্যেককে হাঙ্কা বিছানা, টর্চলাইট্, থালা, গ্লাস, জলের ফ্লাস্ক ও প্রয়োজনীয় ঔষধ সঙ্গে লইতে হইবে । কোনরূপ আপত্তিকর কিছু হইলে তাহা পরিচালক কমিটিকে জানাইতে হইবে । নিজেদের বিছানাди নিজকে বহন করিতে হইবে । তীর্থ-পাণ্ডা বিদায়, ঠাকুর-প্রণামী প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যয় ।

যোগাযোগের ঠিকানা—

মূলকেন্দ্র :

শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, ফোন : ৪০০৬৮

পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ) ।

বিঃ দ্রঃ—অনিবার্য কারণে পরিক্রমাসূচী পরিবর্তন স্বীকার্য্য এবং দৈবদুর্বিপাক বা কোনরূপ দুর্ঘটনার জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না । অগ্রিম ৫০০ টাকা ২১শে ভাদ্রের মধ্যে জমা দিতে হইবে । আসন-সংখ্যা সীমিত, সুতরাং সম্ভব যোগাযোগ করিবেন ।



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্সজে অহৈতুকী ভক্তি বিল্লশূন্য ॥

অন্ত ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৮শ বর্ষ	}	১৮ শ্রীধর, ক্ষীরোদশায়ী, ৫১০ শ্রীগোরাঙ্গ ৩২ শ্রাবণ, শনিবার, ১৪০৩, ইং ১৭/৮/৯৬	{	৬ষ্ঠ সংখ্যা
----------	---	---	---	-------------

সান্নুবাদং

শ্রীশ্রীমুকুন্দ-মুক্তাবলী

(শ্রীমদ্-রূপ-গোষ্ঠামি-বিরচিতা)

নব-জলধর-বর্ণং চম্পকোদ্ভাসি-কর্ণং
 বিকসিত-নলিনাস্রং বিষ্ণুরন্মন্দ-হাস্রম্ ।
 কনক রুচি-তুকুলং চারু-বর্হাবচুলং
 কমপি নিখিল-সারং নোমি গোপী-কুমারম্ ॥ ১ ॥

নবীন মেঘের আয় ঝাঁহার বর্ণ, চম্পককুসুমে ঝাঁহার কর্ণযুগল স্নশোভিত,
 বিকসিত পদ্মের আয় মন্দ মন্দ হাস্রযুক্ত ঝাঁহার বদনমণ্ডল, স্ববর্ণকান্তির আয় ঝাঁহার

শোভা, সুন্দর ময়ূরপুচ্ছে ঘাঁহার চূড়া শোভিত এবং যিনি ত্রিজগতের সারবস্ত, ঈদৃশ
কোন গোপীকুমারকে আমি স্তব করি ॥ ১ ॥

মুখ-জিত-শরদিন্দুঃ কেলি-লাবণ্য-সিন্ধুঃ

কর-বিনিহিত-কন্দুর্বল্লবী-প্রাণবন্ধুঃ ।

বপুরুপমৃত-রেণুঃ কক্ষ-নিষ্কিপ্ত-বেণু-

বচন-বশগ-ধেহুঃ পাতু মাং নন্দসুহুঃ ॥ ২ ॥

শরৎকালীন চন্দ্র অপেক্ষাও ঘাঁহার মুখমণ্ডল সুশোভিত, যিনি কেলি সমুচিত
লাবণ্যের সিন্ধু, ঘাঁহার হস্তে ক্রীড়াকন্দুক সুশোভিত, যিনি ব্রজরমণীগণের
প্রাণবন্ধু, গাভীর খুরোখিত ধূলিতে ঘাঁহার কলেবর বিমণ্ডিত, ঘাঁহার কক্ষদেশে বেণু
বিরাজিত, ধেহুগণ ঘাঁহার বাক্য-বশবর্তী, এবস্থিধ নন্দনন্দন আমাকে রক্ষা
করুন ॥ ২ ॥

ধ্বস্ত-দুষ্ট-শঙ্খচূড় ! বল্লবী-কুলোপগূঢ় !

ভক্ত-মানসাধিরূঢ় ! নীলকণ্ঠ-পিচ্ছচূড় !

কণ্ঠলম্বি-মঞ্জু-গুঞ্জ ! কেলিলব্ধ-রম্যকুঞ্জ !

কর্ণবর্ত্তি-ফুল্লকুন্দ ! পাহি দেব ! মাং মুকুন্দ ॥ ৩ ॥

হে ভক্তগণ-মানসাধিপতি ! হে দেব ! হে মুকুন্দ ! তুমি দুষ্ট শঙ্খচূড়কে বিনাশ
করিয়াছ, তুমি ব্রজরমণীগণ-কর্তৃক সদা আলিঙ্গিত, ময়ূরপুচ্ছে তোমার
চূড়া সুশোভিত, সুন্দর গুঞ্জামালা তোমার কণ্ঠে লম্বিত, কেলিবিলাস-নিমিত্ত
মনোহর নিকুঞ্জবন তোমার আশ্রয়স্থল, কুন্দকুসুমে সুশোভিত তোমার কর্ণযুগল,
তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ৩ ॥

যজ্ঞভঙ্গ-রুষ্টিশত্রু-মুন্নঘোর-মেঘচক্র-

বৃষ্টিপূর-খিন্ন-গোপ-বীক্ষণোপজাত-কোপ !

ক্ষিপ্ত-সব্যহস্ত-পদ-ধারিতোচ্চ-শৈল-সদ্ব-

গুণগোষ্ঠ ! রক্ষ রক্ষ মাং তথাহু পঙ্কজাক্ষ ! ॥ ৪ ॥

হে পঙ্কজনয়ন ! যজ্ঞ-ভঙ্গ নিবন্ধন দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর
মেঘসকল প্রেরণ করত বৃষ্টিদ্বারা সমুদয় গোপ-গোপীদিগকে ক্রিষ্ট করিলে তদর্শনে
তুমি রুষ্টি ও ব্যগ্র হইয়া বামহস্তাঘুজদ্বারা অত্যাচ্চ গোবর্দ্ধন-পর্বত ধারণপূর্বক
ব্রজধাম রক্ষা করিয়াছ, অতএব সেই প্রকার অগ্ন আমাকেও রক্ষা কর ॥ ৪ ॥

মুক্তাহারং দধতু চক্রাকারং

সারং গোপী-মনসি মনোজারোপী ।

কোপী কংসে খল-নিকুরস্বোত্তংসে

বংশে রঙ্গী দিশতু রতিং নঃ শার্ঙ্গী ॥ ৫ ॥

যিনি কণ্ঠে নক্ষত্র-মালার গায় মনোহর মুক্তাহার ধারণ করিয়াছেন, গোপিকা-গণের মানসে কন্দর্পভাব আরোপণ করেন, খল-শিরোমণি কংসের প্রতি ষাঁহার অতিশয় ক্রোধ, সেই বংশীপ্রিয় শার্ঙ্গপানি শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে প্রীতি প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

লীলোদ্দামা জলধর-মালা-শ্যামা

কামাঃ কামাদভিরচয়ন্তী রামাঃ ।

স মামব্যাদখিলমুনীনাং স্তব্যা

গব্যাপূর্তিঃ প্রভুরঘ-শত্রোর্মূর্তিঃ ॥ ৬ ॥

ব্রজলীলায় যে শ্রীমূর্তি অত্যন্ত উপযুক্ত, মেঘমালার গায় শ্যামলবর্ণে মণ্ডিত, স্মরষুদে গোপসুন্দরীগণ যৎসমীপে দুর্বলা, নিখিল মুনিগণের নিত্য ধোয়-বস্ত্র, গাভীগণের তৃপ্তিপ্রদ, অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণের সেই শ্রীমূর্তি আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

পর্ব-বর্তুল-শর্বরীপতি-গর্বরীতি-হরাননং

নন্দনন্দনমিন্দিরা-কৃত-বন্দনং ধৃত-চন্দনম্ ।

সুন্দরী-রতি-মন্দিরীকৃত-কন্দরং ধৃত-মন্দরং

কুণ্ডল-দ্যুতিমণ্ডল-প্লুত-কঙ্করং ভজ সুন্দরম্ ॥ ৭ ॥

যিনি মুখমণ্ডলদ্বারা পূর্ণচন্দের গর্ভ খর্ব করিতেছেন, লক্ষ্মী ষাঁহার পাদপদ্ম-সেবারতা, চন্দনাদিদ্বারা ষাঁহার শ্রীঅঙ্গ অলুপ্ত, গোপিকাগণের সহিত বিহারার্থে গিরিকন্দের যন্নির্দিষ্ট সঙ্কেতস্থান, মন্দর পর্বততুল্য গোবর্দ্ধনধারী ষাঁহার গ্রীবাদেশ কর্ণস্থ কুণ্ডল-প্রভায় স্তম্ভোজিত, (হে মন !) পরমসুন্দর সেই শ্রীনন্দনন্দনকে তুমি ভজনা কর ॥ ৭ ॥

গোকুলাঙ্গন-মণ্ডনং কৃত-পুতনা-ভব-মোচনং

কুন্দ-সুন্দর-দন্তমস্মুজ-বৃন্দ-বন্দিত-লোচনম্ ।

সৌরভাকর-ফুল্ল-পুষ্প-বিস্ফুরং-করপল্লবং

দৈবত-ব্রজ-দুর্লভং ভজ বল্লবী-কুল-বল্লভম্ ॥ ৮ ॥

গোকুলের ভূষণস্বরূপ যিনি পুতনার ভববন্ধন মোচনকারী, কন্দ-কুসুমের গায় পরম মনোহর ষাঁহার দন্তাবলী, পদ্মগণও ষাঁহার নয়নযুগলের সৌন্দর্য্য বন্দনা করে, অতিশয় স্নগন্ধি বিকশিত কমল ষাঁহার শ্রীকরে শোভা পাইতেছে, (হে মন !) দেবতাগণেরও দুর্লভ সেই গোপীকুলবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর ॥ ৮ ॥

তুণ্ড-কান্তি-দণ্ডিতোরু-পাণ্ডুরাংগু-মণ্ডলং

গণ্ডপালি-তাণ্ডবালি-শালি-রত্নকুণ্ডলম্ ।

ফুল্ল-পুণ্ডরীক-বণ্ড কুণ্ড মাল্যমণ্ডনং

চণ্ড-বাহুদণ্ডমত্র নৌমি কংস-খণ্ডনম্ ॥ ৯ ॥

যাঁহার বদনকান্তি চন্দ্রমণ্ডলের শোভা তিরস্কার করে, যাঁহার গণ্ড-প্রদেশে চঞ্চল রত্নকুণ্ডল শোভা পাইতেছে, বিকসিত পুণ্ডরীক-মালায় সুশোভিত যাঁহার ভূজদণ্ড অতিশয় প্রতাপশালী, আমি সেই কংস-মর্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৯ ॥

উত্তরঙ্গদঙ্গরাগ-সঙ্গমাতি-পিঙ্গল-

সুঙ্গ-শৃঙ্গ-সঙ্গিপানিরঙ্গনালি-মঙ্গলঃ ।

দিগ্বিলাসি-মল্লিহাসি-কীৰ্ত্তিবল্লি-পল্লব-

জ্বাং স পাতু ফুল্ল-চারু-চিল্লিরত্ন বল্লবঃ ॥ ১০ ॥

কুসুম-চন্দনাদি অনুলেপনে লিপ্ত শ্রীঅঙ্গে যাঁহার লাবণ্যের তরঙ্গ খেলিতেছে, উচ্চশৃঙ্গ গোবর্দ্ধন-ধারণে সমর্থ যাঁহার হস্ত, গোপাঙ্গনাগণের মঙ্গলস্বরূপ যাঁহার কীর্ত্তিবল্লী মল্লিকাকুসুমের গায় দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিতেছে, অতীব সুন্দর ক্রয়ুগলবিশিষ্ট সেই বল্লবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অতঃ তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ১০ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬৭ পৃষ্ঠার পর]

১০। স্বতন্ত্র বিচারদ্বারা কি হরিভজন হয় না ?

“স্বতন্ত্র বিচারের উপর নির্ভর করিলে অমিত্রা গুরুভক্তি তাহার হৃদয়ে কখনই উদ্ভিত হইবে না।” —‘ততৎকর্মপ্রবর্তন’, সঃ তোঃ ১১।৬

১১। অনর্থফলে কি কি উৎপাত সৃষ্ট হয় ?

“অনর্থের ফলে অসৎসঙ্গ, কুটীনাটী, বহিস্মুখাপেক্ষা প্রভৃতি বহু উৎপাতের সৃষ্টি হয় ; তাহাতে ভজন বিগুহ্ব হইতে দেয় না। অসৎসঙ্গে নানারূপ অসদালোচনা হয় ; তাহাতে অসদ্বিশেষে আসক্তি প্রবল হইয়া বিগুহ্ব ভজনের অত্যন্ত বিঘ্ন জন্মায়।” —‘বিগুহ্ব ভজন’, সঃ তোঃ ১১।৭

১২। প্রেম-সম্বন্ধহীন দীর্ঘজীবন ও সুস্থদেহ কি শ্লাঘ্য নহে ?

“যদি প্রেম-সম্বন্ধ না থাকে, তবে সে দীর্ঘ-জীবন ও রোগ-শূণ্যতা কেবল অনর্থের মূল হয়।” —প্রেঃ প্রঃ ২য় প্রঃ

১৩। পূতনা কোন্ আদর্শের প্রতীক ?

“পূতনা—ভুক্তি-মুক্তির শিক্ষক কপট-গুরু। ভুক্তি-মুক্তিপ্রিয় কপট সাধুগণও পূতনা-তত্ত্ব। গুরুভক্তের প্রতি রূপা করিয়া বালকৃষ্ণ স্বীয় নবোদিত ভাবকে রক্ষা করিবার জন্ত পূতনা বধ করেন।”
—চৈঃ শিঃ ৬।৬

১৪। শকট-ভঞ্জন-লীলার শিক্ষা-দ্বারা সাধক কোন্ অনর্থ দূর করিবেন ?

“শকটাস্থর-বধ প্রাক্তন ও আধুনিক অসৎ সংস্কার, জাড্য ও অভিমানজনিত ভারবাহিত্ব ; বালকৃষ্ণ-ভাব শকট ভঞ্জনপূর্বক সেই অনর্থকে দূর করেন।”
—চৈঃ শিঃ ৬।৬

১৫। তৃণাবর্ত কোন্ কোন্ অনর্থের আদর্শ ?

“তৃণাবর্ত-বধ—বৃথা পণ্ডিতাভিমান, তজ্জনিত কুতর্ক, গুরুযুক্তি বা গুরু গ্রায়াদি ও তৎপ্রিয় লোকসঙ্গই তৃণাবর্ত ; হৈতুক পাষণ্ড-মতসমূহ ইহাতেই থাকে। বালকৃষ্ণ-ভাব সাধকের দৈন্তে রূপাবিষ্ট হইয়া সেই তৃণাবর্তকে মারিয়া ভজনের কষ্টক দূর করেন।”
—চৈঃ শিঃ ৬।৬

১৬। যমলাঙ্গুর্ন-ভঞ্জন-লীলায় সাধকের পক্ষে কোন্ অনর্থ দূর করিবার শিক্ষা আছে ?

“যমলাঙ্গুর্ন-ভঞ্জন—শ্রী-মদ হইতে আভিজাত্য-দোষে যে অভিমান হয়, তাহাতে ভূতহিংসা, স্ত্রীসঙ্গ ও আসব-সেবাদি-জন্ত মত্ততা উৎপন্ন হইয়া জিহ্বা-লাম্পট্য এবং নির্দয়তা-প্রযুক্ত ভূতহিংসা ও নিলজ্জতা-দি দোষ হয়। কৃষ্ণ রূপা করিয়া যমলাঙ্গুর্ন ভঙ্গ করত সে দোষ দূর করিয়া থাকেন।”
—চৈঃ শিঃ ৬।৬

১৭। বৎসাস্থর কোন্ অনর্থের প্রতীক ?

“বৎসাস্থর-নাশ—বালবুদ্ধিজনিত লোভ হইতে যে দুষ্ক্রিয়া ও পরবুদ্ধি-বশবর্তিতা হয়, তাহাই বৎসাস্থর-নামক অনর্থ। কৃষ্ণ রূপা করিয়া তাহা দূর করেন।”
—চৈঃ শিঃ ৬।৬

১৮। বকাস্থরের স্বরূপ কি ?

“বকাস্থর-বধ—কুটীনাটী, ধূর্ততা ও শাঠ্য হইতে মিথ্যা-ব্যবহারই বকাস্থর। তাহাকে নাশ না করিলে গুরু কৃষ্ণভক্তি হয় না।”
—চৈঃ শিঃ ৬।৬

১৯। অঘাস্থর কোন্ অনর্থের প্রতীক ?

“অঘাস্থর-বধ—ভূতহিংসা, দ্বেষজনিত পরদ্রোহরূপ পাপবুদ্ধি-দূরীকরণ। ইহা একটী নামাপরাধ।”
—চৈঃ শিঃ ৬।৬

২০। ব্রহ্মমোহী কোন্ অনর্থের সূচক ?

“ব্রহ্মমোহ—কর্ম-জ্ঞানা-দি-চর্চায় সন্দেহবাদ ও ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে মাধুর্য্যের অবমাননা।”
—চৈঃ শিঃ ৬।৬

২১। ধেনুকাসুর কোন্ অনর্থের আদর্শ ?

“ধেনুকবধ—স্থূলবুদ্ধি, সজ্জ্ঞানাভাব, মূঢ়তা-জনিত তহাক্কতা বা স্বরূপজ্ঞান-বিরোধ, উহার দূরীকরণ।” —চৈঃ শিঃ ৬।৬

২২। কালীয়নাগ কোন্ অনর্থের প্রতীক ?

“কালীয় দমন—অভিমান, খলতা পরোপকারিতা, ক্রুরতা ও জীবে দয়াশূন্যতা, ইহার দূরীকরণ।” —চৈঃ শিঃ ৬।৬

২৩। দাবাগ্নি কোন্ অনর্থের সূচক ?

“দাবাগ্নিনাশ—পরস্পর বাদ, সম্প্রদায়-বিদ্বেষ, অশ্রু দেবাদির বিদ্বেষ ও যুদ্ধ ইত্যাদি সংঘর্ষ-মাত্রেই দাবানল, উহার দূরীকরণ।” —চৈঃ শিঃ ৬।৬

২৪। প্রলম্ব কোন্ অনর্থের প্রতীক ?

“প্রলম্ব-বধ—স্ত্রী-লাম্পট্য, লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাশার দূরীকরণ।”

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

২৫। দাবানল কোন্ অনর্থের সূচক ?

“দাবানল পান—নাস্তিকাদির দ্বারা ধর্ম ও ধার্মিকের প্রতি উপদ্রবের দূরীকরণ।” —চৈঃ শিঃ ৬।৬

২৬। যাজ্ঞিক বিপ্রগণের ক্রুষ-প্রতি অবহেলা কোন্ অনর্থের আদর্শ ?

“যাজ্ঞিক-বিপ্রের ব্যবহার—ক্রুষের প্রতি বর্ণাশ্রমাভিমানজনিত উদাসীন বা কর্মজড়তা।” —চৈঃ শিঃ ৬।৬

২৭। ইন্দ্রপূজা কোন্ অনর্থের আদর্শ ?

“ইন্দ্রপূজা নিবারণ—বহুবীশ্বর বুদ্ধিত্যাগ ও অহংগ্রহোপাসনার দূরীকরণ।”

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

২৮। বরুণ হইতে নন্দোদ্ধার-লীলার তাৎপর্যদ্বারা সাধক কি শিক্ষা লাভ করিবেন ?

“বরুণ হইতে নন্দোদ্ধার—বারুণী ইত্যাদি আসবের সেবায় ভজনানন্দ বুদ্ধি পায়—এই বুদ্ধির দূরীকরণ।” —চৈঃ শিঃ ৬।৬

২৯। সর্পগ্রাস হইতে নন্দমোচন-লীলার তাৎপর্য কি ?

“সর্প-কবল হইতে নন্দমোচন—মায়াবাদাদি-গিলিত ভক্তি-তত্ত্বের উদ্ধার ও মায়াবাদাদির সঙ্গ-ত্যাগ।” —চৈঃ শিঃ ৬।৬

৩০। শঙ্খচূড় কোন্ অনর্থের প্রতীক ?

“শঙ্খচূড়-বধ—প্রতিষ্ঠাশা ও স্ত্রীসঙ্গ-স্পৃহা বর্জন।”

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

৩১। অরিষ্টাসুর-বৃষ কোন্ অনর্থের প্রতীক ?

“অরিষ্টবৃষাস্তর বধ—ছলধর্মাতির অভিমানে ভক্তিকে অবহেলা-করণ ; উহার ধ্বংস ।” —চৈঃ শিঃ ৬/৬

৩২ । কেশী-দৈত্য কোন্ অনর্থের আদর্শ ?

“কেশী-বধ—‘আমি বড় ভক্ত ও আচার্য্য’—এই অভিমান, ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি ও পার্থিবাহকার ; উহার বর্জন ।” —চৈঃ শিঃ ৬/৬

৩৩ । ব্যোমাস্তর কোন্ আদর্শের প্রতীক ?

“ব্যোমাস্তর-বধ—চোঁরাতি ও কপট-ভক্তের সঙ্গ-ত্যাগ ।” —চৈঃ শিঃ ৬/৬

৩৪ । দৃঢ়তার অভাব কিরূপ অনর্থ ? তদদ্বারা কি অন্তঃস্থ হয় ?

“‘আজকার মত এই প্রতিকূল বিষয়টী স্বীকার করি, কল্যা হইতে বিশেষ সাবধান হইব’,—এইরূপ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিলে কখনই মঙ্গল হয় না । যে বিষয়টী ভজন-বাধক বোধ হইবে, শ্রীমন্নহাপ্রভুর কৃপা অবলম্বন করিয়া তখনই তাহা পরিত্যাগ করিবে । দৃঢ়তাই সাধনের মূল । দৃঢ়তার অভাব হইলে সাধন-কার্য্যের এক পদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না ।” —‘সাধন’, সং তোঃ ১১/৫

৩৫ । ধর্ম্মধ্বজিতা কি একটা অনর্থ ?

“ইন্দ্রিয়প্রিয় ধর্ম্মধ্বজীদিগের কোন কুপরাশ্রয়ই শুনিবে না ।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭/১

— জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

ভগবানের কথা যাহারা শ্রবণ করিল না, কীর্তন করিল না, চোখ বন্ধ করিয়া নাক টিপিয়া দুই চারি হাত উপরে উঠিবার বুজরুকীতে মত্ত থাকিল, তাহারা হরিসেবা হইতে বঞ্চিত থাকিল । নিরঞ্জন ভজনের চেষ্টায় পদে পদে অসুবিধা । হরিকথা কীর্তন করিলে অপরেও শুনিতে পাইবে ; সুতরাং কীর্তনে আত্মমঙ্গল ও শ্রবণকারীর মঙ্গল—নিজের উপকার ও পরোপকার যুগপৎ হইয়া থাকে । কীর্তনে নিজেরও শ্রবণ হইয়া থাকে । সুতরাং কীর্তনে ত্রিবিধভাবে হরিসেবা হইয়া থাকে—কীর্তনে হরিসেবা, নিজের শ্রবণে হরিসেবা এবং অপরকে শ্রবণের সুযোগ-দানে হরিসেবা । তদ্ব্যতীত কীর্তনপ্রভাবেই স্মরণ হইয়া থাকে । সুতরাং স্মরণের হরিসেবাও ঐ সঙ্গে হয় ।

শ্রীগুরুপাদপদের প্রসিদ্ধ কৃপায় ভগবান্ কি বস্তু, তাহা শ্রোতপথে জানিতে

পারি। অপ্রাকৃত শব্দের শ্রবণের ফলেই অপ্রাকৃত বস্তুর অনুসন্ধান-স্পৃহার উদয় হয়। মানবের শ্রবণ করিবার জন্ত শব্দের আবির্ভাব হয়। আবার কর্ণের আবশ্যকতা শব্দ-শ্রবণের জন্ত। শব্দ না থাকিলে আমরা বর্ণমালার ব্যবহার করিতে পারি না — বিষয়ের অভাবে ইন্দ্রিয় চালনা করিতে পারি না। অমনোযোগীকে মনোযোগী, বহিস্মুখকে উন্মুখ করিবার জন্তই, বিপথগামীকে স্থপথে চালিত করিবার জন্তই গুরুবর্ণ অপ্রাকৃত শব্দের ব্যবহার ও অনুশীলন করেন। অপ্রাকৃত শব্দ চিৎ। শ্রীগুরুদেব বহিস্মুখ ও কৃষ্ণভজনে অমনোযোগী শিষ্যকে কর্ণে আঘাত প্রদান করিয়া আকর্ষিত করেন। অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের জড়বিপ্লবাত্মিকা বাণী শ্রবণ করিতে প্রথম প্রথম শিষ্যের বড়ই কষ্ট বোধ হয়, কিন্তু শিষ্যকে বেদ শ্রবণ করাইবার পূর্বে আচার্য্যকে মানবদের কর্ণবেধ সংস্কার প্রদান করিতে হইবে। শিষ্যের প্রতি উহাই আচার্য্যের প্রথম কার্য্য। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদেরকে শ্রেষ্ঠনাম প্রদান করেন। সেই বৈকুণ্ঠনামই আমাদেরকে অপ্রাকৃত চিন্তার রাজ্যে লইয়া যান। জীব ভগবানের পরা প্রকৃতি। কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুদ্রত্ব ও অগুত্বপ্রযুক্ত তাহা অপরা প্রকৃতির শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বা বঞ্চনা-শক্তির অধীন হইয়া পড়ে। কিন্তু ভগবানের কথায় আমরা একটি বড় আশ্বাসের বাণী, মায়ার কবল হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় সম্বন্ধে একটি বড় সুন্দর মীমাংসা পাইয়াছি। ভগবান্ গাহিতেছেন — তোমার বর্তমানে ইন্দ্রিয়জ্ঞানদ্বারা বাস্তববস্তুকে পরিমাণ করিবার যে ভ্রান্ত-বিচার উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা হইতে তোমাকে মুক্তিদান করিতে পারি। যখন তোমার নিজেই-জ্ঞানদ্বারা আমাকে বুঝিয়া লইবার বিচার পরিত্যাগ করিয়া আমাতে সম্পূর্ণভাবে প্রপন্ন হইবে, তখনই আমি তোমাকে আমার স্বরূপ দর্শন করাইতে পারি। অল্পবুদ্ধি লোকসকলকে শৃঙ্খলিত করিবার জন্ত আমি আমার গুণত্রয়ের ইঞ্জিনকে নিযুক্ত করিয়াছি; কিন্তু যখন তাহারা আমার উপদেশ শ্রবণ করে, তাহারা দেখিবে যে, আমাতে শরণাপত্তিপ্ৰভাবে তাহারা অনায়াসেই আমার অপাশ্রিতা বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। “মাপিয়া লইবার বুদ্ধি”-রূপ মায়া হইতে মুক্তিলাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। আমরা বর্তমানে যে-সকল ইন্দ্রিয় এবং তদুপায়ে যে-সকল জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা কখনই আমাদেরকে বাস্তব সত্যের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারে না। আমরা মায়ার কবলে কবলিত হইতে বাধ্য হইব। মায়া একটি ফাঁদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি আমরা সেই বন্ধন হইতে নিস্তার চাই, তাহা হইলে আমাদের সম্পূর্ণভাবে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং প্রপত্তিই সর্বপ্রধান কথা; সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদনের নামই প্রপত্তি।

প্রেমিকভক্তের রূপাতেই প্রেমপ্রাপ্তি

[পূর্বপ্রকাশিত ৯৮শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৪ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমন্ন্যাসপ্রভু দাক্ষিণাত্যদেশে ভ্রমণকালে সর্বদা প্রেমাবিষ্ট থাকিয়া দর্শন, আলিঙ্গন ও উপদেশবাহ্যে দেশবাসীকে শক্তিসম্ভার করত তাঁহাদের দ্বারা নিকট ও দূরবর্তী গ্রামবাসীদের পর্য্যন্ত বৈষ্ণব ও প্রেমময় করিতে করিতে ক্রমশঃ কুর্মস্থানে উপস্থিত হইলেন।—

এই মত যাইতে যাইতে গেলা কুর্মস্থানে ।

কুর্ম দেখি' কৈল তা'রে স্তবন-প্রণামে ॥

দেবাসুর-কর্তৃক সমুদ্রমন্থনকালে ভগবান্ কুর্মাভতার স্বীয় পৃষ্ঠদেশে মন্থনদণ্ড মন্দার পর্বতকে ধারণ করিয়াছিলেন। রত্নাকর নানাবিধ রত্নরাজি প্রদানচ্ছলে ভোগপ্রবৃত্তির পরিণাম যে যুদ্ধ ও অশান্তি তাহা আমাদের শিক্ষা প্রদান করিলেও ভগবন্মায়ায় মুগ্ধ জীব ভোগবৃত্তিকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহে ; পরন্তু ভগবানের করুণায় নানাবিধ ক্লেশভোগদ্বারা নির্জিত অবস্থায় উপনীত হইয়া ভাগ্যক্রমে সাধু-শাস্ত্র এবং গুরুরূপে প্রকটিত নিজ মঙ্গলের প্রসঙ্গ লাভ করে। তদ্বারাই মনুষ্যের ভগবন্মহিমা জ্ঞাত হইবার সৌভাগ্য উদ্ভিত হয় এবং ক্রমশঃ শাস্ত্র ও সাধুগুরু-সঙ্গপ্রভাবে শ্রীভগবানের মহিমা জীবের মোহাপনোদন করত ভগবানের সেবায় আকৃষ্ট ও রুচিবৃত্ত করিয়া মায়ার সেবা বর্জন করিতে সক্ষম করায়।—

এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।

গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিসতা-বীজ ॥

সংসঙ্গপ্রভাবে ক্রমশঃ নিজতত্ত্ব, পরতত্ত্ব ও মায়াতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করত মায়াগ্রস্ত জীব বলেন,—

কেঁদে বলে, ওহে কৃষ্ণ ! আমি তব দাস ।

তোমার চরণ ছাড়ি' হইল সর্বনাশ ॥

কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে ভাকে বার বার ।

মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তা'রে করে পার ॥

এইরূপে জীব ভগবানে রুচিলাভ করত ভগবানের নামগ্রহণে আবিষ্ট হইয়া থাকে ।

এবং ততঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্তা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচৈঃ ।

হস্তাত্মা রোদিতি রোতি গায়ত্যান্মাদবম্ ত্যতি লোকবাহুঃ ॥

(ভাঃ ১১।২।৪০)

কৃষ্ণসেবনব্রত-পুরুষ অবশ্যচিন্তে স্বীয় প্রিয়তম কৃষ্ণের প্রিয়তম লীলাসূচক নামকীর্তনফলে অনুরাগ লাভ করত আবিষ্ট হইয়া শ্লথহৃদয়ে উন্মত্তের তায় লোকনিন্দাস্তুতিকে অগ্রাহ্য করত কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চিৎকার, কখনও নর্তন-গায়ন করিয়া থাকেন ।

শাস্ত্রে বর্ণিত ভক্তির সর্বোত্তমতা আচরণমুখে সত্য প্রমাণ করত শ্রীমদ্‌মহাপ্রভু দার্শনিকাত্যবাসীদের আশ্চর্য্যাবিত করিলেন ।—

প্রেমাবেশে হাসি' কান্দি' নৃত্য-গীত কৈল ।
 দেখি' সর্বলোকের চিন্তে চমৎকার হৈল ॥
 আশ্চর্য্য শুনিয়া লোক আইল দেখিবারে ।
 প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি' হৈল চমৎকারে ॥
 দর্শনে 'বৈষ্ণব' হৈল বলে 'কৃষ্ণ' 'হরি' ।
 প্রেমাবেশে নাচে লোক উর্দ্ধদ্বাছ করি' ॥
 কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম ।
 সেই লোক 'বৈষ্ণব' কৈল অণু সব গ্রাম ।
 এই মত পরম্পরায় দেশ 'বৈষ্ণব' হৈল ।
 কৃষ্ণনামামৃত-বজায় দেশ ভাসাইল ॥

* * * *

তদেশীয় সজ্জনব্যক্তিদের মহাপ্রভুর প্রতি যেরূপ ব্যবহার ও বিচার তাহার বর্ণনায় দেখা যায়—তঁাহারা তাঁহাকে ব্রহ্মার ধ্যানগম্য (সাক্ষাৎ নহে) পরাৎপর তত্ত্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন ।

কৃষ্ণ-নামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ ।
 বহু শ্রদ্ধা-ভক্ত্যে কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥
 ঘরে আনি' প্রভুর কৈল পাদপ্রক্ষালন ।
 সেই জল বংশ সহিত করিল ভক্ষণ ॥
 অনেকপ্রকার স্নেহে ভিক্ষা করাইল ।
 গোসাঞির প্রসাদান্ন সবংশে খাইল ॥
 যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে ।
 সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে ॥
 মোর ভাগ্যের সীমা না যায় কখন ।
 আজি মোর শ্লাঘ্য হইল জন্ম-কুল-ধন ॥

শাস্ত্রবর্ণিত ভগবদর্শনের অবস্থা লাভ করত কৃষ্ণব্রাহ্মণ ভগবৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে অক্ষমতা নিবেদন করিলেন ।

ভিগ্নতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিন্নন্তে সর্ব-সংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥ (ভাঃ ১।২।১১)

মহাপ্রভুকে দর্শন হেতু কুর্মের মায়িক দেহে অহংবুদ্ধি বিদূরিত হইল, মহাপ্রভুকে নিঃশংসে নিত্যসেবা বলিয়া জ্ঞান জন্মিল এবং সমস্ত কৰ্ম্মবন্ধন ধ্বংস হইয়া গেল । তিনি মহাপ্রভুর নিকটে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে প্রার্থনা জানাইলেন । কুর্ম বলিলেন,—

কৃপা কর প্রভু মোরে যাও তোমা সঙ্গে ।

সহিতে নারিমু তোমার বিরহ-তরঙ্গে ॥

এতদ্ব্তরে মহাপ্রভু বলিলেন,—

প্রভু কহে, ঐছে বাত্ কভু না কহিবা ।

গৃহে রহি' কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা ॥

যা'রে দেখ তা'রে কহ 'কৃষ্ণ' উপদেশ ।

আমার আজায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥

কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ ।

পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥

মহাপ্রভু কুর্মের তায় অধিকারী ভক্তকেও “ঐছে বাত্ কভু না বলিবা” কেন বলিলেন ? এবং গৃহে থাকিয়াই নিরন্তর কৃষ্ণনাম লইতে কেন বলিলেন ? এ বিষয়ে বিশেষ বিচার করা আবশ্যক ।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলাতেও যাজ্ঞিক বিপ্র-পত্নীদিগের কাতর প্রার্থনা সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে সঙ্গ না রাখিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তিত করিয়াছিলেন দেখা যায় । বিপ্রপত্নীগণ তখন কাতরভাবে সযুক্তি নিবেদন করিয়াছিলেন,—

মৈবং বিভোহঁতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং

সত্যং কুরুষ নিগমং তব পাদমূলম্ ।

প্রাপ্তা বয়ং তুলসীদাম পদাবম্ভং

কৈশৈনিবোচুমতিলজ্য সমস্তবন্ধন ॥

হে বিভো ! আপনার এক্রপ নিষ্ঠুরবাক্য বলা সঙ্গত হয় না । “যিনি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন, তিনি আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হন না”—এই বেদবাক্য এবং “আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হন না”—ইত্যাদি স্বীয় প্রতিজ্ঞাবাক্য আপনি পালন করুন । আমরা পতিপুত্রাদি সমস্ত বান্ধবগণকে অগ্রাহ্য করত আপনার পাদপদ্মে অবজ্ঞাভরেও অর্পিত তুলসীমাল্যকে মস্তকে ধারণ করিবার জন্য আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়াছি ।

বিপ্রপত্নীগণের অধিকার কুর্মের অধিকার অপেক্ষা পরমোন্নত, তথাপি কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদিগকে তাঁহার সঙ্গে অবস্থান করিবার উপযুক্ত নহে বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়াছিলেন। উভয়পক্ষেই ভগবানকে চাক্ষুষ দর্শন হইলেও বিপ্রপত্নীদের ব্রজদেবীদের শ্রীমুখনিঃসৃত কৃষ্ণলীলামৃত শ্রবণে তাঁহাদের চিত্ত যেরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিল, কুর্মবিপ্রের সে সৌভাগ্য ঘটে নাই। বিপ্রপত্নীগণের পরমোন্নত অধিকারও উপযুক্ত ছিল না, তদপেক্ষা অধিকতর যোগ্যতা বা আসক্তি আবশ্যক বলিয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন,—

ন প্রীতয়েহুতুরাগায় হৃঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ ।
তন্মনো ময়ি যুজ্ঞানা অচিরান্মামবাপ্যথ ॥
শ্রবণাদর্শনাক্যানাময়ি ভাবোহুতুকীর্তনাৎ ।
ন তথা সন্নিকর্ষণে প্রতিয়াত ততো গৃহান্ ॥

ইহলোকে কেবলমাত্র অঙ্গসঙ্গ মানবগণের স্মৃতি বা অনুরাগ উৎপাদন করিতে পারে না। অতএব তোমরা আমার প্রতি মন নিবিষ্ট করিয়া অচিরেই আমাকে লাভ করিতে পারিবে। আরও দেখ—আমার গুণশ্রবণ, বিগ্রহদর্শন, রূপচিস্তন এবং নাম-গুণ-কীর্তন হইতে যেরূপ আসক্তি জন্মে, নিকটে অবস্থান করিলে সেরূপ হয় না, অতএব গৃহে প্রত্যাবর্তন কর।

মহাপ্রভুকে দর্শনজনিত কুর্মের অনর্থ নিবৃত্ত হইতে পারে, পরন্তু ইহাই পার্শদত্ব-লাভের যোগ্য অধিকার নহে। এগন কি, স্বরূপসিদ্ধি ঘটিলেও বস্তুসিদ্ধি ও সেবনোপযোগী পার্শদ তহু লাভ না করিলে ভগবানের সান্নিধ্যে অবস্থান ঘটিতে পারে না। কেবল মায়ামুক্তির দ্বারা ভগবানের নিকটে অবস্থান সম্ভব নহে; তৎপরে নিষ্ঠা, কৃতি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমাদি অধিকার লাভের প্রয়োজন আছে। অধিকার-বহির্ভূত প্রার্থনা কখনই অনুমোদনযোগ্য নহে। তজ্জন্তই মহাপ্রভুর উক্তি—‘ঐছে বাত্ কভু না কহিবা।’ কুর্মকে গৃহে অবস্থান করত নিরন্তর কৃষ্ণনাম লইবার উপদেশদ্বারা কুর্মের প্রয়োজনীয় উন্নত অধিকার লাভের অপেক্ষা বুঝাইতেছে। পরন্তু সাধারণ গৃহ ভজনের প্রতিকূল হইলেও শ্রীমন্ন্যহাপ্রভু কুর্মকে কৃপাশীর্বাদ দানে তাঁহার গৃহকে ভজনানুকূল করিয়া দিলেন। তাঁহার আশীর্বাদ—‘কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।’ বিষয়ীর বিষয়বহুল গৃহ ভজনের অনুকূল নহে বলিয়া দুঃসঙ্গজ্ঞানে তাহাকে বর্জনের ব্যবস্থা বর্তমান। “ততো দুঃসঙ্গমুৎসজ্য সৎসু সজ্জত বুদ্ধিমান্।” কুর্মবিপ্রকে মহাপ্রভু শক্তিসংকারপূর্বক কৃষ্ণনামোপদেষ্টা গুরুর অধিকারও প্রদান করিয়াছিলেন।—“আমার আজায় গুরু হঞা তার’ এই দেশ।” এই বাক্যটীও কুর্ম ও তাদৃশ শক্তিসংকারিত ব্যক্তিনিষ্ঠ জানিতে হইবে; ইহা

অনর্থযুক্ত সাধারণ পক্ষীয় বাক্য নহে। অপরাধ ও অনর্থযুক্ত অবস্থায় নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণের কর্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে। পদ্যপুরাণে বর্ণিত আছে,—

“নামাপরাধযুক্তানাং নামন্তেব হরন্ত্যাম্ ।

অবিশ্রান্তি-প্রযুক্তানি তান্বেবার্থকরাণি যৎ ॥

অর্থাৎ নিরন্তর নামগ্রহণদ্বারা অনর্থযুক্ত হইলে গুরু কার্য করা সম্ভবপর জানিতে হইবে।

শ্রীমন্নহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য-দেশে এই পদ্ধতি অবলম্বন করত সর্বত্র প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন।—

পথে ঘাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে ।

ঘা'র ঘরে ভিক্ষা করে, সেই মহাজনে ॥

কৃষ্ণে যৈছে রীতি তৈছে কৈল সর্বঠাঞি ।

নীলাচলে পুনঃ যাবৎ না আইলা গোদাঞি ॥

অতএব ইহা কহিলাম করিয়া বিস্তার ।

এইমত জানিবে প্রভুর সর্বত্র ব্যবহার ॥ (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্তিবেন্দ্রাস্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

নিরপেক্ষতা ও পক্ষপাতিত্ব

মায়াদেবী এমনভাবে চক্রান্তের জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন যে, এই জগতে কৃষ্ণবহিস্মুখগণের কেহই প্রকৃত নিরপেক্ষ থাকিতে পারে না। হয় ভাল, না হয় মন্দ করাই তাহার স্বভাবের পরিচয়। ভগবান্ এক, কিন্তু মানুষ, কুকুরাদি জীবের সংখ্যা অসংখ্য। অনেক পদার্থের সঙ্গে সংস্কৃত হওয়ায় মায়াবদ্ধ জীবের ‘একের’ সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। চेतন জগতে সকলেই এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ব্যস্ত, সেখানে জাগতিক শান্তি ও অশান্তির কোন কথাই থাকিতে পারে না। জাগতিক ‘শান্তি বা অশান্তি’—এই দুইটাই জীবের ভোগপিপাসা-জনিত উপলব্ধি। কিন্তু সাময়িক অর্থাৎ ক্ষণিক শান্তি যে অশান্তিরই পূর্বাভাস, তাহা অজ্ঞানান্ধ জীবের কিছুতেই বোধগম্য হয় না। শান্তি ও অশান্তি, সুখ ও দুঃখ—কখনও নিরপেক্ষ নহে, কারণ দুইটাই পরিবর্তনশীল। দুঃখের অনুভব কম হইলে সুখের উপলব্ধি, আবার সুখের অনুভূতি

কম হইলে দুঃখের অনুভব। জাগতিক শাস্তি তথা সুখের অন্তরালে জাগতিক অশাস্তি তথা দুঃখ লুকাইয়া আছে জানিয়াও তাৎকালিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে গিয়া মায়াবদ্ধ জীবগণ দুঃখ বা অশাহির যুগপক্ষে নিজেদের বলি দিয়া থাকে।

‘তুম্ভি চূপ হাম্ভি চূপ’—এই নীতির পরামর্শকারিগণ প্রকৃতপক্ষে নিরপেক্ষ নহে, তাঁহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে লোকের নিকট প্রতারণামূলক বাক্য বলিয়া জগতের সর্বনাশ করিয়া থাকে। রাজনীতির ক্ষেত্রে ‘নির্দল’ বলিতে যেকোন ‘সুবিধাবাদী’ দলকে বুঝায়, তদ্রূপ ‘তুম্ভি চূপ হাম্ভি চূপ’ এই সর্বনাশা চুক্তির সমর্থনকারী বলিতে দোষী ও অসংখ্যছিদ্রযুক্ত ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করায়। ঐহারা লোকপ্রিয়তাকে সত্য অপেক্ষা অনেক বড় মনে করেন, তাঁহারাই ঐ চুক্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া জাহির করিবার চেষ্টা করেন। বস্তুতঃ মুড়ি ও মিছরির দর যেমন একই নহে, তেমনই লোকপ্রিয়তা ও সত্য একই জিনিস নহে। বাস্তব সত্যগ্রহণ ব্যতীত জগতের কাহারও মঙ্গল হইতে পারে না, তাই প্রকৃত আত্মকল্যাণাকাজী ব্যক্তি সংসাহস, নির্ভীকতা ও সত্য প্রভৃতি আশ্রয়পূর্বক গণ-মত, লোকপ্রিয়তা, তথাকথিত শাস্তি, সংখ্যাধিক্য, নির্বিবাদ ও নির্বিরোধ পৃথিবীতে বা সমাজে বাস—প্রভৃতি বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বাস্তব সত্যকথা অর্থাৎ ভগবানের কথা আচার ও প্রচার করেন।

জগতে যে বস্তুবাদের কথা বহুল পরিমাণে প্রচারিত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে নিরপেক্ষতার কোন চিহ্ন নাই। বাস্তবিক পক্ষে জড়বস্তুবাদ পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। বস্তুর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লেলিন (V. I. Lenin : Materialism & Empirio Criticism, Page—120) বলিয়াছেন,—“বস্তু হইতেছে, বিশ্ব-প্রকৃতির বাস্তব অস্তিত্বে ঐহার অবস্থান আমাদের অনুভূতি নিরপেক্ষ এবং সেই একই জিনিস আমাদের অনুভূতির জগতে প্রতিকলিত হয়।” লেলিনের মতবাদ বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন বস্তুবাদ এবং যান্ত্রিক বস্তুবাদকে অপসারণ করিয়া বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদও অণু কোন বস্তুবাদের দ্বারা অপসারিত হইবে। বস্তুবাদগুলির পরিবর্তনশীলতা ক্রমান্বয়ে দৃষ্ট হইতেছে। কোন বস্তুর পরিবর্তনশীলতা স্বীকার করিলে অতি অবশ্যই তাহার নিরপেক্ষ-ভাবের অভাবের কথা মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিতে হইবে। তাই বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ প্রকৃতপক্ষে নিরপেক্ষ-হীনতারই এক চরম দৃষ্টান্ত—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ভক্তি ও ভক্ত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ

জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গমধ্যে পরিগণিত নয়, যেহেতু তাহা চিত্তের কাঠিন্য উৎপন্ন করে, কিন্তু ভক্তি অতি কোমলস্বভাব। ভক্তি হইতে যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাহাই স্বীকৃত, জ্ঞান ও বৈরাগ্য কখনও ভক্তির হেতু হইতে পারে না। নিরপেক্ষতাই ভক্তিজননী, নিরপেক্ষতাই নিঃশ্রেয়স। জ্ঞান ও বৈরাগ্য যাহা দিতে পারে না, ভক্তিদ্বারা তাহা অনায়াসে লব্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণই ভগবত্তার ইয়ত্তা, অতএব কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তিচেষ্টা, ব্রহ্মানুশীলন ও পরমাত্মানুশীলনরূপ চেষ্টাসমূহ জ্ঞান ও যোগের অঙ্গবিশেষ—ভক্তির নহে। জীব নিত্যকালই কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণপ্রীতিই তাঁহার চরম প্রয়োজনীয় বস্তু। ভক্তিতে কৃষ্ণেরই পরিপূর্ণ স্বার্থ বা কামপূরণের চেষ্টা রহিয়াছে, তাহাতে জীবের ভোগ বা ভোগের কোন অংশও নাই। ভক্তির আভাসেই অনায়াসে ও আনুষ্ঙ্গিকভাবে জীবের সমস্ত ক্লেশের মূল উৎপাটিত হয়, তজ্জন্ম পৃথগ ভাবে আর অনিত্য দৈহিক ক্লেশাদি দূর করিবার চেষ্টা করিতে হয় না। কৃষ্ণভক্তির মধ্যেই প্রকৃত বিশ্বপ্রেম, প্রকৃত দেশপ্রেম পূর্ণমাত্রায় বিद्यমান, তাহার জন্ত আলাদাভাবে দেশপ্রেম বা বিশ্বপ্রেমের অভিনয় করিবার প্রয়োজন হয় না।

যাহারা নিজ ভোগবাসনায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, তাঁহারাি ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ। তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি ভগবৎসেবাবিমুখ জনগণের চিত্তবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অপেক্ষা-যুক্ত কামনাবিশিষ্ট ব্যক্তি ভক্তিযোগ হইতে বিচ্যুত হইয়া অগ্ন্যভিলাষ, কাম-জ্ঞানাদিতে আত্মনিয়োগ করেন। নিরপেক্ষতার অভাবেই ঐ সকল ক্ষুদ্র ফললাভের চেষ্টা উৎপন্ন হয়। ধর্মরক্ষকগণকে সর্বদাই নিরপেক্ষ থাকিতে হয়, নতুবা লোকাপেক্ষার বশবর্তী হইলে ধর্মের রক্ষণ সম্ভবপর নয়। তাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু পার্শ্বদপ্রবর শ্রীদামোদর পণ্ডিতকে বলিয়াছেন,—

তোমা সম 'নিরপেক্ষ' নাহি মোর গণে ।

'নিরপেক্ষ' নহিলে 'ধর্ম' না যায় রক্ষণে ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৩।২৩)

ভক্ত কুকর্মীর গায় কুকর্ম করিয়া সাময়িক লাভবান হইতে চাহেন না, আবার সুকর্মীর গায় পুণ্যকর্ম করিয়া ফলের আকাঙ্ক্ষা করেন না। কুকর্মীর আকাঙ্ক্ষিত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি দ্রব্যসমূহ কানাকড়ির গায় নিরর্থক। সুকর্মী সংকর্মের মাধ্যমে স্বর্গরাজ্যে কিছুকাল সুখভোগ করিবার পরে পুণ্যক্ষয়ান্তে মর্ত্যালোকে পতিত হন। বস্তুতঃ কানাকড়ি দিয়া বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ হয় না। তাই বৈষ্ণবগণ কখনও সুকর্মী বা কুকর্মীর কানাকড়ি গ্রহণ করেন

না, তাঁহারা তাঁহাদের বস্তুসমূহ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত করিয়া অজিত ভগবানকে অনায়াসে জয় করিয়া থাকেন ।

ভগবান্ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, ভক্তপক্ষপাত তাঁহার একটা

মহৎ ও নিরপেক্ষ ভূগ

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে বলিয়াছেন,—

সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

(গীতা ৯।২৯)

“আমার রহস্য এই যে, আমি সর্বভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি,—আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয় নাই, ইহাই আমার সাধারণ বিধি । কিন্তু আমার বিশেষ বিধি এই যে, যিনি আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে এবং আমি তাঁহাতে আসক্ত থাকি ।” এই প্রসঙ্গে চিত্রকেতু মহারাজের পার্বতীর প্রতি উক্তি,—

ন তস্ম কশ্চিদয়িতঃ প্রতীপো ন জ্ঞাতিবন্ধুর্ন পরো ন চ শ্বঃ ।

সমস্ত সর্বত্র নিরঞ্জনস্ত স্তখে ন রাগঃ কুত এব রোষঃ ॥

(ভাঃ ৬।১৭।২২)

“ভগবান্ সর্বভূতে সম, স্তবরাং তাঁহার প্রিয় ও অপ্ৰিয়, জ্ঞাতি বা বন্ধু এবং পর বা আত্মীয় কেহ নাই নিঃসঙ্গ পুরুষ ভগবানের যখন বিষয়স্তখে অনুরাগ নাই, তখন বিষয়স্তখ-প্রাতিকূল্যে রোষ কোথা হইতে আসিবে ?”

কেহ কেহ ভগবানকে পক্ষপাতিত্ব-দোষে দোষযুক্ত করিতে গিয়া পূর্বপক্ষ করিয়া থাকেন,—“শ্রীভগবান্ নিজ ভক্তগণের সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ অভয় পাদপদ্মের সেবা অধিকার দান করেন, অথচ অন্তঃকরণে তাহা দেন না । জীবকে কর্ম্মানুযায়ী পালন করিতে গিয়া তিনি কাহাকেও স্তখ, কাহাকেও দুঃখ, কাহাকেও বন্ধন, কাহাকেও বা মোক্ষরূপ প্রদান করেন, তাহাতে কি তাঁহার রাগ-দ্বेष-জনিত বৈষম্য প্রকাশ পায় না ?” পূর্বপক্ষের উত্তরে উপরোক্ত দুইটা শ্লোক বলিতেছেন,—“পর্জ্জন্ত অর্থাৎ মেঘের দ্বায় ভগবান্ সর্বভূতে সম, তাঁহার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই । তিনি মনুষ্যাদি যাবতীয় ভূতগণকেই স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার রাগ-দ্বেষ-জনিত কোন বৈষম্য থাকিতে পারে না ।” ইহার তাৎপর্য সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ভাগবতের “তথাপি তচ্ছক্তিবিসর্গ” এই শ্লোক (ভাঃ ৬।১৭।২৩) বলিয়াছেন,—

“ভগবান্ মূল কর্তা হইলেও স্বয়ংরূপে তিনি জীবের স্তখ, দুঃখ, বন্ধন, মোক্ষ

প্রভৃতির হেতু হন না। তাঁহার গুণমায়াই জীবের পাপপুণ্যাদি কর্ম্মানুসারে জীবকে সুখ-দুঃখাদি বিভিন্ন প্রকার ফল প্রদান করিয়া থাকে। মায়াশক্তির কার্য্যকে যদি ভগবানের কার্য্য বলিয়াও গণ্য করা হয়, তথাপি ভগবানের বৈষম্য দোষ আসিতে পারে না, যেহেতু জীবগণ স্ব-স্ব-কর্ম্মফলই ভোগ করে।” উক্ত শ্লোকের নীচায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—“সূর্য্যাসদ্বন্ধীয় আতপ যেমন কুমুদ ও পেচকাদির দুঃখপ্রদ, পরন্তু কমল ও চক্রবাকাদির সুখদ, তথাপি সূর্য্যের কেহ বৈষম্য বর্ণন করেন না, তদ্রূপ ভগবন্মায়াদ্বারা জীবকে কর্ম্মানুসারে ফল-প্রদানে ভগবানের বৈষম্য কথিত হয় না।” এই প্রসঙ্গে ভাগবতের ৮।৫।২২ শ্লোকটিও আলোচ্য।

মেঘ সর্ব্বত্রই বারিবর্ষণ করে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রে শস্ত জন্মে, কোথাও জন্মে কণ্টকবৃক্ষ। উহার কারণ মেঘের পক্ষপাতিত্ব নহে, ক্ষেত্রের স্বভাব। নির্ম্মল স্ফটিকের নিকটে রক্তজবা রাখিলে স্ফটিক রক্তাভ দেখায়; নীলপদ্ম রাখিলে উহা নীলাভ হয়, কিন্তু স্বরূপতঃ স্ফটিক রক্তাভও নহে, নীলাভও নহে। দুষ্ক-পোস্ত শিশুর প্রতি স্নেহ-প্রীতি দেখাইলে সে আমাকে দেখিয়া হাসিবে, ঘৃণা-বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিলে সে আমাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইবে। শিশুর শুদ্ধ নির্ম্মল অন্তঃকরণে রাগও নাই, দ্বেষও নাই। উহা আমারই প্রীতি ও বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়া মাত্র। ভগবানের প্রীতি-বিদ্বেষও সেইরূপ জীবেরই প্রীতি বা বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়া মাত্র। ভক্ত প্রহ্লাদ অফুরন্ত প্রীতি লইয়া তাঁহার শরণ লইলেন। হিরণ্যকশিপু অত্যাংকট বিদ্বেষ লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। পুত্রের প্রীতি ও পিতার বিদ্বেষকে কেন্দ্র করিয়া ভগবান্ নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হইয়া বিদ্বেষীকে বিনাশ করিলেন এবং ভক্তকে ক্রোড়ে লইলেন। নৃসিংহ—ভক্তরক্ষক ও অভক্তনাশক, ভক্তের প্রীতি ও অভক্তের বিদ্বেষভাবেরই প্রতিমূর্ত্তি—উহা ভগবানের বৈষম্য-প্রসূত নহে। “নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম”—ইহা শ্রীভগবানের সর্ব্বজীব সম্বন্ধে সাধারণ বিধি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতের (ভাঃ ৯।৪.৬৩) “অহং ভক্ত পরাধীনো…… ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়” শ্লোকে বিশেষ বিধির কথা বলিয়াছেন। ভগবান্ সর্ব্বত্র সম হইয়াও ভক্তি-সম্বন্ধে বা স্বাশ্রিত-বাৎসল্যে বৈষম্যযুক্ত। অবশ্য যিনি ভক্ত হইবেন, তিনি এই বাৎসল্য লাভ করিবেন, ইহাই ভগবানের নিরপেক্ষতা। তবে যিনি যে-প্রকার ভক্ত, তাঁহার প্রতি ভগবানের অধীনতা সেই প্রকারই। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এই বিষয়ে বলিয়াছেন,—“শ্রীভগবান্ ভক্তবৎসল, ইহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তিনি যোগী বা জ্ঞানীবৎসল নহেন। এমন কি, স্বভক্তেই বৎসল,

রুদ্র বা দেবী-ভক্তে নহে।” ভাগবত ৬।১৬।১০ শ্লোকের টীকায়ও তিনি বলিয়াছেন,—“ভগবানে ভক্তবৎসলতা দোষযুক্ত নহে, তাহা তাঁহার ভূষণই।” ব্রহ্মসূত্রের (২।১।৩৬) “উপপত্ত্যে চ অপি উপলভ্যাতে চ”—শ্রীবলদেব বিজ্ঞাভূষণ প্রভু এই সূত্রের যে ভাষ্য লিখিয়াছেন, তাহাও শ্রীম চক্রবর্তিপাদের উপরোক্ত টীকাকে সমর্থন করে। শ্রীবলদেবের ভাষ্য,—“শ্রীভগবানের ভক্তবৎসল্যাহেতু ভক্তপক্ষ-পাতরূপ বৈষম্য যুক্তিসিদ্ধ, ভক্তবক্ষণাদি তাঁহার স্বরূপশক্তি-বৃত্তিভূত-শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়। ভক্ত-পক্ষপাতরূপ বৈষম্য ভগবানের গুণ বলিয়া সর্বশাস্ত্র ও মহাজনগণ ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। ভগবানের যতপ্রকার গুণ আছে, তন্মধ্যে ভক্তপক্ষপাত সমস্ত গুণের ভূষণ-স্বরূপ।

ভক্ত-পক্ষপাতরূপ বৈষম্য ভগবানের নিরপেক্ষতার কোন হানি করিতে পারে না, যেহেতু ভক্তের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তাঁহার একটি নিরপেক্ষ গুণবিশেষ। সে-कारणे ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা বাদ দিয়া সকলপ্রকার শুভাশুভকর্ম সম্পাদনপূর্বক পক্ষপাতিত্ব-দোষে দোষযুক্ত হওয়া কোন বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীক্ষেত্র নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথের

মনোরথ-প্রকাশ-মাহাত্ম্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯২ পৃষ্ঠার পর]

এই স্বপ্নাদেশান্তসারে ইন্দ্রদ্যুম্ন বহু সৈন্যনাগস্তু লইয়া সেই নির্দেশিত স্থানে উপস্থিত হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পরাঙ্কিত পবিত্র দাক্ষব্রহ্মকে দর্শন করিলেন।

আগত দাক্ষব্রহ্মকে সমুদ্র হইতে তুলিবার জ্ঞাত রাজা বহু বলবান্ লোকজন, হস্তী প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়াও দাক্ষব্রহ্মকে সমুদ্রের জল হইতে উপরে তুলিতে পারিলেন না। রাজা পুনরায় স্বপ্নাদিষ্ট হইলেন,—“তুমি আমার পূর্বের সেবক বিশ্বব্রহ্মকে আনয়ন কর এবং একটী সুবর্ণ রথ দাক্ষব্রহ্মের সম্মুখে স্থাপন কর।” তদন্তসারে মহারাজা দাক্ষব্রহ্মের আনয়ন কার্য্য সমাধান করিলেন।

শ্রীমূর্তির প্রকাশ

দারুময় সেই ব্রহ্মকে শ্রীমূর্তিরূপে প্রকট করিবার উদ্দেশ্যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বহু দক্ষ শিল্পীকে আহ্বান করিলেন। শিল্পীগণ সেই দারুব্রহ্মকে স্পর্শই করিতে পারিলেন না। স্পর্শমাত্রেই তাহাদের যন্ত্রপাতি খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যাইত। পরিশেষে স্বয়ং ভগবানই ‘অনন্ত মহারাণা’-নামে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া জনৈক বৃদ্ধ শিল্পীর ছদ্মবেশে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তিন সপ্তাহকালের মধ্যেই মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত করিবেন—আশ্বাস দিলেন। বৃদ্ধ কারিগর রাজাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন,—

একটা ঘরের ভিতরে তিন সপ্তাহকাল দ্বার বন্ধ করিয়া একাকী মূর্তি নির্মাণ করিবেন, তাহার পূর্বে কিছুতেই দ্বার উন্মুক্ত করা হইবে না। কিন্তু দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হইবার পর কারিগরের যন্ত্রপাতির কোন শব্দ না পাইয়া রাজা উৎকণ্ঠিত হইয়া দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেখেন—ভিতরের কারিগর নাই। চমৎকৃত হইবার বিষয়, দারুব্রহ্মটী চারিটা মূর্তিরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। মূর্তিগুলির হস্তের অঙ্গুলিগুলি ও পাদপদ্ম যথাযথরূপে প্রকাশিত হয় নাই। ইহারা শ্রীবলদেব, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীসুভদ্রাদেবী ও সুদর্শন নামে পরিচয় লাভ করিলেন।

অন্য যে-সমস্ত কারিগর মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের আহ্বানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহারা তালধ্বজ, গরুড়ধ্বজ ও পদ্মধ্বজ নামে তিনখানা রথ নির্মাণ করিলেন।

নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে দ্বার উন্মুক্ত করিবার জন্য শিল্পী মূর্তির রূপ দান করিতে পারেন নাই মনে করিয়া এবং নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দায়ে রাজা নিজেকে মহা অপরাধী ভাবিয়া প্রাণত্যাগ করিবার সংকল্প-ধারণে কুশল্যায় শয়ন করিলেন। তখন মধ্যরাত্রে শ্রীজগন্নাথদেব স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া রাজাকে জানাইলেন,— “আমি এই দারুব্রহ্মরূপে “শ্রীপুরুষোত্তম”-নামে নীলাচলে (পুরীতে) নিত্য অধিষ্ঠিত। আমি প্রাকৃত-হস্ত-পদাদিরহিত হইয়াও অপ্রাকৃত হস্ত-পদাদির দ্বারা ভক্তের প্রদত্ত সেবোপকরণ গ্রহণ করি এবং ভুবন-মঙ্গলার্থ বিচরণ করি। প্রেমাঙ্গনস্ফুরিত ভক্তি-বিলোচনে আমার মাধুর্য্যসল্লভ ভক্তগণ আমাকে শ্রীশ্রীম-সুন্দর মুরলীবদনরূপে দর্শন করেন। আমার ঐশ্বর্য্যময়ী সেবায় যদি তোমার কখনও অভিলাষ হয় তাহা হইলে তুমি স্বর্ণ বা রৌপ্য-নির্মিত হস্ত-পদাদির দ্বারা আমাকে ভূষিত করিতে পারিবে। কিন্তু নেইনঙ্গে ইহা জানিয়া রাখ যে, আমার শ্রীঅঙ্গ যাবতীয় ভূষণের ভূষণ-স্বরূপ।”

শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে আদেশ করিলেন, “বিশ্ববহু ও বিজ্ঞাপতির বংশধরেরা যুগে যুগে আমার সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন।” মহারাজ তাহাতে সম্মত হইয়া

প্রার্থনা করিলেন,—“আমাকে একটী বর দান করিতে হইবে এবং তাহা হইল—
প্রত্যহ তিনঘণ্টা আপনার মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকিবে, আর অবশিষ্ট সময় সকলের
দর্শনের জন্ত আপনার মন্দির উন্মুক্ত থাকিবে। সারাদিন আপনার ভোজন
চলিবে, আশনার হস্তপল্লব কখনও শুষ্ক হইবে না।”

শ্রীজগন্নাথদেব ‘তথাস্তু’ বলিয়া সন্মত হইলেন এবং রাজাকে বলিলেন,—“এখন
তোমার নিজের জন্ত বর প্রার্থনা কর।”

রাজা ইন্দ্রহায় প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—“যাহাতে কোন মানুষ আপনার
শ্রীমন্দিরকে নিজ সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিতে না পারে সেজন্ত আমি নির্বংশ
হইতে চাই; আমাকে সেই বর দান করুন।” শ্রীজগন্নাথদেব ‘তথাস্তু’ বলিয়া
তাহাতেও সন্মত হইলেন। এইরূপে পরমমঙ্গলময় শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব,
শ্রীসুভদ্রাদেবী ও স্বদর্শনচক্রসহ জীবকুলের মঙ্গলার্থে শ্রীক্ষেত্রে চারিরূপে প্রকটিত
হইলেন। সপার্বদ মহারাজ ইন্দ্রহায় শ্রীবিগ্রহগণের দর্শনে চমকপ্রদভাবে আনন্দিত
হইয়া পূর্ক আদেশানুসারে তাঁহাদের জন্ত একটী মন্দির নিৰ্ম্মাণের চিন্তায় মগ্ন
হইলেন।

শ্রীমন্দির নিৰ্ম্মাণ

শ্রীইন্দ্রহায় রাজা প্রস্তরদ্বারা শ্রীমন্দির নিৰ্ম্মাণার্থে ‘বউলমালা’ নামক স্থান
হইতে প্রস্তর আনয়নের জন্ত নীলকন্দের পর্য্যন্ত পথ নিৰ্ম্মাণ করিয়া শঙ্খনাভিমুখে
শ্রীমন্দির নিৰ্ম্মাণ করাইলেন। মহারাজা ইন্দ্রহায় দেবর্ষি নারদের উপদেশে
মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতে ব্রহ্মাকে আনয়ন করিলেন। মহারাজ ইন্দ্রহায়
যে-সময়ে ব্রহ্মার নিকট পৌঁছিয়াছিলেন তখন সেখানে শ্রীহরি-সংকীৰ্ত্তন হইতেছিল।
কীৰ্ত্তনশেষে ব্রহ্মা ইন্দ্রহায়ের আগমন-বার্তা শ্রবণ করিয়া কহেন,—হে নৃপতে!
আপনি যে অল্পকাল এখানে রহিয়াছেন ইহা অল্প হইলেও পৃথিবীতে শত শত বৎসর।
এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে মহাপ্রলয় ঘটিয়া গিয়াছে। আপনার পরিবার,
রাজ্য, দৈত্য-সামন্ত সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। কেবল আপনার নিৰ্ম্মিত মন্দির ও
শ্রীবিষ্ণুর দশাবতারসহ চারি-মূর্তি অতাপি বিত্তমান আছেন। আপনি দেবগণসহ
তথায় গিয়া শ্রীমন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উপকরণাদি সংগ্রহ করুন। আমি
দীর্ঘ ই তথায় গমন করিতেছি।

দৈবযোগে রাজা গালবের নীলাচল আগমন

মহারাজ ইন্দ্রহায় মন্দির নিৰ্ম্মাণকার্য প্রায় শেষ করিয়া প্রতিষ্ঠার্থ ব্রহ্মাকে
আনিবার জন্ত সত্যলোকে যাইবার পর প্রলয় সংঘটনে সমুদ্রের বালুকাদ্বারা

নীলাচল আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল। কালক্রমে তথায় নানা বৃক্ষলতাাদি জন্মিয়া বিচিত্র পশুপাখীর আবাসস্থল হইয়াছিল।

অনন্তর একদা গালব নামক এক রাজা যুগয়ার্থ শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। তিনি সমুদ্রতটে বালুকোপরি অস্বারোহণে চলিতে চলিতে কোন রক্তে অশ্বের এক পদ প্রবিষ্ট হওয়াতে অশ্ব উহা উত্তোলন করিতে না পারায় অশ্বপৃষ্ঠে হইতে অবতরণপূর্বক বালুকা খনন করিয়া একটি লৌহনির্মিত চক্র দেখিলেন। তিনি বহু কষ্টে অশ্বের পদ বাহির করিয়া পরে কোতূহল পরবশ হইয়া সেই লৌহচক্র উত্তোলনে অতুচ্চরবর্গ নিযুক্ত করিলেন। অবিলম্বে রাজা গালব বুদ্ধিতে পারিলেন, সেই চক্র কোন মন্দিরের মস্তকস্থিত বিষুচক্র। ইহাতে কোতূহলবশে তিনি সেই মন্দির উদ্ধারার্থ বহু সংখ্যক লোক নিযুক্ত করিলেন। যতই বালুকা অপসৃত হইতে লাগিল ততই এক প্রকাণ্ড মন্দির দৃষ্ট হইতে লাগিল। পরিশেষে যখন সম্পূর্ণরূপে মন্দির নিস্কৃত হইল তখন রাজা দেখিলেন, সেই অত্যুচ্চ বিশাল মন্দিরমধ্যে কোন বিগ্রহ নাই। মন্দির সংক্রান্ত বিষয় এবং ইহার ভিতর কোন মূর্তি না থাকার কারণ বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন তথ্য অবগত হইতে না পারিয়া অবশেষে তিনি মন্দিরে মাধব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাভর্তন করিলেন।

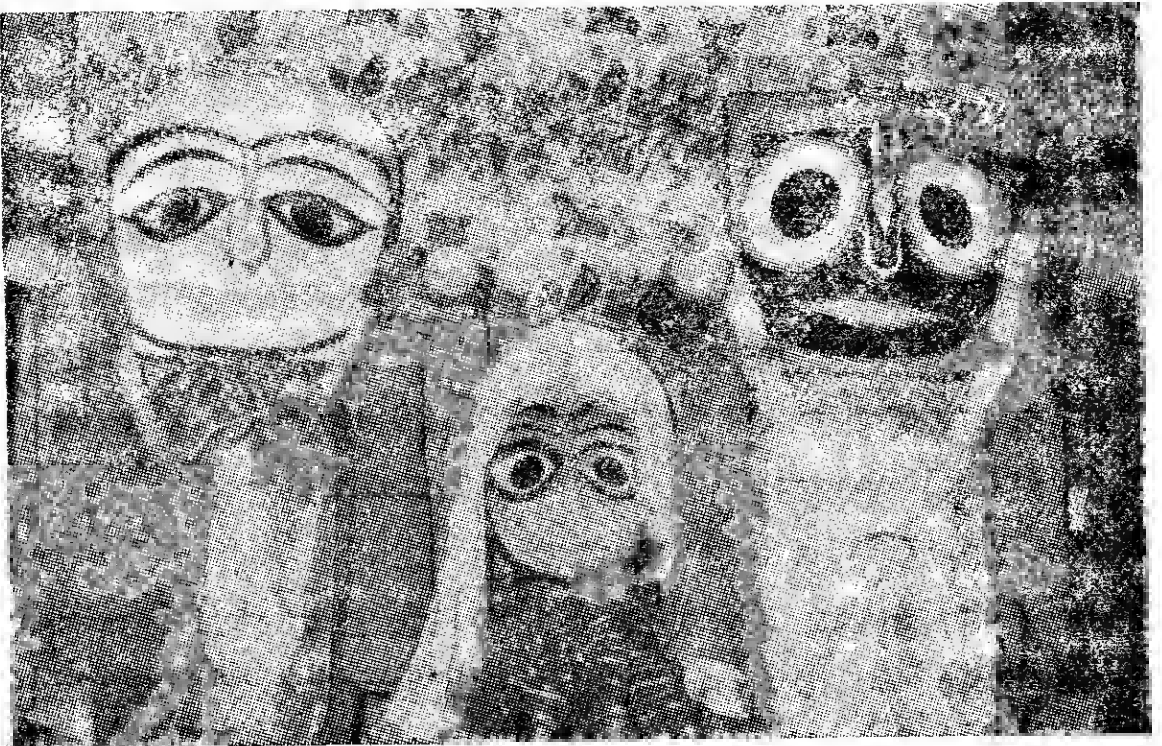
মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের নির্মিত মন্দিরে ব্রহ্মা-কর্তৃক

শ্রীজগন্নাথের প্রতিষ্ঠা

এদিকে ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবগণ ও প্রতিষ্ঠার উপযোগী সকল বিষয় লইয়া নীলাচলে আসিয়া দেখিলেন যে, মন্দিরে মাধবমূর্তি অধিষ্ঠিত আছেন। ইহার কারণ অবধারণে অসমর্থ হইয়া তিনি অক্ষয়বটের সন্নিধানে একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে সেই মাধবমূর্তিকে রক্ষা করিলেন। এদিকে রাজা গালব শ্রীমন্দির হইতে মাধবমূর্তি অপসারণ সংবাদ পাইয়া অতীব ক্রোধাবিত হইয়া সন্মৈত্রে যুদ্ধার্থ নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীলাচলস্থিত শ্রীমন্দিরটি কাহার? রাজা গালবের? না, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের? উভয়ে কলহে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীভগবৎ-কৃপাপ্রাপ্ত ত্রিকালদর্শী কাকভূষণ্ডি ইন্দ্রদ্যুম্নের নির্মিত মন্দির বলিয়া তথায় সাক্ষ্য প্রদান করেন। মন্দিরাদি সংক্রান্ত পূর্ববৃত্তান্ত কাকভূষণ্ডি-কর্তৃক সমস্ত অবগত হইয়া ক্রোধের পরিবর্তে আনন্দিত হইয়া মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের আশ্রিত সেবকের ন্যায় প্রতিষ্ঠাদি কার্যে রাজা গালব নিযুক্ত হইলেন। রাজা গালবের বহু সংখ্যক লোকজন এই মহৎ কার্যে যথায়থরূপে নিযুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন।

এইকপে প্রতিষ্ঠার আয়োজনাদি সমস্ত সংগৃহীত হইলে এবং দেবতাগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিলে ব্রহ্মা হংসরথে তথায় উপস্থিত হইলেন।

তখন ভগবানের চারি দাক্ষমূর্তি গুণ্ডিচা-বাড়ীতে ছিলেন। গুণ্ডিচা—মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের সহধর্মিণী—রাণী। উৎকল-ভাষায় ‘মৌসী’ শব্দের অর্থ—মহামাতা। ‘মৌসী’ শব্দের অপভ্রংশ ‘মাসী’, চলিত মাসীর বাড়ী মানে—মহামাতা গুণ্ডিচা দেবীর বাড়ী। ‘জগন্নাথের মাসীর বাড়ী’—মানে জগন্নাথ, সকলের নাথ প্রভু হইয়াও তিনি তাঁহার ভক্তকে সর্বদাই মাগু করেন। তিনি পুরুষই হউন বা স্ত্রীই হউন, ভক্ত—ভক্তের তথা শ্রীভগবানের মাগু ; এ দুইয়েরই ভক্তকে মানদান স্বভাব। ব্রহ্মা গুণ্ডিচাদেবীর সুরক্ষিত ভগবানের চারি দাক্ষময়ী মূর্তিকে প্রথমে পরিমার্জিতরূপে স্নাত, রঞ্জিত, নানা পটুবস্ত্রে আচ্ছাদিত ও অলঙ্কারাদিতে বিভূষিত করণান্তর শ্রীমন্দিরে লইয়া যাইবার জন্য রথত্রয় আনয়ন করাইলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের রথ গরুড়ধ্বজরূপে, শ্রীবল্লভদেবের রথ তালধ্বজরূপে ও শ্রীসুভদ্রা দেবীর রথ পদ্মধ্বজরূপে চিহ্নিত করা হইল। পরে ইন্দ্রদ্যুম্ন রথারোহণে তাঁহাদিগকে গুণ্ডিচাবাড়ী হইতে নীলাচলের শ্রীমন্দিরে আনিয়া সমুদ্রজলে অভিষেক করাইয়া শ্রীব্রহ্মা-কর্তৃক মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।



হে ষোড়শবৃন্দ ! ভগবান্ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠাদি মহোৎসব শাস্ত্রসম্মত, আর ইহা অপেক্ষা পরম মঙ্গলপ্রদ কিছুই নাই। ইহা সত্য সত্য করিয়া পুনরায় সত্য প্রতিজ্ঞাসহ বলিতেছি,—

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং প্রতিজ্ঞাতং দ্বিজোক্তমাঃ ।

নাতঃ শ্রেয়পদো বিষ্ণোরুৎসবঃ শাস্ত্রসম্মতঃ ॥

শ্রীব্রহ্মা আরও বলেন,—শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিদ্বারা প্রকাশিত এই শ্রীক্ষেত্র ও স্বপ্রকাশ শ্রীভগবানকে প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতা কাহার ? শ্রীজগন্নাথ ও তাঁহার শ্রীধাম এই প্রপঞ্চে তদীয় কৃপায় নিত্য অবস্থিত । ব্রহ্মা শ্রীবলদেব, শ্রীমুভদ্রা, শ্রীজগন্নাথ ও সুদর্শনকে শ্রীমন্দিরে স্থাপনপূর্বক চূড়ায় একটী ধ্বজা বন্ধন করিলেন । দূর হইতে এই ধ্বজা দর্শন করিয়া জগন্নাথ-উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণামকারীকে প্রভু-মুক্তি প্রদান করিবেন ।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-প্রাসঙ্গিক স্নানযাত্রা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস

বৈশাখ মাসের অক্ষয়-তৃতীয়ায় শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা । ঐ দিন হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথ নির্মাণ আরম্ভ হয় । জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমাবধি চন্দনযাত্রা হইয়া পূর্ণিমায় শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব, শ্রীমুভদ্রাদেবী ও সুদর্শনদেব ১০৮ স্বর্ণ ঘণ্টার জলে স্নান করিয়া গণেশরূপ ধারণ করেন । সেদিন হইতে পনের দিন জগন্নাথের দ্বার বন্ধ থাকায় দর্শন হয় না । বলা হয়—জগন্নাথদেব স্নান করিয়া সর্দিজ্বরে রোগাক্রান্ত হইয়াছেন । ইহাকে শ্রীক্ষেত্রে ‘অনবসর কাল’ বলে । শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সার্থক রূপকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীমন্ন্যমহাপ্রভুর চরিত বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

পুনরপি নীলাচলে গমন করিল ।

ভক্তগণে মেলিয়া স্নানযাত্রা দেখিল ॥

অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন ।

বিরহে আলালনাথ করিল গমন ॥

শ্রীক্ষেত্রে নীলাচল দ্বারকাস্বরূপ । এখানকার সমুদ্র সেই স্থিতিই স্ফূরণ করায় । আর দ্বাপরের গোপীজনবল্লভ শ্রীশ্রামসুন্দরই শ্রীমতী রাধাভাবে বিভাবিত বিরহ-রমাস্বাদনকারীরূপে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু । কংস প্রেরিত অক্রুর রথে শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে সোনার ব্রজ আঁধার করিয়া লইয়া যাইতেছেন মথুরায় । ইহাকে না দেখিয়া গোপীগণের দশা—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।

শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥

একটী নিমেষকাল যুগ বলিয়া মনে হয়, চক্ষুতে আঘাটের বর্ষার তায় প্রেমাশ্রু বিগলিত হয়, শ্রীগোবিন্দের বিরহে এ জগৎ শূন্য বলিয়া বোধ হয়, তাঁহারা লাজলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া রথযাত্রায় চরম বাঁধার সৃষ্টি করিলেন । প্রিয় প্রিয়াসঙ্গ বিনা

এবং প্রিয়া প্রিয়সঙ্গ বিনা বাঁচিতে পারে না, তাঁহাদের বাঁচার জন্ত প্রাণাস্পদ শ্রীগৌবিন্দ 'আশা অর্গল' সাত্তনার আশাস দিয়াছেন—শীঘ্রই আসিবেন। সেই আশায় পথপানে চাহিয়া আছেন গোপীগণ। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় অত্যাচারী কংসকে হত্যা করিয়া তাহার শত্রুর জরাসন্ধের হইয়াছেন চরম শত্রু। তৎকর্তৃক বার বার আক্রান্ত মথুরার পুরবাসী, পিতামাতা, আত্মীয়-পরিজনদের স্মরণের জন্ত তাঁহাদের সহিত তিনি স্থানান্তরিত হইয়াছেন নবনির্মিত পুরী দ্বারকায়। অপাত্র শিশুপালের সহিত বিবাহসম্বন্ধে অসম্মতা শরণাগতা ককিলী, যোগ্য বর বরণার্থে পিতার মর্যাদা রক্ষায় জাহ্নবতী, সত্যসঙ্গ সহধর্মিণী অভিলাষিণী সত্যভামা, ব্রতচারিণী লক্ষ্মণা ও নাগজিতী প্রমুখা মহিষীগণ বিবাহ করেন দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণকে। নরকাসুর-কর্তৃক আবদ্ধ ষোড়শ সহস্র রাজকুমারীকে শরণাগতপালক শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করিয়া হইয়াছে গাইস্থ্য-লীলাপরায়ণ। দ্বারকার মহিষীগণ-কর্তৃক অশেষবিশেষে সেবিত হইয়াও আকুলপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কাহাদের চিন্তায় যেন মগ্ন হন, রাত্রে চক্ষুর জলে বালিশ ভিজিয়া যায়, ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দেখিয়া কাহাদের জন্ত যেন ব্যাকুল হন, মাঝে মাঝে কাহাদের নাম লইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, তাঁহার কী যেন হারাইয়াছে, অসহনীয় মর্মবেদনায় আপনমনে তাহাকে খোঁজেন। দ্বারকার রাজ-ঐশ্বর্য, পত্নীগণের পতি সেবা পরিচর্যা, সোনা-দানা, হীরা-জহরত কিছুই তাঁহার সুখপ্রদ নহে। প্রভুর মানসিক পীড়া অনুভব করিয়া রোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, মহিষীগণ মাতা রোহিণীকে।

একদা শ্রীবলদেব ও কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে রোহিণীদেবী মহিষীগণকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাস্পদ ব্রজবাসীগণের কথা বলিবার অভিপ্রায়ে স্বজাতীয়শয়নস্থিত মহিষীদের কৃষ্ণকথা শ্রবণে বাধা-স্বরূপ বিজাতীয় অবরোধ করিবার ছলে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-লীলা শ্রবণের অযোগ্য ভগ্নী সুভদ্রাকে দ্বার রক্ষায় নিযুক্তা করিলেন। রোহিণী-দেবী কৃষ্ণের শান্তরসাম্প্রিত গাতী, বেণু প্রভৃতির সুখদান, দাস্তরসাম্প্রিত চিত্রক-পত্রকের সেবাপ্রচেষ্টা, সখ্যরসাম্প্রিত শ্রীদামাদির সুহৃদমনোরঞ্জন গোবৎস সন্ধানের ছলনাচাতুর্য্য, নন্দযশোদার বাৎসল্যস্বলভ স্নেহের তাড়ন-ভৎসন-শাসন-প্রেম-ভোরে বন্ধনাদি, হরিদাসবর্ষা শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের কন্দমূলদান ও বিবিধ খেলার পরিবেশ রচনা, পৌর্ণমাসীর লীলার সংযোগ যত্ন বর্ণনা করিয়া পরিশেষে সখীগণের মধুর ব্যবহারের কথা বলিতে শুরু করিয়াছেন। কথিকা রোহিণীদেবী ও শ্রোতৃ মহিষীগণ লীলারসে তন্ময়া হইয়াছেন। এমন সময়ে বলদেব প্রভুসহ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারে উপস্থিত হইলে ভগ্নী সুভদ্রা-কর্তৃক ভিতরে প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হন। যাহা আচ্ছাদিত তাহাকে দেখিবার, যে-স্থানে যাইতে নিষেধ সেখানে যাইবার,

যাহাকে জানিতে বাধা তাহা জানিবার ইচ্ছা কোতূহলীর স্বাভাবিক। বলদেব ও কৃষ্ণ আশ্চর্য্য হইলেন, ‘কি এমন কথা! মা মহিষীগণের নিকট বলিতেছেন—যাহাতে আমাদেরও নিষেধনামা জারি!’

বলদেব প্রভু ও শ্রীকৃষ্ণ দ্বারে থাকিয়াই কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। ভগ্নী স্তম্ভ্রাও তাঁহাদের অনুরূপে শুনিতে লাগিলেন। ব্রজের কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের চিত্ত প্রেমরসে দ্রবীভূত হইয়া তিন জনেরই হস্তপদাদি অঙ্গ বিগলিত হইতে লাগিল। এমন সময় যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে বীণাবাদনে শ্রীহরিগুণকারী দেবর্ষি শ্রীনারদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দেবর্ষি নারদ শ্রীবলদেব, দেবী স্তম্ভ্রা ও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গবিগলিত এই মূর্ত্তির কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন,—ব্রজবাসীর ব্রজরসের ভক্তগণের ভক্তিমহিমা শ্রবণ করিতে করিতে ইহারা এতাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পরদুঃখকাতর দেবর্ষি নারদ শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিলেন,—‘হে ভগবন্! ভবদীয় বার্ত্তা শ্রবণে ভক্তের চিত্ত বিগলিত হইয়া প্রেমাক্ত স্বেদ-কম্পনাদি অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হয়, সৌভাগ্যবশে কোন কোন প্রেমিক ভক্তের উহা দৃষ্টি গোচরীভূত হইয়া থাকে; কিন্তু ভক্তের মহিমা-শ্রবণে আরাধ্য ভগবান্ যে এমন বিগলিত হন ইহা অপূৰ্ণ চমকপ্রদ ভগবন্তীলা এবং আত্মকল্যাণকামীর নিত্য দর্শন-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও স্মরণযোগ্য। হে জগন্নাথ! জগতের কল্যাণার্থে আপনার এই রূপ মর্ত্তে বিরাজ করুক। হে শ্রোতৃবৃন্দ! দ্বারকাস্বরূপ নীলাচলে ভক্তের ভক্তিরস শতধারায় স্নাত শ্রীজগন্নাথকে স্নানযাত্রার পরে দর্শন না পাইয়া সেইভাবে বিভাবিত শ্রীগঙ্গাপ্রভু। কৃষ্ণবিরহে মহাপ্রভু মুচ্ছিত হইয়া পড়িলে তাঁহার অঙ্গস্পর্শে পাপাশও বিগলিত হইয়া আলালনাথের মহিমা ঘোষণা করেন।

স্নানযাত্রার পনের দিন পর শ্রীজগন্নাথদেব বৎসরে একবার রথযাত্রার ছলে নীলাচল—দ্বারকা ছাড়িয়া সুন্দরাচল মাসীর বাড়ী শ্রীবৃন্দাবনে ঘাইবার জন্ত নিভূতে মহিষীগণের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু প্রত্যক তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ স্বরূপ দামোদর, রায়-রামানন্দ, শ্রীবাস পণ্ডিতাদির সহিত স্নানযাত্রার সেই রস আশ্বাদন করিয়াছেন। কৃষ্ণ-প্রেমরসিক শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর হেমকুস্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে প্রেমরস আমাদিগকে পান করাইবার জন্ত শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীনবদ্বীপধামে রথযাত্রা অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রজচারী, প্রেমরত্ন

জীবের কৃত্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪২ পৃষ্ঠার পর]

চতুর্দশ ভুবনই জীবের ভোগস্থান। চতুর্দশ ভুবন যথা,—ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই সাতটি উর্দ্ধলোক এবং অতল, সূতল, বিতল, নিতল, তলাতল, মহাতল ও রসাতল—এই সাতটি নিম্নলোক বা পাতাল। এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দশ ভুবনের অন্ততম ভুলোক। এই ভুলোকে আমরা বাস করি। আমরা যে ব্রহ্মাণ্ডে বাস করি তাহা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে পঞ্চাশ কোটি যোজন। দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু তখন ব্রহ্মাকে সৃষ্টিশক্তি দিয়ে সৃষ্টিকার্য্যে নিয়োগ করলেন।

ভগবান্ কৃষ্ণের তটস্থাপ্রকৃতির পরিণাম হল জীব। তট-অর্থে তীরস্থান অর্থাৎ জল ও স্থলের মধ্যস্থান বা সৎ ও অসৎ উভয়ের সন্ধিস্থল এরূপ বুঝায়। যে-সমস্ত জীব চিহ্নজগৎ ও মায়িক জগতের তটস্থানে থেকে উভয় জগৎ দেখতে দেখতে ভগবজ্জ্ঞানাকুণ্ড হয়ে চিদভিলাষী হলেন, তাঁরা চিহ্নজগৎ-বিলাসগত হলাদিনী-বল প্রাপ্ত হয়ে কৃষ্ণপার্শ্বদরূপে চিহ্নজগতে গমন করলেন; তাঁদিগকে নিত্যমুক্ত জীব বলা হয়। আর যাঁরা চিৎ ও জড়ের সন্ধিস্থলে থেকে উভয় কুল দেখতে দেখতে নিজ নিজ সুখ ভোগের ইচ্ছা করলেন, তাঁরাই কৃষ্ণ-বহিস্মূখ হয়ে পড়লেন। ঐ সকল জীবগণের মায়া প্রবেশের পূর্বেই ভোগেচ্ছা জাগায় স্বীয় স্বাতন্ত্র্যরূপ চিহ্ন অপর্য্যাপ্ত করার অপরাধে কৃষ্ণ-স্মৃতি না থাকায় তাঁদের অনাদি-বহিস্মূখ বলা হয়। ভোগেচ্ছার উদয়ে জীবগণ নিকটস্থ মায়াকর্তৃক ভোগায়তন গ্রহণ করতে আহুত হয়। মায়া পার্শ্বস্থিতা এবিধ জীবসকলের মায়াতে মোহিত হবার লোভ দেখে ও তাদের নিত্য ভগবদ্বৈমুখ্যের ফলস্বরূপ মায়াধীশ কারণাক্রিশায়ী পুরুষাবতার তাঁদিগকে জড় জগতে নিক্ষিপ্ত করলেন। কিভাবে পুরুষাবতার-কর্তৃক অপরাধী জীবগণ জড় জগতে নিক্ষিপ্ত হল? আদি পুরুষাবতার কারণাক্রিশায়ী বিষ্ণু চিন্ময় জলপূর্ণ কারণ-সমুদ্রে শয়ন করে দূর হতে জড়া প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করলেন। ঐ ঈক্ষণ জড়া প্রকৃতি বা মায়ার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে মায়ার অন্তর্যামিকরূপে থেকে জড়া মায়াতে ক্রিয়াবতী করলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ মায়াতে স্পর্শ করেন না। তাঁর ইচ্ছাতেই আদি পুরুষাবতার কারণাক্রিশায়ী বিষ্ণু ঐ ঈক্ষণদ্বারে অপরাধী জীবগণকে গুণময়ী (ক্ষোভিতা) মায়াতে সমর্পণ করেন। মায়ার সহিত আদি-পুরুষাবতারের মিলন এক অঙ্গাভাসে হয় অর্থাৎ তিনি স্বয়ং মায়ার সহিত মিলিত হন না। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে,—

“কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ ।

পুরুষেণাত্মভূতেন বীৰ্য্যমাধত্ত বীৰ্য্যবান্ ॥” (ভাঃ ৩।৫।২৬)

অর্থাৎ—“কালবৃত্তিদ্বারা গুণময়ী (ক্ষোভিতা) মায়ায় সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীহরি প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা আদি পুরুষাবতারদ্বারা বীৰ্য্য (চিৎ-পরমাণুপুঞ্জ জীব-শক্তি) আধান করেছিলেন ।”

কৃষ্ণবিমুখ জীবের উপর মায়াশক্তি কাষ্য করে থাকেন । অপরাধী জীবগণকে মায়া সংসার-দুঃখ দিয়ে দণ্ড প্রদান করেন । মায়া নির্দিষ্টকালে ভগবদ্ভিচ্ছায় মহত্ত্ব সৃষ্টি করলেন । মহত্ত্ব হল সমষ্টি বিরাট ও সমস্ত বাসনায়ুক্ত জীব বা হিরণ্যগর্ভের অত্যন্ত সূক্ষ্ম অবস্থা । মহত্ত্ব হতে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কার প্রকাশিত হল । সাত্বিক অহঙ্কার হতে মন ও ইন্দ্রিয়ের শক্তিদাতা ও অধিষ্ঠাতা দেবতাদের সৃষ্টি হল । রাজসিক অহঙ্কার হতে বুদ্ধি এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় প্রকাশিত হল । তামসিক অহঙ্কার হতে ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান পঞ্চ মহাভূত ও অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হল, আর পঞ্চ তন্মাত্রও সৃষ্টি হল । পঞ্চ তন্মাত্র—জীবের ভোগ্য বিষয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ । ঐ বিষয়গুলি পঞ্চ মহাভূতকে আশ্রয় করে থাকে, যেমন—আকাশে—শব্দ, বায়ুতে—শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নিতে—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলে—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, আর মাটিতে—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ । এইভাবে জীবের ভোগের স্থান ও ভোগ্য বিষয়গুলির সৃষ্টি হল । কিন্তু চিৎকণ জীব যে দেহ দিয়ে পঞ্চ বিষয় ভোগ করবে সেই দেহ তখনও সৃষ্টি হয় নি । জীবের সেই দেহ কে সৃষ্টি করলেন ? ব্যষ্টি জীবের দেহ ব্রহ্মা সৃষ্টি করলেন । তখন ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ থেকে বাসনায়ুক্ত জীবগুলি আনলেন, আর বিরাট বা ব্রহ্মাণ্ড থেকে পঞ্চ মহাভূতের উপাদান গ্রহণ করে প্রত্যেক জীবের বাসনানুসারে পৃথক পৃথক চৌরাশী লক্ষ রকমের দেহ সৃষ্টি করলেন । প্রত্যেক জীব যে যে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভোগ করতে ইচ্ছা করল তাকে সেইরূপ দেহ প্রদান করলেন । যেমন, যে জীবগণ গন্ধের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হল তাদের শূকরাদি দেহ প্রদান করলেন ; যে জীবগণ রসের দিকে আকৃষ্ট হল তাদের ভৃঙ্গাদি দেহ প্রদান করলেন । যে জীবগণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটি বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হল, তারা মানব-দেহ প্রাপ্ত হল । এইভাবে কৃষ্ণ-বহিস্মুখ অপরাধী জীবগণ নিজ নিজ ভোগেচ্ছানুসারে পৃথক পৃথক জড়দেহ প্রাপ্ত হল । কিন্তু ইন্দ্রিয় ব্যতীত বিষয়গুলি ভোগ করা যায় না । তাই ব্রহ্মা পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চ প্রকার বিষয়গুলি ভোগ করার জন্য রাজসিক অহঙ্কার থেকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দিলেন । আবার ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি না থাকলে বিষয় ভোগ হবে না,

মেজন্ত ব্রহ্মা সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে ইন্দ্রিয়ের শক্তিদাতা দেবতাদের দ্বারা ইন্দ্রিয়-গুলির শক্তি প্রদান করলেন এবং সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক চিদাভাস মন প্রত্যেক দেহধারী জীবকে দিলেন ।

গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর অংশ তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু প্রত্যেক জীবের মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম শরীর ও পঞ্চ মহাভূতাত্মক স্থূল শরীরের অন্তর্ধামী পরমাত্মারূপে অবস্থান করলেন । এইভাবে অপরাধী জীবগণ সর্বপ্রথম পৃথক পৃথক জড়দেহ ধারণ করে এই মায়িক জগতে আগমন করেন । একজন কুস্তকারের ঘট প্রস্তুতের দৃষ্টান্তদ্বারা এই বিষয়টি সহজে অনুধাবন করা যায় । যেমন, একজন কুস্তকারের ঘট প্রস্তুত করবার সময় ঘটের উপাদান মাটির প্রয়োজন । মাটি না থাকলে ঘট প্রস্তুত হবে না । তেমনই চৌরাশী লক্ষ প্রকারের ভৌতিক জীব-দেহ সৃষ্টি করতে গেলে ভৌতিক উপাদান প্রয়োজন ;—সেই উপাদান হচ্ছে পঞ্চমহাভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ ও সূক্ষ্মজড় মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার । জীবগণ এই জগতে ভৌতিক দেহ নিয়ে বিচরণ করছে ; যেমন—কারও মানুষ দেহ, কারও পশু দেহ, কারও পক্ষী দেহ—এইরূপ বিভিন্ন দেহ পঞ্চমহাভূতে প্রস্তুত । আবার প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ, তমঃগুণের বৈষম্য থেকেই জগতের বস্তুগুলি সৃষ্টি হয়েছে । ঐ তিন গুণের বৈষম্যের জন্ত জীবগণের বিভিন্ন স্বভাব পরিলক্ষিত হয় । জীবের স্বভাব থাকে সূক্ষ্মদেহে । স্বভাব অনুসারে ইন্দ্রিয়গুলি পরিচালিত হয় । পুরুষাবতারত্রয় তথা কারণাক্ষিশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর আশ্রয়ে মায়ী-কর্তৃক জীবগণ দেহ ধারণ করে জগতে যত্র তত্র পরিভ্রমণ করছে । জনসাধারণের চাহিদামত কুস্তকার যেমন তার চক্রদণ্ডের চাকা ঘুরিয়ে ঘট-পট প্রস্তুত করে জনসাধারণের চাহিদা পূরণ করে, তেমনই কুস্তকাররূপী পরমাত্মাও জীবের সংসার-বাসনা পূরণার্থে তাকে মায়িক সত্ত্বার মধ্যে এনে বাসনানুরূপ ভৌতিক দেহ দিয়ে আনন্দচর্চা করাচ্ছেন । যে জীব যেমন দেহ কামনা করছে, সে সেইরূপ দেহ পেয়ে আনন্দচর্চা করছে । জীবের জড়দেহ লাভের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম শুরু হয়ে গেল । যতকাল জীবের ভোগ-বাসনা থাকবে, ততকাল তাকে কর্মের স্থান এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে কর্মানুসারে ভ্রমণ করতে হবে । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ১৮শ অধ্যায়ে ৬১ শ্লোকে জানা যায়,—

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেজ্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়য়া ॥”

অর্থাৎ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—হে অজ্জুন ! অন্তর্ধামী ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করে মায়াবলে (নিজ মায়ীশক্তিবলে) যন্তরূপ দেহে আরূঢ়

দেহাভিমানী জীবদিগকে তাদের কর্মানুসারে ভ্রমণ করান। এক্ষণে জীবের দেহ-যন্ত্রটি একটি আবরণ। এই দেহের মধ্যে দেহী আত্মা যেমন আছেন, তেমনই পরমাত্মা ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু প্রতি জীব-হৃদয়ে কর্মফল দ্রষ্টা ও কর্মফল-দাতারূপে অবস্থান করছেন। ভগবানের নির্দেশে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ব্যাষ্টি জীবের জড় দেহ সৃষ্টি করেছেন। পুরুষাবতার ব্রহ্মাকে দিয়ে সব জীবের দেহ সৃষ্টি করান। তাই আমাদের এই স্মলদেহ পিতামাতা বা অন্য কোনও দেবতার দ্বারা সৃষ্ট নহে। মূলতঃ সমস্ত জীবের দেহের পিতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

আদি পুরুষাবতার কারণোদশায়ী বিষ্ণুর আশ্রয়েই জড় সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর আশ্রয়ে ব্রহ্মা-কর্তৃক ব্যাষ্টি জীবের দেহ সৃষ্টি হয়েছে এবং জীব সংসার-বাসনানুসারে দেহ পেয়ে যেকোনো কর্ম করেছে সেকোনো ফল পাচ্ছে। জীবের হৃদয়ে অন্তর্ধামিরূপে তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু সর্বদা অবস্থান করেন। এইভাবে পুরুষাবতারত্রয়ের ও শেষদেবের আশ্রয়ে জড় জগৎ ও জীব জগৎ অবস্থান করছে। তত্ত্ববিচারে জানা যায়, মূল সঙ্কর্ষণ বলরাম, সঙ্কর্ষণ, পুরুষাবতারত্রয় ও শেষদেব—ইহাদের সকলের একমাত্র আশ্রয় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

বলরাম শ্রীকৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ, সঙ্কর্ষণ ও পুরুষাবতারত্রয় শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশাবতার এবং শেষদেব ও অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য শক্ত্যাবেশাবতার। আর মায়া কৃষ্ণের অপরা প্রকৃতি এবং জীব কৃষ্ণের পরা প্রকৃতি। অতএব কৃষ্ণই সকলের মূল আশ্রয়।

“স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্বাশ্রয়। —

পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে কয় ॥” (১৫: ৮: আঃ ২।১০৬)

জীব স্বভাবতঃ নিগূর্ণ হয়েও স্বেচ্ছাক্রমে ভোগপ্রবৃত্তিবশে সর্কেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্র হতে বিমুখ হওয়ায় তার চিদ্বল হ্রাস প্রাপ্ত হল। সেই সময় মায়ার গুণসকলের প্রতি জীব আকৃষ্ট হওয়ায় মায়া-বৃত্তি অবিচারদ্বারা লিপ্ত হল। এইভাবে জড় জগতের উৎপত্তির কাল থেকেই অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টির আরম্ভ থেকেই জীবগণ অবিচার দ্বারা মোহ প্রাপ্ত হয়েছে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

নিরপেক্ষতা

পূর্ণবস্তু সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনাই হইল গোড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ একমাত্র গোড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনই চিং-অচিং, আলো-আধার, অন্তর্মুখ-বহিস্মুখ, সং-অসং, ভাল-মন্দ দুইটী দিক্ ছাড়াও তটস্থ, নিরপেক্ষ বা মধ্যবর্তী বলিয়া যে একটি অবস্থা আছে, তাহার সম্বন্ধেও যথাযথভাবে সর্বাঙ্গীণ আলোকপাত করিয়া থাকে। জগতে যতপ্রকার দর্শন, মতবাদ এমন কি অগ্ৰাণ্ণ যত ধর্মীয় সম্প্রদায় আছে তৎসমুদয়ই কোন একটি বিশেষ দিক্ বা একটি বিশেষ অবস্থাকে লইয়াই আবদ্ধ থাকে, সেইহেতু ইহাদের সমস্ত আলোচনাই খণ্ড, আংশিক এবং অসম্পূর্ণ। বর্তমান জগতে যে দুইটী মতবাদ বহুল প্রচারিত আছে, সেই দুইটির একটি হইল—ভোগবাদ, অপরটী ব্রহ্মবাদ বা মায়াবাদ অর্থাৎ প্রজ্জ্বল-বৌদ্ধবাদ বা শূন্যবাদ। লৌকিক যতপ্রকার নীতি-আদর্শ, আচার-বিচার, আইন-কানুন আছে তৎসমুদয়ই ভোগবাদকে কেন্দ্র করিয়া। পারলৌকিক ব্যাপারে অধুনা ধর্ম্যনামে যতপ্রকার প্রথা ও মতবাদ প্রচলিত আছে, তৎসমুদয়ই চরমে মোহহং বা শিবোহহম-এর উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ জীবই শিব বা জীবই ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মে লীন হইয়া যাও—এইরূপ অবাস্তব নিকৃষ্ট চিন্তাধারা লইয়াই ব্যস্ত। ভোগবাদ লইয়া বর্তমান আলোচনা আমাদের আদৌ উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে দু-একটি কথা না বলিলে আলোচনা যথাযথ হইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের অমল প্রমাণ-স্বরূপ,— ইহাই অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। “আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়শ্চকাম-বৃন্দাবনং, রম্যা কাচিছুপাসনা ব্রজবধুবর্গেন যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥” ইহাতে বলা হইয়াছে “বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাশ্রুতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥” (ভাঃ ১।২।১১)—অর্থাৎ তত্ত্ববিদগণের তত্ত্বসিদ্ধান্তে ক্রমানুসারে ও চরমে ভগবানিতি, এবং ব্রহ্মেতি-দ্বারা তত্ত্ব-দর্শনের আরম্ভ। কারণ বেদান্তের প্রথমেই বলা হইয়াছে “অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।” ইহার অর্থ জড়ীয় সম্বন্ধ সম্পূর্ণ নিরসন হইলে তাহার পর যে চিজ্জগতের ব্যাপারের গুণভারম্ভ তাহা জিজ্ঞাসার বিষয় হয়। সেই জিজ্ঞাসাই ‘ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা’। ইহা Positive Degree, ভগবানিতি Superlative Degree এবং পরমাশ্রুতি Comparative Degree। তত্ত্ববিদগণ কেবল-জ্ঞানদ্বারা অদ্বয়জ্ঞান বস্তুকে ‘ব্রহ্ম’, সচ্চিদ্বৃত্তিদ্বারা ‘পরমাশ্রুতি’ এবং সচ্চিদানন্দ-সর্বশক্তিভ্রমে সেই বস্তুকে ভগবান্ বলিয়া নির্দেশ করেন। ভগবতত্ত্ব

ঐশ্বর্যদর্শনে বাসুদেব ও ঐশ্বর্যশিথিল মাধুর্যদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীকৃষ্ণ রসপঞ্চকের ভজনীয় ধন । ‘ব্রহ্মোক্তি’ তত্ত্বালোচনার শুরু এবং জড়ীয় আলোচনার পরপার । তজ্জগৎ ইহা নিগূর্ণ, নিঃশক্তিক, নিরাকার, না আলো—না আঁধার, না সুখ—না দুঃখ, নিরপেক্ষ, **Neutral** প্রভৃতি বিভিন্ন নেতিবাচক শব্দে মায়াবাদী-কর্তৃক কথিত হইয়া থাকে । ব্রহ্মরূপ জ্যোতিতে মায়াবাদীর চক্ষু কলমাইয়া যায় । সেইজগৎ ইহারা চক্ষু মুদিত করিয়া থাকাকেই চরম অবস্থা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন । ‘জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্রামসুন্দরম্’—রূপ তাঁহাদের আর দৃষ্টিগোচর হয় না ।

“ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা না শোচতি ন কাজজতি ।

মমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তুজ্জিৎ লভতে পরাম্ ।” (গীতা ১৮।৫৪)

এই শ্লোকটি মায়াবাদিগণ অপব্যাখ্যা করিয়া ‘ব্রহ্ম’ সাজিবার দুর্ভাসনা করিয়া থাকেন । কিন্তু ব্রহ্মভূত হইলেই যদি জীব শ্রীভগবানের সহিত সমতালাভ করিত, তাহা হইলে আবার পরাভক্তি লাভের কথা পরে থাকিত না । ‘ব্রহ্মভূতঃ’ শব্দে কুদ্রাপি ‘ব্রহ্মের’ সহিত ‘জীবের’ সর্বতোভাবে সমতা উক্ত হয় নাই । ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’, ‘তত্ত্বমস্যাং’ প্রাদেশিক বেদবাক্যদ্বারা জীবের পরব্রহ্মত্ব কখনই সিদ্ধ হয় না । চিজ্জাতীয়ত্বে সাদৃশ্যহেতু জীবকে বস্তুতঃ ব্রহ্ম বলা যায় ; কিন্তু সর্বাত্মশে নহে । বস্তুতঃ কৃষ্ণ অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্বই একমাত্র পরব্রহ্ম । “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ । অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্ ।” আবার “এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।” ইত্যাদি ।

‘ব্রহ্মভূত’ অর্থে চৈতন্য আবরণ-রহিত হওয়ায় অষ্টগুণযুক্ত স্ব-স্বরূপের সাক্ষাৎকার । ‘প্রসন্নাত্মা’ অর্থে অবিজ্ঞাদি পঞ্চবিধ ক্লেশ, কৰ্ম্ম-বিপাক, কৰ্ম্মফল ও আশয়াদি অর্থাৎ বাসনাসমূহের নাশহেতু অতিশয় স্বচ্ছ ; নদীর প্রসন্ন সলিলের ন্যায় অতিশয় বিমল । এবম্ভূত হইয়া দেহাদিতে অতিমান না থাকায় ভগবান্ ভিন্ন অণু কোন বস্তুর জগৎ শোক করেন-না এবং অণু কোন জড়বস্তু কামনা করেন না এবং বাহ্যলুপ্তকান না থাকায় ভগবান্ ভিন্ন অণু সমস্ত ভদ্র ও অভদ্র, উচ্চ ও নীচ প্রাণীতে বালকের ন্যায় সমবুদ্ধি হইলে ‘পরাং’ অর্থাৎ ‘নিষ্ঠা জ্ঞানস্ত যা পরা’—যাহা জ্ঞানের চরম নিষ্ঠা বা জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ, নিষ্কাম কৰ্ম্ম ও জ্ঞানাদিশূন্য কেবল ভগবদবুভূতি-স্বরূপ ও তাঁহার দর্শনের সমানাকার সাধ্যাভক্তি লাভ করেন । ভক্তি ভগবৎস্বরূপ-শক্তিবৃত্তি এবং মায়াশক্তি হইতে বিনক্ষণ বলিয়া অবিজ্ঞা ও বিজ্ঞার অপগমেও তাহার অপগম হয় না । পূর্বে মোক্ষ-সিদ্ধিহেতু জ্ঞান-বৈরাগ্যাদিতে আংশিকভাবে অবস্থিত ভক্তির, সর্বভূতে অন্তর্ধামীর ন্যায় স্পষ্ট উপলব্ধি ছিল না বলিয়া ‘কুতঃ’-এই শব্দ প্রয়োগ না করিয়া ‘লভতে’ এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়, “তঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল। উপনিষৎ কহে তাঁ’রে ব্রহ্ম স্থনির্মল ॥” (আদি ২।১২) এবং “অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ। ‘ব্রহ্ম’, ‘আত্মা’, ‘ভগবান্’—তিন তাঁ’র রূপ ॥” (আদি ২।৬৫) শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ভগবৎ-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—“ব্যক্তিগে ভগবত্ত্বে ব্রহ্ম চ বাজ্যতে স্বয়ম্।” অর্থাৎ ভগবত্ত্ব প্রকাশিত হইলে ব্রহ্মত্ব আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তিনি তত্ত্বসন্দর্ভের অষ্টম শ্লোকেও লিখিয়াছেন,—“যশ্চ ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং কচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্র সত্য।” শ্রীব্রহ্মসংহিতায় পাওয়া যায়,—“যশ্চ প্রভা প্রভাবতো জগদণ্ডকোটি, কোটিবিশেষ-বসুধাদি-বিভূতি ভিন্নম্। তদ্ব্যক্ত নিষ্কলমনস্তমশেষভূতং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥” (৫।৪০) ঈশোপনিষদে পাওয়া যায়,—“হিরণ্যেন পাত্রেণ সত্যাস্তানিহিতং মুখম্... তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।” এইরূপ অজস্র প্রমাণ শাস্ত্রে সর্বত্র বিদ্যমান।

শ্রীগীতায় পূর্বেই সেইজন্ত শ্রীভগবান্ নিজেই ব্রহ্মবাদীদের নিরাশ করিয়াছেন, “ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতশ্রাব্যশ্চ চ। শাস্ততশ্চ চ ধর্মশ্চ সূখশ্রৈকান্তিকশ্চ চ ॥” (১৪।২৭) অর্থাৎ, “যেহেতু আমি ব্রহ্মের (নির্বিশেষ) প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, অব্যয় মোক্ষের, সনাতন ধর্মের ও ঐকান্তিক সূখের আমিই একমাত্র আশ্রয়।” অব্যয় মুক্তি সহক্বেও শ্রীমদ্ভাগবতে দেবগণ মুচুকুন্দকে বলিয়াছেন,—“বরং বৃণীশ্ব তদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমগ্ন নঃ। এক এবেশ্বরস্তশ্চ ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥” (১০।৫১।২০) অর্থাৎ—হে রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক। আপনি অগ্ন মুক্তি ব্যতীত অপর যে-কোন বর প্রার্থনা করুন, আমাদের মধ্যে একমাত্র অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণুই মুক্তি প্রদানে সমর্থ।

শ্রীভগবানের জড়শক্তিতে তাঁহার তটস্থ-শক্তির চৈতন্যবীজের আধানকালে, প্রথমোক্ত শক্তির যে আদি প্রকাশ, তাহাই তাঁহার ‘ব্রহ্ম’-স্বভাব। জড়ব্রহ্ম জীব জ্ঞানালোচনাক্রমে যখন উচ্চোচ্চ অবস্থা লাভ করিতে করিতে ব্রহ্মধাম লাভ করেন, তখন তিনি নিগুণ অবস্থার প্রথম সীমা প্রাপ্ত হন। সেই সীমা লাভ করিবার পূর্বে জড়বিশেষ-ত্যাগরূপ একটা নির্বিশেষ ভাব উপস্থিত হয়। তাহাতে অবস্থিত হইলে সেই নির্বিশেষতা দূরীভূত হইয়া চিদ্বিশেষ হইয়া পড়ে। এই ক্রমানুসারে জ্ঞানমার্গে সনকাদি ঋষিগণ ও বামদেব প্রভৃতি নির্বিশেষ আলোচকগণ নিগুণ-ভক্তিরসরূপ অমৃত লাভ করিয়াছেন। মুমুক্সরূপ দুর্দাসনা-বশতঃ দুর্ভাগ্যক্রমে যাহাদের ব্রহ্মত্বে সম্যক অবস্থিতি না হয়, তাহারা চরমে নিগুণ-ভক্তি লাভ করিতে পারে না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবীরভদ্ৰদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন

অপ্রাকৃত-দীনতা হীনতা নহে

‘দীন’-অর্থে কৃষ্ণ-বিরহকাতর

অগ্নি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে ।

হৃদয়ং হৃদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ।

(চৈঃ চঃ মঃ ৪।১২০)

শ্রীমদ্বায় শ্রীমদ্বাধবেন্দ্রপুরীপাদ সর্বপ্রথম এই অপূর্ব শ্লোক রচনাদ্বারা প্রেম-ভক্তি-কল্পতরুর বীজ বপন করিয়াছিলেন । ইহা পরবর্তিকালে অঙ্কুরোদগম হইয়া মূল, শব্দ, শাখা, প্রশাখা, উপশাখা, পত্র, পুষ্প ও প্রেমফলময় বিশাল মহীৰুহে পরিণত হয় । শ্রীমদ্বাহাপ্রভুই ইহার মালী ও মূলশব্দস্বরূপ এবং এই শ্লোকেই তাঁহার যাবৎ উপদিষ্ট-তত্ত্ব অন্তর্নিহিত ।

“মথুরারাজ্যপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে শ্রীমতী রাধিকার মহাপ্রেমের যে উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, সেই ভাবের অন্তর্গত হইয়া যে-কৃষ্ণভজন করা যায়, তাহাই সর্বোত্তম । এই রসের ভক্ত আপনাকে অত্যন্ত দীনজ্ঞানে ‘দীনদয়ার্দ্রনাথকে’ এইভাবে ডাকিবেন । **জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন** । কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন, তাঁহার অদর্শনে শ্রীমতীর হৃদয় নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার দর্শন-লালসায় বলিতেছেন,—হে কান্ত, তোমার দর্শনভাবে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল ; বল, আমি কি করিলে তোমার দর্শন পাই ? আমাকে দীনজন জানিয়া তুমি দয়ার্দ্র হও ।” (অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য) । প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী অনুভাষ্যে,—‘দীনাস্ত কৃষ্ণবিরহকাতরাস্ত’ অর্থাৎ দীনতা বলিতে কৃষ্ণ-বিরহকাতরতাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন । সুতরাং ‘দীন’ বলিয়া জগতের অভিধানে যে হীনতাময় ভাবার্থের উদয় হয়, অপ্রাকৃত ভূমিকায় তাহা পরমভূষণ-স্বরূপ—ভাবের অবধি । অপ্রাকৃত কবিকুলশেখর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উক্ত শ্লোক সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—“এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধাঠাকুরাণী । তাঁর কৃপায় স্মুরিয়াছে মাধবেন্দ্র-বাণী ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ৪।১২৪) । এমতাবস্থায় শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীকে ‘দীনশিরোমণি’ বলিলে নিশ্চয়ই তাহা অসত্য অথবা অত্যাক্তি হইবে না । কারণ তাঁহার তায় কৃষ্ণবিরহকাতরতা আর কাঁহার পক্ষে সম্ভব ?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত দৈন্ত

গম্ভীরায় ভাবগম্ভীর ‘শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক’ আশ্বাদনকালে উৎকট-বিরহতাপে জর্জরিত শ্রীমন্মহাপ্রভু হৃদয়ের শোক ‘উবাড়িয়া’ যে শ্লোক কীর্তন করিয়াছেন তাহা অপ্রাকৃত দৈন্তের পরম পরাকাষ্ঠা।

ন প্রেমগন্ধোহস্তি দূরাপি মে হরৌ, ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।

বংশীবিলাস্তানন-লোকনং বিনা, বিভস্মি যং প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥

(চৈঃ চৈঃ মঃ ২।৪৫)

“শ্রীকৃষ্ণে আমার প্রেমের লেশমাত্রও নাই। তবে যে আমি তাঁহার জন্ত ক্রন্দন করিতেছি, তাহা কেবল আমার সৌভাগ্য জানাইতেছি মাত্র। যদি সত্যই তাঁহাতে আমার প্রেম থাকিত, তাহা হইলে সেই বংশীবিলাস্তাননের শ্রীমুখদর্শন না করিয়া আমি কিছুতেই বৃথা জীবন ধারণ করিতাম না। অহো! কি আশ্চর্য্য দীনতা, কি মহান্ লাভ! জগৎপূজ্য গৌরভক্তগণও দীনতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের দৈন্ত-ক্লিষ্ট-বসন, দৈন্ত-নমিত-বদন এবং দৈন্ত-নমিত-বচন—সকলই দৈন্তের চূড়ান্ত আদর্শ এবং চরম শিক্ষা।—(শ্রীভক্তিবিমোদ ঠাকুরকৃত ‘দৈন্ত’)।”

জগন্মহাপ্রভুর দৈন্তদশা ‘দীনতা’ নহে

“তৃণাদপি সুনীচেন”—শ্লোকদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনামভজনের যে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে দীনতাই ভজন-প্রণালীর প্রথম ও প্রধান উপকরণ-রূপে নির্দ্ধিষ্ট হয়। তাই বলিয়া ‘দীনতা’ অর্থে জগতে কিছু অভাবজনিত অবস্থা বুঝিতে হইবে না। “জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্” (ভাঃ ১।৮।২৬) কুলের কুলীনতা, ধনের প্রাচুর্য্য, বিচার বাহুল্য এবং রূপের আধিক্যে যেরূপ মদমত্ততা আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্রূপ তাহাদের অভাবেও জীবের একপ্রকার দৈন্তদশা লাভ ঘটে। এই প্রকার দৈন্তদশা পূর্ব্বকর্ম্মফল-প্রসূত ও দেহ-মন সম্পর্কযুক্ত—নিত্য আত্মধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নহে। তাই কোনরূপে কুলহীনের সংকুল, নির্ধনের ধন, অবিদ্বানের বিদ্যা, শ্রী হীনের শ্রী প্রাপ্তি ঘটিলে দৈন্তাভিমান ঘুচিয়া মেস্থলে ‘মদ’ আসিয়া অধিকার করে। “আমি অন্ত্যজ, অত্যন্ত দরিদ্র বা নিরক্ষর, দেখিতে কুৎসিত”—এই প্রকার অনিত্য ও দেহ-মনোগত দৈন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু-উদ্দিষ্ট ‘দৈন্ত’ নহে—ইহাতে তাঁহার হৃদয় যথার্থরূপে দ্রবীভূত হয় না। “উত্তম হুণা হীন করি’ মানহ আপনারে। অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে ॥” (চৈঃ চৈঃ মঃ ১৬।২৬৪)—‘উত্তম’ ব্যক্তির পক্ষেই হীনাভিমান শোভনীয়—তাঁহার জন্তই দীনতা অলংকার-স্বরূপ—‘দীনদয়ার্দ্রনাথ’ তাঁহাতে

মুগ্ধ হইয়া সাক্ষাৎ সেবাদানদ্বারা তাঁহার ভবশাশ মোচন করেন। অসংকর্মে লিপ্ত হইয়া কুন্তীরাশ্র বিসর্জন করিতে করিতে “আমি অসং”—বলিলেও তাহা দৈন্ত্য নহে—অপকর্মের স্বীকারোক্তি মাত্র। অসংকর্ম পরিবর্জন করিয়া সাধুসঙ্গে ‘উত্তম’ হইবার দৃঢ় অভিলাষ জাগ্রত হইলে ‘দৈন্ত্য’-লাভের অধিকার হয়।

দীনতাশূন্য ব্যক্তি দান্তিক

যাহার ভিতরে দীনতা নাই, বুদ্ধিতে হইবে তিনি দান্তিক। দিন এবং রাত্রির ছায় ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক। ‘পণ্ডিত, কুলীন, ধনীর বড়ই অভিমান ॥’—বস্তুতঃ উপরিউক্ত চারিপ্রকার ‘মদ’ হইতেই দান্তিকতার উদয়। যেস্থলে দান্তিকতা, সেস্থলে পুরুষাভিমান, ভোগবাদ, প্রতিষ্ঠাশা, অশরণাগতি, অধিরোহ-বাদ, অশ্রৌতপন্থা, মায়াবাদ, অহংগ্রহোপসানা, অভক্তি ইত্যাদি। এবং যেস্থলে প্রচ্ছন্ন দান্তিকতা, সেস্থলে মিছাভক্তি, শঠতা, কৃত্রিমলীলা-স্বরণ, পিচ্ছিল-হৃদয়ের বহমানন, শ্রীকৃষ্ণকে ভোগেচ্ছা, তাঁহার ভাবের ঘরে সিঁধ কাটিয়া প্রবেশের অপপ্রয়াস প্রভৃতি। এই উভয়প্রকার দান্তিকতাই সাধন-ভজনক্ষেত্রে অত্যন্ত নিকৃষ্ট, অতএব পরিত্যজ্য। “সদা দত্তং হিমা কুরু রতিমপূর্যামতিতরামধে স্বাস্তব্রীতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ॥” (শ্রীমদঃশিক্ষা)।

কপটতা দীনতা নহে

অনেকে দীনতাকেও এক অভিমান বিশেষ বলিয়া মনে করেন। বদ্ধজীব স্বভাবতঃ জড়াভিমানগ্রস্ত। তাই সে ‘দীনতা’ অবলম্বন করিতে গিয়া ‘আমি অত্যন্ত দীন’—এইরূপ এক অভিমান মাত্র আশ্রয় করিয়া বসে। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট তাহা ‘দৈন্ত্য’-রূপে মুগ্ধতার কারণ হইলেও ‘দীনবন্ধু’ তাহাতে বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট হন না। কারণ তাহা সম্পূর্ণ কপটতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার অন্তরালে প্রতিষ্ঠাশা তুষারিণি স্থায় জলিতে থাকে। “আপনি সত্যই অনাসক্ত, আপনার জ্ঞায় বৈরাগ্যবান্ জগতে দুঃখভ”—এইরূপ প্রশংসা লাভ না হইলে অন্তর দক্ষীভূত হইতে থাকে। অনেকক্ষেত্রে আবার এই দৈন্ত্য প্রতিযোগিতামূলক হইয়া প্রকাশিত হয়। দীনতার অভিমান থাকিলে তাহা কোনক্রমেই শুদ্ধ নহে—উহা নিরেট কপটতা—শ্রীকৃষ্ণনামাহুশীলনের বিরোধী। এই প্রকার ‘দৈন্ত্য’ আত্মগত নহে—আরোপিত, তাই সময়বিশেষে (প্রতিষ্ঠার অভাবে বা নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত ঘটিলে) তাহা দস্তুরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য।

দীনতা আত্মার ধর্ম

দীনতা আত্মগত-ধর্মে ওতপ্রোত এবং স্বাভাবিকভাবে অবস্থিত। এই

আত্মধর্মসম্বন্ধীয় দৈন্ত একমাত্র সাধুসঙ্গে এবং হরিভজনেই লভ্য—কর্মফলচক্রে তাহা লাভ হয় না।

এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন। সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন ॥
নিজতত্ত্ব জানি' আর সংসার না চায়। কেন বা ভজিতু মায়া করে হায় হায় ॥
কেঁদে বলে,—‘ওহে কৃষ্ণ, আমি তব দাস। তোমার চরণ ছাড়ি’ হইল সর্বনাশ ॥”
(শ্রীপ্রেমবিবর্ত)

সাধুসঙ্গেই জীব-হৃদয়ে দৈন্তের শুভ উদ্বোধন ঘটে। শ্রীকৃষ্ণের দাস্য হইতে বঞ্চিত হইবার অকপট দুঃখই দৈন্ত—তাহাই শ্রীকৃষ্ণ-বিরহকাতরতা। “আত্ম-নিবেদন দৈন্তে যুচাও জঞ্জাল।” (শ্রীপ্রেমবিবর্ত)।—এই দৈন্ত হইতেই শ্রীকৃষ্ণে আত্মনিবেদন তথা শরণাগতি এবং ভজনক্রিয়ার শুভারম্ভ। তখন হইতে জীবের যাবৎ জঞ্জালরূপ অনর্থ ক্রমে ক্রমে ভস্মীভূত হইতে থাকে। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তাঁহার ‘শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু’-গ্রন্থে প্রেম-অভ্যাসের যে ক্রম দিগ্‌দর্শনরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ সেই ক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে সাধকের তত্ত্বাবস্থা তাঁহার ‘শ্রীমাধুর্য্যকাদম্বিনী’-গ্রন্থে সুবিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়,—এই ভজনক্রিয়ায় জীবের অনর্থ যতই দূরীভূত হইতে থাকে, ততই তাহার চেতনার অর্থাৎ আত্মস্বরূপের বিকাশ ঘটিতে থাকে। এইরূপে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, কচি, আসক্তি, ভাব এবং প্রেম—এই ক্রমে সাধক যতই অরূঢ় হইতে থাকেন, ততই তাঁহার ‘দীনতা’ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। নিষ্ঠাপর একজন সাধক এক ভাবগ্রস্ত সাধকের দৈন্ত কল্পনায়ও আনিতে সক্ষম হন না। সে কি দীনতা! ইহাকে যিনি জগতের দৈন্তদৃশ্যের সহিত একাকার করিয়া ফেলেন—তিনি নিতান্তই দুর্ভাগ্য।

বস্তুতঃ আত্মার স্বরূপেই দীনতা নিত্য এবং অবিচ্ছেদ্যরূপে বিরাজমান। রসসামগ্রী-চতুষ্টয়ের অন্ততম—‘সংসারী’র অন্তর্গত তেত্রিশটি ভাবের মধ্যে ‘দৈন্ত’ একটি পরিলক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন বা অমিলন—সর্বত্র ইহা ঘটিয়া থাকে। তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যথার্থই বলিয়াছেন,—

“প্রেমের স্বভাব—যাঁহা প্রেমের সহক।

সেই মানে—কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেম-গন্ধ ॥”

(চৈঃ চঃ অঃ ২০।২৮)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী

বিরহিণী শ্রীরাধিকা (রাসান্তে)

বল ওহে তরুণ, মোর শ্যাম নটবর,
এসেছে কি তোমাদের পাশে ?
আতিপাতি ব্রজধাম, খুঁজিয়া না পাইলাম,
আনিয়াছি হেথা তা'রি আশে !
তোমরা সে রাসাপায়, প্রণাম করিতে হায়,
লুটিয়া পড়েছ অনুমানি,—
সে-পদ পরশ পেয়ে, মনটী গিয়াছে ধেয়ে,
আজো তাই লুটায় পরাণী ।
ঢালি পূত অশ্রুজল, পূজেছ সে পদতল,
স্মৃতি তা'রি রয়েছে ধরায়,
নিশির শিশির ব'লে, সবে তা'রে পায় দলে,
নাহি জানে কি মাধুরী তায় !!
আতপে তাপিত হয়ে, ব্যথিত পরাণ লয়ে,
যে আসে হে তোমার তলায়,—
তা'রেই লইয়া বৃকে, শাস্তি ঢেলে দাও সুখে,
ও হৃদয়ে ভরা করুণায় !
তরু তব পায় ধরি, অভাগীয়ে দয়া করি,—
চাহ তুলি' করুণ নয়ান ।
তরু তুমি দয়াময়, দহিতেছে এ হৃদয়,
হয়ো নাকো নিষ্ঠুর পাষণ ।
আমার প্রাণের হরি, কোথায় রেখেছ ধরি',
দেহ মোরে শ্যামচাঁদ দান ।
অথবা সে রাকালশী, কা'র কুঞ্জে আছে বসি',
বলে মোর বাঁচাও পরাণ ।
কই कहিলে না কথা, মোর এ দারুণ ব্যথা,
হেরিয়া কি পেলো না বেদন ?
কে কবে দয়াল আর, তুমি বন্ধু বঁধুয়ার,
হেন বটে পুরুষের মন ।

রমণীর আঁখিজলে, পুরুষ নাহিক টলে,
ধিক রহু সো হেন রমণ !!

তরু না কহিল কথা, হেরিয়া মাধবীলতা,
পুছে তারে করিয়া যতন,—

লতা তুমি সখী মোর, দেখছ কি মনোচোর,
কোন্ পথে করেছে গমন ?

বল সখী দয়া ক'রে, কে তা'রে রেখেছে ধ'রে,
বধিবারে আমার জীবন ?

পেলে এ বঁধুয়ারে, রাখিব হৃদয়াগারে,
বাহির না করিব কখন ।

এত বলি লতিকায়, স্তবধ হইয়া চায়,
শুনিবারে উত্তর তাহার ।

সে যে লতা অচেতনা, প্রেমময়ী বুঝিল না,
কহে পুনঃ ঢালি অশ্রুধার,—

অনাথিনী দেখি' মোরে, তুই (ও) অনাদর ক'রে,
না কহিলি একটী বচন,—

অথবা সে বঁধুয়ায়, ডালি দেহ আপনায়,
 (সে যে বড় রমণীমোহন !)

রাধিকার মন হরি, রেখেছ গোপন করি’,
তাই নাহি তুলিলে নয়ন ;

হা নাথ গোলোক ইন্দু, দয়িত করুণাসিন্ধু,
কেন দহ দাসীর জীবন !

হ'য়ে থাকি অপরাধী, এস পায় ধরে সাধি,
তুমি যে হে করুণানিধান !

স্মরিয়া সে মনোচোর, ভাবাবেশে হয়ে ভোরি,
পড়ে বালা হ'য়ে অগেয়ান ।

—ଶ୍ରୀମତୀ ଗଣେନ୍ଦ୍ରବାଳା ଦାଶୀ

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে

সাদর আহ্বান

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ

পোঃ তুরা, পিন্—৭২৪০০১

জেলা—ওয়েষ্ট গারো হিল্‌স্ (মেঘালয়)

ফোন : ৩২৬৯১

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নিয়ামক নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিঃসৃতধারায় সমিতির বর্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আত্মগতো অচ্যুত বংশরের ন্যায় এই বংশরেও উক্ত মঠের সেবকবৃন্দের উদ্যোগে আগামী ৮ই ভাদ্র (ইং ২৫।৮।৯৬) রবিবার হইতে ১১ই ভাদ্র (ইং ২৮।৮।৯৬) বুধবার পর্য্যন্ত পঞ্চম দিবসব্যাপী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ও ১২শে ভাদ্র (ইং ৩০।৮।৯৬) শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্তন, ধর্মসভা, নগর-সঙ্কীর্তন, ছায়াচিত্র এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীযোগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাদি প্রদর্শন তথা বিশেষভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক, ভোগরাগ এবং শ্রীনন্দোৎসব-দিবসে সর্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে।

অতএব, ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সম্বন্ধে যোগদান করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী স্কৃতি অজ্জিত হইবে। বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—২রা বৈশাখ, ১৪০৩

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে জানিতে হইলে বা আত্মকূল্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজের নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

শ্রীজন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান-সূচী

১৮ই ভাদ্র (৪।৯।৯৬) বুধবার—

ব্রাহ্মমুহূর্তে—যথারীতি মঙ্গলারতি ও কীর্তন ।

পূর্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনাম-সঙ্কীৰ্তন ।

অপরাহ্নে—মহাজন পদাবলী কীর্তন ।

গোধূলিলগ্নে—সন্ধ্যারতি ও গীতিকীর্তন ।

রাত্রে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও অধিবাস-কীর্তন ।

১৯শে ভাদ্র (ইং ৫।৯।৯৬) বৃহস্পতিবার—

মঙ্গলারতি—ভোর ৪ টায় ।

নগর-সংকীর্তন—মঙ্গলারতি অন্তে প্রাতঃ হইতে পূর্বাহ্ন ৮টা
পর্যন্ত নগর-পরিভ্রমণ ।

পূর্বাহ্নে—৮-৩০ টার পর সম্পূর্ণ দিবস শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী
হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা-প্রসঙ্গ পারায়ণ ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিক ও শ্রীহরিনাম কীর্তন ।

রাত্রি—৮টা হইতে ধর্মসভা, রামমঙ্গল ও ছায়াচিত্রযোগে
শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন ।

২০শে ভাদ্র (ইং ৬।৯।৯৬) শুক্রবার—

মঙ্গলারতি—ভোর ৪ টায় ।

পূর্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্তন ।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিক ও কীর্তনান্তে ধর্মসভা, পরে ছায়াচিত্রযোগে
শ্রীশ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন ও রামমঙ্গল ।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্তন
স্বীকার্য ।



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।
অধোক্ক্ষে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৮শ বর্ষ	}	২০ হৃষীকেশ, প্রহ্মায়, ৫১০। শ্রীগোরাঙ্গ ৩১ ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৪০৩, ইং ১৭/৯/৯৬	{	৭ম সংখ্যা
----------	---	---	---	-----------

সানুবাদঃ

শ্রীশ্রীমুকুন্দ-মুক্তাবলী

[শ্রীমদ্-রূপ-গোষামি-বিরচিতা]

ইন্দ্র-নিবারং ব্রজপতি-বারং,
নিধূত-বারং হৃত-ঘন-বারম্ ।
রক্ষিত-গোত্রং প্রীণিত-গোত্রং,
তাং ধৃত-গোত্রং নোমি সগোত্রম্ ॥ ১১ ॥

যজ্ঞভঙ্গহেতু কুপিত দেবরাজ ইন্দ্রকে যিনি পরাভব করিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধন ধারণপূর্বক ইন্দ্র-প্রেরিত মেঘের বারিবর্ষণ নিবৃত্ত করত মেঘ বিদূরিত করিয়া ব্রজধাম রক্ষা করিয়াছিলেন, গোসমূহের প্রীতিবর্দ্ধনকারী সেই সপার্বদ ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে বন্দনা করি ॥ ১১ ॥

কংস-মহীপতি-হৃদগত-শূলং,
সন্তত-সেবিত-যামুন-কূলম্ ।
বন্দে সুন্দর-চন্দ্রক-চূলং,
হামহমখিল-চরাচর-মূলম্ ॥ ১২ ॥

কংসরাজের হৃদগত শূলস্বরূপ যিনি নিরন্তর যমুনাতীরস্থ কুঞ্জসমূহে সেবিত হইতেছেন, মনোহর ময়ূরপুচ্ছ-শোভিত-চূড়াবিশিষ্ট, অখিল চরাচরের মূল সেই নন্দনন্দনকে আমি বন্দনা করি ॥ ১২ ॥

মলয়জ-রুচিরস্তনুজিত-মুদিরঃ,
পালিত-বিবুধস্তোষিত-বসুধঃ ।
মামতি-রসিকঃ কেলিভিরধিকঃ,
স্মিত-সুভগরদঃ কুপয়তু বরদঃ ॥ ১৩ ॥

সুগন্ধি চন্দনাদিতে অতুলিষ্ঠ ঐহ্যার শ্রীঅঙ্গের শোভা নবীন-মেঘের কাস্তিকেও পরাভব করিতেছে, দেবতাগণের পালক যিনি কংসাদি দৈত্যসমূহ বধপূর্বক ভূভার-পীড়িতা বসুধাকে তুষ্ট করিয়াছেন, কেলিবিষয়ে সুরসিক ঐহ্যার দস্তশ্রেণী অত্যন্ত মনোহর, সেই সর্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কৃপা করুন ॥ ১৩ ॥

উররাকৃত-মুরলী-রুত-ভঙ্গং,
নবজলধর-কিরণোল্লসদঙ্গম্ ।
যুবতি-হৃদয়-ধৃত-মদন-তরঙ্গং,
প্রণমত যামুন-তট-কৃত-রঙ্গম্ ॥ ১৪ ॥

বংশীধ্বনি-তরঙ্গ বিস্তারকারী ঐহ্যার শ্রীঅঙ্গকাস্তি নব-জলধর-দীপ্তির স্রাব, যুবতীরূপের হৃদয়ে যিনি অনঙ্গ-তরঙ্গ বিস্তার করেন, সেই যমুনাতট-বিহারী শ্রীহরিকে প্রণাম কর ॥ ১৪ ॥

নবাস্তোদ-নীলং জগন্তোষি-শীলং,
মুখাসঙ্গি-বংশং শিখণ্ডাবতংসম্ ।
করালম্বি-বেত্রং বরাস্তোজ-নেত্রং,
ধৃত-ক্ষীত-গুঞ্জং ভজে লব্ধকুঞ্জম্ ॥ ১৫ ॥

নবীন-মেঘসদৃশ নীল-কলেবর-বিশিষ্ট ঐহ্যার স্বভাবে ত্রিজগৎ পরিতুষ্ট, বদনে বংশী, শিরে ময়ূরপুচ্ছ, হস্তে বেত্র, গলদেশে গুঞ্জাহার—এরূপ কমললোচন, কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি ॥ ১৫ ॥

হৃত-ক্ষৌণি-ভারং কৃত-ক্লেশ-হারং,
জগদগীত-সারং মহারত্ন-হারম্ ।
মৃচ্ছ-শ্যাম-কেশং লসদ্বন্ত-বেশং,
কৃপাভিনদেশং ভজে বল্লবেশম্ ॥ ১৬ ॥

ভূভার হরণকারী, জগতের দুঃখনাশকারী—ঐহার অপার মহিমা ত্রিজগৎ
কীর্তন করিতেছে, মহামূল্য রত্নহার ঐহার গলে সুশোভিত, সুকোমল কৃষ্ণবর্ণ
কেশ-কলাপযুক্ত যিনি বন্তবেশে সুসজ্জিত, অপার-করুণাসমুদ্র সেই গোপ-বল্লভ
শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি ॥ ১৬ ॥

উল্লসদ্বল্লবী-বাসসাং তস্কর-
স্তেজসা নিজ্জিত-প্রফুরদভাস্করঃ ।
পীন-দোঃস্তম্ভয়োরল্লসচ্চন্দনঃ,
পাতু বঃ সর্বতো দেবকীনন্দনঃ ॥ ১৭ ॥

ব্রজবনিতাগণের বসনাপহারী যিনি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সূর্যের প্রভা পরাভব
করিয়াছেন, চন্দনচর্চিত বিশাল বাহুগলবিশিষ্ট সেই যশোদা (দেবকী) নন্দন
শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন ॥ ১৭ ॥

সংসৃতেস্তারকং তং গবাং চারকং,
বেণুনা মণ্ডিতং ক্রীড়নে পণ্ডিতম্ ।
ধাতুভির্বেষিণং দানব-দ্বেষিণং,
চিন্তয় স্বামিনং বল্লবী-কামিনম্ ॥ ১৮ ॥

যিনি ঘোর সংসার-ত্রাতা, গো-পালক, বংশীবিস্তারিত, কেলি-নিপুণ,
নীলপীতাদি গৈরিকধাতু-রঞ্জিত বেশে বিভূষিত, দানব-সংহারক ও সকলের স্বামী,
হে ভক্তগণ! সেই বল্লবীকামী—শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা কর ॥ ১৮ ॥

উপাত্ত-কবলং পরাগ-শবলং,
সদেক-শরণং সরোজ-চরণম্ ।
অরিষ্ট-দলনং বিকৃষ্ট-ললনং,
নমামি সমহং সদৈব তমহম্ ॥ ১৯ ॥

হস্তে নবনীত-গ্রাস, কলেবরে কুসুম-রেণুর বিচিত্র চিত্রণ—এবম্বিধ ঐহার
শ্রীচরণকমল শরণাগতের একমাত্র আশ্রয়, অরিষ্টাসুর-মর্দন ও গোপললনাকর্ষক
সেই নিত্য উৎসবমুখর নন্দনন্দনকে আমি প্রণাম করি ॥ ১৯ ॥

বিহার-সদনং মনোজ্ঞ-বদনং,
 প্রণীত-মদনং শশাঙ্ক-বদনম্ ।
 উরস্-কমলং যশোভিরমলং,
 করান্ত-কমলং ভজস্ব তমলম্ ॥ ২০ ॥

যিনি অশেষ-লীলার আশ্রয়, অতীব মনোহর ষাঁহার দন্তরাজি, গোপবালাগণের
 হৃদয়ে যিনি মদনভাব বিস্তারকারী, শশাঙ্কের গ্রায়ে পরম রমণীয় ষাঁহার মুখমণ্ডল,
 কমলার আশ্রয়স্বরূপ বক্ষবিশিষ্ট ষাঁহার নির্মল যশোরশি ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত,
 দক্ষিণহস্তে লীলাপদাধারী সেই শ্রীকৃষ্ণকে তোমরা নিরন্তর ভজনা কর ॥ ২০ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০৭ পৃষ্ঠার পর]

নিষ্ঠা

১। প্রীতির প্রাণ কি ?

“প্রীতি-তত্ত্বের জীবনই নৈষ্ঠিকতা।”

—‘সমালোচনা’, সং: তো: ২।৬

২। নৈষ্ঠিক ভক্তের সঙ্কল্প কি ?

“কৃষ্ণভক্তজনই আমার মাতা-পিতা, কৃষ্ণভক্তজনই আমার বন্ধু-ভ্রাতা, কৃষ্ণই
 আমার একমাত্র পতি এবং আমি কৃষ্ণের সংসার ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।”

—প্রঃ প্রঃ ৭ম প্রঃ

৩। ভজনে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কি ?

“ভজনে কেবল দৃঢ়তা ও সরলতার প্রয়োজন।”

—কৃ: ক: ১১২

৪। তথাকথিত সমন্বয়বাদের নিরপেক্ষতা ও বৈরাগ্য অপেক্ষা নিষ্ঠা ও

ভক্তসঙ্গ-লিপ্সা শ্রেষ্ঠ কেন ?

“পরমহংসের প্রশংসাস্থলে লিখিয়াছেন যে, তিনি সাম্প্রদায়িক ধর্মের নিতান্ত
 বিরোধী এবং সমস্ত সাম্প্রদায়িকের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও আনন্দলাভ করেন।
 এই পরিচয়ে আমরা মনে করি যে, পরমহংস মহাশয় জ্ঞানী ব্যক্তি; কিন্তু
 তাঁহার ভক্তির কোন বিশেষ পরিচয় নাই। জ্ঞানের ধর্ম এই যে, সাধককে
 ফলকালে নিঃসঙ্গ ও নিরপেক্ষ করিয়া ফেলে। ভক্তের ধর্ম এই যে, সাধককে

ফলকালে ভক্তসঙ্গলিপ্সা ও ইষ্টবস্তুতে নৈষ্ঠিকী মতি প্রদান করে। ইহার মধ্যে কোন্টি ভাল?—এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব আমাদেরকে এই বলেন যে, নৈষ্ঠিকী ও ভক্তসঙ্গলিপ্সা বৈরাগ্য ও নিরপেক্ষতা অপেক্ষা অনন্ত-গুণে শ্রেষ্ঠ।” —‘সমালোচনা’, সঃ তোঃ ২।৬

৫। নৈষ্ঠিক ভক্তের বিচার কি?

“ভক্তি-অনুকূল যাহা তাহাই স্বীকার।

ভক্তি-প্রতিকূল সব করি পরিহার ॥

কৃষ্ণ বই রক্ষাকর্তা আর কেহ নাই।

কৃষ্ণ সে পালন মোরে করিবেন ভাই ॥

আমি, আমার যত কিছু কৃষ্ণে নিবেদন।

নিষ্কপট দৈন্তে করি জীবন-যাপন ॥”

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, ‘নিষ্ঠাভজন’

৬। ইষ্টবস্তুতে নিষ্ঠা কিরূপ? তাহা কি অন্ধবিশ্বাস মাত্র?

“বহু উপচারার্পণে, পূজি’ কামী দেবগণে,

প্রসন্নতা না লভে তোমার।

সর্বভূতে দয়া করি, ভজে অখিলাত্মা হরি,

তারে কৃপা তোমার অপার ॥”

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, ‘নিষ্ঠাভজন’

৭। কৃষ্ণনামগুণগান-শ্রবণে নিষ্ঠা কিরূপ?

“সাধুমুখে যেই জন, কৃষ্ণনাম-গুণগান,

শুনিয়া না হৈল পুলকিত।

নয়নে বিমল জল, না বহিল অনর্গল,

সে বা কেন রহিল জীবিত ॥”

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, ‘নিষ্ঠাভজন’

৮। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তিতে নিষ্ঠা কিরূপ?

“জগদগুরু কৃষ্ণ সবে করেন রক্ষণ।

কৃষ্ণ বিশ্বস্তর বিশ্ব করেন পালন ॥

কৃষ্ণ হৈতে এই বিশ্ব হঞাছে উদয়।

অবশেষে এই বিশ্ব কৃষ্ণে হয় লয় ॥

কৃষ্ণে বিশ্ব অবস্থিত, জীব—কৃষ্ণদাস।

সদগতি-প্রদাতা কৃষ্ণে করহ বিশ্বাস ॥

জনম লয়েছ কৃষ্ণভক্তি করিবারে ।

কৃষ্ণভক্তি বিনা সব মিথ্যা এ সংসারে ॥”

—ভ: র: তৃতীয় যামসাধন, ‘নিষ্ঠাভজন’

২। ভজনে নিষ্ঠা কিরূপ ?

“বৃথা দিন যায় মোর মজিয়া সংসারে ।

এ মানস-রাজহংস ভজুক তোমারে ॥

অতাই তোমার পাদপঙ্কজ-পঙ্করে ।

বন্ধ হ’য়ে থাকুক হংস রসের সাগরে ॥

এ প্রাণ-প্রয়াণকালে কফ-বাত-পিত্ত ।

করিবেক কণ্ঠরোধ অপ্রফুল্ল চিত্ত ॥

তখন জিহ্বায় না ক্ষুরিবে তব নাম ।

সময় ছাড়িলে কিসে হবে সিদ্ধকাম ॥”

—ভ: র: তৃতীয় যামসাধন, ‘নিষ্ঠাভজন’

১০। ইষ্টে নিষ্ঠা প্রার্থনা কিরূপে করিতে হয় ?

“ধর্ম-নিষ্ঠা নাহি মোর, আত্মবোধ বা স্তম্ভর,

ভক্তি নাই তোমার চরণে ।

অতএব অকিঞ্চন, গতিহীন দুষ্টজন,

রত সদা আপন-বন্ধনে ॥

পতিতপাবন তুমি, পতিত অধম আমি,

তুমি মোর একমাত্র গতি ।

তব পাদমূলে পৈন্থ, তোমার শরণ লৈন্থ,

আমি—দাস, তুমি—নিত্যপতি ॥”

—ভ: র: তৃতীয় যামসাধন, ‘নিষ্ঠাভজন’

১১। কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ-বিধানের প্রতি নিষ্ঠা কিরূপ ?

“হেন দুষ্ট কর্ম নাই, যাহা আমি করি নাই,

সহস্র সহস্র বার হরি ।

সেই সব কর্মফল, পেয়ে অবসর বল,

আমায় পিশিছে যন্তোপরি ॥

গতি নাহি দেখি আর, কান্দি হরি অনিবার,

তোমার অগ্রেতে এবে আমি ।

যা তোমার হয় মনে, দণ্ড দেহ অকিঞ্চনে,

তুমি মোর দণ্ডধর স্বামী ॥”

—ভ: র: তৃতীয় যামসাধন, ‘নিষ্ঠাভজন’

১২। অত্যাভিলাষ পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণদাস্ত্রে নিষ্ঠা-প্রার্থনা কিরূপে করিতে হয় ?

“আমি বড় দুষ্ট-মতি, না দেখিয়া অন্ম গতি,
তব পদে ল’য়েছি শরণ ।
জানিয়াছি এবে নাথ, তুমি প্রভু জগন্নাথ,
আমি তব নিত্য পরিজন ॥
সেই দিন কবে হ’বে, ঐকান্তিক-ভাবে যবে,
নিত্য-দাস্ত্র-ভাব পা’ব আমি ।
মনোরথান্তর যত, নিঃশেষ হইবে স্বতঃ,
সেবায় তুষিব ওহে স্বামি !”

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাদন, ‘নিষ্ঠাভজন’

১৩। শরণাগতিতে নিষ্ঠা কিরূপ ?

“আমি অপরাধী জন, সত্ত-দণ্ড দুর্লক্ষণ,
সহস্র সহস্র দোষে দোষী ।
ভীম-ভবান্নবোধরে, পতিত বিষম-ঘোরে,
গতিহীন গতি-অভিলাষী ॥
হরি তব পদদ্বয়ে, শরণ লইলু ভয়ে,
কৃপা করি’ কর আশ্রয় ।
তোমার প্রতিজ্ঞা এই, শরণ লইবে যেই,
তুমি তারে উদ্ধারিবে নাথ ॥”

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাদন, ‘নিষ্ঠাভজন’

১৪। আত্মদৈন্ত্বময়ী নিষ্ঠা কিরূপ ?

“অগ্রে এক নিবেদন, করি মধুনিঃস্রবন,
শুন কৃপা করিয়া আমায় ।
নিরর্থক কথা নয়, নিগূঢ়ার্থ-ময় হয়,
হৃদয় হইতে বাহিরায় ॥
অতি অপকৃষ্ট আমি, পরম দয়ালু তুমি,
মোরে দয়া তব অধিকার ।
যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়,
তা’তে আমি সুপাত্র দয়ার ॥

মোরে যদি উপেক্ষিবে, দয়াপাত্র কোথা পাবে,
দয়াময় নামটি তোমার ॥”

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, ‘নিষ্ঠাভজন’

১৫। পদসেবা-লালসাময়ী নিষ্ঠা কিরূপ ?

“আমি ত’ চঞ্চলমতি, অমর্যাদ ক্ষুদ্র অতি,
অস্থ্যা-প্রসব সদা মোর ।

পাপিষ্ঠ, কৃতঘ্ন, মানী, নৃশংস, বধনে জ্ঞানী,
কাম-বশে থাকি সদা ঘোর ॥

এ হেন দুর্জ্ঞান হ’য়ে, এ দুঃখ-জলধি বয়ে’,
চলিতেছি সংসার-সাগরে ।

কেমনে এ ভবাস্থি, পার হ’য়ে নিরবধি,
তব পদসেবা মিলে মোরে ॥”

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, ‘নিষ্ঠাভজন’

১৬। ইষ্টভক্ত-সঙ্গ-লাভে নিষ্ঠা কিরূপ ?

“বেদবিধি-অনুসারে, কৰ্ম করি এ সংসারে,
জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম পায় ।

পূর্বকৃত কৰ্ম-ফলে, তোমার বা ইচ্ছাবলে,
জন্ম যদি লভি পুনরায় ॥

তবে এক কথা মম, শুন হে পুরুষোত্তম,
তব দাস-সঙ্গিজন-ঘরে ।

কীটজন্ম যদি হয়, তাহাতেও দয়াময়,
রহিব হে সন্তুষ্ট অন্তরে ॥

তব দাস-সঙ্গ-হীন, যে গৃহস্থ অর্কাচীন,
তার গৃহে চতুর্মুখ-ভূতি ।

না চাই কখন হরি, করদ্বয় জোড় করি’,
করে তব কিঙ্কর মিনতি ॥”

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, ‘নিষ্ঠাভজন’

১৭। আত্মনিবেদনময়ী নিষ্ঠা কিরূপ ?

“স্ত্রী-পুরুষ-দেহগত, বর্ণ-আদি ধর্ম যত,

তা’তে পুনঃ দেহগত ভেদ ।

সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ, আশ্রয়েতে ভেদ পুনঃ,

এইরূপ সহস্র প্রভেদ ॥

যে কোন শরীরে থাকি', যে অবস্থা, গুণ রাখি',

সে অহংতা এবে তব পায় ।

সঁপিলাম প্রাণেশ্বর, মম বলি' অতঃপর,

আর কিছু না রহিল দায় ॥”

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, ‘নিষ্ঠাভঙ্গন’

১৮। দৈন্ত্যময়ী নিষ্ঠা কিরূপ ?

“মস্তকে অঞ্জলি বান্ধি', এই দুষ্টজন কান্দি,

নিকপট-দৈন্ত্য-মুক্তশ্বরে ।

ফুকারি' ফুকারি' কয়, ওহে দেব দয়াময়,

দাক্ষিণ্য প্রকাশি' অতঃপরে ॥

কৃপাদৃষ্টি একবার করহ সিঞ্চন ।

তবে এ জনের প্রাণ হইবে রক্ষণ ॥”

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, ‘নিষ্ঠাভঙ্গন’

১৯। কৃষ্ণ-প্রসন্নতায় নিষ্ঠা কিরূপ ?

“মধুর কটাক্ষ বংশীনিনাদের সহ ।

আমাকে প্রসাদ করি' তব পদে লহ ॥

প্রসন্ন হইলে তুমি অশ্রু প্রসন্নতা ।

প্রয়োজন কিবা মোর, এই মোর কথা ॥

তব প্রসন্নতা বিনা অশ্রুর প্রসাদে ।

কি কার্য আমার বল कहিহু অবাধে ॥”

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, ‘নিষ্ঠাভঙ্গন’

— জগদগুরু শ্রী শ্রীমন্ত সঙ্কির্দানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

বস্তু প্রদর্শক বা পথপ্রদর্শক গুরুর নিকটে আমাদের চরম গন্তব্যপথের সন্ধান লইতে হইবে। শিষ্যের পক্ষে যোগ্যতানুসারে সেবা করা ও সেবা-বিষয়ে শ্রবণ করা দরকার। অত্যন্ত আগ্রহকারীর উপার্জন অধিক হওয়া দরকার। তুষ্ণাপ্য বস্ত্রলাভের জন্ত অধিক মূল্য দিতে হয়। বস্তুপ্রদর্শক গুরুর নিকট বাস্তব-মঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। ইহ জগতের কথা আমরা জানি, কিন্তু যে জগতের কথা আমাদের জানা নাই, সে জগতের কথা সেই জগতের লোকের নিকট হইতে জানা দরকার।

আমরা যদি হরির সত্যি সত্যি সেবক বা কীর্তনকারীর সহিত যোগ দেই, তবে আমাদেরও সাকীর্তন হইবে। সম্যগ্রূপে কীর্তন করাই আমাদের আবশ্যক; কারণ, কৃষ্ণ সম্যক বস্তু, তিনি হেয়, ঋণ, অনুপাদেয়, ‘অসম্যক’ বা আংশিক বস্তু নহেন। কৃষ্ণের সম্যক কীর্তনকারীর সহিত যে-কাল পর্যন্ত কীর্তন না করি, সে-কাল পর্যন্ত মায়া আমাদেরকে নানাভাবে বঞ্চনা করিয়া থাকে। যাহাদের হৃদয় নিজ প্রকৃত মঙ্গল চায় না, যাহারা নিজেকে নিজে বঞ্চনা করিতে চায়, তাহাদের অনুগত হইয়া কীর্তন করিলে কোন মঙ্গল হইবে না; উহা মায়ার কীর্তনই হইয়া যাইবে।

শ্রীকৃষ্ণনামে সকল জিনিষই পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণনামে সর্বশক্তি, সর্বশোভা, সর্ব আকাজক্ষার পরিস্ফুটতি এবং সর্বসাধনার চরমফল ও সিদ্ধি নিহিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, পরিকর, ধাম ও লীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নাম সর্বতোভাবে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের নাম-সেবাব্যবহারই তাঁহার স্বরূপ, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর সকল। বস্তুই জীবের চেতনের বৃত্তিতে প্রকাশিত হয়। অপ্রাকৃত শ্রীনামই—নামী, রূপী, গুণী, লীলাময়ের আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম শ্রীকৃষ্ণের নাম-সেবার দ্বারা পরিপূরিত হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের নামে আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াভিনিবেশ, যাবতীয় প্রবৃত্তি, যাবতীয় চিন্তা, যাবতীয় ধারণা—সকল নিয়মিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের নাম আমাদের জিহ্বাতে উদিত হইলে আমরা নখর জগতের যাবতীয় কৃত্য, কর্তব্যবুদ্ধি, নখর জগৎ ভোগ করিবার প্রবৃত্তি এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি সমস্তই অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারি। আমরা তখন আমাদের নিখিল চেষ্টাকে শ্রীকৃষ্ণের কাম-সেবায় নিযুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম শ্রবণ ও কীর্তন করিতে করিতে জীবন যাপন করিতে পারি।

প্রেমিক ভক্তের কৃপাতেই প্রেমপ্রাপ্তি

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৩ পৃষ্ঠার পর]

কৃপাময় শ্রীমন্নহাপ্রভু কুর্মক্ষেত্রে রাত্রিষাপন করত প্রাতঃস্নানান্তর তথা হইতে দক্ষিণাভিমুখে শুভবিজয় করিলেন। কুর্মবিপ্র চুষকাকুষ্ঠের ত্রায় বহুদূরদেশ পর্যন্ত মহাপ্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ইহাকে বৈদীভক্তির অনুব্রজ্য বিচার করিলে সঙ্গত হইবে না। প্রভুর আদেশ-পালনই ভূত্যের সেবা; কুর্মবিপ্রের এই জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞমান থাকা সত্ত্বেও বিপ্রের এই অনুগমন অপরাধব্যঞ্জক নহে। শ্রীমন্নহাপ্রভুও ভক্তের এই প্রকার ইষ্ট-সঙ্গ পরিত্যাগ করা কিরূপ বেদনাময় ও সেবাময় তাহা আনন্দন করিতে করিতে বিপ্রকে নিবেদন করিতে সক্ষম হইলেন না। এইভাবে প্রেমাবিষ্ট ভক্ত ও ভগবান্ বহুদূর পথ অতিক্রম করিলেন। অবশেষে বিপ্রের মঙ্গলের জন্ত মহাপ্রভু স্নেহভরে নিজে যত্ন করত তাঁহাকে নিবর্তিত করিলেন।—

এইমত সেই রাত্রি তাহাই রহিলা।

প্রাতঃকালে প্রভু স্নান করিয়া চলিলা ॥

প্রভুর অনুব্রজি কুর্ম বহুদূর আইলা।

প্রভু তাঁরে যত্ন করি ঘরে পাঠাইলা ॥

কুর্মবিপ্রকে বিদায় দিয়া মহাপ্রভুও প্রেমাবেশে পূর্ববৎ বেগে গমন করিলেন। কুর্মবিপ্রও মহাপ্রভুর কৃপাশক্তিতে শক্তিলভ করত ক্রমশঃ স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিপ্রের ধীরগতিতে প্রত্যাগমন করিতে বহু সময় অতিক্রান্ত হইল, তন্মধ্যে আমাদের প্রভু বহু দূরবর্তী হইয়া গেলেন,— ইহা সহজেই অনুমেয়।

অচিন্ত্য অনন্তশক্তিমান্ মহাপ্রভুর মহাবদাণ্ড লীলার অণু একটী অধ্যায় ইহাতে সমাগত হইলেন। শ্রীমন্নহাপ্রভু ব্যতীত অণু কোনও অবতারে একরূপ লীলা প্রকটিত হয় নাই। মহাপ্রভুর এই লীলা যতপি “তানামাবিরভূচ্ছোরিঃ” শ্লোকের স্মৃতিকে জাগরুক করে, তথাপি প্রেমবিচারে গোপীদের নিকট আবির্ভাবকে বাসুদেব বিপ্রের নিকট আবির্ভাবের তুলনা মহামূর্খতা ও অপরাধজনক। কারণ বাসুদেব বিপ্রের কাতরতা ও গোপীদের কাতরতা—“কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—চিন্ময় ভাস্কর” রূপে ভেদাত্মক। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এক্ষণে সেই প্রসঙ্গে আনিতেছেন।—

‘বাসুদেব’-নাম এক দ্বিজ মহাশয় ।
 নরীক্ষে গলিত-কুষ্ঠ, তাতে কীড়াময় ॥
 অঙ্গ হৈতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য় ।
 উঠাইয়া সেই কীড়া রাখে সেই ঠায় ॥
 রাত্তিতে শুনিলা তিঁহো গোসাঁঞর আগমন ।
 দেখিবারে আইলা প্রভাতে কুর্মের ভবন ॥
 প্রভুর গমন কুর্ম-মুখেতে শুনিয়া ।
 ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূচ্ছিত হঞা ॥
 অনেক প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলা ।
 সেইক্ষণে আসি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিলা ॥

শ্রীমমহাপ্রভুর নরীকান্তর্যামিত্ত ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে । তিনি বহুদূরগত হইয়াও বাসুদেবের আগমন ও তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ত বাসুদেবের কাতরতা বিদিত হইয়াছিলেন । দ্বিতীয়তঃ ইচ্ছামাত্রেই স্বদূরবর্তী স্থান হইতে ক্ষণমধ্যে প্রত্যাগমনরূপ আবির্ভাব নামক বৈভব প্রকটিত করিলেন । এতদপেক্ষা একটি অধিকতম লীলা-মাহাত্ম্য কবিরাজ গোস্বামী লেখনীমুখে অঙ্কিত হইয়াছে — বাসুদেব গলিত-কুষ্ঠরোগী ; তাহার কুষ্ঠের দুর্গন্ধে কেহ তাহার নিকটে গমন করে না । এইরূপ বাসুদেব বিপ্রকে মহাপ্রভু আলিঙ্গন করত তাঁহার মহাবদান্ততার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন । এরূপ পতিতের প্রতি আলিঙ্গনদ্বারা কৃপা কোন ভগবল্লীলায় প্রকাশ পায় নাই । শ্রীরামচন্দ্র পাষণে পরিণত অহল্যাকে শ্রীপদদ্বারা স্পর্শ করত তাহাকে শাপমুক্ত ও পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন । অহল্যা ঘৃণ্য গলিত-কুষ্ঠরোগীও ছিল না ; সর্বোপরি বাসুদেবকে মহাপ্রভু যে প্রেমদান করিয়াছিলেন অহল্যা তাহা আশ্বাদন করিবার নোভাগ্য লাভ করে নাই । শ্রীরামচন্দ্র গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, গুহকের নোকাটী স্বর্ণময় হইয়াছিল । গুহক চণ্ডাল জাতিতে জন্মিয়াছিল, কিন্তু বাসুদেবের গ্রাস ঘৃণ্য গলিত-কুষ্ঠরোগী ছিল না । কৃষ্ণচন্দ্র পুতনাকে ধাত্রীগতি প্রদান করত পরম দয়াল বলিয়া বিদিত হইয়াছেন ।—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যামধ্বী ।

লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং ততোহন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥

(ভাঃ ৩।২।২৩)

এই শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণার প্রকাশ থাকিলেও বাসুদেবের প্রতি মহাপ্রভুর যে কৃপা, তাহা বদান্ততাগুণে সমতুল্য নহে । পুতনাও বাসুদেবের

ভ্রায় অস্পৃশ্য কুষ্ঠরোগিণী ছিল না। এইরূপ বিচারে বাসুদেবের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা অধিকতর মহান্।

মহাপ্রভুর স্পর্শমাত্রই সুন্দর দেহ লাভ করিয়া বাসুদেব অতীব বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি সুদামা বিপ্রোক্ত স্তব উচ্চারণপূর্বক মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন।—

কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ ।

ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরস্তিতঃ ॥

সুদামা বিপ্রের এই স্তবটীও বাসুদেবের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপার সম্যক মহিমার প্রকাশযোগ্য নহে বলিয়া মনে হয়। সুদামা বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তাঁহাকে আলিঙ্গন করাই স্বাভাবিক। তাঁহার। স্বভাবতই সখা ছিলেন। সর্বোপরি সুদামা ঘৃণ্য গলিতকুষ্ঠরোগী ছিলেন না। এখানে ভেদের কারণ—‘লক্ষ্মীপতি ও লক্ষ্মীছাড়া’ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু মহাপ্রভুর মহিমা বিচার করিলে তাহা বদান্ততার পরাকাষ্ঠা ও অতীব বিস্ময়জনক। তাঁহার মহত্ত্ব কোথায়?—

প্রভু-স্পর্শে দুঃখ সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল ।

আনন্দ সহিত অঙ্গ সুন্দর হৈল ॥

প্রভুর কৃপা দেখি’ বিস্ময় হৈল মন ।

শ্লোক পড়ি’ পায়ে ধরি’ করয়ে ক্রন্দন ॥

বহু স্তুতি করি কহে—শুন মহাশয় ।

জীবে এই গুণ নাহি, তোমাতে এই হয় ॥

বাসুদেব বিপ্রের মহাপ্রভুকে কোন ভক্ত বা উন্নত জীব বলিয়া ধারণা করা মিথ্যা ও অতুপযুক্ত—জ্ঞান হইল। তাঁহাকে দয়াময় ঈশ্বর বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন,—

মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর ।

হেন মোরে স্পর্শ তুমি—স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥

মহাপাতকের ফলে জীবের কুষ্ঠব্যাদি হয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্তি।—“দুঃশ্রমঃ গুরুতল্লগঃ।” এরূপ পাপীকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে স্নান করত শুদ্ধির ব্যবস্থা। অধিকন্তু আমার কুষ্ঠের দুর্গন্ধে লোকে দূরে পলায়ন করে। আর তুমি আমাকে স্নেহভরে তোমার পরম রূপযুক্ত ও পরম পবিত্র শ্রীঅঙ্গদ্বারা আলিঙ্গন করিলে! মাতাপিতা আমার রোগের সংক্রামতাভয়ে আমাকে গৃহ হইতে বিদূরিত করিয়াছে। এমত পাপিষ্ঠ দুর্ভাগাকেও প্রেমভরে আলিঙ্গনদ্বারা সর্ব দুঃখ-যন্ত্রণা ও দুরারোগ্য

স্বণ্য ব্যাধি হইতে মুক্তিদান করিলে ! এই গুণ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাতেও অসম্ভব । ভগবান্ স্বতন্ত্র, বেদবিধির অতীত বলিয়াই তাঁহাতে ইহা অর্থাৎ আমার গ্ৰায় পাপীকে স্পর্শ করা সম্ভব হইতে পারে । অতএব তুমি নিশ্চয়ই ভগবান্ । বাসুদেব আরও বলিলেন,—

কিন্তু আছিলাম ভাল, অধম হঞা ।

এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া ॥

তুমি আমার প্রতি অহৈতুকী কৃপা করিলেও আমার ভাগ্যদোষে এহেন কৃপাও আমার অনিষ্টকারক হইল । আমি এক্ষেত্রে রোগমুক্ত হওয়ায় আমার অধম অভিমান নষ্ট হইয়া নিজকে উত্তম বলিয়া অভিমানী করিবে । ইহা আমার পারমার্থিক ক্ষতিকারক হইল । বস্তুতঃপক্ষে বাসুদেববিপ্র পরম বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া তাঁহার এই দৈন্তোক্তি । ইহাই ‘তৃণাদপি সুনীচতা’ নামক বৈষ্ণবের মুখ্য পরিচয় । বাসুদেবে এই গুণই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আকর্ষণ করিয়াছে । বাসুদেবের দেহের প্রতিও মমতা ছিল না বলিয়া ক্ষতের কীড়াগুলিকে নিজ দেহকে তাহাদের ভোজ্যরূপে উৎসর্গ করিতেন । ইহা বিচার করিলে তাঁহাকে মুক্ত ও সর্বভূতমধ্যে শ্রীভগবানের সম্বন্ধ দর্শন তাঁহার হইয়াছিল বুঝা যায় । এই কারণে মহাপ্রভু প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে বলিলেন,—

প্রভু কহে,—কভু তোমার না হবে অভিমান ।

নিরন্তর লহ তুমি ‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’ নাম ।

কৃষ্ণ উপদেশ করি জীবের নিস্তার ।

অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু এইভাবে কৃষ্ঠরোগীকেও স্পর্শ ও আনিঙ্গনদ্বারা হুরারোগ্য কুংসিত কৃষ্ঠব্যাধিমুক্ত করত তাঁহাকে শ্রীনামোপদেষ্টা শ্রীগুরুদেবের অধিকার প্রদান করিলেন এবং নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণদ্বারা কষায়মুক্ত হইয়া অচিরেই কৃষ্ণশীলায় প্রবেশাধিকার পাইবেন বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী ও আশীর্বাদ করিলেন । অতঃপর তিনি সহসা তথায়ই সর্বসমক্ষে অন্তর্দান করিলেন ।

এতক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্দানে ।

হুই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে ॥

ইহাতে লক্ষিতব্য যে—বাসুদেবকে কৃপাচ্ছলে মহাপ্রভু তাঁহার “আবির্ভাব ও “অন্তর্দান”—এই ঐশ্বর্যদ্বয় প্রকট করিলেন । আরও একটি লক্ষ্যের বিষয় যে, মহাপ্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ কিরূপ অবস্থায় থাকিল ? অচিন্ত্যশক্তিতে সকল ঐশ্বর্যের অধিকারীর পক্ষে ইহার সমাধান কিছু বিশেষ ব্যাপার নহে—ইহা

সহজেই অনুমেয়। মনে হয়, মহাপ্রভু এক মূর্তিতে কৃষ্ণদাসের সহিত পথাতিক্রম করিতেছিলেন, এবং দ্বিতীয় মূর্তি প্রকট করত বাসুদেবকে দর্শন দান ও উদ্ধার করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু এই লীলাদ্বারা ‘বাসুদেবায়তপ্রদ’ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই লীলা স্বল্লঙ্করে বর্ণনায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবদয়াদ্রধীঃ ।

নষ্ট কুষ্ঠং রূপপুষ্ঠং ভক্তিতুষ্ঠং চকার যঃ ॥

—এই লীলা শ্রবণের ফল বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন,—

শ্রদ্ধা করি’ এই লীলা যে করে শ্রবণ ।

অচিরাতে মিলয়ে তারে চৈতন্য-চরণ ॥

কিন্তু দুর্ভাগা জনগণ এই সুযোগ লাভে বঞ্চিত থাকিল। এই লীলার অলৌকিকতাদি দর্শন করিয়াও মহাপ্রভুকে ভগবান্ বলিতে তাহারা কুণ্ঠিত হইতেছে। পক্ষান্তরে কেহ কেহ নিজকে ভগবান্ বলিতেছে ও বলাইতেছে। এইভাবে তাহারা অপরাধময় নারকীয় বৃত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। প্রভুর লীলা ও মহিমা আমি ক্ষুদ্র বদ্ধজীব অনুভব করিতে অক্ষম। শচীনন্দন গৌরহরি জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

গীতার প্রথম অধ্যায়ের আবশ্যকতা কি ?

মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্বে পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়া বিচত্বারিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত উচ্চ দীপস্তম্ভের ন্যায় অবস্থিত থাকিয়া গীতা সমগ্র মহাভারতের মূল তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছে। গাভীস্বরূপ সকল উপনিষৎ দোহন করিয়া গীতারূপী হৃদ্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিমিত্ত করিয়া পৃথিবীর জনগণকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীগীতার মাহাত্ম্য পাওয়া যায়,—

সর্বোপনিষদো গাবো দোক্ষা গোপালনন্দনঃ ।

পার্থো বৎসঃ সুধীভোক্তা হৃদ্বং গীতামৃতং মহৎ ॥

“সমগ্র উপনিষদ্রাশি গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্তা, অর্জুন বৎস এবং মহৎ গীতামৃত হৃদ্বস্বরূপ, সুধীগণ তাহা পান করেন।” মুখ্যতঃ জড়ীয় আসক্তিজনিত মোহের উপরেই গীতার গদাঘাত।

কেহ কেহ মনে করেন, দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে গীতার আরম্ভ হইয়াছে। যেহেতু দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক হইতে অর্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ উপদেশ আরম্ভ হইয়াছে। অতএব তথা হইতে গীতার আরম্ভ ধরিলে ক্ষতি কি? প্রশ্নটি বিশেষভাবে আলোচনা করিলেই গীতার প্রথম অধ্যায়ের গুরুত্ব সর্বসম্মুখে উন্মোচিত হইবে। গীতার প্রথম অধ্যায়কে উপক্রম বা প্রস্তাবনা ভাগ হিসাবে ধরিলে তাহার ত' বিশেষ গুরুত্ব থাকিবেই। প্রস্তাবনাকে কেন্দ্র করিয়াই যেরূপ কোন গ্রন্থ রচিত হয়, তদ্রূপ গীতার প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ উপক্রমাংশকে কেন্দ্র করিয়াই অর্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে। অর্জুন কোন্ ভূমিকায় অবস্থিত, কোন কথা প্রতিপাদনের জন্ত গীতার প্রবৃতি, তাহা প্রথম অধ্যায় ব্যতীত কিছুতেই বুঝা যাইবে না।

অর্জুন কৃতনিশ্চয় করিয়া যুদ্ধার্থে উত্তোগী হইয়া কুরুক্ষেত্র মহারণাঙ্গনে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কর্তব্যতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। যুদ্ধ এড়াইবার যথাসম্ভব প্রযত্ন করিয়াও তাহা এড়ান সম্ভবপর হয় নাই। সর্বনিম্ন দাবীর প্রস্তাব ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির দৌত্যকার্য্য বিফল হইয়াছিল। এমতাবস্থায় পাণ্ডবপক্ষ-সমর্থনকারী রাজপুত্রবর্গকে একত্র করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার সারথ্য করিতে রাজী করাইয়া অর্জুন রণাঙ্গনে দণ্ডায়মান। তন্ত্র অর্জুন স্বীয় আরাধ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব পূর্ব হইতেই অবগত ছিলেন। শোকমোহাভিনয়কারী অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শোকমোহযুক্ত জগজ্জীবকে নিজপাদপদ্মে আকর্ষণ করিবেন জানিয়া সেই লীলার অনুকূলে তিনি প্রথমেই সমবেত যুদ্ধার্থীদের পরিচয় জানিবার বাসনায় স্বীয় আরাধ্য দেবতাকে উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথস্থাপনের উদ্দেশ্যে বলিলেন,—“উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ সংস্থাপন করুন। যারা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছে তাদের মূর্তি যেন আমি একবার দেখে নিতে পারি।” শ্রীকৃষ্ণ তাহাই করিলেন। অর্জুন চতুর্দিকে একবার তাকাইয়া কি দেখিলেন? দেখিলেন, উভয়দিকে নিজ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের বিরাট সমাবেশ। ঠাকুরদা-নাতি, পিতা-পুত্র, চারি পুরুষ আত্মীয়-স্বজন মরণের অন্তিম প্রতিজ্ঞায় সমবেত হইয়াছে। এখন তিনি বিচার করিলেন যে, রণক্ষেত্রে উপস্থাপক্ষে সমাগত লোকদিগকে উপদেশ প্রদানের এই উপযুক্ত স্থান ও সময়। তাই তিনি উভয়পক্ষে দেহসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনকে এবং লৌকিক গুরুবর্গকে দর্শন করিয়া মোহাভিভূতের ন্যায় অভিনয়পূর্বক বিবাদপ্রাপ্ত-ভাব জ্ঞাপন করিয়া নির্বেদযুক্তভাবে যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এ যাবৎ অনেক যুদ্ধে অসংখ্য

বীরকে তিনি সংহার করিয়াছেন। তিনি কখনও থিন্ন বোধ করেন নাই, তাঁহার হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়ে নাই, শরীর কাঁপে নাই, চক্ষে জল আসে নাই, তবে এখন কেন এরূপ হইল ? উহা ছিল নিছক স্বজনাসক্তি। যদি লৌকিক গুরু, বন্ধু-বান্ধব সম্মুখে না থাকিত, তবে শত্রুর মুণ্ডপাত হেলায় করিতেন। কিন্তু আসক্তিজনিত মোহ তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা গ্রাস করিয়াছিল। তিনি যত ধর্মশাস্ত্র খুঁজিয়া খুঁজিয়া যুদ্ধের অকর্তব্যতা প্রতিপাদন করিতে তৎপর। ‘ন কাজে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং স্থানি চ’, ‘এতান্ ন হন্তমিচ্ছামি যতোহপি মধুসূদন’, ‘যুদ্ধই আসলে এক পাপ’, ‘যুদ্ধে কুলক্ষয় হইবে, ধর্মলোপ পাইবে, স্বৈরাচার দেখা দিবে, ব্যভিচারবাদের প্রসার হইবে, দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, সমাজে নানাবিধ দৃষ্ট উপস্থিত হইবে’—এইরূপ নানা যুক্তি দিয়া তিনি কৃষ্ণকে বুঝাইতে লাগিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইতেছে। এক বিচারপতি শত শত অপরাধীকে ফাঁসির সাজা দিয়াছিলেন। কিন্তু একদিন তাঁহারই পুত্রকে খুনের অভিযোগে তাঁহার সামনে হাজির করা হইল। প্রমাণ হইল সে খুন করিয়াছে। নিজের পুত্রকে ফাঁসি দেওয়ার পালা উপস্থিত হইলে বিচারপতি তাহা করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন। তিনি বুদ্ধির কসরৎ আরম্ভ করিলেন। “ফাঁসির সাজা অমানুষিক। এইরূপ সাজা দেওয়া মানুষের শোভা পায় না। ইহাতে মানুষের সংশোধনের আশা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়। হত্যাকারী উত্তেজনার বশে খুন করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু খুনের নেশা যখন কাটিয়া গিয়াছে তখন তাহাকে নির্বিকারচিত্তে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইয়া মারা মনুষ্যত্বের দিক হইতে সমাজের পক্ষে বড়ই লজ্জার ও কলঙ্কের কথা” ইত্যাদি যুক্তি বিচারপতি উপস্থিত করিলেন। নিজপুত্র যদি সম্মুখে না আসিত তাহা হইলে বিনা দ্বিধায় বিচারপতি ফাঁসি দিয়া চলিতেন। কিন্তু নিজপুত্রের মমতাবশে বিচারপতি ঐরূপ কথা বলিতে লাগিলেন। ঐ কথা আন্তরিক ছিল না, তাহা আসক্তিজনিত ছিল। ‘এ আমার পুত্র’ এই মমতা হইতে এই বাক্যজালের সৃষ্টি হইয়াছিল।

অর্জুনের দশাও এই বিচারপতির ন্যায় হইয়াছিল। মোহবশে তিনি তাঁহার দায়িত্ব এড়াইতে চাহিয়াছিলেন। অর্জুনের মনে স্বজনাদি বধের আশঙ্কায় যে কাতরতা ও বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দর্শন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, উহা হৃদয়-দৌর্বল্য, স্মৃতিবিভ্রম, অজ্ঞানজনিত মোহ। আগন্তু গীতা গুনাইবার পর ভগবান্ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হে অর্জুন, তোমার মোহ দূর দূর হইল ?” আর অর্জুন বলিলেন,—“নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুতঃ”

(১৮।৭৩) । এইভাবে গীতার উপক্রম ও উপসংহার (শেষ অধ্যায়) মিলাইয়া দেখিলে দেখা যায়, মোহ নিরসন করিয়া জীবকে কৃষ্ণের নিজের পাদপদ্মে আকর্ষণ করাই গীতা উপদেশের প্রকৃত উদ্দেশ্য । গীতার প্রথম অধ্যায়ের তাৎপর্যে ইহা পাওয়া যায় যে, দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণই দেহ-ধর্ম, কুল-ধর্ম, জাতি-ধর্ম প্রভৃতি মনোমল্লোঁথ বিচারকে সম্যক ধর্ম বলিয়া থাকে এবং দেহাত্মবুদ্ধি হইতেই শোক, মোহ ও ভয়ের উৎপত্তি হয় । ইহার দ্বারা অভিভূত হইয়াই বদ্ধজীব সংসারে পরিভ্রমণ করিতে থাকে । শ্রীভগবান্ স্বীয় নিত্যপার্ষদ অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বদ্ধজীবের প্রাপঞ্চিক অবস্থার কথা জানাইলেন । অর্জুন দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ হইতেছে তাঁহার দেহ এবং দেহজাত আত্মীয়-পরিজনই তাঁহার আপনজন । তাঁহার ঐ ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তিত করিবার জন্ত ভগবান্ ভগবদগীতার দিব্যজ্ঞান তাঁহাকে দান করেন । শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ বলিয়া অর্জুনের কুমতির কোন সম্ভাবনা নাই । ‘এবমুক্তাৰ্জুনঃ’ শ্লোকে অর্জুনকে শোকাবলম্বিত বলিয়া বোধ হইলেও বস্তুতঃ তাঁহার শোকাদি নাই । অর্জুন শব্দের অর্থ ই ‘ঋজু’ অর্থাৎ ‘সরলস্বভাবের’ । জড়ীয় আসক্তি বা জড়ীয় মোহবশতঃ জীবের মনে যে-সকল বিকার অথবা বিচার উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা অর্জুন নিজের মনে সৃষ্টির অভিনয় করিয়া মুক্তহৃদয়ে ভগবানের নিকট ধরিয়াছিলেন । গোপন তিনি কিছুই করেন নাই । ইহা অর্জুনের বদান্যতারই পরিচয় ।

অনেকে বলেন যে, অর্জুনের ক্রৈব্য দূর করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত গীতা বর্ণিত হইয়াছে । তাঁহাদের মতে গীতা যুদ্ধযোগ প্রতিপাদন করে । কিন্তু এই কথা যে ভুল তাহা একটু বিচার করিলেই বুঝা যাইবে । আঠার অশ্বোহিণী সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত । এই কথা কি বলিতে হইবে যে, সমগ্র গীতা শুনাইয়া অর্জুনকে ঐ সেনার যোগ্য করিয়া লইয়াছিলেন ? বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন অর্জুন, সেনা বিভ্রান্ত হন নাই । তাহারা কি অর্জুন অপেক্ষা অধিক যোগ্য ছিল ? এই কথা কল্পনাতেও স্থান দেওয়া যায় না । অর্জুন যে যুদ্ধ হইতে পরাবৃত্ত হইতেছিলেন, তাহা ভয়ের কারণে নয় । শত শত যুদ্ধ তিনি করিয়াছিলেন । এমনই মহাবীর তিনি ছিলেন যে যুদ্ধকে খেলা মনে করিতেন । জগদ্বিকারক স্বতন্ত্রজাপক শ্রীগীতাশাস্ত্রকে আবির্ভাব করাইবার জন্ত অর্জুন ক্লীবতার অভিনয় করিয়াছিলেন জানিতে হইবে ।

জড় জগতের প্রতি অত্যধিক আসক্তি মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, “ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ” এই ধরনের ভীতি এবং আত্মবিস্মৃতি তখনই দেখা

যায়, যখন মানুষ প্রকৃতির প্রভাবে জড় জাগতিক কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সে এই মোহাচ্ছন্ন কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা অনুভব করে। জড় জাগতিক ক্লেশ হইতেছে দাবানলের তায়—যাহা আপনা হইতে জলিয়া উঠে, এই আগুন কেহই লাগায় না। তাই ক্লেশগ্রস্ত মানুষের সত্যদ্রষ্টা সদগুরু শরণ গ্রহণের প্রয়োজন হয় এবং তিনি জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করিবার পথে সবাইকে পরিচালিত করেন। প্রতিটি জীবই হইতেছে ভগবানের নিত্যদাস। সকলেরই কর্তব্য হইতেছে, নিজেদ্রিয়-তর্পণের কথা চিন্তা না করিয়া ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণপূর্বক তাঁহার সেবা করা, তবে জগতে জীবনধারণের প্রকৃত তাৎপর্য তাহাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে।

—ত্রিদাশুস্বামী শ্রীমন্তকিবেন্দান্ত বোধায়ন মহারাজ

জীবের কৃত্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৫৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৯ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমন্তগবদগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—

“ইচ্ছাদ্বেষদমুখেন দম্বমোহেন ভারত।

সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥” (গীতা ৭।২৭)

অর্থাৎ—‘হে পরন্তপ ! হে ভারত অজ্ঞান ! সৃষ্টি আরম্ভকালে যাবতীয় জীব ভোগাভিলাষরূপ ইচ্ছা ও তৎপ্রতিকূলে দ্বেষ থেকে উৎপন্ন সুখ-দুঃখাদি-দম্ববিষয়ে সম্যক্ মোহ প্রাপ্ত হইবে থাকে।’

তখন জীবের আর বিদ্য গ্রন্থীতি থাকে না। জীবের ত্রিংশরূপ তৎকালে লিঙ্গ শরীর ও শূল শরীরদ্বারা আবৃত হওয়ায় অবিজ্ঞা সংসর্গে জড়গত স্বরূপে আত্মাভিমান করে বিষয়-কাম্য-কর্ম বন্ধনে জড়িত হয়ে সংসার-চক্রে পুণ্য-পাপদ্বারা ক্লেশ বেঁধে লাগল।

মায়া কিভাবে জীবকে ক্লেশ দেয় ? মায়াশক্তির দুইটি ভাগ—একটি গুণমায়া, অপরটি জীব-মায়া। গুণমায়ার দ্বারা জীব ভোগের বিষয়গুলি এবং ঐ বিষয়গুলি ভোগ করার উপযোগী দেহ পেয়েছে। আর জীবমায়ার দ্বারা জীব মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম শরীর পেয়েছে, যার মধ্যে ভোগ-বাসনাগুলি থাকে। জীবমায়ার দুইটি বৃত্তি—একটি আবরণাত্মিকা, আর অন্যটি বিক্ষেপাত্মিকা। জীবমায়া

আবরণাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা জীব যে কৃষ্ণের নিত্য দাস—জীবের এই স্বরূপ-জ্ঞানকে আবরণ করে দেয় ; আর বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা জীবের ভোগ্য বিষয়গুলির প্রতি ভোগ করার জন্য জীবের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে দেয় । বদ্ধজীব এইভাবে মায়ায় মোহিত হয়ে কৃষ্ণের দাসত্ব ত্যাগ করে মায়া'র দাসত্ব করে । বদ্ধজীব যাদের দাসত্ব করে, যাদের আপনজন বলে বোধ করে, তাদের কাছেই নানারকম দুঃখ পেয়ে থাকে । ভগবানের এই সৃষ্টিলীলায় জীব যে জড়বস্তুগুলি ভোগ করছে—এটা জীবের স্বরূপের ধর্ম নয়—এটাই তার মায়াবদ্ধ-দশা ।

মায়া'র দাসত্বে স্বেচ্ছের পরিবর্তে দুঃখই লভ্য হয়

জীব (আত্মা) চিৎস্বরূপ মায়াতীত বস্তু হলেও এই মায়িক জগতে এসে প্রকৃতির গুণজাত স্বভাবের অধীন হয়ে পড়েছে । জীব মায়া-জাত বস্তু নয় । তথাপি মায়া-জাত বস্তুর সংস্পর্শে তার কৃষ্ণ-দাসত্বরূপ ধর্মটি প্রকাশিত হতে পারছে না । কৃষ্ণ-দাসত্ব বা কৃষ্ণ-প্ৰীতিই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম । কিন্তু মায়া'র এমনই প্রভাব (Influence) যে মায়া'র ছলনায় ভুলে জীব তার কৃষ্ণ-দাসত্বই যে নিত্য-স্বরূপ—এই সত্য বিস্মৃত হয়েছে । শ্রীমদ্ভাগবত আমাদের জানিয়েছেন,—

“যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্ ।

পরোহপি মনুতেহনর্থং তৎকৃতক্কাতিপদ্বতে ॥” (ভাঃ ১।৭।৫)

অর্থাৎ—“সেই মায়া'র দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হলে জীব সদ্ধ, রজস্তম—এই ত্রিগুণের অতীত হয়েও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অন্তর্গত ‘প্রাকৃত’ বলে অভিমান করে । এই ত্রিগুণজাত প্রাকৃত অভিমান-বশতঃ উহার অনর্থ ঘটে থাকে ।”

মায়া'র এমনই শক্তি যে, সে জীবকে কুবুদ্ধি দিয়ে ভগবৎ প্রসঙ্গে যেতে দেয় না ; ফলে জীব তার দেহকে নিজের স্বরূপ বা আত্মা বলে মনে করে ; ভগবানের সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহকে জড়বস্তু বলে মনে করে ; স্বামী হয়ে পত্নীর মোহে অথবা পত্নী হয়ে স্বামীর মোহে আকৃষ্ট হয় ; পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-বান্ধব প্রভৃতির প্রতি মমত্ব বোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় ; সংসারকে ভালবেসে সংসারের শ্রীবুদ্ধির জন্য ধন-দৌলতের আশায় দিবারাত্র পরিশ্রম করে ও চিন্তাশ্রিত হয় । বিলাস-বহুল জীবন-যাপনের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন তাহাই পাবার জন্য সর্বদা চেষ্টিত থাকে । গৃহব্রতের চরিত্র সম্পর্কে শাস্ত্র জানিয়েছেন,—

“যন্তাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ ।

স্তৈশ্চঃ কপণধীর্মূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে ॥” (ভাঃ ১।১।১৭।৫৬)

অর্থাৎ—“যে ব্যক্তি গৃহে আসক্তচিত্ত এবং পুত্র ও ধনৈষণায় আতুর এবং জৈগ্ৰণ ও অলসমতি, সেই মূঢ় ব্যক্তি ‘আমি’ ও ‘আমার’ এইরূপ জ্ঞানে বদ্ধ হয়।”

এরূপ গৃহব্রতগণের কিরূপ গতি হয় ? শাস্ত্র তারও স্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন,—

“অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালান্নজাঃ ।

অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ ॥

এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্ ।

অতৃপ্ত স্তান্নুধ্যায়ন্ মৃতোহন্ধঃ বিশতে তমঃ ॥”

(ভাঃ ১১।১৭।৫৭-৫৮)

“হায় ! আমার বৃদ্ধ মাতাপিতা, শিশুসন্তানবিগিষ্টা ভার্য্যা এবং সন্তানগুলি আমা বিনা অনাথ ও দুঃখিত হয়ে দীনভাবে কিরূপেই বা জীবন ধারণ করবে’— এই প্রকার গৃহাভিনায়ে আক্ষিপ্তচিত্ত, অসন্তুষ্ট ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি পুত্রকন্যাদিকে সর্বদা ধ্যান করে এবং মৃত্যুর পর ‘অন্ধ’-নামক অতি তামসী যোনিতে প্রবেশ করে।”

গৃহমেধিগণের আপাতরম্য সুখ দুঃখেরই নামান্তর । যথা শ্রীমদ্ভাগবত-বাণী,—

“যন্মৈথুনাদি-গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং কণ্ডুয়নেন করয়োরিব দুঃখ-দুঃখম্ ।

তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজাঃ কণ্ডুতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ ॥”

(ভাঃ ৭।৯।৪৫)

“গৃহমেধিগণের স্ত্রী-সঙ্গাদিজনিত সুখ অতীব তুচ্ছ, উহাতে করদ্বয় সংঘর্ষণের জায় দুঃখের পর দুঃখই দৃষ্ট হয় । কামুক ব্যক্তিগণ বহু দুঃখ ভোগ করেও গৃহমেধ-সুখে পরিতৃপ্ত হয় না । (আপনার কৃপায়) কোন কোন ধীর ব্যক্তি কণ্ডুতির (চুলকানির) জায় কামকে ধারণ করতে সমর্থ হন ।”

সংসারে ভোগসুখ অন্বেষণ করতে গিয়ে পরিণামে দুঃখ এবং শত জালা-ঘন্ত্রণা পেয়েও হতভাগ্য বদ্ধজীব নিজেকে সংসার থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না । বাড়ীর কর্তা ভাবেন—স্ত্রীর ভরণ-পোষণ জোগাচ্ছি, পুত্র-কন্যার লেখাপড়া ও গ্রামাচ্ছাদনের সুব্যবস্থা করছি, এদের জন্মই প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছি ও করছি, সুন্দর অট্টালিকা এদের জন্মই প্রস্তুত করেছি ; অতএব আমিই এদের প্রভু বা মালিক, এরা আমার দাসত্ব স্বীকার করে আমার বাধ্য হয়ে চলুক । কিন্তু কর্তা ত’ যা’ কিছু করেছেন বা করছেন সবই ত’ নিজ স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মনোরঞ্জনের জন্ম ; তাদের সুখে রাখার জন্মই তাঁর যাবতীয় প্রচেষ্টা ! দাসের কর্তব্য প্রভুর মনোরঞ্জন করা, প্রভুর আজ্ঞা পালন করা, প্রভুর সেবার ক্রটি যাতে না হয়, তৎপ্রতি সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখা । এক্ষণে গৃহস্বামী বা গৃহকর্তা কি প্রকারান্তরে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার

দাসত্ব করছেন না ? স্ত্রী-পুত্র-কন্যার আজ্ঞাবাহী দাসরূপেই ত' গৃহকর্তাকে চলতে হচ্ছে । তারা যখন যা আদেশ করেছে, তাদের খুশী করার জন্য গৃহকর্তাকে তাদের আদেশ পালন করতে হচ্ছে,—একটু নড়চড় হলেই তারা অসন্তুষ্ট হবে । দাস-কর্তৃক প্রভুর সেবার ক্রটি হলে প্রভু যেমন দাসকে তিরস্কার করেন, তেমনই স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সেবার ক্রটি হলে গৃহকর্তাকেও সেজন্য তাদের কাছে অনুরোধ (Complaint) শুনতে হয়, তাদের মুখ ভারাক্রান্ত দেখে গৃহকর্তার মনেও কষ্ট হয় । তখন তাঁহার কি মনে হয় না যে, যাদের স্বথ দেবার জন্য প্রাণপাত করেছি এবং উদয়াস্ত পরিশ্রম করে চলেছি, তাদেরও মন পাওয়া যায় না, তারাও তাঁকে প্রীতির চক্ষে দেখে না ! আমরা যাকে প্রীতি করি, তার প্রতি আনুগত্য এনে যায় । যার আনুগত্য করা হয়, তারই স্বথ-বিধান করতে ইচ্ছা জাগে । তাই ক্ষেত্রবিশেষে স্বামী স্ত্রীর আনুগত্য করে, পিতা পুত্রের আনুগত্য করে—এরই নাম মায়া ।

সংসারের এমনই রীতি ! কেউ যদি একটা কুকুর পোষে, তখন দেখা যায় সেই কুকুরের মালিকই কুকুরটার দাসত্ব করেছে । কিরূপ দাসত্ব ? কুকুর মালিকের সাথে রাস্তায় যেতে যেতে পায়খানায় বসল । তখন মালিকের যত কার্যই থাকুক, তাঁকে কুকুরটিকে পায়খানা করানোর জন্য অপেক্ষা করতেই হবে । কুকুরটির পায়খানা না হওয়া পর্যন্ত উহার মালিককে কুকুরের ইচ্ছার অনুকূলে তার প্রতি প্রীতিবশতঃ কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে হল । এক্ষণে কুকুরটি তার নিজের স্বথের জন্য মালিককে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করল । এস্থলে কুকুরটিই তার মালিকের উপর প্রভুত্ব করল—এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না । এইভাবে কুকুরের মালিক কুকুরের মেথর-রূপে বা দাসরূপে কার্য করেছে ।

তাই মায়ার প্রভু হতে গিয়ে আমরা সবাই মায়ার দাস হয়ে পড়েছি । আত্মীয়-স্বজনের দাসত্ব, দেশের-দেশের দাসত্ব, সমাজের দাসত্ব, বড়-রিপুর দাসত্ব,—আরও কত দাসত্ব করে চলেছি । সংসারকে ভালবেসে আপাতরম্য ক্ষণিক স্বথের দিকে আমরা ধাবিত হচ্ছি । মায়া যে আমাদের কতভাবে প্রতারণা (delude) করেছে আমরা দেহাভিমানী হয়ে তা' বুঝতে পারছি না ।

প্রাকৃত দাম্পত্য সুখাভিলাষী সকাম গৃহীতকৃতও নিন্দাই । শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হয়েছে,—

“যে মাং ভজন্তি দাম্পত্যে তপসা ব্রতচর্যয়া ।

কামাত্মানোহপবর্গেশং মোহিতা মম মায়ায়া ॥”

(ভাঃ ১০।৬০।৫২)

অর্থাৎ—“(সকাম ভক্তদিগকে নিন্দা করে বলেছেন—) যে-সকল কামাত্মা প্রাকৃত দাম্পত্য-সুখ-ভোগার্থ তপস্যা ও কঠোর ব্রতচরণদ্বারা মুক্তির অধীশ্বর আমার উপাসনা করে, তারা নিশ্চয়ই আমার মায়ায় মুগ্ধ হয়।”

পুত্র-কন্যা বা কোন স্বজন জন্মগ্রহণ করলে যেমন সুখ বা আনন্দ হয়, তেমনই তাদের বিয়োগে বা মৃত্যুতে শোকে-দুঃখে মুহমান হয়ে পড়ি। যাদের নিয়ে আমরা সুখী হব মনে করি, তাদের থেকেই আবার দুঃখ পেয়ে থাকি। ইন্দ্রিয়ার্থ-জনিত সুখ দুঃখকেই প্রসব করে। শাস্ত্র বলেছেন,—

“যাবন্তঃ কুরুতে জন্তু সঙ্কল্পান্ মনসঃ প্রিয়ান্।

তাবন্তোহস্ত নিন্থন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ ॥” (বিষ্ণুপুরাণ)

“জীব প্রিয় বস্তুর সহিত যতদিন মনের সম্বন্ধ স্থাপন করে, ততদিন শোকশঙ্কাকা তার হৃদয়ে বিদ্ধ করতে থাকে।”

আমরা বদ্ধজীব ; আমাদের নিত্য প্রিয় ভগবানকে ভুলে দেহ-মনকে প্রিয়র স্থানে বসিয়েছি। দেহ-মনের সুখোৎপাদনদ্বারা সুখ পাবার আশা করি। মনের প্রিয় বস্তুর সঙ্গেই বদ্ধজীবের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কারণ দেহী জীব (আত্মা) বদ্ধাবস্থায় মনের অধীন। আমরা মনের সঙ্গে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রিয়ত্ব সম্বন্ধে সেই ব্যক্তি বা বস্তুকে প্রিয় জেনে প্রীতি করে থাকি। আমাদের নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি স্বজনবর্গের বিয়োগে আমরা দুঃখিত ও শোকার্ত হই, কিন্তু অল্প কোন ব্যক্তির স্বজনবর্গের বিয়োগে অথবা সংবাদপত্রে প্রকাশিত নাম না জানা তথা অজানা অচেনা ব্যক্তিদের মৃত্যুর খবর শুনে আমরা শোকার্ত হই না। আমাদের নিজেদের বাড়ীতে ডাকাতি হলে আমরা হা-ছতাশ করি, কিন্তু অপরের বাড়ীতে ডাকাতি হলে আমরা হা-ছতাশ করি না। আমাদের নিজেদের দ্রব্যাদি নষ্ট হলে বা হারিয়ে গেলে আমরা দুঃখিত হয়ে থাকি ; কিন্তু অল্প ব্যক্তির দ্রব্যাদি বিনষ্ট হলে বা হারিয়ে গেলে আমাদের দুঃখ হয় না। ইহার কারণ কি ? যে ব্যক্তিতে বা যে বস্তুতে আমাদের প্রীতি আছে, সেই ব্যক্তি বা সেই বস্তুর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ বিত্তমান। যেখানে যেমন সম্বন্ধ থাকে, সেখানে তেমনই প্রীতি থাকে। যাদের সঙ্গে বা যে-সব বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, সেখানে প্রীতিও থাকে না। কিন্তু এই প্রীতি দেহ-সম্বন্ধীয়। এই প্রীতি ভৌতিক দেহেতে ভৌতিক সত্ত্বার সঙ্গে ভৌতিক সম্বন্ধ মাত্র। এ জগতে নিজের সুখের জন্তই একজন অপর-জনের প্রিয় হয়। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলেছেন—“স হোবাচ ন বা অরে পতুঃ কামায় প্রিয়ো ভবত্যাগ্ননস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি 'ন বা অরে সর্বশ্চ কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাগ্ননস্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি'।”—(বৃঃ আঃ ২।৪।৫)

অর্থাৎ “কেহই অণ্ডের প্রীতিসাধনের নিমিত্ত অণ্ডকে ভালবাসে না। নিজ নিজ প্রীতির জন্তই পতি পত্নীকে, পত্নী পতিকে, পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে ভালবাসে। কারও প্রীতির জন্ত কেহ প্রিয় হয় না, কেবল আত্মার প্রীতির নিমিত্তই সকলেই সকলের প্রিয় হয়ে থাকে।”

আত্মার উপর মায়া-রচিত সত্ত্বাতে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে, সেই সম্বন্ধ স্থায়ী হয় না। গীতার (৮.৪) ভগবান্ বলেছেন,—“অধিভূতং ক্ষর ভাবঃ” অর্থাৎ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল নশ্বর পদার্থসমূহ অধিভূত শব্দবাচ্য। তাই পদার্থসমূহ ক্ষণস্থায়ী। আমরা নিজেদের দেহ-মনের স্বথের জন্য অন্যদের প্রীতি করি। এ জগতে জীবের ভোগের বস্তুগুলি গুণমায়ার পরিণাম। মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার সূক্ষ্মজড়, জীবমায়া থেকে জাত। জীবমায়ার প্রভাবেই আমরা সংসারে জড় দেহ-গেহ প্রভৃতিতে ‘অহং’-‘মম’-রূপ সম্বন্ধ স্থাপন করে বিষয় ভোগ করার চিন্তায় সংসারে বদ্ধ থাকতে চাই। কিন্তু ত্রিগুণাত্মক বস্তুসকল অনিত্য। বদ্ধ-জীবের ইন্দ্রিয়গুলি কিভাবে বিষয়ে নিয়োজিত হয়ে মায়ার দ্বারা আকর্ষিত হচ্ছে, তাই দেখে প্রহ্লাদ-মহারাজ বদ্ধজীবের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন,—

“জিহ্বৈকতোহচ্যাত বিকর্ষতিমাবিতৃপ্তা

শিশ্নোহন্যাতস্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ ।

ব্রাণোহন্যাতশ্চপলদৃক্ ক চ কর্মশক্তি-

বহ্ন্যাঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি ॥” (ভাঃ ৭।৯।৪০)

“হে অচ্যাত ! জিহ্বা তৃপ্ত না হয়ে একদিকে অর্থাৎ যেদিকে মধুরাদি রস, সেই দিকে আমাকে আকর্ষণ করছে ; এইরূপ শিশ্ন অণ্ডদিকে, ত্বক্ আর একদিকে আকর্ষণ করছে। উদর ক্ষুধায় সন্তপ্ত হয়ে যে কোন আহারের প্রতি এবং শ্রবণ, ব্রাণ ও চক্ষু চক্ষু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি, কর্মেন্দ্রিয়সকল বিভিন্ন কর্মের প্রতি আকর্ষণ করছে। সপত্নীগণ যেমন গৃহপতিকে আকর্ষণ করে ব্যতিব্যস্ত করে, এই সকল ইন্দ্রিয় সেইরূপ ভিন্ন বিষয়ে আকর্ষণ করে আমাকে বিব্রত করছে।” বিবিধ কামনাই মনকে অশান্ত করে তোলে। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলেছেন—“কামান্ মানবো মনসি স্থিতান্” (ভাঃ ৭।১০।৯) অর্থাৎ “মানবের কামনাসমূহ নিজের মনে অবস্থিত।” অশান্ত মন সংসারের যে বিষয়গুলিকে প্রীতি করে, সেগুলিও অশান্ত এবং ক্ষণস্থায়ী। প্রিয়জনের যে রূপ, গুণ, কার্যের প্রতি আমাদের প্রীতি, তাহাও স্থায়ী হয় না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

অপ্রাকৃত দীনতা হীনতা নহে

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৬ পৃষ্ঠার পর]

অপ্রাকৃত দৈন্তের কিছু দৃষ্টান্ত

“বিষয় বিষম বিষ সতত থাইলু । গৌরকীর্তন-রসে মগন না হৈলু ॥

কেন বা আছেয়ে প্রাণ কি স্থখ পাইয়া । নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া ॥”

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তাঁহার ‘প্রার্থনায়’ এইরূপে তাঁহার হৃদয়ের আকুল আতি ব্যক্ত করিয়াছেন । তাঁহার এই দৈন্তে কেহ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে গৌরকীর্তন-রস-বঞ্চিত এক ঘোর বিষয়রূপে স্থির করিলে তিনি মহা অপরাধী হইবেন । শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের ইহাই স্বভাব যে, তাহার অন্ত নাই, স্থিরতা নাই, নিত্য নবনবায়মান —“আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয় । স্ব-স্ব প্রেম-অনুরূপ ভক্তে আশ্বাদয় ।” (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৪৪) ।” ইহার অন্তহীনতা সন্দেহে ব্যাখ্যা করিতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এক উদাহরণের অবতারণা করিয়াছেন—“আকাশ—অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষীগণ । যার যত শক্তি তত করে আরোহণ ॥” (চৈঃ চঃ অঃ ২০।৭২) । শ্রীল রূপ গোস্বামীর ‘ভুগু তাণ্ডবিনী’ শ্লোক, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের ‘অনুরাগবল্লী’ ইত্যাদি বিভিন্ন গোস্বামী-রচনায় দেখা যায়,—শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ লীলার আনন্ত্য ও নিত্য নবনবায়মানতায় ভক্ত পরিপ্লুত, বিস্মিত ও অধৈর্য্য হইয়া সহস্র জিহ্বা, সহস্র নাসিকা, সহস্র কর্ণ, সহস্র নিষ্পলক নয়ন, সহস্র হস্ত, সহস্র পদ, সহস্র মন কামনা করিতে থাকেন । কিন্তু তাহাতেও তাঁহার আশ্বাদনের পূর্ণতা সম্ভব হয় না—“সম্যক্ আশ্বাদিতে নারে, মনে রহে ক্ষোভ ।” সেই ক্ষোভবশতঃ তিনি বিরহ, দৈন্তে আক্রান্ত হইয়া নিজকে ‘বিষয়ী’, ‘পাষণ-হৃদয়’, ‘অভাগা’ ইত্যাদি ভাষায় স্বীয় আতি প্রকাশ করিতে থাকেন ।—

“এতাদৃশী তব রূপা ভগবনমাপি দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥”

(শ্রীশিক্ষাষ্টক)

“নরহরি-হিয়া, পাষণ দিয়া, কেমনে গড়িয়াছে ॥”

“কাদে কৃষ্ণদাস কেশ ছিঁড়ি নিজ করে ।

ধিক্ ধিক্ অভাগিয়া কেন নাহি মরে ॥”

“আমি ভাগ্যহীন, অতি অকর্বাচীন, না জানি ভকতি-লেশ ॥” (শ্রীল

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর) “অভাগ্যের নাহি ওর, মিছামোহে হৈলু ভোর, দুঃখ রহে অন্তরে জাগিয়া ॥” (শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

“অভাগা কেশব করে নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন”

আচার্য্যসিংহ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুর তাঁহার রচিত “শ্রীগৌর-গোবিন্দ-আরতি-কীর্ত্তনে” “অভাগা কেশব করে নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন” —এইরূপে তাঁহার অপ্ৰাকৃত দৈত্তের প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা কীর্ত্তনকালে তদন্তরাগিগণের মধ্যে কেহ কেহ জগতের হতভাগ্যগণের দুর্ভাগ্য স্মৃতি প্রাপ্ত হওয়ায় অত্যন্ত সংকোচ বোধ করেন এবং তজ্জন্ত স্বকলিত শব্দবিজ্ঞাসে তৎপর হন। বস্তুতঃ অপ্ৰাকৃত এই দৈত্তানুভূতিকে প্রাকৃত দৈত্তদশার সহিত একীভূত করায় একরূপ বিপত্তি ঘটে। ইহা দ্বারা পদকর্তার হৃদয়ের স্বাভাবিক অপ্ৰাকৃত বিরহকে অবমাননাই করা হয়।

কৃষ্ণবিরহকাতর ব্রজবাসিগণকে সাহসনা প্রদানার্থে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক উদ্ধবজী প্রেরিত হইলে প্রথমেই তিনি শ্রীনন্দগৃহে উপনীত হন। যাবৎ শাঙ্গসিন্ধু আলোড়ন করিয়া মখা-উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা নিরূপণদ্বারা নন্দবাবা ও যশোদামাতার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রতি ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি আনয়ন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বিরহ আরও বদ্ধিত হইতে লাগিল—নন্দবাবা বুক চাপড়াইয়া নিজকে অভাগা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের একরূপ ঐশ্বর্য্যলেশহীন নিখাদ প্রীতি সন্দর্শন করিয়া শ্রীউদ্ধব ভাবিতে লাগিলেন,—‘অহৌ! ব্রজবাসিগণের সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই, কবে আমার একরূপ সৌভাগ্য লাভ হইবে!’ নন্দ-মহারাজের একরূপ অভাগা-কীর্ত্তন বস্তুতঃ পরম সৌভাগ্য প্রকাশেরই নামান্তর—ইহা তত্ত্বদর্শী উদ্ধবজী মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন। অমঙ্গিগণ ইহাকে অযথা প্রাকৃত জগতে টানিয়া আনিয়া নিজেরাই প্রাকৃত-সংকুচিত-ভাবে ক্লিষ্ট হইতে থাকেন। ভগবৎ-পার্ষদগণ যে অপ্ৰাকৃতভাব অবলম্বনে নিজকে ‘অভাগা’ ইত্যাদি বলিয়া খেদোক্তি করেন, তাহার এক লক্ষাংশও লাভ হইলে জগতের কোনপ্রকার সৌভাগ্যের মুখদর্শন কেহ করিতে চাহিবে না। ইহা না বুঝিয়া স্বীয় আধ্যাত্মিক বিচার আনয়ন করিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তিত বাক্যে বিকৃতি ঘটাইলে দুর্ভাগ্য আমাদের পিছু ছাড়িবে না।

‘অভাগা’ অর্থে অহো ভাগা

অপ্ৰাকৃত জগতে যাহা ‘ভাব’, প্রাকৃত রাজ্যে তাহা ‘অভাব’। শ্রীগীতো-পনিষদোক্ত “নাসতো বিত্ততে ভাবো নাভাবো বিত্ততে সতঃ”—শ্লোকে তাহা পরিস্কৃত হইয়াছে। সুতরাং এই অচিজ্জগতের ‘অভাব’ অবলম্বন করিয়া চিজ্জগতের ‘ভাব’ উপলব্ধি হইতে পারে না। এই জগতে ‘দৈত্ত’ বলিতে যাহা অভাব, কুণ্ঠা, শোচনীয়তা ইত্যাদি বুঝায়, অপ্ৰাকৃত জগতে তাহা পূর্ণতা, প্রাচুর্য্য, আনন্দদায়ক-

অর্থযুক্ত । “মমাব্যয়মত্তমম” (গী: ৭।২৪)—এস্থলে ‘অত্তমঃ’ অর্থে ‘ন উত্তমঃ’ (উত্তম নহে অর্থাৎ অধম) না হইয়া ‘নাস্তি উত্তমো যস্মাৎ’ (যাহা হইতে কোন উত্তম বস্তু নাই, অর্থাৎ সর্বোত্তম) হইয়াছে । ব্রজবাসিগণের পূজালাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া দাস্তিকতাবশে ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণপ্রতি “বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিত-মানিনম্”—ইত্যাদি বলিয়া যে নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহাই শুদ্ধাসরস্বতীকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণপ্রতি স্তুতিতে পরিণত হইয়াছে । সেস্থলে ‘বাচাল’ অর্থে বেদপ্রবর্তক, ‘বালিশ’—শিশুবৎ নিরতিমান, ‘স্তব্ধ’—সাঁহার বন্দ্য কেহ নাই অতএব অনম্র, ‘অজ্ঞ’—সাঁহা হইতে কেহ বিজ্ঞ নাই, ‘পণ্ডিতমানী’—পণ্ডিতকর্তৃক মান্য ইত্যাদি অর্থে ভূষিত হইয়াছে । অর্থাৎ জগতের কোনপ্রকার নিন্দা, ভৎসনা, অভাব ইত্যাদি ভগবান্ এবং তাঁহার পার্শ্বদগণকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না । সুতরাং এস্থলে ‘অভাগা’ অর্থে যে ‘সাঁহা হইতে (শ্রেষ্ঠ) ভাগ্য নাই’—অর্থাৎ অত্যন্ত সৌভাগ্যসূচক, ইহাতে সংশয় কি ?

ভাগবতানুগত্যে কীর্তনই সঙ্গীর্ভন

মহাভাগবতগণ অন্তর্দশা, অর্দ্ধবাহদশা, বাহদশা—সর্বাবস্থায়ই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রত থাকেন । তাঁহাদের আনুগত্যে কীর্তন সম্ভব হইলে তবেই তাহা যথার্থ মার্ধকতা লাভ করে । বৈষ্ণব-মহাজনগণকৃত পদাবলী স্বয়ং ‘শঙ্করক’—তাঁহারাই মূল-কীর্তনীয়—আমরা তাঁহাদের পশ্চাৎ দোহারকারী মাত্র । এই প্রকারে আনুগত্য স্বীকৃত না হইলে তাহা ‘মানুষ-ভজনে’ পর্য্যবসিত হয়—‘মানুষ-ভজন করছো রে তাই ভাবের গান গেয়ে ।’ (শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত বাউলসঙ্গীত) ।

একজন স্নিগ্ধ শিষ্য শ্রীগুরুদেবকেই মূল-পূজারূপে জানিয়া নিজকে ‘তাঁহার পূজার সহায়ক মাত্র’—এই অভিমান করেন । তাহা না হইয়া ‘আমিই পূজারী’—এইরূপ দুর্বুদ্ধির উদয় হইলে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে ‘প্রাকৃত ভক্ত’ বলিয়া পরিচিত হন । তদ্রূপ বৈষ্ণব-মহাজনগণের আনুগত্যেই তৎকৃত পদাবলীসমূহ কীর্তনীয় । ‘আমিই কীর্তন করিতেছি’—অভিমানে বশীভূত হইয়া আধ্যাত্মিক বিচারবশতঃ তাঁহাদের রচিত পদাবলীতে পদের পরিবর্তন করিলে তাহাতে পদ-কর্তার কর্তৃত্ব বা পদলালিত্য থাকে না । শ্রীঅজ্ঞানমিশ্র মহোদয় গীতাপাঠকালে দুর্বুদ্ধিগ্রস্ত হইবার অভিনয় করিয়া গীতাবাক্যে যে লালকালির আঁচড় দিয়াছিলেন, তাহা স্বয়ং ভগবানের শ্রীঅঙ্গে আঘাতস্বরূপ হইয়াছিল । প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ তাঁহার দোষ-চতুষ্টয়-রাহিত্য ও স্বীয় উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করিতেই এরূপ আঘাত বরণের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন ।

সুতরাং দোষ-চতুষ্টয়-রহিত ভগবৎপার্ষদ বৈষ্ণব মহাজনগণের কীর্তনের দৌহার-কারী, তাঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজী ভৃত্য—এই শুদ্ধ অভিমানে কীর্তন করিতে পারিলে তাঁহাদের শুভেচ্ছায় আমরাও সেই অপ্ৰাকৃত দৈত্তের অধিকারী হইতে পারিব। এই প্রকার দৈত্ত কোনরূপ কৃত্রিমচেষ্টা দ্বারা লভ্য নহে—একমাত্র ভগবৎ এবং ভাগবত-রূপায়ই তাহা অন্বেষ্য ও লভ্য হয়। তজ্জন্ম শুদ্ধভক্ত-ভাগবত-দাসত্ব ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই।—

“প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র এ জীবন।

দাস করি’ বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥”

স্বস্থ-বাসনাহীন হইয়া কৃষ্ণস্বখবাহু হই প্রকৃত দীনতা

প্রাকৃত দীনতা অথবা কেবল প্রাকৃত অভিমান-হীনতা—কোনটাই শ্রীমন্নহাপ্রভুর অভিপ্রেত ‘দীনতা’ নহে। কর্মিগণ প্রাকৃত দৈত্তে স্থখ-রাহিত্যের কারণে ‘ধনং দেহি জনং দেহি’ ইত্যাদি প্রাকৃত কৰ্ম্মচেষ্টায় নিযুক্ত হইয়া কৰ্ম্মের নাগরদোলায় ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে থাকেন। জ্ঞানিগণ প্রাকৃত দৈত্ত বা তদ্বিপরীত প্রাকৃত স্থখের হেয়ত্ব—উভয়েই বীতস্পৃহ হইয়া ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’-দ্বারা সর্বপ্রকার প্রাকৃত অভিমানকে জলাঞ্জলি দিতে চাহেন। মূলতঃ স্বীয় স্বখানুসন্ধানই তাঁহাদিগকে এইরূপ স্বীয় সন্তানশমূলক কার্য্যে প্ররোচিত করে। কিন্তু তজ্জন্ম ভগবচ্চরণ-কমনকে অবজ্ঞা করিয়া ফেলিলে অধিকতর প্রাকৃত দৈত্তে তাঁহারা নিপতিত হন।

সাধুসঙ্গেই জীব শ্রীভগবানের চিদ্বিশেষত্বে আকৃষ্ট হন। তখন তাঁহার চিদৈশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সাযুজ্য মুক্তি অত্যন্ত নিকটেজ্ঞানে পরিত্যক্ত হয়। সামীপ্য, সাষ্টি, সালোক্য ও সারূপ্য—এই চারিবিধ মুক্তি সাধ্য হইলে পরব্যোমরূপ ভগবদ্ধাম ও তথায় ঐশ্বর্য্যপ্রধান শ্রীনারায়ণের সেবা লাভ ঘটে। বস্তুতঃ এইস্থল হইতেই প্রাকৃত দৈত্তের প্রকৃত অবসান এবং চিদানন্দ লাভের সূত্রপাত। কিন্তু এমতাবস্থায় স্বস্থ ও ঐশ্বর্য্যের বাহু হই প্রধান হওয়ায় অপ্ৰাকৃত দৈত্তের পরিপূর্ণতা লাভ হয় না। শ্রীমন্নহাপ্রভুর “প্রেম—প্রয়োজন”-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে পঞ্চবিধ মুক্তির কোনটাই অঙ্গীকৃত হয় না। পরব্যোমনাথ লক্ষ্মীপতি নারায়ণ কিংবা দ্বারকাধীশ রুক্মিনীপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদও মন হরণে অসমর্থ হয়। তৎকালে এক “গোপীভর্তৃঃ পদকমল-দ্ব্যাদাস-দামানুদাসঃ”—অভিমানে স্বস্থবাসনার লেশমাত্রও পরিত্যক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রীতিবিধানই একমাত্র অভীষ্ট হইয়া থাকে।

“না গগি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর স্থখ, তাঁর স্থখ—আমার তাৎপর্য্য।

মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাস্থখ, সেই দুঃখ মোর স্থখবর্ষ্য ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ২০।৫২)

ইহাই অপ্রাকৃত দৈন্তের পরিপূর্ণতম বিকাশ। সকলপ্রকার প্রাপ্তির সীমা লাভ হইয়াও অপ্রাপ্তির খেদ ইহার বৈশিষ্ট্য। ইহা এক অচিন্ত্য, অপ্রাকৃত বিবর্ত—যাহা হইতে অপ্রাপ্তিতেও পরিপূর্ণ-প্রাপ্তির বাস্তব অনুভূতি লাভ হইয়া থাকে। সেশ্বে 'দৈন্ত' কিংবা 'দন্ত' একই তাৎপর্য্যপূর্ণ। প্রাকৃত ভূমিকায় কোনপ্রকার মনগড়া অনুভূতির দ্বারা ইহা বোধগম্য নহে।

—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, সেবারত্ন

নিরপেক্ষতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩২ পৃষ্ঠার পর]

বস্তুতঃ নিগুণ সবিশেষত্ব শ্রীভগবানই জ্ঞানীদিগের চরমগতি যে ব্রহ্ম, তাহার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্মরূপ প্রেম ও ঐকান্তিক-সুখরূপ ব্রজরস, সমুদয়ই এই নিগুণ সবিশেষ-ত্বরূপ কৃষ্ণ-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে। শ্রীভগবান্ গীতাশাস্ত্রেও পরতত্ত্ব নির্ণয়ে 'ব্রহ্ম'-বিচারকে গুহ্য, 'পরমাত্ম'-বিচারকে গুহ্যতর এবং 'শ্রীভগবদ্'-বিচারকে গুহ্যতম বলিয়া তারতম্য-মূলক সম্বয় করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনগুণের সংযোগেই সংসার-দশা হয়। ওই তিনগুণের অবসান হইলেই মুক্তি হয়। তাহার সিদ্ধি কিন্তু কেবল হরিভক্তির দ্বারাই হইবে।

আত্মার বিচার-বৃত্তির পরিচালনাকে জ্ঞান বলে, আর বিশুদ্ধ আত্মার আনন্দ-বৃত্তির পরিচালনাকে কেবলা ভক্তি বলে; ইহার অঙ্গতর নাম 'প্রেম'। জ্ঞান যখন প্রেমের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন 'জ্ঞানমিশ্রা' ভক্তি হয়, আবার জ্ঞান যখন প্রেম-প্রাচুর্য্যক্রমে বিচারবৃত্তিকে স্থগিত করে, তখন তাহা 'কেবলা ভক্তি'রূপে প্রকাশিত হয়। আনন্দনশূন্য-বিচার চরমে প্রায়ই অভেদ-ব্রহ্মবাদ বা নির্বাণবাদরূপ অনর্থকে আনয়ন করে। জীব স্বভাবতঃই 'আনন্দন'-প্রধান। কেবল বিচারময় হইতে গেলে স্ব-স্ব-ভাব হইতে চ্যুত হইতে হয়।

তাহা হইলে এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সমস্ত শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত যদি ভক্তি হইয়া থাকে, তবে জীব ভুক্তি, মুক্তি ইত্যাদি অজস্র বাসনা করে কেন? এবং শাস্ত্রে ইহাদের সমর্থনেও কিছু প্রাদেশিক বাক্য দেওয়া আছে কেন? ইহার এক কথায় উত্তর হইল, জীব তাহার স্বতন্ত্রতাহেতু এইরূপ করিয়া থাকে এবং

বৈচিত্র্যময় ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবের অজস্র বাসনাদ্বারাও শ্রীভগবান্ তাঁহার অনন্ত লীলা-বৈচিত্র্য আশ্বাদন করেন। এখন প্রশ্ন হইবে, শাস্ত্রে তাহা হইলে এত উপদেশের প্রয়োজন কি? এবং ‘ইহাও বটে’, ‘উহাও বটে’ রূপ সকলেরই সমর্থনযোগ্য অথবা বিরোধমূলক বাণী প্রযুক্ত হইয়াছে কেন?

শাস্ত্রে কোথাও অসঙ্গতিপূর্ণ, অসামঞ্জস্যপূর্ণ, অস্পষ্ট বা বিরোধমূলক বাণীর দৃষ্টান্ত নাই। শাস্ত্র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, সমদর্শী, সর্বব্যাপী, সুস্পষ্ট অপৌরুষেয় বাণী। ইহাতে কোথাও কোন উপদেশ চাপাইয়া দেওয়া হয় নাই। শুধু নিরপেক্ষভাবে পথপ্রদর্শন করা হইয়াছে মাত্র। তুমি যদি ইহা কর, এই পথে যদি চল, এই ফল পাইবে; আর যদি উহা কর, ঐ পথে যদি চল, ঐ ফল পাইবে; এই মাত্র—“যে যথা মাং প্রপত্তন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।” অসুরদিগের স্বভাব, কর্ম এবং তাহাদের প্রাপ্তির কথাও বলা হইয়াছে এবং দৈবী ভাবাপন্ন ভক্তবৃন্দের স্বভাব, কর্ম ও তাঁহাদের প্রাপ্তির কথাও বলা হইয়াছে, অর্থাৎ যে যেমন করিবে, সে তেমন ফল পাইবে। সেখানে বৈষম্যের কোনই অবকাশ নাই এবং মুড়ি-মিছরি সবই সমান—এমন কথাও নাই। অনর্থগ্রস্ত, পণ্ডিতাভিমानी জীব নিজদের অধিকারের সীমা বুঝিতে না পারিয়া নিজদের কুচির পক্ষে টানিয়া জোরপূর্বক সকলকে নিজের মত দেখাইতে গিয়া যত রকম অসামঞ্জস্য, অপরাধ, জটিলতা ও বিরোধের সৃষ্টি করিয়া থাকেন যেমন—কোন এক স্বামিজী বদিয়াছেন,—‘মহাভারতে আছে, শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে যুদ্ধজয়ের জন্ত নাকি দুর্গাপূজা করিতে বলিয়াছিলেন।’ এই বক্তব্য আবার গত 30. 9. 95 তারিখে শনিবার সকালে ‘আকাশবাণী কলিকাতা’ কেন্দ্র হইতে প্রচার করাও হইয়াছে। শাস্ত্রাদির মুখ্য অর্থ বুঝিতে না পারিয়া নিজদের হীন উদ্দেশ্য পূরণের জন্ত মহাভারতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থকে টানিয়া আনিয়া আপনাদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনেন এবং নিরীহ জনসাধারণকেও বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন। আশ্চর্য্য হই, যখন দেখি—বর্তমান প্রচার-মাধ্যমগুলিও ইহাদের এইসব অপপ্রচারে সহায়তা করেন।

একদা কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন,—শাস্ত্রে অজস্র নিয়ম-কানুন, বিধি নিষেধ, বার-ব্রত সব কি পালন করা সম্ভব? বলিলাম,—শাস্ত্রের সমস্ত বিধি-বিধান ত’ একজনের জন্ত নয়। তখন তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—শাস্ত্রের কোন্ বিধি-বিধানগুলি আমাদের পালনীয়, আর কোনগুলি পালনীয় নয়? বলিলাম,—মঙ্গললাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে শাস্ত্রের সমস্ত বিধি-নিষেধ পালনীয়। তখন অপর একজন বলিলেন,—‘আপনি একবার বলিলেন শাস্ত্রের সব বিধি পালনীয় নহে, আবার পরক্ষণেই ঠিক তাহার বিপরীত কথা বলিলেন। শাস্ত্রেও বেশীর ভাগই

দেখি, একবার একটী উপদেশ দিয়া পরক্ষণেই ঠিক তাহার বিপরীত কথা বলা হইয়াছে, ইহাতে কি বুঝিব ?

তখন বলিলাম,—বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন উপদেশের সমস্তই একেবারে একই সময়ে একব্যক্তির জন্ত নহে। মঙ্গলের পথে আরুঢ় ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থার, বিভিন্ন অধিকারের জন্ত বিভিন্ন উপদেশ আছে। এইভাবে ক্রমোন্নতির পথে তাহার সমস্ত বিধি-বিধানই অল্পদূরত হইয়া থাকে। পূজনীয় গোস্বামিবর্গ তাহা বিশ্লেষণপূর্বক দেখাইয়াছেন। আমাদের অজ্ঞানতা এবং অবজ্ঞার জন্তই শাস্ত্রের বিভিন্ন উপদেশ আপাত-বিরোধ বলিয়া বোধ হয়। যেমন,—পিতার প্রতি শাস্ত্রের উপদেশ “পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপনে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা॥” কিন্তু এই উপদেশ কি প্রহ্লাদ মহারাজের জায় ভক্ত পুত্রের জন্ত ? নাকি হিরণ্যকশিপুর জায় ভগবদ্বিরোধী অশুর পিতাদিগের প্রতি প্রযোজ্য হইবে ? অবিবেকী নীতি-আদর্শহীন, অশুরস্বভাব, দুরাচার, দুঃসন্তানদের প্রথমে কিছুটা নীতি-আদর্শ শিখাইয়া মানুষের পর্যায়ে আনিবার জন্ত এই উপদেশ। তদ্রূপ “জননী জন্মভূমিঞ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী”—এই বাক্যও তৃতীয় দাশরথী ভারতের প্রতি প্রযুক্ত হইবে না। বাল মহারাজের প্রতিও গুণ্ডাচার্যের জন্ত গুরুনিষ্ঠার উপদেশ সকল বর্তাইবে না। সেইজন্ত বহিন্মুখ জীবগণের যে-কোন উপায়ে ধর্মের প্রতি একটু শ্রদ্ধা উদয় করাইবার জন্ত প্রাদেশিক বাক্যদ্বারা এইরূপ ব্যবস্থা দিয়া অবশেষে বলিলেন—“সর্বধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।” শাস্ত্র স্বতঃই নিরপেক্ষ বাণী বহন করেন

‘শাস্ত্র’-মানে শাসনবাণী ; কিন্তু এই শাসনবাণীও সকলের জন্ত নহে। বহিন্মুখ জীব জাতশ্রদ্ধ হইয়া যখন ভগবদনুশীলনকে একমাত্র পথ বলিয়া, শাস্ত্র-বাণীকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া আপন-বুদ্ধিতে তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে, তখনই তাহার প্রতি শাসনবাণী প্রত্যক্ষভাবে প্রযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। তাহার পূর্ব পর্যন্ত শাস্ত্র নিরপেক্ষ বাণী বহন করিয়া থাকেন, ইহা করিলে ইহা হয়, উহা করিলে উহা হয় ইত্যাদি। অনেকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন,—সদগুরু তাহার শিষ্যদের শাসন করেন না কেন ? ইহার পাঁচটা প্রশ্ন হইবে,—সদগুরুর শাসনের যোগ্য কয়জন ? সদগুরু অবশ্যই তাহার শিষ্যদের শাসন করেন। শিষ্য মানে যিনি শাসন স্বীকার করেন।

জীব তাহার অজস্র ভোগ-প্রবৃত্তি ও বাসনাক্রমে বিভিন্ন কর্মপাকে ঘুরিতে ঘুরিতে কখনও কোন সৌভাগ্যোদয়ে শ্রীগুরুপদাশ্রয়পূর্বক সাধনানুশীলন করে ; কিন্তু তখনও তাহার চিত্তবৃত্তি জড়ীয়-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত না হওয়ার ফলে

চিদনুশীলনে একাগ্রতা ও একমুখী-ভাব প্রাপ্ত হয় না। “ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে। নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥” (চৈঃ চঃ)

ক্রমশঃ নিষ্ঠার সহিত সাধন করিতে করিতে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে, সাধকের জড়ীয়-ব্যাপারে নিলিপ্ত, নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী এবং চিত্ত্যাপারে একনিষ্ঠতার উদয় হয়। তখন সৌভাগ্যক্রমে সদ্গুরু পাইলে জীব সম্পূর্ণভাবে তাঁহার শরণাগত হয়। “ভাক্তঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরহুত্র চৈষ ত্রিক্ এককালঃ।” সদ্গুরু তখন তাঁহাকে সরাসরি শাসন এবং প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ আদেশ-নির্দেশ দিয়া থাকেন। ইহার পূর্ব পর্য্যন্ত তিনি সকলকেই চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ করিয়া ভগবনুখী করিবার জন্ত সাধারণ উপদেশাবলীর মাধ্যমে পরোক্ষ-আদেশ, নির্দেশ ও শাসন-বাণী প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অতএব “বহু দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র-জীবনে। সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদ বরণে ॥” এই অবস্থার পূর্ব পর্য্যন্ত জীব সরাসরিভাবে সদ্গুরুর শাসনবাণী লাভ করিবার যোগ্য হয় না এবং তাহার সঠিক সম্বন্ধ স্থাপনও সম্ভব হয় না। বস্তুতঃ সদ্গুরুর তাঁহার সচ্ছিত্তকে শাসনের কোন প্রয়োজন হয় না। তবে যেটুকু দেখা যায়, সেইটুকু শুধুমাত্র লোকশিক্ষার নিমিত্ত; কারণ বিশ্বস্তভাবে প্রগাঢ় সম্বন্ধে ভুল বোঝাবুঝির কোন অবকাশ থাকে না। স্বভাবতঃই সদ্গুরুকে নিরপেক্ষ বলিয়া বোধ হয়। ‘নিরপেক্ষতা’ অর্থে ক্লীব বা জড়বৎ নহে। যোগ্যতানুসারে যথাযথ ব্যবহারই যথার্থ নিরপেক্ষতা বা সমতা; কিন্তু ‘চোর-সাবু, পণ্ডিত-মুখ্য সবাই সমান’ রূপ উদারতার গ্রহণ দেখাইয়া মুখের স্বর্গরাজ্য বানাইবার অপচেষ্টা কখনই নিরপেক্ষতা নহে। ইহা একদেশদর্শিতা-দোষে ভুষ্ট কতকগুলি অপদার্থ মূর্খের মতবাদ মাত্র।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি নীমিত্ত ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের বড়াই করেন না। চক্ষুদ্বারা আমরা বস্তু দেখিতে পারি মাত্র, চিনিতে পারি না; ইহার জন্ত প্রয়োজন হয় বোধের। নির্বোধ ব্যক্তির সকল ইন্দ্রিয় কর্মক্ষম থাকিলেও উহা যথার্থ নহে। চক্ষু জিনিসকে দেখাইয়া দেয়, ‘বোধ’ বস্তুকে বুঝাইয়া দেয়।

—শ্রীবীরভদ্রদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন

শ্যামে রাই

গুরে বনমালি, তোর চতুরালি,
আমি ত' বিশেষ জানি ।
তুমি ভুবনমোহন, বংশীবদন,
শ্রীরাধা ভুবনমোহিনী ॥
ভুবনমোহন, যবে অচেতন,
হৃদয়ে ধরিয়ে রাই ।
যোগনিদ্রাময়ী, রাই বিনোদিনী,
স্বরূপ মিলন তাই ॥
পরে জাগরণে, তোমার নাসায়,
শ্রীমতী প্রথম স্বাসা ।
তেঁই বিনোদিনী, পরাণ রূপিণী,
প্রাণসম ভালবাসা ॥
বিধির বদনে, যথা কৃতিগণে,
রাই, শ্যাম মুখে বাণী ।
শ্যাম কলেবরে, ইন্দ্রিয় নিকরে,
শক্তিরূপা বিনোদিনী ॥
শ্যাম জলধরে, রাই সৌদামিনী—
শ্যাম জলনিধি, রাই তরঙ্গিনী,
শ্যাম অনলে অনল শিখা ।
শ্যাম সুধাকরে সুধাংশু বদনী
বিমল কৌমুদী রেখা ॥
শ্যাম অলি রাধা মধুর গুঞ্জন
শ্যাম কুসুমে শ্রীমতী ভ্রাণ
রাই, শ্যাম গগনে তারা ।
শ্যাম হৃদিপরে শ্যাম মোহাগিনী
চিকন কুসুম হারা ॥

শ্যাম ফণী, রাধা উজ্জল রতন
 শ্যাম বসনে চিত্র চিকন
 রাই, শ্যাম নয়নে তারা ।
 শ্যাম সরোবরে রাই কমলিনী
 প্রেমে পরিমল ভরা ॥
 শ্যাম ক্ষিতি রাই গন্ধ মনোহরা
 শ্যাম অপ্ তাহে রাই রসভরা
 শ্যাম তেজে রাই রূপছটা ।
 শ্যাম মরুতে শ্রীমতী পরশ
 শ্যামাকাশে ধ্বনি ঘটা ॥
 শ্যাম চারুরূপে শ্রীমতী লাবণ্য
 শ্যামগুণে রাই গৌরব গণ্য
 রাই শ্যাম বদনে ভাষা ।
 শ্যাম রসময়ে রাই রসময়ী
 রাই মতি, শ্যাম নাসা ॥
 শ্যাম শিখী, রাধা বিচিত্র বরণ
 শ্যাম নীলমণি শ্রীমতী কাঞ্চন
 রাই শ্যাম একে জোড়া ।
 শ্যাম তমালে কনক মাধবী
 মোহনিয়া ছাঁদে বেড়া ॥
 রাই, শ্যাম দৌহে অভেদ মূরতি
 মধুর বিলাস - মধুময় জ্যোতি
 শ্যাম মধুরে মাধুরী রাই ।
 শ্যাম ত্রিভঙ্গে, রাই ত্রিভঙ্গিনী
 দৌহে দৌহা মুখ চাই ॥

—শ্রীশঙ্করনাথ গুপ্ত

“শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট”-এর অনুকূলে প্রদত্ত যাবতীয়
 দান আয়কর মুক্ত । চেক্, ড্রাফট্, মানি অর্ডার ইত্যাদি “শ্রীগৌড়ীয়
 বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট” (Shri Goudiya Vedanta Samiti
 Trust) এর অনুকূলে প্রদেয় ।

শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯৮ পৃষ্ঠার পর]

যে কোন সময় যে কোন লীলা প্রদর্শন করতে পারেন সেই ভগবান্ ।
“কর্তুমকর্তুমতথাকর্তুম ইতি ঈশ্বরঃ ।” ভগবানের পক্ষে সবটাই সম্ভব, সেইটাই দেখিয়েছেন এখানে ।

দামোদরদেব বললে আমরা সাধারণভাবে বুঝ্‌ব হামাগুড়ি দেওয়া ছেলেটা, কিন্তু সবসময় তা হচ্ছে না । তার তিতরেও তিনি অনেক কিছু দেখিয়ে দিচ্ছেন । নন্দমহারাজ গুরু-বাহুর সামলাতে রাধারাণীর হাতে কৃষ্ণকে দিয়ে যাচ্ছেন । সেই-সময় এই লীলাগুলো হচ্ছে । ঐটুকু বাচ্চা শিশু ! এইখানে পূর্ণদর্শনের বিচার । সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে হবে না ওটা । ভগবানের ক্ষেত্রে সম্ভব, অসমোদ্ধ লীলা । তাঁর সমানও কেউ নাই, উদ্ধেও কেউ নাই ।

ন তস্ত কার্যং করণঞ্চ বিত্ততে, ন তৎ সমশ্চাত্ত্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥

তাঁর বরাবর কেউ হতে পারেন না, তাঁর থেকে অধিকও কিছু প্রকাশ করার ক্ষমতা নাই কারও । অচিন্ত্য, অব্যক্ত জিনিস ব্যক্ত হচ্ছে, যদি একথা কেউ বলেন, ভগবানের ক্ষেত্রে সেটা হবে না । তিনি সবসময়ই ব্যক্ত । তিনি অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হয়েছেন, অপ্রকাশিত থেকে প্রকাশিত হয়েছেন, এমন কথা বলতে গেলে ভাষামল প্রবেশ করে । সেখানে শাস্ত্রকারগণ পর্যন্ত ক্ষমা চাইছেন । বেদব্যাস বেদ বিভাগ করেছেন, শাস্ত্র রচনা করেছেন, তিনিও তাঁর উপরওয়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন । কি ? তোমার কথা শু' ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু আমি করলাম । এটা কি বেয়াদপি, বাহাদুরি ? আমি বর্ণনা করেছি, ক্ষমা কর । ব্যাসদেব যে সে ব্যক্তি নন, তিনি স্বয়ং নারায়ণ । “শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণ স্বয়ম্ ।” বেদব্যাস এত কিছু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেও তাঁর উপরওয়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন—“আমি যেন কোন প্রাকৃত চিন্তা নিয়ে কিছু বর্ণনা না করি ।” ভাষা সেখানে রূপ নিচ্ছে । সাধু-মহাজনগণের বাণী এই-রকম, ভগবানের বাণী এইরকম—যা বলবেন তাই হয়ে যাবে । বাক্য সেখানে রূপ নেয় । কিরকম ? মুনি-ঋষিগণ কাকেও অভিসম্পাত করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেটা ঘটে গেল ; কাকেও আশীর্বাদ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেটা হয়ে গেল ।

পিণ্ডারক তীর্থে অসিত, দেবল, ব্যাস, নারদ প্রভৃতি নামকরা নামকরা ঋষিগণ

বসে আছেন। সেখানে গিয়েছিলেন যদুকুমার শাস্ত্রী। একা নয়, সঙ্গে আরও অনেকে ছিল। গিয়ে ঋষিদের কাছে যখন কথাটা বলল, তখন ঋষিগণ বললেন— বড় ফাজলামি না, কুলনাশন মুঘল প্রসব করবে এই নারীবেশী পুরুষ। ভয়ে ভীত স্বস্তস্ত হয়ে চলে গেল। গিয়ে সেই কাপড়-চোপড় সব খুলে দেখে সত্যিই মুঘল হয়েছে। কি ব্যাপার? বাক্য সেখানে রূপ নিয়েছে—মুঘল হয়েছে। ভগবদ্বাক্য ঐরকম সত্য, সাধুবাক্য ঐরকম সত্য, মুনি-ঋষিগণের বাক্য ঐরকম সত্য।

যখন দেখলেন সত্যিই মুঘল হয়েছে তখন সবাই বললেন, শিলে ঘসে ঘসে সব ফেলে দাও। শিলে ঘসে সব পাউডার হল এবং সমুদ্রে ফেলে দিল। এরূপ (নল খাগড়া) বনের সৃষ্টি হল। তাই দিয়ে কি মানুষ মরে? কিন্তু মানুষ তাই দিয়ে যুদ্ধ করে সব মরল। অবশিষ্ট ছিল সামান্য টুকরো। বললেন, সমুদ্রে ফেলে দাও, কি হবে ওটা! একটা মাছ মুঘলের অবশিষ্টাংশ গিলে ফেলল। সেই মাছটা আবার একটা জেলের জালে ধরা পড়ল। মাছ কুট্টে গিয়ে লৌহখণ্ড পাওয়া গেল। সেই লৌহখণ্ড দিয়ে বাণের তুণ তৈরী করা হল। সেই তুণ দিয়ে ভগবানকে মারা হল।

ভগবান্ কি যে সে লোক, যে কেউ বাণ দিয়ে মেরে দেবে, আর ভগবান্ মারা যাবেন! ভগবান্ ত' ওরকম লোক নন। তিনি সব **Part play** করে যাচ্ছেন। আশ্চর্য! ভগবান্ চলে যাবেন, থাকবেন না এখানে। কেন না, দেবতার। যারা স্তবস্ততি করেছেন ভগবানের কাছে, তাঁরাই কিন্তু আগে বলেছিলেন,—আমুন প্রভু, তুমি যদি জগতে অবতীর্ণ না হও তাহলে আমাদের সব শেষ। ভগবান্ এলেন, সব কাজ শেষ হয়েছে। তখন সেই দেবতাগণ আবার বলছেন, প্রভু! আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, এখন আপনি আপনার নিজের ধামে যান। আমাদের ক্ষমা করুন। ভগবান্ বললেন, হ্যাঁ যাব, কিন্তু একটু বাকী আছে ত'। কি বাকী আছে?—এই যাদবগণ, বৃষ্ণিগণ আমাকে পেয়ে ভীষণ অহঙ্কারী হয়েছে, 'দুর্মদ'—কাকেও কিছু মানছে না। আমার এখনও ভুভার হরণ হয় নাই, সামান্য লেজে বিষ আছে। এটুকু শেষ করে দিয়ে যেতে হবে আমাকে।

পিণ্ডারক তীর্থে যে-সব ঘটনাগুলো ঘটছে, সেগুলো এই প্রভাসেরই ব্যাপার। যিনি এতদিন ধরে সমুদ্রের বেলাভূমি রক্ষা করেছিলেন, এখন তিনি নিশ্চেষ্ট। আমি কিছু জানি না, বুঝি না, আমি কিছু দেখব না। ভগবান্ যদি বলেন আমি কিছু দেখব না, তাহলে ত' সব শেষ। ভগবান্ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন, **Notral**—নিরপেক্ষ-নীতি অবলম্বন করেছেন। মালিক যদি দায়িত্ব ছেড়ে দেন তদধীন ব্যক্তিগণের যে অবস্থা হয়, ঠিক সেইরকম অবস্থা যাদবগণের। ভগবান্ আর কিছু

দেখছেন না, ঘটনা সব ঘটে যাচ্ছে সামনে । তিনি দেখে যাচ্ছেন, কিন্তু কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না । যা হয় হোক । সবই ঘটে গেল আস্তে আস্তে । তাঁর সব লীলা শেষ, এখন যাওয়ার পালা । বর্ণনা আছে ভাগবতে,—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ ।

কলৌ নষ্টদশামেষ পুরাণাকৌহধুনোদিতঃ ॥

ভগবান্ যখন চলে যাচ্ছেন তখন রেখে যেতে হবে ত' কিছু । দুষ্ট-বদমায়েস ত' আছেই । সাধু-সন্ত ঋষিরা আছেন, তাঁদের জগৎও ত' কিছু রেখে যেতে হবে । 'কলৌ নষ্টদশামেষ পুরাণাকৌহধুনোদিতঃ'—এই পুরাণমূর্ত্য শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রসমষ্টি, গ্রন্থ-সম্রাটকে রেখে গেলেন ।

চলে যাচ্ছেন তিনি । কাকে কাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন । 'ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ' । ঋষিরা তাঁর লীলার সহায়করূপে এসেছিলেন, তাঁরা সব তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন । কি করে যাচ্ছেন ? বিমানে (Aircraft) যাচ্ছেন কৃষ্ণ । বিমানে চেপে বসেছেন, তাঁর সাজপাঙ্গরাও সব উঠে বসেছেন । Aircraft take-off করেছে, দুই তিন হাত মাটি থেকে উপরে উঠে গেছে । উদ্ধবকে সঙ্গে নেওয়া হয় নাই । উদ্ধব কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছেন—প্রভু, আসবার সময় তুমি আমাকে সঙ্গে আনলে, আর এখন যাওয়ার সময় আমাকে সঙ্গে নিচ্ছ না কেন ? ভীষণ কান্নাকাটি,—

‘নাহং তবাজ্জিহ্মকমলং ক্ষণাদ্ধিমপি কেশব ।

ত্যক্তুং সমুৎসাহে নাথ স্বধাম নয় মামপি ॥

আমি তোমার বিরহ সহ করতে পারব না, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল—এই বলে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছেন । রথ দাঁড়িয়ে গেল । যতটুকু উঠেছিল ঠিক সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেল । কৃষ্ণ বললেন,—দেখ, ভূভার হরণ ত' হয়েছে, দেবতারা আমাকে যা যা বলেছেন আমি সবই করেছি—

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সন্তুভামি যুগে যুগে ॥

সাধুগণকে পরিভ্রাণ করেছি, দৈত্য-দানব-অসুর সকলকে বিনাশ করেছি, ধর্ম-সংস্থাপন করেছি । কিন্তু তুমি কেন ওরকম করছ ? আমাকে কেন রেখে যাচ্ছেন ? আমি কি কোন অশ্রায় করেছি ?—না, তুমি কোন অশ্রায় কর নাই । যে-কথা আমি জগতে বলে গেলাম, সেই কথা তুমি জগতে প্রচার করবে, সেইজগৎ তোমাকে রেখে যাচ্ছি । এইজগৎ, আচ্ছা, ঠিক আছে । সব বুঝিয়ে দিলেন । বললেন, তুমি কি কথা জগতে প্রচার করেছ, সে-কথা ত' জগতের লোক সব ভুলে গেছে, আমিও ভুলে গেছি । ভক্ত কিরকম চতুর দেখুন । কবে তুমি ব্রহ্মাকে বর্ণাশ্রম-

ধর্ম, সনাতন-ধর্ম উপদেশ করেছিলে, দুনিয়ার লোক সব ভুলে গেছে, আমিও ভুলে গেছি। কৃষ্ণ তখন বললেন, ঠিক আছে, আমি আবার বলছি। ঐ অবস্থায় রথ দাঁড়িয়ে থাকল। সেখানে বর্ণাশ্রম-ধর্মতত্ত্ব থেকে সনাতন-ধর্মতত্ত্ব পর্যন্ত সমস্ত আবার বললেন। যে অংশটা উদ্ধব-সংবাদ বলে বর্ণিত। তখন উদ্ধব বললেন, ই্যা বুঝলাম। এইসব কথা তোমাকে প্রচার করতে হবে, লোককে জানাতে হবে। উদ্ধব বললেন,—

ত্বয়োপভুক্তশ্রগ্গন্ধবাসোহ্লকার-চর্চিতাঃ ।

উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি ॥

ঠিক আছে, আমি তোমার আজ্ঞা পালন করে তোমার কথা জগতে প্রচার করব। কিন্তু আমি কখন যাব? ভগবান্ বললেন,—তোমার যখন ইচ্ছা, তুমি তখন চলে যাবে। যখন তুমি বুঝবে তোমার প্রচার মোটামুটি হয়েছে, তখন তুমি চলে যাবে। চলে যাওয়াটাও ভক্তের ইচ্ছাধীন। ইচ্ছামৃত্যু ত' ভক্তের।

পিতামহ ভীষ্মের শুধু ইচ্ছামৃত্যু হয় নাই, আরও অনেক ভক্তের হয়েছে। আমার গুরুদেবেরই হয়েছে। সে ঘটনা দেখেছি আমরা। তিনি সবই বলে-কয়েই যাচ্ছেন। সময় দেখতে বলছেন, দেখত' পূর্ণিমা কতক্ষণ আছে। সেই সময়ের ভিতরে যাচ্ছেন। অদ্ভুত কথা! মন্দিরে রাধারাণীর মালা খুলে পড়ল, সেই মালা এনে তাঁকে দেওয়া হল। এরকম ত' বহু সাধু-মহাত্মা আছেন, যারা সব বুঝতে পারেন, ভগবানের থেকে খোঁজখবরটা আসে ঘাঁদের। ভগবানের সঙ্গে সবসময় Connection আছে।

এ দেহের ক্রিয়া, অভ্যাসে করিব, জীবন যাপন লাগি'।

শ্রীকৃষ্ণভজনে, অনুকূল যাহা, তাহে হব অনুরাগী ॥

কথাটা আছে ত'। এ দেহের ক্রিয়া অভ্যাসে করিব। যখন ইচ্ছা হবে, তখন তুমি চলে যাবে—উদ্ধবকে বলে দিলেন ভগবান্। ভক্তের সব জিনিষটা এইরকম। 'ভক্তের মুখে ভগবান্ খান'—একটা কথা আছে। কথাটার অর্থ কি?—কথাটার অর্থ হল—ভক্তকে বাদ দিয়ে ভগবান্ নন। ভগবান্ বলছেন—আমি আমার ভক্তকে ছাড়া কিছু জানি না, আর ভক্ত ত' বলেই বসে আছেন—ভগবান্ ছাড়া আমার আর কেউ নাই। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ ছাড়া আমার আর কেউ নাই। অদ্ভুত ব্যাপার! এইরকম অদ্ভুত ভগবান্। ভক্ত ছাড়া আমার কেউ নাই। আমি কারও পরে নির্ভর করি না।

অহং ভক্তপরাধীনো হৃদয়তত্ত্ব ইব দ্বিজ ।

সাধুভির্গ্ৰাস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥

আমি ভক্তের অধীন। লোকে আমাকে বলে আমি নাকি স্বাধীন, স্বরাট, নীলাপুরুষোত্তম ভগবান্। কিন্তু আমি দেখছি আমি সর্বতোভাবে বদ্ধ। কিসে বদ্ধ? ভক্ত আমাকে প্রেমভোরে বেঁধে ফেলেছে, নড়তে দিচ্ছে না; তুমি যেতে পারবে না আমার কাছ থেকে।

বিন্ধমঙ্গলের কাছে কৃষ্ণ এসেছেন। আর কাছে পেয়ে কৃষ্ণকে ধরেছেন। তখন কৃষ্ণ বিন্ধমঙ্গলের হাত ছাড়িয়ে দূরে সরে দাঁড়িয়েছেন। তখন বিন্ধমঙ্গল বলছেন, তোমার গায়ে খুব শক্তি আছে দেখছি। আমি ৭০০ বছরের বৃদ্ধ (বিন্ধমঙ্গল ৭০০ বৎসর বেঁচেছিলেন, দ্বাপরের শেষ, আর কলির প্রথম), আর তুমি ত' নবীন যুবা। গায়ে অনেক জোর আছে তোমার তা' আমি জানি। কিন্তু দেখ Bet— বাজি রাখছি আমি, তুমি আমার সঙ্গেও পেরে উঠবে না। “হস্তমুংক্ষিপ্যজাতোহসি বলাং কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।” তুমি আমার হাত ছাড়িয়ে দূরে দাঁড়িয়েছ, আমার গায়ে বল নাই বুঝলাম, কিন্তু “হৃদয়ান্যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে।” আমার হৃদয়ে বেঁধে রেখেছি, এখান থেকে যদি তুমি তোমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পার, তবে জানব তোমার বাহাদুরি। ভক্ত-ভগবানের এইরকম প্রেমকোন্দল হয়। ভক্ত ছাড়া ভগবান্ নন; ভগবান্ ছাড়া ভক্ত নন। ভগবান্ বলছেন, আমি ভক্তের অধীন। আমি পরম স্বাধীন হয়েও আমি ভক্তপরাধীন। ভক্ত যা বলবেন আমি তার বাইরে কিছু করতে পারি না। “অহং ভক্তপরাধীনো হৃদ্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।”— সব স্বাধীনতা-স্বতন্ত্রতা বিসর্জন দিয়েছি আমি, সব গেছে আমার। “মাধুভিগ্রস্ত-হৃদয়ো”—মাধুগণ যেন আমাকে গ্রাস করেছে। আমার আর এদিক-ওদিক করবার কোন উপায় নাই। ‘ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ।’

এখন শ্রীদামোদরাষ্টকের অত্বাদ ও ব্যাখ্যা আলোচনা করব।—

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং লসৎ-কুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।

যশোদা-ভিয়োল্খলাকাবেমানং পরামৃষ্টমত্যং ততোজ্ঞাত্য গোপ্যা ॥

যাঁর গুণদ্বয়ে দোহুল্যমান কুণ্ডলদ্বয় ক্রীড়া করছে, যিনি গোকুল-নামক (অপ্রাকৃত চিন্ময়) ধামে শোভমান, যিনি (দধিভাণ্ড ভগ্ন করার অপরাধ-হেতু) মাতা যশোদার ভয়ে ভীত হয়ে উদ্বল হতে (লক্ষ প্রদানপূর্বক) অতিবেগে ধাবমান, মাতা যশোদা তদপেক্ষা অধিক বেগে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিতে হয়ে যাঁর পৃষ্ঠদেশ ধারণ করেছিলেন, সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ (সর্বশক্তিমান্) শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি।

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী যে দিগ্‌দর্শিনী-টীকা করেছেন, তার বঙ্গাত্বাদ এখানে রয়েছে। শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীদামোদর-ঈশ্বরকে প্রণাম করে অধুনা এই দামোদরাষ্টকের (দিগ্‌দর্শিনী) ব্যাখ্যা আরম্ভ করছি :—

মূলশ্লোকে অগ্রেই কিছু প্রার্থনা করবার উদ্দেশ্যে, তাঁর তত্ত্ব-রূপ-গুণ-লীলাদির বৈশিষ্ট্যদ্বারা উৎকর্ষ-বিশেষ, গোকুলে প্রকটিত নিজ ভগবন্তার সার ও সর্বস্বভূত বিশেষণগুলি বর্ণনামুখে ভক্তির সহিত প্রথমেই নমস্কার করছেন—‘নমামীতি’।

‘নমামি’-শব্দে নমস্কার মঙ্গলার্থ। সমস্ত অতুষ্ঠানের প্রারম্ভেই ইষ্ট-নমস্কারের বিধি আছে। তাতে ভগবানের প্রতি দাস্ত-ভক্তি-বিশেষও প্রকাশ পায়। সেহেতু প্রথমেই তাঁর নমস্কারের নির্দেশ করেছেন।

(প্রথমতঃ টীকার শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী তত্ত্বসম্বন্ধে আলোচনা করছেন)—
কাকে নমস্কার? ঈশ্বরকে। অর্থাৎ যিনি সর্বশক্তিমান (১), জগতের একমাত্র ঈশ্বর (২), অথবা আমার প্রভু (৩),—তাঁহাকে নমস্কার। প্রথমপক্ষে—‘সর্ব-শক্তিমান’—এই বাক্য বলার হেতু স্তুতিশক্তি লাভ। স্তব-স্তুতি যে করব, তার জন্ত শক্তি প্রার্থনা করা হচ্ছে। আমাদের ত’ কোন ক্ষমতা নাই, অধিকার নাই, সেজন্ত ক্ষমতা প্রার্থনা করা হচ্ছে। ভগবানের স্তব-স্তুতি করতে গেলেও তাঁর কৃপা প্রার্থনা করা দরকার, তবে আমরা ঠিক ঠিক স্তব-স্তুতি করতে সক্ষম হই।

দ্বিতীয়পক্ষে—‘জগতের একমাত্র ঈশ্বর’ অর্থাৎ পরম বন্দনীয়তা-জ্ঞাপন; অন্ত্য বা তৃতীয়পক্ষে—‘আমার প্রভু’ ইহার তাৎপর্য—ভক্তিবিশেষ জ্ঞাপন। তিনি কি-প্রকার?—সচ্চিদানন্দ-রূপ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দধন-মূর্তি। এই তত্ত্ব-বিশেষদ্বারা উৎকর্ষ-বিশেষ উক্ত হল।

ঈশ্বর-শব্দ বললে যে কোন ঈশ্বর হতে পারেন। আধিকারিক দেবতাগণকেও ঈশ্বর বলা হয়। কিন্তু পরমেশ্বর বললে অত্ন কোন মানে হয় না, **Supreme Authority**কেই লক্ষ্য করে। পরমেশ্বর-শব্দে তত্ত্ববস্তুর চরম প্রকাশ, যিনি সর্বোপরি মালিক, সর্বশক্তিমান তাঁকেই বুঝায়। আবার বিশ্বনাথ, বিষ্ণেশ্বর, মহেশ্বর-শব্দেরও ব্যবহার আছে। এ-সব শব্দে শিবঠাকুরকে লক্ষ্য করে। শব্দটা শুনলে মনে হবে যে, ‘মহেশ্বর’-শব্দে ভগবানকে লক্ষ্য করা হচ্ছে। কিন্তু মহেশ্বর-শব্দে সাধারণতঃ আমরা সকলে বুঝি শিবঠাকুর। পাছে ভুল বুঝাবুঝি হয় এইজন্ত ঐ একই শব্দের দ্বারা যদি ভগবানকে লক্ষ্য করতে হয় তাহলে একটা ‘মহা’ উপসর্গ লাগাতে হয়। মহামহেশ্বর। তাহলে আর শিবঠাকুরকে লক্ষ্য করবে না। তখন **Supreme Authority**—মূল মালিককেই লক্ষ্য করবে। আবার ‘মহেশ্বর’-শব্দে সর্বশক্তিমান ভগবানকে লক্ষ্য করে। বেদের মধ্যে, উপনিষদের মধ্যেও এরকম শব্দ আছে। কোথায়?—“মায়ান্ত প্রকৃতিং বিত্যান্ময়িনস্ত মহেশ্বরম্”—এই বাক্যে। এখানে কিন্তু শিব-শিবানীকে লক্ষ্য করা হয় নাই। এখানে ‘মহেশ্বর’-শব্দদ্বারা সর্বশক্তিমান ভগবানকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। ‘প্রকৃতি’-শব্দে তাঁরই শক্তি রাধারাণীকে বুঝানো হয়েছে। প্রকৃতিবাদিগণ বলবেন আত্মাশক্তি, আর যারা ঠিক ঠিক উদ্ভদর্শী, তাঁরা বলবেন সর্বশক্তিমতী। সর্বশক্তিমান-শব্দ যেমন কৃষ্ণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তেমনই সমস্ত শক্তির মালিকানি যিনি, তিনি হলেন রাধারাণী। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ক্ষেজে অহৈতুকী ভক্তি বিল্লশৃণু ॥

অন্য ধর্ম সৃষ্টরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৮শ বর্ষ	২০ পদ্মনাভ, কারণোদশায়ী, ৫১০ শ্রীগোরাঙ্গ ৩০ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৪০৩, ইং ১৭/১০/৯৬	৮ম সংখ্যা
----------	---	-----------

সামুবাদং

শ্রীশ্রীমুকুন্দ-মুক্তাবলী

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতা]

দুষ্টি-ধ্বংসঃ কর্ণিকারাবতংসঃ

খেলদ্বংশী-পঞ্চম-ধ্বান-শংসী ।

গোপীচেতঃ-কেলিভঙ্গি-নিকেতঃ

পাতু সৈরী হন্ত বঃ কংস-বৈরী ॥ ২১ ॥

যিনি দুষ্টিধ্বংসকারী, কর্ণিকার-কুসুম ঝাঁহার কর্ণভূষণ, পঞ্চমস্বরে যিনি
বংশীধ্বনি করেন, গোপিকাগণের চিত্তে ঝাঁহার বিলাসাদির নিকেতন, সেই
স্বচ্ছন্দচারী, কংসরিপু—শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২১ ॥

বৃন্দাটব্যং কেলিমানন্দ-নব্যং

কুব্ধমারী-চিত্ত-কন্দর্পধারী ।

নর্মোদগারী মাং দুকূলাপহারী

নীপারুঢ় পাতু বর্হাবচূড়ঃ ॥ ২২ ॥

বৃন্দারণ্যে আনন্দকর বিবিধ লীলাময় যিনি নারীচিত্তে মদনভাব বিস্তার করেন, নর্ম-পরিহাসে তাঁহাদিগের আনন্দ বিধান করেন, গোপীবসনহর ও কদম্ববৃক্ষারুঢ় সেই ময়ূরপুচ্ছধারী শ্রীকৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করুন ॥ ২২ ॥

রুচির-নখে রচয় সখে ! বলিত-রতিং ভজন-ততিম্ ।

ত্বমধিরতিস্থরিত-গতির্নত-শরণে হরি-চরণে ॥ ২৩ ॥

হে সখে ! তুমি সম্বর প্রবল-রতি সহকারে উজ্জল-নখরাজি শোভিত, প্রণত-জন-পরিপালক সেই হরির চরণযুগল অবিরাম ভজনা কর ॥ ২৩ ॥

রুচির-পটঃ পুলিন-নটঃ পশুপ-গতিগুণ-বসতিঃ ।

স মম শুচির্জলদ-রুচির্মনসি পরিফুরতু হরিঃ ॥ ২৪ ॥

মনোজ্ঞ বসনধর, যামুন-পুলিন-বিহারী, গোপগণের একমাত্র গতি, সমস্ত গুণ-গণ-ধাম—আমার একমাত্র পাবনস্বরূপ, সেই নবীননীরদ—শ্রীহরি সদা চিত্তে স্মরিত হউন ॥ ২৪ ॥

কেলি-বিহিত-যমলার্জুন-ভঞ্জন

শূললিত-চরিত-নিখিল-জন-রঞ্জন ।

লোচন-নর্দন-জিত-চল-খঞ্জন

ম্মাং পরিপালয় কালিয়-গঞ্জন ॥ ২৫ ॥

হে কালিয়দমন ! তুমি বাল্য-লীলাচ্ছলেই যমলার্জুনের শাপ-ভঞ্জন করিয়াছ, তোমার এহেন শূললিত চরিত্র নিখিল জন-রঞ্জনকর, তোমার নৃত্যরত নয়নের ভঙ্গিতে চঞ্চল খঞ্জনও পরাভূত হয়, এক্ষণে তুমি ভক্তিরসে আমাকে রূপা করিয়া পরিপালন কর ॥ ২৫ ॥

ভুবন বিম্বস্বর-মহিমাডম্বর !

বিরচিত-নিখিল-খলোৎকর-সম্বর ।

বিতর যশোদা-তনয় ! বরং বর-

মভিলষিতং মে ধৃত-পীতাম্বর ! ॥ ২৬ ॥

হে পীতাম্বর ! তোমার মহিমা ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত, তুমি নিখিল-খল-

নিবারক, হে যশোদাতনয়, আমার অতীষ্ট শ্রেষ্ঠ-বর রূপাপূর্বক আমাকে বিতরণ কর ॥ ২৬ ॥

চিকুর-করস্থিত-চারু-শিখণ্ড
ভাল-বিনির্জিত-বর-শশিখণ্ডম্ ।
রদ-রুচি-নিধুত-মুদ্রিত-কুন্দং
কুরুত বুধা ! হৃদি সপদি মুকুন্দম্ ॥ ২৭ ॥

অতীব সুন্দর ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত ঝাঁহার চূড়া, শুক্লাষ্টমী-সমুদিত অর্দ্ধচন্দ্র ঝাঁহার ললাটচন্দ্রের নিকট পরাভূত, ঝাঁহার দশনকান্তিতে কুন্দমুকুলও তিরস্কৃত হয়, হে পণ্ডিতগণ ! আপনারা সেই মুকুন্দকে শীঘ্র হৃদয়ে ধারণ করুন ॥ ২৭ ॥

যঃ পরিরক্ষিত-সুরভী-লক্ষসুদপি চ সুরভী-মর্দন দক্ষঃ ।

মুরলী-বাদন-ধুরলীশালী স দিশতু কুশলং তব বনমালী ॥ ২৮ ॥

লক্ষ লক্ষ সুরভীর পরিরক্ষক যিনি যুগপৎ সুর-ভী-মর্দনে দক্ষ অর্থাৎ স্বরগণের ভয়-বিনাশক, মুরলীবাদনরূপ শরাভ্যাসে সুনিপুণ, সেই বনমালী শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের কল্যাণ বিধান করুন ॥ ২৮ ॥

রমিত-নিখিল-ডিম্বে বেণু-পীতোষ্ঠ-বিস্বে
হতখল-নিকুরস্বে বল্লবী-দত্ত-চুম্বে ।
ভবতু মহিত-নন্দে তত্র বঃ কেলিকন্দে
জগদবিরল-তুন্দে ভক্তিরুববী মুকুন্দে ॥ ২৯ ॥

নিখিল ব্রজ-বালকের সহিত ক্রীড়ারত ঝাঁহার বিশ্বকল-সদৃশ ওষ্ঠদেশে বেণু নিরন্তর পান করে, পুতনাদি খলকুলনাশন যিনি ব্রজবল্লবীগণ-প্রদত্ত চুম্বনের একমাত্র বিষয়, পিতৃভক্তিবশতঃ যিনি নন্দমহারাজকে পূজা করেন, নিখিল কেলিকন্দ ঝাঁহার উদরাভ্যন্তরে জগদব্রজাণ্ড বিরাজিত, সেই মুকুন্দে তোমাদের উত্তম ভক্তি হউক ॥ ২৯ ॥

পশুপ-যুবতি-গোষ্ঠী-চুম্বিত-শ্রীমদোষ্ঠী
স্মর-তরলিত-দৃষ্টিনিম্বিতানন্দ-বৃষ্টিঃ ।
নব-জলধর-ধামা পাতু বঃ কৃষ্ণ নামা
ভুবন-মধুর-বেশা মালিনী মূর্তিরেষা ॥ ৩০ ॥

ব্রজরমণীগণ ঝাঁহার সুকোমল ওষ্ঠে চুম্বন করিলে যিনি চঞ্চল নয়নে তাঁহাদিগের প্রতি কন্দর্পোদ্দীপ্ত দৃষ্টিদ্বারা আনন্দবৃষ্টি রচনা করেন, নব-নীরদ-কান্তিবিশিষ্ট যিনি জগন্মোহন বেশে সুসজ্জিত, বনমালা শোভিত শ্রীকৃষ্ণনামা সেই শ্রীমূর্তি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৩০ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৯ পৃষ্ঠার পর]

রুচি

১। রাগাঙ্কিকা সেবায় লোভোদয়ের ফল কি ?

“কৃষ্ণ-সেবা, বৈষ্ণব-সেবা ও নামালোচনায় লোভ জন্মিলে আর ইতর লোভ থাকিতে পারে না। ব্রজবাসীদিগের কৃষ্ণসেবা দেখিয়া তাহাতে যে ভাগ্যবান ব্যক্তির লোভ হয়, তিনি সেই লোভের কৃপায় রাগভক্তিতে অধিকার লাভ করেন। যে পরিমাণে রাগাঙ্কিকা-সেবায় লোভ হয়, সেই পরিমাণে ইতর লোভ খর্ব হয়।”
—লৌল্য, সঃ তোঃ ১০।১১

২। রুচি কাহাকে বলে ? আত্মবৃত্তির স্বাভাবিকী রুচির ব্যতিক্রমের চেষ্টায় কি অসুবিধা হয় ?

“প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কাররূপ দ্বিবিধ স্বকৃতিদলিত প্রবৃত্তিকেই ‘রুচি’ বলা যায়। জীবাত্তার এই রুচি নৈসর্গিক। ষাঁহাদের শৃঙ্গার-রসে রুচি নাই, পরন্তু দাস্ত বা সখ্যে আছে, তাঁহারা সেই সেই রসে উপদ্রষ্ট হইবেন, নতুবা অনর্থই ঘটবে। মহাত্মা শ্যামানন্দের সিদ্ধ স্বরুচি প্রথমে পরিজ্ঞাত হয় নাই, এইজন্যই তাঁহাকে সখ্যরসে প্রবেশ করান হইয়াছিল; পরে শ্রীজীবের কৃপায় তাঁহার রুচি-সমেত ভজন লাভ হয়—ইহা লোকপ্রসিদ্ধ আছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে যোগ্যতা ও অধিকারের বিচারই প্রবল।”
—‘ভজন-প্রণালী’, হঃ চিঃ

৩। কাঁহার সন্ধর্শ-প্রবর্তক রুচি জন্মে ?

“ষাঁহার হৃদয় নিগুণ, তাঁহারই ব্রজ-জনের আনুগত্যে রুচি জন্মে; অতএব রাগানুগা-ভক্তিতে লোভ বা রুচিই একমাত্র সন্ধর্শ-প্রবর্তক।”

—জৈঃ ধঃ ২১শ অঃ

৪। শুদ্ধভক্তিতে রুচির উদয়ে কৃষ্ণের বিষয়ে অরুচি হয় কি ?

“গৃহ, দ্রব্য, শিশু, পশু, বাণ্য-আদি ধন।

স্ত্রী-পুত্র, দাস-দাসী, কুটুম্বাদি জন ॥

কাব্য-অলঙ্কার আদি সুন্দরী কবিতা।

পাণ্ডিত্য-বিষয় মধ্যে এসব বারতা ॥

এইসব পাইবার আশা নাহি করি।

শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি ॥”

—ভঃ রঃ চতুর্থ যামসাধন, ‘রুচিভজন’

৫। নামে রুচির উদয় হইলে কি প্রতিষ্ঠাদিতে রুচি থাকে ?

“বহু শিষ্য-লোভেতে অযোগ্য শিষ্য করে ।

ভক্তিশূন্য শাস্ত্রাভ্যাসে তর্ক করি’ মরে ॥

ব্যাখ্যাবাদ-বহ্নাড়ন্তে বৃথা কাল যায় ।

নামে যার রুচি, সেই এ-সব না চায় ॥”

—ভঃ রঃ চতুর্থ যামসাধন, ‘রুচিভজন’

৬। রুচির সহিত ভজন কিরূপ ?

“অনন্ত ভাবেতে কর শ্রবণ-কীর্তন ।

নাম-রূপ-গুণ-ধ্যান কৃষ্ণ-আরাধন ॥

সঙ্গে সঙ্গে অনর্থ নাশের যত্ন কর ।

ভক্তিসত্তা ফল দান করিবে সত্ত্বর ॥”

—ভঃ রঃ চতুর্থ যামসাধন, ‘রুচিভজন’

৭। ভগবৎসেবায় রুচি থাকিলে কি কখনও প্রাকৃত বিষয়ে শোক-মোহাদি থাকে ?

“পুত্র-কলত্রের শোক, ক্রোধ, অভিমান ।

যে হৃদয়ে, তাহে কৃষ্ণ স্মৃতি নাহি পান ॥”

—ভঃ রঃ চতুর্থ যামসাধন, ‘রুচিভজন’

৮। ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণপদসেবার রুচি কিরূপ ?

“এই ব্রহ্মজন্মেই বা অত্ন কোন ভবে ।

পশু-পক্ষী হয়ে’ জন্মি তোমার বিভবে ॥

এইমাত্র আশা তব ভক্তগণ-সঙ্গে ।

থাকি তব পদসেবা করি নানা রঙ্গে ॥”

—ভঃ রঃ চতুর্থ যামসাধন, ‘রুচিভজন’

৯। কৃষ্ণ-গুণগান-শ্রবণে রুচি কিরূপ ?

“যাহাতে তোমার পদসেবা-স্বথ নাই ।

সেইরূপ বর আমি কভু নাহি চাই ॥

ভক্তের হৃদয় হৈতে তব গুণ-গান ।

শুনিতে অযুত কণ করহ বিধান ॥”

—ভঃ রঃ চতুর্থ যামসাধন, ‘রুচিভজন’

আসক্তি

১। ‘আসক্তি’ কাহাকে বলে ?

“কুচির গাঢ়তর অবস্থার নাম—আসক্তি।”

—চৈঃ শিঃ ৫।২

২। কৃষ্ণাসক্তিতে প্রার্থনীয় কি ?

“তব দাস্ত-আশে ছাড়িয়াছি ঘরদ্বার।

দয়া করি’ দেহ’ কৃষ্ণ ! চরণ তোমার ॥

তব হাস্তমুখ-নিরীক্ষণ-কামি-জনে।

তোমার কৈঙ্কর্য দেহ’ প্রফুল্ল-বদনে ॥”

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, ‘কৃষ্ণাসক্তি’

৩। কৃষ্ণাসক্ত-জনের জীবনযাত্রা কিরূপ ?

“তোমার প্রসাদ-মালা, গন্ধ, অলঙ্কার।

বস্ত্রাদি পরিয়া দিন যায় ত’ আমার ॥

তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস-পরিচয়ে।

তব মায়া জয় করি’ অনাসক্ত হ’য়ে ॥”

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, ‘কৃষ্ণাসক্তি’

৪। কৃষ্ণাসক্তের আর্তি কিরূপ ?

“তুমি—প্রিয় আত্মা, নিত্য রতির ভাজন।

আর্তি-দাতা পতি-পুত্রে রতি অকারণ ॥

বড় আশা করি’ আইলু তোমার চরণে।

কমলনয়ন ! হের প্রসন্ন-বদনে ॥”

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, ‘কৃষ্ণাসক্তি’

৫। আশ্রয়-বিগ্রহের কৈঙ্কর্যে আসক্তি ব্যতীত কৃষ্ণাসক্তি সম্ভব কি ?

“রাধাপদান্তোজরেণু নাহি আরাধিলে।

তঁহার পদাঙ্কপূত ব্রজ না ভজিলে ॥

না সেবিলে রাধিকা গম্ভীরভাবভক্ত।

শ্রামসিকুরসে কিসে হ’বে অনুরক্ত ?”

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, ‘কৃষ্ণাসক্তি’

৬। কৃষ্ণাসক্তিতে কোন্ রসে ভজন-লালসা উদিত হয় ?

“স্থূল-দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিহরি।

কৃষ্ণকুপাশ্রয়ে নিত্য গোপীদেহ ধরি’ ॥

কবে আমি পারকীয়-রসে নিরন্তর।

রাধাকৃষ্ণ-সেবাস্থ লভিব বিস্তর ॥”

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, ‘কৃষ্ণাসক্তি’

৭। কৃষ্ণাসক্ত-জনগণ কি চতুর্কর্গের প্রার্থী? তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য কি?

“স্বজন-সম্বন্ধ-স্বথ, চতুর্কর্গ, অর্থ ।
সকল সাধন ছাড়ি’ জানিয়া অনর্থ ॥
সহজ অদ্ভুত সৌখ্য-ধারা-বৃষ্টি করি’ ।
রাধাপদরেণু ভজি শিরে সদা ধরি’ ॥”

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, ‘কৃষ্ণাসক্তি’

৮। কৃষ্ণাসক্ত জনের আশাবন্ধ কি?

“বৃষভানুকুমারীর হইব কিঙ্করী ।
কলিন্দনন্দিনী-তীরে র’ব বাস করি’ ॥
করণা করিয়া রাধে ! এ দাসের প্রতি ।
বৃন্দাটবী কুঞ্জপথে হইবে অতিথি ॥”

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, ‘কৃষ্ণাসক্তি’

৯। কৃষ্ণাসক্তের অনুক্ষণ অনুশীলনীয় সাধন ও সাধ্য কি?

“নিরন্তর কৃষ্ণাধ্যান, তন্মামকীর্তন ।
কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা তন্মন্ত্র-জপন ॥
রাধাপদ-দাস্যমাত্র অভীষ্ট-চিন্তন ।
কৃপায় লভিব রাধা-রাগানুভাবন ॥”

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, ‘কৃষ্ণাসক্তি’

১০। কৃষ্ণাসক্তের একমাত্র অভীষ্ট কি?

“অপার রসের সার বিলাস-মুরতি ।
পরম-অদ্ভুত সৌখ্য আনন্দ নিবৃতি ॥
ব্রহ্মাদির সুহৃৎ ভ বৃষভানু-কণা ।
জন্মে-জন্মে তাঁর দাস্ত্রে হই যেন ধন্যা ॥”

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, ‘কৃষ্ণাসক্তি’

১১। কৃষ্ণাসক্ত-জন সর্বোদ্রিগে কি অনুশীলন করেন?

“জিহ্বা হউক সুবিহ্বল রাধানাম-গানে ।
বৃন্দারণ্যে চল পদ, রাধা-অশ্বেষণে ॥
রাধাসেবা কর কর, রাধা স্মর মনে ।
রাধাভাবে মাতি’ ভজ রাধাপ্রাণধনে ॥”

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, ‘কৃষ্ণাসক্তি’

১২। কৃষ্ণাসক্ত-জন কি আশ্রয়-বিগ্রহের সখীত্ব কামনা করেন?—না, দাস্ত্র কামনা করেন?

“তব পদ-দাস্ত্র বিনা কিছু নাহি মাগি।

তব সখে নমস্কার, আছি দাস্ত্র লাগি”।”

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, ‘কৃষ্ণাসক্তি’

১৩। কৃষ্ণাসক্ত-জনের আশ্রয়-বিগ্রহের নিকট প্রার্থনা কি?

“ভূমে দণ্ডবৎ পড়ি বহু আর্তিস্বরে।

কাকুভরে গদগদ-বচনে জোড়করে ॥

প্রার্থনা করি গো দেবি! এ অবোধ-জনে।

তব গণে গণি’ কৃপা কর অকিঞ্চনে ॥”

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, ‘কৃষ্ণাসক্তি’

১৪। কৃষ্ণাসক্ত-জনের আশ্রয়-বিগ্রহের কৈঙ্কর্যে অধিকতর আসক্তি বা তদীয়-পক্ষপাতিত্ব কেন?

“ঘাঁহার কটাক্ষ-শরে শ্রীকৃষ্ণ মুচ্ছিত।

কর হৈতে বাঁশী থমে, শিখণ্ড স্থলিত ॥

পীতবস্ত্র ভষ্ট হয়, সে রাধা-চরণ।

কবে আমি রসযোগে করিব সেবন ॥”

—ভঃ রঃ পঞ্চম যামসাধন, ‘কৃষ্ণাসক্তি’

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

ভগবান্ অথগু পরিপূর্ণ অধোক্ষজ সর্বশক্তিমান্ পরাংপর পরমেশ্বর সর্বতত্ত্ব-স্বতন্ত্র স্বরাট্ বাস্তব বস্তু। তাঁহাতে ‘অভাব’ বলিয়া কোন বিচার নাই। তাঁহার পাদপদ্মে শরণাপন্ন হইলে তিনি আমাদিগকে অপূর্ণ মনোরথ করিয়া প্রত্যাখান করিবেন না। আমাদের অভাব পরিপূরণের, সর্বতোভাবে আশ্রয়দানের ক্ষমতা নাই—এ প্রকার সন্দেহ নিতান্ত অমূলক। তিনি আমাদিগকে তাঁহার অমন্দোদয়া দয়া-বিতরণে এ প্রকার সমৃদ্ধ করিতে পারেন, যাহাতে আমাদের প্রাকৃত অভাব-বোধের কারণ পর্যন্ত নিত্যকালের জগু অন্তমিত হইতে পারে এবং তাঁহার সেবা করিয়াও কিছু করিতে পারিলাম না, তাঁহাতে আমার বিন্দুমাত্রও প্রেমোদয় হইল

না—এই প্রকার একটা অমূল্য অপ্রাকৃত অভাব বা অতৃপ্তি-নামক সম্পদ লাভ হইবে। তখন তাঁহার নাম-রূপ-গুণাদির অনুশীলন ‘একঘেষে’, ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যরূপ অন্ধকারময়—তাঁহার কাছে আসিয়া ঠকিয়াই গেলাম—ইত্যাকার অনুশোচনার কারণ থাকিবে না। তখন “আনন্দাশ্রুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্” বিচার আসিয়া যাইবে—শ্রীনাম-সকীর্্তনের বিজয়বৈজয়ন্তী সর্বোপরি বিরাজ করিতে থাকিবেন। ‘কৃতজ্ঞ’—‘সমর্থ’—‘মহাবদাণ্ড’ প্রভু আমাদের কখনও নিরাশার সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবেন না।

জীব দেহ নহে, জীব আত্মা ; জীব জড় নহে, জীব চেতন। আত্মা পরমাত্মার দর্শন পায়, উহার সহিত কথা বলিতে পারে। আত্মাই আত্মাকে দর্শন করে। বিবেকরহিত ব্যক্তিগণ অনাত্ম-বিচারে প্রতিষ্ঠিত। সেবা-বৈমুখ্যের তারতম্যানুসারে তাহাদের মন ও দেহের পরিবর্তন। জীব যথার্থ সৎগুরুর আনুগত্যে ভজন-রাজ্যে চরমোন্নতি লাভ করিতে পারে। হরি-সেবা-ফলে প্রাকৃত অভিমানরহিত হইলে জীবের গোলোক-প্রাপ্তি হয়। জীব কৃষ্ণের ভেদাংশ হইলেও জাগতিক ভেদাংশ নহে। জীব নিকপট সেবাফলে মুক্তগণের, এমন কি, নিত্যমুক্তকুলের সমপর্যায়ভুক্ত হইতে পারেন। তখন এই সংসারের কথা মনে থাকে না। কৃষ্ণ প্রেমময়। তিনি সকলকেই প্রীতির সহিত আকর্ষণ করেন। তিনি আমাদের সেবা পাইলে আনন্দিত হন। অধোক্ষজ কৃষ্ণের নিরন্তর স্মৃতিষণা ব্যতীত আমাদের আর কোন কার্য নাই। কৃষ্ণের নামের ভজনে ক্রমে রূপের, গুণের, পরিকরণের ও লীলার সেবা পাওয়া যাইবে। শ্রীনামভজনেই সর্বসিদ্ধি। শ্রীনামের ভজন ব্যতীত নামীর ভজন হয় না। ইহজগতে নানা-প্রকার শব্দ আমাদের কর্ণে ঝঙ্কত হইতেছে, তাহা অপসারিত করিয়া কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিতে হইবে।

অধোক্ষজ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা লব্ধ জ্ঞানের অতীত বস্তু। শ্রীবিষ্মতে ভক্তি অহুষ্ঠিত হইলে অনর্থ বিনষ্ট হয়। অনর্থের প্রভাবেই শোক, মোহ ও ভয়ের উৎপত্তি। শ্রীবেদব্যাস ঐ সকল অনর্থে আক্রান্ত জনগণের মঙ্গলের জন্তই অনর্থ ত্যাগপূর্ব্বক পরমার্থ-গ্রহণের সুযোগ দিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-নামক সাস্তুত-সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পরমহংস-সংহিতা-শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে ভক্তির উদয় হয়। সেই ভক্তির আভাসেই শোক, মোহ ও ভয় বিদূরিত হইয়া থাকে।

VOX POPULI, VOX DEI

(The voice of the people is the voice of God.)

বহু লোকের বা অধিকাংশ লোকের রায়ই সত্য বা গ্রাহ্য হওয়া উচিত—ইহাই বর্তমান ভারতের বিচার। অধিকসংখ্যক মানুষের যাহা বিচার তাহাই কার্যকরী করাকে ভোট (Vote) বলে। বর্তমানে এই ভোটতত্ত্বই পৃথিবীতে প্রচলিত হইয়াছে। যাহার মতের সমর্থক-সংখ্যা অল্প পক্ষ হইতে কম হইবে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। এই পদ্ধতি সত্যকে জানাইতে বা সত্যকে লাভ করিতে কতদূর সমর্থ তাহাই বিচার্য বিষয়।

আলো ও অন্ধকার যেরূপ সম্বন্ধিত তত্ত্ব, সত্য ও মিথ্যা তদ্রূপ সম্বন্ধিত। যাহা সত্য তাহা কখনও মিথ্যা, বা যাহা মিথ্যা তাহা কখনও সত্য হইতে পারে না। সত্য এবং মিথ্যাতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মতও তদ্রূপ সত্য অথবা মিথ্যা অবশ্যজ্ঞাবী হইবে। যাহারা সত্যকে জানে না, তাহারা অন্ধকে সত্য কিরূপে জানাইবে? তাহারা সত্য-সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবে তাহা মিথ্যা ব্যতীত কখনও সত্য হইতে পারে না।—ইহাই বেদ-পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রে উপদিষ্ট রহিয়াছে।—

অবিজ্ঞায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মতমানাঃ ।

দ্রুতম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাক্কাঃ ॥

(কণ্ঠ ১২।৫)

যাহারা অবিজ্ঞার মধ্যে থাকিয়া আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে সেই কুটিল-স্বভাববিশিষ্ট অবিবেকিগণ দুর্গমপথে অন্ধগণের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায় অধঃপতিত হয়।

পিতা হিরণ্যকশিপুকে শ্রীশ্রুত্বাদ বলিয়াছেন,—

মতি ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোহভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ।

অদাস্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চবিতচৰ্ৰ্ণানাম্ ॥

ন তে বিহুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দূরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ ।

অন্ধা যথাকৈরুপনীয়মানাস্তেহপীশতন্ত্র্যামুরুদান্নি বন্ধাঃ ॥

নৈবাং মতিস্তাবহুরুক্রমাজ্জিহ্বং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।

মহীয়সাং পাদরজোহভিষেকং নিক্ষিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

(ভাঃ ৭।৫।৩০-৩২)

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বলিলেন—তুই যে আমার শ্রবণ-কীর্তনাদি—
বিষ্ণুভক্তির কথা বলিতেছিস, তাহা ষণ্ডামৰ্ক-গুরুদ্বয় ব্যতীত অন্য কেহ তোকে
নিশ্চয়ই শিক্ষা দেয় নাই। এতদুত্তরে প্রহ্লাদ বলিলেন,—তোমার নিযুক্ত ষণ্ডামৰ্ক
—গুক্রাচার্য্যপুত্রদ্বয় বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা নিজে উহা
আচরণ করেন নাই। আচরণহীন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির মুখনির্গত শাস্ত্রবাক্যদ্বারা কোন
বদ্ধজীব কৃষ্ণোন্মুখ হয় না।

আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে।

আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়।

এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায় ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩২১)

যদ্যচরতি শ্রেষ্ঠস্তদেবেতরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ (গীঃ ৩২১)

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কেবল শাস্ত্রবাক্য উল্লেখ করিলেই তাহা শ্রোতার মনকে ভগবানে
আসক্ত করে না, পরন্তু ঐ শাস্ত্রবাক্য নিজে আচরণ করত বদ্ধজীবকে উপদেশ
করিলে তাহা কার্য্যকরী হয়, আচরণহীন ব্যক্তির শাস্ত্রোপদেশ কাহাকেও ভক্তিতে
প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না।

যাহারা গৃহব্রত অর্থাৎ ঘোষিৎসঙ্গী হইয়া গৃহিণী ও বিষয়ে আসক্ত এবং
অজ্ঞিতেন্দ্রিয়, তাহাদের মুখোচ্চারিত শাস্ত্রবাক্য কোনও বদ্ধজীবের মনকে কৃষ্ণপদে
নিযুক্ত করিতে পারে না। তাহারা নিজদের গুরু বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া
অন্যকে শিষ্য করিলেও, যেহেতু নিজেরা আচরণবিহীন, গোস্বামী না হইয়া গোদাস-
রূপে অনাদিকাল ইন্দ্রিয়তর্পণরত থাকিয়া অন্ধ শিষ্যের অন্ধ গুরুরূপে তমিশ্র-নামক
নরকে অধঃপতিত হয়। তাহারা প্রকৃত গুরুরূপে শিষ্যকে মায়া হইতে উদ্ধার ও
কৃষ্ণপদে আসক্ত করিতে সক্ষম হয় না। কেবল শাস্ত্রবাক্য মুখে উপদেশ করিলেই
আচার্য্য হওয়া যায় না, পরন্তু আচরণশীল হওয়া একান্ত আবশ্যক। তোমার
গুরুপুত্রদ্বয় সেইরূপ আচরণশীল শাস্ত্রজ্ঞ নহে। তাহাদের উপদেশে আমার মন
কৃষ্ণপদে আসক্ত হয় নাই। বদ্ধজীব যতদিন পর্য্যন্ত না নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ
মায়িক রূপ-রসাদি বিষয়ে অনাসক্ত মহৎ ব্যক্তির অর্থাৎ যিনি সকলের সুহৃৎ,
ভগবন্নিষ্ঠতাহেতু একাদশ ইন্দ্রিয়জয়ী, অক্রোধী এবং জাগতিক সুখ-দুঃখে অনভিভূত
ও পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের ভক্তিরূপ পরম মঙ্গল প্রদানে রত প্রকৃত
মহতের সঙ্গ ও কৃপা লাভ করে, ততদিন কাহারও মনাদি কৃষ্ণপদে আসক্ত
হয় না। আমি মাতৃজঠরে অবস্থান করিয়াও এতাদৃশ মহৎ শ্রীনারদ ঋষির
কৃপায় তাঁহার উপদেশরূপ মন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াছি। আমার এই ভগবন্তক্তির
গুরু তোমার ষণ্ডামৰ্ক-নামক গুরুপুত্রদ্বয় নহে।

“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস”—যে-সকল মনুষ্য বা জীব ইহা জ্ঞাত নহে, উপদিষ্ট হইলেও তাহাতে বিশ্বাস করিতে সক্ষম নহে, তাহারা মায়ামুগ্ধ ও মায়া বা মিথ্যা অভিনিবেশ হেতু নিজকে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি নানা মিথ্যা পরিচয় প্রদান করে। কৃষ্ণদাসরূপ বাস্তব সত্যকেও তাহারা মিথ্যা বিচার করিয়া অনাদর এবং বিরোধিতা করিতে দ্বিধাবোধ করে না। এমনকি, এই সুসত্যকে মিথ্যা ও ক্ষতিকারক জ্ঞান করত মায়িক তামসিক একাকারকে ত্রিগুণাতীত ও নিত্যসত্য ঐক্য বলিয়া স্থাপন করিতে মরিয়া হইয়া উঠে। নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণতত্ত্ব ও নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণদাস্ত্র যে একমাত্র সত্য, অগ্ৰাণ্য অভিমান যে সনাতন নহে, তাহারা মায়িক কালের বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত, তাহা মায়ায় অভিভূত মনুষ্য ধারণা করিতে অক্ষম। নিত্যবস্তুর স্বভাবই তাহার নিত্য ধর্ম—ইহা বুঝিতে অক্ষম হইয়া ‘ধর্ম’ শব্দটি শুনিবামাত্র তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। স্বভাবই ধর্ম; দেহীমাত্রেরই কৃষ্ণদাস, দেহী মায়াবদ্ধ হইয়া যখন তাহার কৃষ্ণদাস পরিচয়কে বিস্মৃত হয়, তখনই সে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি মিথ্যা পরিচয় প্রদান করে।—

“পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।

মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয় ॥

‘আমি নিত্য কৃষ্ণদাস’—এই কথা ভুলে।

মায়ার নক্ষর হঞা চিরদিন বলে ॥”

বর্তমান School, College এবং University-তে যে-ভাবে বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, তাহা প্রকৃত এবং উন্নত শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীগণ সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। ‘অল্লবিজ্ঞা ভয়ঙ্করী’রূপে বিজ্ঞানের অধিকাংশ প্রাথমিক ছাত্রদিগকে বলিতে শুনা যায়—‘যাহা আমরা দেখিতে পাই না বা যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, তাহাকে আমরা স্বীকার করি না।’—ইহা যে কতদূর কুশিক্ষা তাহা প্রথমে তাহারা স্বীকার করে না, ক্রমশঃ অধিকার উন্নত হইলে, তাহাদের এই ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করে। পিতা সন্তানের জন্মদাতা, পিতাকে জন্মদান করিতে কোন সন্তান দেখে না বলিয়া কোন সন্তান তাহার জন্মদাতা পিতাকে অস্বীকার করে কি?

প্রকৃত দার্শনিক বা সত্যদ্রষ্টাগণ দশপ্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণকে স্বীকার করিলেও তাহাতে গুরুত্ব প্রদান না করিয়া শব্দ অর্থাৎ অপৌরুষেয় বাণী বেদ ও তদনুগত বাক্যকেই মূল প্রমাণ বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের অনেকেই ভারতীয় উপনিষদকে বাস্তব সত্য বলিয়া সর্বোচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

যাবতীয় শরীরমধ্যে যে বস্তুটি প্রধানরূপে অবস্থান করে, যাহার অবর্তমানতায় দেব-মহুগ্ৰাদি শ্রেষ্ঠ শরীরও মূল্যহীন, অস্পৃশ্য ও অপবিত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, তাহাকে জড়বৈজ্ঞানিকগণ আজ পর্য্যন্ত দেখিতে ও সম্যক্ বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। পরন্তু কোন বৈজ্ঞানিকই তাহার অস্তিত্ব বা বর্তমানতা অস্বীকার করেন না। সেই অতি সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য বস্তুটিই যাবতীয় জড়পদার্থের অবলম্বন। তাহার অবলম্বন ব্যতীত এই প্রাকৃত বৈচিত্র্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়। পরমসত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগে ইহাই গান করিয়াছেন,—

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

অপরেয়মিতস্বচ্ছাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ (গীঃ ৭।৪-৫)

বিজ্ঞানী বলিতে সাধারণতঃ জড়াপ্রকৃতির অনুশীলকদের বুঝায়। এই জড়া প্রকৃতিকে অপরা অর্থাৎ অশ্রেষ্ঠা প্রকৃতি বা শক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করিয়াছেন। এই শক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা অনন্তশক্তির ধারণা জড়বিজ্ঞানীগণ রাখেন না। ভারতীয় ঋষিগণ সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠা শক্তির ধারণা ও মহত্ববিষয়ে সম্যক্ অবগত ছিলেন। পরম সত্যের পরাশক্তির নানাত্ব উল্লিখিত হইলেও গীতার সেই শ্রেষ্ঠা শক্তিদিগের বিশেষ আলোচনা অর্জুন ও তদপেক্ষা হীন অধিকারীদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ করেন নাই। কেবলমাত্র জীবশক্তিকেই গীতায় সামান্যভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে পরাশক্তিগণের আলোচনা থাকিলেও অনধিকারী বদ্ধজীব তাহাকে মায়িক ব্যতীত তাহার যথার্থ ধারণা করিতে অক্ষম। শ্রীকৃষ্ণ জীবশক্তির একটী সামান্য বিশেষত্ব “যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ” বলিয়াছেন। এই জড়জগৎ সেই জীবশক্তি ব্যতীত প্রকাশিত থাকিতে পারে না। স্থাবর-জঙ্গমাди সকল শরীরই সেই জীবশক্তির সঙ্গচ্যুত হইলে নাশ বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেই জীবশক্তিই জীবাত্মা। তাহা জড়াশক্তির পরিণামভূত বস্তু নহে বলিয়া তাহাকে চক্ষুরাদিদ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না। জড়বিজ্ঞানী তাহার স্বরূপ, স্বভাব বা ধর্ম্মকে ধারণা ও বর্ণনা করিতে সক্ষম নহে। সেই শক্তির স্বভাব বা ধর্ম্মকে আত্মধর্ম্ম, সনাতনধর্ম্ম বা চিদ্ধিজ্ঞান কহে। তাহাতে দেহমনের স্বভাব আলোচিত না হইয়া চিদাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ, নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে জীবাত্মার স্বভাব যে কৃষ্ণদাস্ত তাহাই অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। কৃষ্ণতত্ত্বও মায়িক ধারণার বিষয় নহে। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। জড়বিজ্ঞানে সচ্চিদানন্দ তত্ত্বের কোন ধারণা নাই।

জড়বিজ্ঞাবুদ্ধিদ্বারা তাঁহাকে জানিতে গিয়া জড়বৈজ্ঞানিকগণ অবধারণা ব্যক্ত করে। ইহা পরমসত্যের স্বমুখ-নিঃসৃত বাণী,—

অবজানন্তি মাং মৃঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ (গীঃ ৭।১১)

সেই পরমসত্যকে জড়বিজ্ঞানী তাহার সর্বভূত মহেশ্বররূপ পরম স্বভাব বা গুণ ও ক্ষমতাকে জানিতে অক্ষম হইয়া তাঁহাকেও প্রাকৃত মনুষ্য বলিয়া তাঁহার প্রতি অবধারণা বা অত্যন্ত হীন ধারণা প্রকাশ করে। তাঁহাতে কিছু কিছু গুণাধিক্য স্বীকার করিলেও, তাহা তাঁহার সম্যক ধারণার অতি তুচ্ছ ছায়াস্বরূপ কাল্পনিক। তাঁহার অপ্রাকৃত শরীরকেও প্রাকৃত মনুষ্যশরীরের ধর্মযুক্ত নশ্বর ও জন্মমৃত্যুর অধীন জ্ঞান করে। তাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদির সীমাহীনতা বা আনন্ত্য ও অবিনশ্বরত্ব বুঝিতে গিয়া তাঁহাকে জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ বস্তুর অগ্রতম বলিয়া ধারণা করে। সৃষ্টিকর্তা চতুর্মুখ ব্রহ্মা তাঁহাকে জানিবার অক্ষমতা নিজমুখে প্রকাশ করিয়াছেন।—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবান্ পরান্

যোগেশ্বরোতীর্ভবতপ্তিলোক্যাম্ ।

ক বা কথং বা কতি বা কদেতি

বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।২১)

জানন্তু এব জানন্তু কিং বহুভ্যা ন মে প্রভো ।

মনসো বপুসো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩৮)

শ্বেতবরাহকল্পে বৈবস্বত মহন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের দ্বাপরের অন্ত্যভাগে শ্রীকৃষ্ণ যখন অঘাসুরকে মস্তক বিদীর্ণ করত বিনাশ করিয়াছিলেন, তখন অঘাসুরের আত্মা তাহার স্পর্শরীর হইতে নিক্ষেপ্ত হইয়া আকাশে জ্যোতিরূপে অপেক্ষারত ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখা ও বৎসগণসহ অঘাসুরের শরীর হইতে বহিরাগমন করিলে অঘাসুরের আত্মা শ্রীকৃষ্ণচরণে বলীন হইয়াছিল। হংসারূঢ় ব্রহ্মা আকাশ হইতে ইহা দর্শন করত আশ্চর্যান্বিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে সম্যকভাবে অবগত হইতে পারেন নাই। নন্দগোপপুত্র বালকটির আরও অলৌকিক ক্ষমতা আছে কিনা তাহা দর্শন করিবার জন্য সখাগণ পরিবৃত্ত শ্রীকৃষ্ণের ভোজনকালে তাঁহাদের বৎসগুলিকে ব্রহ্মা অপহরণ করিয়া লুপ্তায়িত রাখিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে যে পরিমাণ কৃপা করত স্বীয় তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা অনুভূত হওয়ায় ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে তখন ঈড্য বলিয়া সম্বোধনপূর্বক নিজসৃষ্ট মনুষ্য বলিয়া বিচার পরিত্যাগ করত তাঁহাকে পরমপূজ্যজ্ঞানে বারম্বার দণ্ডবৎ-প্রণাম করিতে লাগিলেন ও এতাবৎকাল তাঁহাকে প্রণাম না করা জনিত নিজকৃত অপরাধ

ক্ষালন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে বর্তমানের অনুভূত জ্ঞান প্রকাশ করিতেছেন। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে ভূমন্, ভগবন্, পরমাত্মন্ ও যোগেশ্বর—এই চারিটা পদে সম্বোধন করত তাঁহার অনুভব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ চারিটা সম্বোধন পদও কৃষ্ণতত্ত্বের অতি অকিঞ্চিংকর মহিমাভাজক বলিলেন। তাঁহার অনন্ত মহিমা কেহই প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে—ইহা ব্যক্ত করেন। কৃষ্ণ কোথায়, কি কারণে, কত প্রকার এবং কোন্ সময়ে নিজশক্তি যোগমায়াতে অবলম্বন করত যে লীলা বিস্তার করেন, তাহা কেহই জানিতে সক্ষম নহে—ইহাই তাঁহার অনুভব প্রকাশ করিলেন। কেহ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব জানি বলিলেও তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে নারাজ, তবে তর্ক হইতে বিরত থাকিবার জন্ত তিনি নিজে যে কায়মনোবাক্যের দ্বারা জানিতে সক্ষম নহেন, তাহাই বলিলেন। বস্তুতঃপক্ষে তিনি সকলেরই অজ্ঞেয়। ব্রহ্মার এই উক্তি অতিরঞ্জিত বা অবিশ্বাস্য নহে। শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীবলদেব এক বৎসর যাবৎ বৎস ও সথারূপী কৃষ্ণের সহিত প্রত্যহ গোচারণলীলা করিয়াও তাঁহাকে জানিতে সক্ষম হন নাই—ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ হেন চরম সত্য তত্ত্বকে আমাদের জড়-বৈজ্ঞানিকগণ যে জানিতে অক্ষম, তাহা বলাই নিম্প্রয়োজন। তাঁহারা ও তাঁহাদের ছাত্রবৃন্দ এই কৃষ্ণতত্ত্বকে মনুষ্য বাতীত তাঁহাকে “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গৌবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।”—বলিয়া জ্ঞান করেন না। ইহা পরম সত্য হইলেও দেশবাসীর ভোটে ইহা সমর্থিত হইবে না।

পরন্তু এই সত্যকে জানিবার জন্ত শাস্ত্রের নির্দেশ—“তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।” অর্থাৎ পরম সত্যকে জানিবার জন্ত সত্যদ্রষ্টা ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির বিচারকেই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ সত্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকেই গুরুতত্ত্ব বলা হইয়াছে। শ্রীগুরুদেব মায়ামুক্ত, সত্যদ্রষ্টা ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত। মিথ্যাশ্রয়ী কোটি কোটি লোকের মতকে অগ্রাহ্য করত এইরূপ সত্যদ্রষ্টা একজন হইলেও তাঁহার মতই গ্রাহ্য, কারণ তাহাই সত্য। বস্তু বস্তু বা পাহাড়-প্রমাণ ভ্রমকে পরিত্যাগ করত বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেমন সর্ষপ পরিমাণ স্বর্ণখণ্ডকে সমাদর করেন, তদ্রূপ অজ্ঞ, মূর্খ, মিথ্যাশ্রয়ী সংখ্যায় বহু হইলেও তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া সত্যশ্রয়ী একজন ব্যক্তিই গ্রাহ্য ও আদরণীয়।

মায়ামুক্ত মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গুলি ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা দোষচতুষ্টয়ে দুষ্ট থাকায় তাহার প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া বহুক্ষেত্রেই মিথ্যা হয়। চক্ষুদ্বারা সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াও সে রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করে। অতএব বস্তুতে মন নিবিষ্ট থাকিলে সম্মুখস্থ বস্তু বা নিকটস্থ শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না, ইহা তাহার প্রমাদরূপ দোষ। অসীম আকাশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও গ্রহ-নক্ষত্রাদি সর্বদা অবস্থিত থাকিলেও,

তাহাদের কয়টি সে দেখিতে পায় ? সমগ্র বিশ্বে অবিরত কত না কত শব্দ ধ্বনিত হইতেছে, সে তাহার কয়টি শুনিতে পায় ? ইহা তাহার করণাপাটবদোষ । চতুর্থ-প্রকার দোষটি বন্ধজীবের স্বভঃসিদ্ধ । সে নিজকে এবং অপরকে বঞ্চনাপূর্বক বৃথা মিথ্যা উক্তি করে ; ইহাকে বিপ্রলিপ্সা দোষ বলে । সত্যদ্রষ্টা বা শ্রীগুরুতত্ত্বে এই দোষ চতুষ্টয় থাকে না বলিয়া তাঁহার বিচার বা মতই সত্য । মায়াবন্ধ জীব ভোগাসক্ত বলিয়া অধোগামী হয় । তাহার বিচার গ্রহণ করিলে তাহারও অধঃপতন অনিবার্য্য ।

অতএব যাঁহারা ভোগী নহেন, সত্যদ্রষ্টা ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ ঋষিকুল বন্ধজীবের মঙ্গলের জন্ত শাস্ত্রে যাহা উপদেশ করিয়াছেন তাহা অদ্রাস্ত সত্য ও মঙ্গলজনক । এই হেতু শাস্ত্রে বর্ণিত বা উল্লিখিত ভগবান্কেই ভগবান্ বলা উচিত । মায়াবন্ধ অধিকাংশ ভ্রম-প্রমাদাদিহুঁষ্ট ভোগবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তিদের কল্পিত অনুমোদিত কাহাকেও ভগবান্ বলিলে তাহা সত্য হইবে না । সত্যই প্রকৃত ধর্ম, সত্যবজ্জিত বিচার অধর্ম বা মিথ্যা । গীতাশাস্ত্রে ইহাই উক্ত হইয়াছে,—“তস্মাচ্ছাস্তং প্রমাণন্তে” । শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ । অনাদিরাদির্গৌবিন্দ সর্বকারণ-কারণম্ ॥” কৃষ্ণই পরমেশ্বর ও মূল কারণ এবং নিত্য সত্য আনন্দময় তত্ত্ব । ইহা বন্ধজীবের ভোটে সাব্যস্ত নহে । বন্ধজীবের ভোটাধিক্যে সাব্যস্ত মিথ্যাতত্ত্বকে সত্য বা ভগবান্ বলা উচিত নহে । ইহাই বাস্তব বিজ্ঞান ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্মুক্তিবেন্দাস্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

সদাচার ও কদাচার

ইহ জগতে প্রত্যেক মানবই সদাচার বা কদাচারের কোন না কোনটিতে অবশ্যই লিপ্ত রহিয়াছে । আচারের তারতম্যের জন্ত তাহাদের ফলের তারতম্যও পরিলক্ষিত হয় । সাধুগণের আচারই ‘সদাচার’ আখ্যায় আখ্যায়িত । শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসের ৩৮ শ্লোকে উল্লেখ রহিয়াছে, “সাধবঃ ক্ষীণদোষান্ত সচ্ছন্দঃ সাধু-বাচকঃ । তেষামাচরণং যত্তু সদাচার স উচ্যতে ॥” অর্থাৎ “দোষহীন ব্যক্তিগণ সাধু । সৎ-শব্দ সাধুবাচক । সাধুগণের আচরণই সদাচার ।” যিনি সদন্ত ভগবানকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সেবায় নিমগ্ন থাকেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে সদাচারী ।

সাধুগণের শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিবিধান ব্যতীত অন্য কোন আকাজক্ষা নাই। কৃষ্ণ-বহিন্মুখগণ সদাচারীর সম্মান লাভ করিতে চাহিলেও বাস্তবে তাহা তাহারা লাভ করিতে পারে না। তাহাদের সদাচার কদাচারেরই নামান্তর। ‘সদাচার’ বলিতে কন্ম্যা, জ্ঞানী প্রভৃতি অন্ততঃ সম্প্রদায় যাহা ধারণা করিয়া থাকেন, ভক্তিমার্গে তাদৃশ সদাচারের অপেক্ষা নাই। ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সদাচার স্বতঃই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অগ্রে সদাচার পালনের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে, পরে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হইবে—এইরূপ সিদ্ধান্ত স্মার্তজ্ঞানোচিত অপসিদ্ধান্ত মাত্র। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিখ্যাত চক্রবর্তী ‘সারার্থ-দর্শিনী’ টীকা বলিয়াছেন,—“স্মার্তগণ নামাপরাধী, তাহারা নিজ নিজ কৃষ্ণবহিন্মুখ স্মৃতি-শাস্ত্রের বিধি পালন করিয়া আপনাদিগকে সদাচারমগ্ন বলিয়া অভিমান করিলেও সদাচারী হইতে পারেন না।” ভক্তিদেবী সদাচার পালনের অপেক্ষা করেন না বলিয়া যাহারা বৈষ্ণব-স্মৃতির বিরুদ্ধ অসদাচার বা যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেন, তাহারা অতত্ত্বজ্ঞ ভোগপরায়ণ প্রাকৃত সহজিয়া এবং তাহাদের কোনকালে সুখ বা আনন্দ লাভ হয় না। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৩৬ শ্লোকে উল্লেখ রহিয়াছে, “আচাররহিতো রাজেন্নেহ নামৃত্র নন্দতি” (ভবিষ্যোত্তর পুরাণ) অর্থাৎ “হে রাজন্ ! আচারবিহীন ব্যক্তি কি ইহ, কি পর—কোন লোকেই আনন্দলাভ করিতে পারে না।” সদাচার পালনের কর্তব্যতা-বিষয়ে মার্কণ্ডেয় পুরাণে মদালনা-অলর্ক-সংবাদে পাওয়া যায়,—

গৃহস্থেন সদা কার্যমাচার-পরিপালনম্ ।

ন হাচারবিহীনশ্চ স্থখমত্র পরত্র চ ॥

যজ্ঞদান-তপাংসীহ পুরুষশ্চ ন ভূতয়ে ।

ভবন্তি যঃ সদাচারং সমুল্লজ্য প্রবর্ততে ॥

“গৃহিব্যক্তি সর্বদা আচার পরিপালন করিবে। ইহলোকে ও পরলোকে কুত্রাপি আচারবিহীনের স্থখ নাই। যে ব্যক্তি সদাচার পরিত্যাগ করিয়া কার্যে অগ্রসর হয়, যজ্ঞ, দান এবং তপশ্চ ইহলোকে সেই ব্যক্তির মঙ্গলের কারণ হয় না।” ভবিষ্যোত্তর পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে পাওয়া যায়,—

আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা

যতপ্যধীতাঃ সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ ।

ছন্দাংসোনাং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি

নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ ॥

“বেদসকল যদি ষড়ঙ্গ সহিতও অধ্যয়ন করা হয়, তত্রাপি আচারবিহীন

ব্যক্তিকে পবিত্র করিতে সক্ষম হয় না। জ্ঞাতপক্ষ পক্ষিগণ যে-প্রকার নীড় ত্যাগ করে, সেই প্রকার বেদসকল মরণ সময়ে তাহাকে ত্যাগ করেন।” সদাচারসম্পন্ন পুরুষকর্তৃক ইহ-পর উভয়লোকই জিত হয়—ইহা বিষ্ণুপুরাণোক্ত গৃহিধর্মের “সদাচারবতা পুংসা জিতৌ লোকানুভাবপি” শ্লোকে পাওয়া যায়।

ন কিঞ্চিৎ কস্তুচিৎ সিধ্যোৎ সদাচারং বিনা যতঃ ।

তস্মাদবশ্যং সর্বত্র সদাচারো হুপেক্ষতে ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৩৪)

“যেহেতু সদাচার ব্যতিরেকে কাহারও কোন কর্ম সফল হয় না, অতএব সকল বিষয়ে নিশ্চয়ই সদাচার আবশ্যক হয়।” বৈষ্ণবের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার অসংসঙ্গ ত্যাগ ও সংসঙ্গে শ্রীহরিনাম সংকীৰ্ত্তন করা। “অসংসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। দ্বীপঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণভক্ত আর ॥”

ভক্তের আচরণে কদাপি কদাচার দৃষ্ট হইলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে সদাচারব্রহ্ম নহেন। শ্রীভাগবতের ‘নিগুণো মদপদাশ্রয়ঃ’ (ভাঃ ১১।২৫।২৬) শ্লোকে ভগবানে আশ্রিত ব্যক্তি নিগুণ বলিয়া উল্লেখিত আছে। ভক্তি নিগুণা, সুতরাং ভক্তির আধার ভক্তও নিগুণ, এহেন ভক্ত প্রাকৃত দোষ-গুণাতীত। যাহারা ভাগ্যদোষে ভক্তে দোষ ও গুণ দর্শন করে, তাহারা অপরাধী। ভক্ত পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ নিষিদ্ধকর্ম কখনও করেন না। শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

ন মযোকান্ত ভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ ।

সাধুনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্ ॥ (ভাঃ ১০।২০।৩৬)

“রাগাদিরহিত, সর্বত্র সমবুদ্ধিবিশিষ্ট, আমাতে একান্ত ভক্তিযুক্ত ও মায়াতীত ভগবদ্বস্ত প্রাপ্ত ভক্তগণের বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্মের জ্ঞান পুণ্য বা পাপের সম্ভব হয় না।” শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

বিধিধর্ম ছাড়ি’ ভঞ্জে কৃষ্ণের চরণ ।

নিষিদ্ধ-পাপাচারে তার কহু নহে মন ॥ (চৈঃ চঃ মঃ)

সুতরাং অনন্তভক্তের দুরাচারে মন নাই, তথাপি তাহা যদি দৈবাৎ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাতে দোষদৃষ্টি অকর্তব্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞানকে বলিয়াছেন,—

অপি চেৎ সুহুরাচারো ভজতে মামনন্ত্যভাক্ ।

সাধুরেব স সম্ভব্যঃ সমাখ্যাবসিতো হি সঃ ॥ (গীতা ৯।৩০)

“যিনি অনন্ত ভজনপরায়ণ হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি যদি নিরতিশয় দুরাচারবিশিষ্টও হন, তথাপি তাহাকে সাধু বলিয়াই মানিবে, যেহেতু তিনি মদুত্তিতে সম্যকপ্রকারে নিশ্চয়বিশিষ্ট।”

উপরিউক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—
 “স্বভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের আসক্তি স্বাভাবিকই আছে। সে ভক্ত ছুরাচারী
 হইলেও সে আসক্তি অপগত হয় না এবং শ্রীভগবান্ সেই ভক্তকেই উৎকৃষ্ট করিয়া
 থাকেন। সুছুরাচার বলিতে যদি সেই ব্যক্তি পরহিংসা, পরদারামভ, পরদারা
 গ্রহণপরায়াণ হইয়াও আমাকে ভজন করে, অনন্ততাক্ হইয়া অর্থাৎ আমা ছাড়া
 অন্য দেবতার ভজন করে না, মন্তুস্তি ব্যতীত জ্ঞান-কর্মাদির অহুষ্ঠান করে না।
 মংকামনা ব্যতীত রাজ্যসুখাদি কোন কামনাই করে না, সে ব্যক্তি সাধু। এই
 প্রকার কদাচার দৃষ্ট হইলেও তাহাকে সাধু বলিয়া মন্তব্য অর্থাৎ তাহাকে সাধুই
 জ্ঞানিতে হইবে। ‘মন্তব্য’-শব্দে বিধি সূচিত হইতেছে, অত্থায় প্রত্যবায়
 আছে, এই বিষয়ে ভগবানের আজ্ঞাই প্রমাণ। যদি কেহ তাহাকে অংশতঃ সাধু
 ও অংশতঃ অসাধু বলিয়া মনে করিতে চায়, তদুত্তরে শ্রীভগবান্ ‘এব’-শব্দের দ্বারা
 সর্বাংশেই সাধুজ্ঞান করিতে হইবে জানাইয়াছেন। কখনও তাহার অসাধুত্ব দেখিতে
 হইবে না। যেহেতু সে ‘সম্যক্ ব্যবসিতঃ’ অর্থাৎ নিশ্চয় করিয়াছে যে, দুস্ত্যজ্য
 স্বপাপে নরক বা তির্যগ্‌যোনি যাইব, কিন্তু ঐকান্তিক কৃষ্ণভজনকে কিছুতেই
 পরিত্যাগ করিব না।” শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ভাঃ ৬।৩।৩ শ্লোকের টীকায়ও
 লিখিয়াছেন,—“ভ্রমর যেমন ক্ষুধায় ম্রিয়মাণ হইলেও গো-মল্লুগাদির তক্ষ্য
 ঘাসান্নাদিতে আসক্ত হয় না, তদ্রূপ কৃষ্ণপাদপদ্মের মধুপানকারী ভক্ত-ভ্রমরও
 কখনও কখনও দুর্বিষয়ে রত হইলেও ভক্তত্বহেতু পাপে রত হন না। যদিও
 কনিষ্ঠ ভক্ত সেই বিষয়সমূহের সেবা করেন, তাহাতে সেইসকল বিষয়কে
 পরিণামে দুঃখদ ও গর্হণীয়-জ্ঞানে অপ্ৰীতির সহিত সেবা করেন, কিন্তু প্রীতির সহিত
 রত হন না।”

গীতার ৯।৩০ শ্লোকের টীকায় বৈষ্ণব ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর
 লিখিয়াছেন,—“সুছুরাচার শব্দার্থ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। বদ্ধজীবের আচার
 দুই প্রকার—সাম্বন্ধিক ও স্বরূপগত। শরীররক্ষা সমাজরক্ষা ও মনের উন্নতি সম্বন্ধে
 যতপ্রকার শৌচ, পুণ্য ও পুষ্টিকর অভাব নির্বাহী আচার অনুষ্ঠিত হয়, সেই
 সমস্তই সাম্বন্ধিক। শুদ্ধজীবস্বরূপ আত্মার আমার প্রতি যে চিৎকার্যরূপ আচার
 আছে, তাহাই জীবের স্বরূপগত। তাহার অন্য নাম—অমিশ্রা বা কেবলাভক্তি।
 বদ্ধদশায় জীবের কেবলাভক্তিও সাম্বন্ধিক আচারের সহিত অনিবার্য্য সম্বন্ধ রাখে,
 অর্থাৎ অনন্ত ভজনরূপ ভক্তি বদ্ধজীবে উদিত হইলেও দেহ থাকা পর্য্যন্ত সাম্বন্ধিক
 আচার অবশ্যই থাকিবে। ভক্তি উদিত হইলে জীবের ইতর-রুচি থাকে না অর্থাৎ
 যে-পরিমাণে কৃষ্ণরুচি সমৃদ্ধ হয়, সেই পরিমাণে ইতর-রুচি খর্ব্বিত হইয়া থাকে।

নিতান্ত নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত কখনও কখনও ইতর-রুচি বলপ্রকাশপূর্বক কদাচার অবলম্বন করে, কিন্তু অতি শীঘ্রই তাহা কৃষ্ণরুচিদ্বারা দমিত হইয়া যায়। ভক্তির উন্নত-সোপানারূঢ় জীবদিগের ব্যবসায়—সহজেই সর্বদাঙ্গসুন্দর। তাহাতে যদি উক্ত ঘটনাক্রমে কদাচিৎ দুরাচার পরিলক্ষিত হয়, তাহাও অবিলম্বে যাইবে এবং তদ্বারা প্রবল প্রবৃত্তিরূপা মন্ডলিত দূষিত হয় না—ইহাই জানিবে।”

ভগবতি চ হরাবনগুচেতা ভূশমলিনোহপি বিরাজতে মনুষ্যঃ ।

ন হি শশ-কলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ ॥ (নৃসিংহ পুরাণ)

“যে-মনুষ্য ভগবান্ শ্রীহরিতে একান্তভাবে চিত্তসম্মিবেশ করিয়াছেন, যদি বাহ্যে তাঁহার অত্যন্ত দুরাচারও দেখা যায়, তথাপি তিনি অন্তর্গত ভক্তিপ্রভাবে বিরাজমান হন। যেমন পূর্ণচন্দ্র বাহ্যদেশে মৃগচিহ্নে কলঙ্কিত হইলেও কখনও তিমিরের নিকট পরাভূত হন না।” শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু-কৃত উপদেশামৃতে পাওয়া যায়,

দৃষ্টেঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষ্ট দোষৈঃ ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্ত পশ্যেৎ ।

গঙ্গাস্তমাং ন খলু বদবুদ্ধেনপঙ্কজব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধশ্চৈঃ ॥

“এই প্রপঞ্চে অবস্থিত ভগবদ্ভক্তের স্বভাবজনিত (নীচবর্ণ, কর্কশতা) ও আলস্লামাদি দোষ এবং বপু (কদর্যা বর্ণ, কুগঠন, পীড়া, জড়াদিজনিত কুদর্শন)-দোষদ্বারা প্রাকৃত দৃষ্টিতে দেখিতে নাই। যে রূপ নীরধশ্চ বদবুদ্ধ, ফেন ও পঙ্কজদ্বারা গঙ্গাজল ব্রহ্মদ্রবত্বম্ অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব কখনও পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ আত্ম-স্বরূপলব্ধ ভক্তের প্রাকৃত কোন দোষ দেখিতে নাই।”

কেহ কেহ পূর্বপক্ষ করিতে গিয়া বলেন,—“শ্রুতিতে পাওয়া যায়, সতত দুষ্চরিত্র, অশান্ত, অসমাহিত, অশান্তমনা প্রজ্ঞানের দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হয় না ইত্যাদি শ্রোতবাক্যে দুরাচারী ব্যক্তির ভগবদ্ভিমুখতাই শুনা যায়, সুতরাং তাহার সাধুত্ব কিরূপে পরিগণিত হইবে?” তদ্বক্তরে বলা হইতেছে যে, উক্ত স্থলে শ্রুতিতে স্বাভাবিক দুরাচারের বিষয় কথিত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত, মনে সর্বদা অতিপবিত্র, সর্বোত্তর বিষ্ণুকে স্মরণমূলে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহারা শীঘ্রই ভগবানের রূপায় আগন্তুক দুরাচার বিধোত করিয়া ধর্মান্ধা অর্থাৎ সদাচারনিষ্ঠ হইয়া উঠেন। ইহা গীতায় ৯।৩১ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন। গীতা ৯।৩১ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বলদেব বিজ্ঞানভূষণ প্রভু বলিয়াছেন,—“পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করিবার ফলে ভগবানের স্মৃতির প্রতিকূল বিষয়সমূহ অনন্ত-ভজনকারিগণের চিত্ত হইতে বিদূরিত হয় এবং তাঁহারা নিবৃত্তিরূপা শান্তিলাভ করিয়া থাকেন।”

সিদ্ধের কা কথা, যাহারা অনন্তা ভক্তির সাধক, তাঁহাদেরও যদি প্রাক্তন-

কর্মবশতঃ আকস্মিক কোন ছুরাচার দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও যে সাধু মনে করিতে হইবে, ইহা পুনঃ পুনঃ ভগবান্ বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন । ভাগবতের (১১।২০।৩৬) টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন,—বুদ্ধেঃ প্রকৃতেঃ পরং ভগবন্তমুপেষুবাং ভক্ত্যা সিদ্ধেষুদেতেষু দোষদৃষ্টিনকর্তব্যোতি কিং বক্তব্যং সাধকেষু ছুরাচারেষপি ন কার্যোতি ।” অর্থাৎ “বুদ্ধি প্রকৃতির পর ভগবানকে প্রাপ্ত সাধুগণের, ভক্তির দ্বারা ইহার সিদ্ধ হইলে দেষাদৃষ্টি কর্তব্য নয়, একথা আর কি বলা হইবে, এমন কি, অনন্তা ভক্তির সাধক ছুরাচার হইলেও দোষদৃষ্টি করা উচিত নয় ।” **অনন্তভক্তি আশ্রিত সিদ্ধপুরুষে কোন ছুরাচার নাই, অজ্ঞলোকের দৃষ্টিতে ছুরাচার বলিয়া দৃষ্ট হইলেও, তাহা প্রকৃত ছুরাচার নহে, তিনি প্রকৃতই সাধু ।** অজ্ঞের কথা দূরে থাকুক, “বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝায় ।” উত্তমাদিকারীর আচরণ অক্ষজ্ঞানে বিচার করা উচিত নহে । শ্রীমন্নহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

শুন বিপ্র, মহা অধিকারী যেবা হয় ।

তবে তান্ দোষ-গুণ কিছু না জন্ময় ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৬।২৬)

মহতের আচরণ অধিকারী-জন ব্যতীত অন্তের অনুকরণীয় নহে, অনুকরণ করিলে ধ্বংস অনিবার্য ।

অধিকারী বই করে, তাহান আচার ।

হুঃখ পায় সেই জন, পাপ জন্মে তার ॥

রুদ্ধ বিনে অন্তে যদি করে বিষপান ।

সর্বথায় মরে, সর্ব পুরাণ প্রমাণ ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৬।৩০-৩১)

এই সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে শ্রীশুকোক্তি,—“তেজীয়মাং ন দোষায় বহুঃ সর্বভূজো যথাঃ ।” অকৃত্রিম মহতের বাহ্য ছুরাচার দর্শনে আধ্যাত্মিক-বিচারপরায়ণ কটাক্ষ তাহার নিজ বিনাশেরই কারণ ।

গর্হিত করয়ে যদি মহা-অধিকারী ।

নিন্দায় কি দায়, তাঁরে হাসিলেই মরি ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৬।৩৫)

শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মার কোন ছুরাচার আচরণ দর্শনে উপহাস করায়, তৎপোত্র মরীচি-পুত্রগণ অস্তুরযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

ভক্তকে কৃত পাপাচারের জগু প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না । শ্রীভাগবতের (৬।৩।৩৩) “কৃষ্ণাজিৎ পদ্মধূলিঙ্ ...রজঃ পুনঃ স্মাৎ” শ্লোকে পাওয়া যায়, “ভক্তগণের পাপাচরণে প্রবৃত্তি নাই, সুতরাং তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত নাই ।” ভাগবত (১১।২০।২৫) “যদি কুর্য্যৎ প্রমাদেন” শ্লোকে ভক্তের প্রায়শ্চিত্তের কথা বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন । শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

অজ্ঞানে বা হয় যদি পাপ উপস্থিত ।

কৃষ্ণ তাঁ'রে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত ॥ (চৈঃ চঃ)

শ্রীল রূপ গোস্বামি-পাদ বলিয়াছেন,—

নিষিদ্ধাচারতো দৈবাং প্রায়শ্চিত্তত্ত্ব নোচিতম্ ।

ইতি বৈষ্ণবশাস্ত্রানাং রহস্যং তদ্বিদাং মতম্ ॥ (ভঃ রঃ সিঃ)

“যদি কখনও দৈববশতঃ নিষিদ্ধকর্ম্ম আচরিত হয়, তাহা হইলেও হরিভক্তি-পরায়ণগণের প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয় নহে—বৈষ্ণবশাস্ত্র-রহস্যবেত্তা পণ্ডিতগণের এই মত ।” শ্রীযম স্বকিঙ্করগণকে বলিয়াছিলেন,—

তে মে ন দণ্ডমহন্ত্যথ যত্মমীষাং ।

স্যাৎ পাতকং তদপি হন্ত্যকুণ্ডয়াবাদঃ ॥ (ভাঃ ৬।৩।২৬)

“কৃষ্ণভক্তগণ আমার দণ্ডাহঁ নহেন, তাঁহাদের পাপই হইতে পারে না, যদি প্রমাদবশতঃ কখনও তাহা হয়, তবে শ্রীভগবানের নাম-সঙ্কীর্তন প্রভাবেই তাহা ধ্বংস হইয়া যায় ।” এতৎপ্রসঙ্গে নবযোগেশ্বরের অগ্রতম করভাজন নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন,—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়শ্চ ত্যক্তাশ্চ ভাবশ্চ হরিঃ পরেশঃ ।

বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিং ধুনোতি সর্ব্বং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ ॥

(ভাঃ ১১।৫।৪২)

“যিনি অনগ্রভাবে ভগবানের পদকমলযুগলের আরাধনা করেন, তাদৃশ প্রিয়ভক্ত যদি কখনও প্রমাদবশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্মে পতিত হন, তাহা হইলে তদীয় হৃদয়স্থিত পরমেশ্বর হরি সমুদয় পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন ।”

জরন্মবর্ষব্যবহারের দিন জ্বর আসিলেও যেমন পরদিনে রোগ সম্যক্রূপে নষ্ট হয়, তদ্রূপ পাপপ্রবৃত্তির মূল অবিজ্ঞাবিনাশিনী ভক্তির আশ্রয়কারীকে সাময়িক পাপাচরণে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট দেখিলেও অচিরেই ঐ বৃত্তিসমূহ নষ্ট হইয়া থাকে । অতএব ভগবদ্ভজনে ঔদাসীণ্যই দুরাচার এবং তদভিমুখতাই প্রকৃত সদাচার—ইহাই সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ।

—ত্রিদণ্ডিগোপী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

জীবের কৃত্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৪ পৃষ্ঠার পর]

আজ যার সঙ্গে প্রীতি আছে, কাল হয়ত' কোন কারণে তার সাথে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। মায়াজাত কোন কিছুই স্থায়ী হয় না। মায়া-রচিত দেহের সম্বন্ধে দৈহিক বস্তুতে যে প্রীতি হয় ও তাতে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহা পরিবর্তনশীল, অনিত্য, দে-কারণে পরিণামে দুঃখ পেতে হয়। যে-সমস্ত জাগতিক বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের প্রীতি নেই, সেখানে আমাদের কোন বিচ্ছেদের কারণ থাকতে পারে না এবং প্রীতির এই অভাববশতঃ মনে দুঃখ পাই না। প্রীতি যেখানে স্থাপিত হয়েছে, সেখানেই বিচ্ছেদের সম্ভাবনা বিद्यমান। তাই জাগতিক বিষয়-জাত প্রীতি বা সুখ ক্ষণিক ও অনিত্য হওয়ায় তাহা দুঃখেরই কারণস্বরূপ। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় উক্ত হয়েছে—

“যে হি সং স্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।

আগন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥” (গীতা ৫।২২)

“হে কৌন্তেয় ! যে-সকল সুখ বিষয় হতে জাত, সে-সকল নিশ্চয় দুঃখেরই হেতু ; কারণ তাহা আদি ও অন্তবিশিষ্ট, সূতরাং জ্ঞানিগণ তাতে অনুরক্ত হন না।”

স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয় প্রভৃতির সাথে সম্বন্ধ স্বপ্নের তায় নশ্বর। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হয়েছে,—

“পুত্রদারাপ্তবন্ধুনাং সঙ্গমঃ পাত্তসঙ্গমঃ।

অনুদেহং বিয়ন্ত্যতে স্বপ্নো নিদ্রাহুগো যথা ॥” (ভাঃ ১।১।১৭।৫৩)

অর্থাৎ—“পুত্র, স্ত্রী, আত্মীয় ও বন্ধুগণের সহিত মিলন, পাত্তশালাস্থিত ব্যক্তিগণের সঙ্গমতুল্য। যেমন নিদ্রাকালে দৃষ্ট স্বপ্ন নিদ্রাবসানে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মমতাস্পদীভূত পুত্রদারাদিও প্রতি দেহে বিনাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তারাও স্বপ্নের তায় নশ্বর।” মহাজন গীতিতে পাই,—

“ভাল করে দেখে ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই,

যে আছে, সে দুঃখের কারণ।

সে-সুখের তরে তবে, কেন মায়া-দাস হবে,

হারাইবে পরমার্থ ধন ॥”

অতএব, দুঃখের অশান্তির মূল হচ্ছে জড় বিষয়ভোগাভিলাষ। জড়বিষয়

কোনদিনই স্থায়ী সুখ দিতে পারে না, বরং দুঃখই এনে দেয়। অথচ এই জগতে ক্ষুদ্র কৃমি কীট থেকে আরম্ভ করে সুসভ্য মানব পর্যন্ত সকলেই সুখ বা আনন্দ পাবার জন্ত চেষ্টা করছে। এমনকি, ব্রহ্মলোকবাসীগণ পর্যন্ত সুখ বা আনন্দের কামনা করেন। আমরা যে সুখ পাওয়ার জন্ত কামনা করি, সেই সুখ পাবার পর আবার অল্প সুখ পাবার জন্ত কামনার উদ্রেক হয়। রজন্তমঃ গুণের প্রভাবে একটা কামনা পূরণ হলে আবার অল্প কামনা উপস্থিত হয়। যার শত টাকা আছে, সে সহস্র টাকা চায়; আবার সহস্র টাকা পেয়েও কামনা পূর্ণ হয় না। তখন লক্ষ টাকা পেতে চায়, লক্ষাধিপতি হয়েও কোটি টাকার কামনা করে। এইভাবে কামনা পূর্ণ হতে চায় না, বরং ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। মনুষ্য, রজঃ, তমোগুণের বৈষম্য থেকে জীবের বিভিন্ন স্বভাব ও বিভিন্ন কামনা পরিলক্ষিত হয়। একজন যে-প্রকার আনন্দ-চর্চা পছন্দ করে, অপরজনের সেই প্রকার আনন্দ-চর্চা পছন্দ হয় না। একজনের চাহিদার সঙ্গে অপর জনের চাহিদার সঙ্গতি নেই। একজন বারবনিতার আনন্দ-চর্চার পদ্ধতি ও কামনা, আর একজন সতী স্ত্রীর আনন্দ-চর্চার পদ্ধতি ও কামনা সম্পূর্ণ পৃথক্। সতী স্ত্রী কখনও বারবনিতার কামনাকে পছন্দ করবে না। বারবনিতাকে কুকার্যের ফলস্বরূপ নানাবিধ অসুখ ও অসুবিধা ভোগ করতে হয়। একজন ডাকাতের স্বভাব ও কার্য নিশ্চয়ই একজন সদৃগৃহস্থের স্বভাব ও কার্যের সঙ্গে এক নয় এবং উভয়ের কার্যের ফলাফলও ভিন্ন হয়। একজন লম্পট যে সুখ উপভোগ করে, একজন সচ্চরিত্র সাধু সেই সুখ উপভোগ করে না, বরং সেই সাধু ভগবৎসেবা-সুখ-আনন্দ দান করে। সকল ব্যক্তিই সুখ চায় বটে, কিন্তু সুখ লাভের উপায় ও সুখ-প্রাপ্তি সকলের একই প্রকারের নয়। একজন যে কার্যের দ্বারা আনন্দ পায়, অপরজন সেই কার্য করতে দুঃখ পায় ও সেই কার্য পছন্দ করে না। যারা জড় বিষয়গুলি থেকে আপাতরম্য সুখ পেয়ে মনে করে আনন্দেই ত' আছি; তারাই আবার কিছুদিন পরে সেই বিষয়গুলি ভোগ করা সত্ত্বেও সেই আনন্দে তৃপ্ত হতে না পেয়ে আরও অধিক আনন্দ পাবার আকাঙ্ক্ষা করে। এইভাবে জগতের বদ্ধজীব আনন্দের অভাব অনুভব করে থাকে। আনন্দের অভাবের জন্তই অসন্তোষ আসে। অসন্তোষবশতঃ জীব সুখী হতে পারে না অর্থাৎ দুঃখই পেতে হয়।

এই জগতের যে বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে আমাদের আনন্দ হয়, সেই বিষয়গুলি নিত্য নয়। আবার আনন্দ-উপভোগকারী আমরাও এ জগতে নিত্যকাল থাকব না। তাই জড়বিষয়গুলি ও আমাদের মধ্যে যে আনন্দ পরিলক্ষিত হয়,

ভক্ত সাধকের প্রার্থনা হওয়া উচিত ;—

“মমোত্তমঃ শ্লোকজনেষু সখ্যং সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্মভিঃ ।
ত্বন্মায়য়াত্মাঅজদার গেহেষাসক্ত চিত্তশ্চ ন নাথ ভূয়াৎ ॥”

(ভাঃ ৬।১১।২৭)

অর্থাৎ—“হে নাথ ! স্বকর্মদ্বারা সংসারচক্রে ভ্রমণকারী আমার কৃষ্ণভক্তজনে সখ্য হোক ! তোমার মায়্যা-মোহিত হয়ে আসক্তচিত্ত যে আমি, আমার যেন স্ত্রী-পুত্র ও গৃহাদিতে সখ্য বা আসক্তি না হয়,—আমার এই প্রার্থনা ।”

পাপ-পুণ্যের পরিণাম সুখকর হয় না

আত্মা ত্রিগুণাতীত চিৎস্বরূপ হলেও জড়প্রকৃতি মায়ার আশ্রয়লাভ করায় প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণত্রয় আত্মাকে প্রকৃতি-জাত দেহে অধ্যাস উপাদানপূর্বক বন্ধন করে থাকে । শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীভগবানের বাণী, যথা—

“সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।

নিবলন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥” (গীতা ১৩।৫)

“হে মহাবাহো ! জড় প্রকৃতি হতে জাত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণত্রয় দেহমধ্যে অবস্থিত নির্বিকার দেহী জীবকে (আত্মাকে) সুখ-দুঃখাদি ভোগে আবদ্ধ করে ।” দেহী জীব (আত্মা) অসঙ্গ হলেও অবিজ্ঞানদ্বারা কৃত গুণসঙ্গহেতু গুণগণই জীবকে বদ্ধ করে । দেহী জীব ত্রিগুণের থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র আনন্দকে বহুমানন করে এই ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন দেহ ধারণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে । জীবের দেহাশ্রয়বুদ্ধি হতে বিষয়-বাসনা জাগে । বিষয়-বাসনা হতে শুভাশুভ কর্মে প্রবৃত্তি হয় । শুভকর্মের ফল পুণ্য ও অশুভ কর্মের ফল পাপ । কর্ম-বাসনা থেকেই পুণ্য ও পাপের ক্রিয়া ফলবতী হয় । বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে,—“স বা অয়মায়া যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি । সাধুকারী সাধুভবতি । পাপকারী পাপো ভবতি । পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন । (৪।৪।৫ ব্রাহ্মণ)

অর্থাৎ—“সেই বা এই (স্থূল-লিঙ্গদেহধারী) আত্মা যেক্রপ যেক্রপ আচরণ করেন সেইক্রপ সেইক্রপ অবস্থা লাভ করেন । সাধু আচরণের দ্বারা সাধু, পাপাচরণের দ্বারা পাপী হয়ে থাকেন । পুণ্যকর্মের দ্বারা পুণ্য এবং পাপ কর্মের দ্বারা পাপ হয়ে থাকে ।” শারীরিক ও মানসিক সুনীতিকরণ যেমন পুণ্য, তেমনই শারীরিক ও মানসিক দুর্নীতিকরণই পাপ । জীব-হিংসাদি পাপবৃত্তি । শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হয়েছে,—

“এতে মহদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ ।

হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যেন তে স্যঃ পরতাপিনঃ ॥”

অর্থাৎ—“হে ব্যাধ ! তুমি পূর্বে যখন বহিস্মুখী সংসারী ছিলে, তখন তোমার হিংসা প্রভৃতি নৈসর্গিকরূপে তোমাতে আশ্রয় করেছিল। এখন তুমি হরি-ভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়েছ, সুতরাং জীব-হিংসাদি পাপ-প্রবৃত্তি আর তোমার থাকতে পারে না।” পুণ্য কিভাবে লাভ হয় ? জ্ঞান-কর্মের সাধনের দ্বারা পুণ্য লাভ হয়। কিন্তু অনন্তভক্তিব্যোগে সমুদয় পুণ্যফল আত্মবিক্ষিপ্তভাবে লাভ হয়ে তাহা অতিক্রম করত তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপ্রাকৃত নিত্য পরমধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণী আলোচ্য,—

“বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিশ্টম্।

অতোতি তৎ সৰ্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাত্মম্ ॥”

(গীতা ৮।২৮)

অর্থাৎ—“বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা এবং দান-কর্মাদিতেও যে-সকল পুণ্যফল শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয়েছে, যৎকথিত এই তত্ত্ব অবগত হলে ভক্তিব্যোগী সে-সকল অতিক্রম করে অনাদি ও অপ্রাকৃত স্থানকে প্রাপ্ত হন।” (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

আবির্ভাব

পরম গুণসম্পন্ন

সমঘটি সুপ্রসন্ন

আসে দ্বাপরেতে ।

উদয় হয় রোহিণী

সদলবলে অশ্বিনী

ভাসে আকাশেতে ॥

চতুর্দিক সুনির্মল

সদা করে বালু-মল

পৃথ্বীমাঝে সব ।

গোষ্ঠে, গ্রামে ও নগরে

মধু সুরে মিষ্টি ঝরে

ওঠে পক্ষীরব ॥

প্রফুটিত কমলেতে

নদী, হ্রদ ওঠে মেতে

ভ্রমরের সুর ।

বাতাসেতে মধু স্পর্শে

পুণ্যবাস বয়ে হর্ষে

মধুর, মধুর ॥

ভয়ে ভীত সাধুগণ

মহা আনন্দিত হন

আসার আশায় ।

আকাশে ছন্দুভি ধ্বনি

মহাসুরে ওঠে অনি

স্পষ্ট শোনা যায় ॥

গন্ধর্ব্ব ও চারণেরা
স্তবে হয় আশ্রয়হারা
অঙ্গরার দল ।

বিজ্ঞাধরাদি সাথে
মহাহর্ষে নৃত্যে মাতে
ওঠে কোলাহল ॥

দেবতা ও ঋষিরা
একসাথে মিলি তাঁরা
করে পুষ্পবৃষ্টি ।

মহাক্ষণে তাঁ'র রূপ
হ'য়ে ওঠে অপরূপ
সুহৃৎভ সৃষ্টি ॥

রাত্রি অন্ধকারময়
গাঢ় মসীলিপ্ত হয়
নামে বৃষ্টি, ঝড় ।

হেঁকে হেঁকে থেকে থেকে
পুঞ্জীভূত মেঘ ডেকে
করে কড়কড় ॥

যমুনা উত্তাল হয়
তরঙ্গ ফেনিলময়
অতি ভয়ঙ্কর ।

তীব্র 'চড়াং, চড়াং'
শব্দে হয় বজ্রপাত
কাঁপায় ভূধর ॥

অতঃপর শ্রীহরি
জন্ম পরিগ্রহ করি
দেবকী উদরে ।

তৃপ্ত হন দুইজনে
বসুদেব মনে মনে
ধেনু দান করে ॥

এরপর দেখলেন
প্রত্যক্ষও করলেন
বালকের রূপ ।

চতুর্ভূজ মূর্ত্তিধর
অবতার লীলাকর
অতি অপরূপ ॥

শ্রীবৎস-চিহ্ন আঁকা
বক্ষঃস্থলে তাহা রাখা
পীত বস্ত্রধর ।

মেঘবর্ণ দেহ তাঁ'র
গলে শোভে মণিহার
স্বধন্য ভূধর ॥

পরক্ষণে পুত্রকেই
মহাপুরুষ-জ্ঞানেই
করজোড় করে ।

তাঁ'র স্তবে মগ্ন হন
মহালগ্নে অনুক্ষণ
অতি ভক্তিভরে ॥

কান্তিময় তাঁ'র দেহ
জ্যোতিতে স্মৃতিকা গেহ
আলোকিত হয় ।

প্রকৃতি অতীত যিনি
তাঁ'রে যেন জানি, চিনি
সকল সময় ॥

আনন্দ ও অনুভব
 এঁর মাঝে আছে সব
 তাঁ'রই স্বরূপ ।
 ধ্যান, জ্ঞান, ভক্তি চাই
 অথ কোন পথ নাই
 জানিতে শ্রীরূপ ॥
 যোগমায়ার পরাণ
 নন্দজায়া গর্ভে যান
 ভগবতাদেশে ।
 এদিকে তাঁ'রই মায়ায়
 প্রহরীরা নিদ্রা যায়
 তথা অবশেষে ॥
 লোহার খিল, শিকল
 হয় মুক্ত সে-সকল
 কংস-কারাগার ।
 মুক্ত হয় দু'টি প্রাণ
 মহা করুণার দান
 প্রীতি উপহার ॥
 বসুদেব পুত্র লয়ে
 ঝড়, ঝুপ্টি, বজ্র সয়ে
 নদী পার হয় ।
 দেখলেন নন্দরাজ
 গোকুলে করে বিরাজ
 অতি দয়াময় ॥
 গোপ-গোপী সকলেই
 নিদ্রামগ্ন রয়েছেই
 যেন অচেতন ।

যশোদারানী-শয্যায়
 কণ্ঠারত্ন শোভা পায়
 ঘুমেতে মগন ॥
 বসুদেব অতঃপর
 হয়ে অতি তৎপর
 কৃষ্ণে রাখে পাশে ।
 কণ্ঠাকে তুলিয়া কোলে
 মহা আনন্দেতে দোলে
 মনে মনে হাসে ॥
 ফিরে আসে পুনরায়
 দেবকীর স্ন-শয্যায়
 কণ্ঠারত্ন রাখে ।
 বন্দীরত অবস্থায়
 নিজেকে বাঁধেন, হায়
 স্থির হয়ে থাকে ॥
 জন্মরহিত শ্রীকৃষ্ণ
 জীবের উদ্ধার-জন্ত
 হন অবতার ।
 জ্ঞানহীনে দানে জ্ঞান
 চান মঙ্গল, কল্যাণ
 বিশ্বে সবাকার ॥
 সারা বিশ্বে যিনি অজ
 ওহে জীব ! তাঁ'রে ভজ
 তাঁ'র কৃপা পে'তে ।
 একান্ত ভজরে ভাই
 কৃপা বিনা গতি নাই
 শ্রীকৃষ্ণে লভিতে ॥

তিঁনি আদি ও অনন্ত

সর্বদাই প্রাণবন্ত

স্মরণীয় যিঁনি ।

আদিতে ছিলেন তিঁনি

এখন আছেন তিঁনি

থাকবেন তিঁনি ॥

কলিকালে ‘হরিনাম’

নামেতে রয়েছে ধাম

পরম আশ্রয় ।

উচ্চকণ্ঠে বল সবে

সঙ্কীর্ণনের গৌরবে

শ্রীকৃষ্ণের জয় ॥

এইজ্ঞ ‘গুরু’ চাই

অন্য কোন পথ নাই

পাইতে উদ্ধার ।

যেন সদা মনে রাখি

নাম ছাড়া সব ফাঁকি

তুচ্ছ এ সংসার ॥

—শ্রীবলাইচাঁদ ঘোষ, সেবাস্বহৃদ

শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৮০ পৃষ্ঠার পর]

সর্বশক্তিমান্ বললে সব শক্তি নিয়ে ভগবান্, সেখানে শক্তিকে বাদ দিলে শব্দটা আসে নাই, শক্তিকে নিয়েই এসেছেন সর্বশক্তিমান্ । তৎসত্ত্বেও শক্তির যে বৈশিষ্ট্য সেটা প্রকাশ করেছেন । সেখানে বলছেন, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্, রাধা—পূর্ণশক্তিমতী । কৃষ্ণকে যেমন সর্বশক্তিমান্ বলা হয়েছে, রাধাকেও তেমন সর্বশক্তিমতী বলা হয়েছে । স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গশক্তি, পরাশক্তি, হলাদিনীশক্তি প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে রাধাতত্ত্ব বুঝাতে গিয়ে ।

তত্ত্বদর্শন নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করি, তখন তত্ত্বদর্শন পুরুষ, পুরুষোত্তম, লীলাপুরুষোত্তম—এসব অধিক অধিক গুণবাচক শব্দগুলো পর পর এসেছে । রাধারাণীর বিশেষণেও ঐ রকম ধরণের শব্দের ব্যবহার হয়েছে, যেখানে অন্য কোন শক্তিকে লক্ষ্য করবে না । তিনি হলেন সকল শক্তির উপরওয়ালী । যেমন বলা হয়েছে সর্বলক্ষ্মীময়ী । সর্বলক্ষ্মীময়ী রাধারাণীকে বলা হয়েছে । যত লক্ষ্মী আছেন—নারায়ণ, বিষ্ণুশক্তির যত লক্ষ্মী আছেন, সব শক্তির উপরওয়ালী রাধারাণী । সেইজ্ঞ সর্বলক্ষ্মীময়ী-শব্দ ব্যবহার হয়েছে ।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা ।

সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥

রাধারাগীর এতগুলো বিশেষণ । ‘সর্বলক্ষ্মীময়ী’ সমস্ত লক্ষ্মীগণের যে বাহাদুরি, তা সব রাধারাগীর মধ্যে আছে । ‘কৃষ্ণময়ী’—কৃষ্ণ ঘাঁর অন্তরে বাহিরে । কৃষ্ণময় মূর্তি ঘাঁর, কৃষ্ণ ছাড়া যিনি কিছু জানেন না, এমন অবস্থা ঘাঁর । ‘রাধিকা’ শব্দ কেন ? রাধারাগীর ঝায় ভগবানকে আরাধনা, উপাসনা আর কেউ করতে পারেন নাই । *She excels all*, সেইজন্য তিনি সর্বসাধিকা । এঁর সঙ্গে কারও তুলনা হবে না । এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন । আবার ‘রাধিকা পরদেবতা’ একটা শব্দ আছে । ‘পর’ মানে শ্রেষ্ঠ । যত দেবী আছেন, সবথেকে শ্রেষ্ঠ যিনি । ‘গুণৈরতি গরীয়সী’—রাধারাগীর মধ্যে যে গুণ আছে, সে গুণ কারও মধ্যে নাই । ব্রহ্মসংহিতায় ‘গোবিন্দ-স্তব’ এর মধ্যে রয়েছে “লক্ষ্মীসহস্রশত-সম্ভ্রম-সেব্যমানম্”—শতসহস্র লক্ষ্মীদেবী ঘাঁকে সম্ভ্রমে সবসময় স্তবস্তুতি করছেন, তিনি হলেন রাধারাগী । ‘সর্বকাস্তিঃ’—এমন ধরণের সৌন্দর্য্য জগতে কোথাও নাই । প্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্য ত’ সেখানে *fail* করেছে । অপ্রাকৃত জগতের যে সৌন্দর্য্য সে সৌন্দর্য্যকে নিঙড়িয়ে দিয়ে যেটা হবে তার *essence* হচ্ছেন রাধারাগী । ‘সম্মোহিনী পরা’—ভগবানকে বশীভূত করার যা কিছু বুদ্ধি, তাঁর মধ্যে শ্রেষ্ঠভাবে, পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত । গুরু-শারীর দ্বন্দ্বের মধ্যে কথাটা আছে—

“গুরু বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন ।

শারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ,

নৈলে শুধুই মদন ॥”

“রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ ।”

যদি রাধা-বিরহিত মাধব হন, তাহলে তাঁকে আর মাধব বলা হবে না । ‘মা’ অর্থে লক্ষ্মী, সর্বলক্ষ্মীময়ী রাধা । তাঁকে যদি বাদ দেওয়া হয় কৃষ্ণের থেকে, তাহলে কৃষ্ণ আর মদনমোহন নামটা পাবেন না । তখন কি নাম হবে তাঁর ? —শুধুই মদন নাম হবে তাঁর । যখন রাধা পাশে দাঁড়াচ্ছেন, তখন কৃষ্ণের নাম হবে মদনমোহন । এই তত্ত্বদর্শনটা বলছেন । তার মানে কথাটা হল রাধাছাড়া কৃষ্ণ নন, আর কৃষ্ণছাড়া রাধা নন । কৃষ্ণ থেকে যদি রাধা বাদ হয়ে যান, তাহলে তাঁকে আর কৃষ্ণ বলা হবে না ; আর রাধা থেকে যদি কৃষ্ণ বাদ হয়ে যান, তাহলে তাঁকে আর রাধা বলা হবে না । কেন ? তিনি কার আরাধনা করেন ?—তিনি কৃষ্ণের আরাধনা করেন । ঠিক এই তত্ত্বদর্শনটা বুঝানো আছে ।

অনয়ারাধিতো ন্যূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।

যন্মো বিহায় গোবিন্দঃ প্রাতো যামনয়দ্রহঃ ॥

এ শ্লোক ভাগবতের। ঈশ্বর হরি ইহাকর্তৃক (রাধারাণী) অধিকভাবে আরাধিত হয়েছেন। ‘যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ’—যাঁকে নিয়ে তিনি রাসস্থলী পরিত্যাগ করছেন কে তিনি? ভগবান্ হরিকে তিনি অধিকভাবে আরাধনা করেছেন, সেজন্য তাঁর এক নাম সেবারাণী। সেবায় তিনি সন্তুষ্ট করেছেন কৃষ্ণকে। এমন সেবা, এমন উপাসনা কেউ করতে পারেন নাই। সেবায় সন্তুষ্ট করেছেন কৃষ্ণকে সব দিক দিয়ে, সেই যে তত্ত্ববস্তু তিনি হলেন রাধা।

অনেকে খুব বাহাদুরি করে বলেন, ভাগবতে কোথাও রাধারাণীর নাম নাই। কিন্তু ভাগবতের সবটাই রাধারাণীকে নিয়ে। রাধাতত্ত্বটা অত্যন্ত গোপনীয়, সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস একটু চেপে রেখে কথাটা বলেছেন। রাধারাণীর নামটা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু “অনয়্যারাধিতো ন্যনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥” শ্লোকে রাধারাণীর নাম এসে গেছে। ‘রাধা’-শব্দ ‘রাধ’ ধাতু থেকে হয়। ইনি ভগবান্ শ্রীহরিকে অধিক আরাধনা করেছেন বা ঈশ্বর শ্রীহরি ইহাকর্তৃক অধিক আরাধিত হয়েছেন। অতএব ‘রাধা’-শব্দ এখানে এসে গেছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যেটা প্রকাশ করতে চাইলেন না, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে গেছেন সব জায়গায়, সেটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন কবি জয়দেব। কবি জয়দেব এই শ্লোকের ব্যাখ্যা দিলেন তাঁর নিজস্ব গীতগোবিন্দ গ্রন্থে—

কংসারিরপি সংসার-বাসনা-বদ্ধ-শৃঙ্খলাম্।

রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥

‘রাধা’-নাম আছে সব জায়গায়, কোথাও একটু কম আছে, কোথাও একটু ভাল করে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। “বুঝিবে সুবুদ্ধিজন, না বুঝিবে মূঢ়।”—একটা কথা আছে। স্মমেধা ব্যক্তিগণ তত্ত্বদর্শী।

কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাহকৃষ্ণং সাদ্ভোপাঙ্গাস্ত্রপার্শ্বদম্।

যজ্ঞৈঃ সঙ্কীৰ্ত্তনপ্রায়ৈর্ঘজন্তি হি স্মমেধসঃ ॥

এখানে ‘স্মমেধা’-শব্দ বলা হয়েছে। স্মমেধা-শব্দে বুদ্ধিমান, পণ্ডিত (ঠিক ঠিক পণ্ডিত), তত্ত্বদর্শী, প্রেমিক ভক্ত—এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিপশিৎ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ বুঝবেন এই তত্ত্বদর্শন। সকলের মাথায় ঢুকবে না। এইভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর তত্ত্বদর্শনটা এই ‘কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাহকৃষ্ণম্’ শ্লোকের মধ্যে রয়েছে।

অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র, পার্শ্বদ-সঙ্গে ।
 নাট্য ভাব মুরতি গোরা অঙ্গে ॥
 গাওত কলিযুগ-পাবন নাম ।
 ভ্রমৈ শচীসূত নদীয়া-ধাম ॥

তাহলে বুঝতে ভুল হচ্ছে কেন? ভাগবত গৌরহৃন্দরকে লুকিয়ে রাখছেন যেন, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ নৃসিংহদেবের যে স্তব করেছেন, তার মধ্যে বলে দিয়েছেন,—

ইথাং নৃতির্ঘৃষিদ্বেব-ঝাষাবতারৈ-
 লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্ ।
 ধর্ম্যং মহাপুরুষ পাসি যুগান্তবৃত্তম্
 ছন্ন কলৌ যদভবজ্জিযুগোহুথ স স্বম্ ॥

আমি সেই ছন্নাবতার গৌরহৃন্দরকে প্রণাম করি। ঠিক এইভাবে তত্ত্বদর্শনটা প্রকাশ পেয়েছে। সব জায়গায় সব কথা সমানভাবে বলা হয় নাই। ভাগবতে কৃষ্ণলীলার যে বর্ণনা আছে, ঠিক সেই বর্ণনা অন্য জায়গায় হয়ত আছে, বা কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যাখ্যাও আছে সেখানে।

হরিবংশ মহাভারতের পরিশিষ্ট। একজন বলছিলেন—মহাভারত ত' প্রাকৃত গ্রন্থ। আমি বললাম,—মহাভারত যদি প্রাকৃত গ্রন্থ হবে, তাহলে শাস্ত্রের তালিকার মধ্যে এসেছে কেন? শাস্ত্র কাকে বলা হয়?—

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ক্যাক্ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্ ।
 মূলরামায়ণকৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥
 যচ্চানুকুলমেতশ্চ তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্তিতম্ ।
 অতোহনুগ্রন্থাবস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্জ্য তৎ ॥

ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ক—এই চার বেদ এবং মহাভারত, নারদ পঞ্চরাত্র, হৃদ্যশীর্ষ পঞ্চরাত্র, মূল-রামায়ণকে শাস্ত্রের তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া আর কোনটা তাহলে শাস্ত্র নয় কি? ‘যচ্চানুকুলমেতশ্চ তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্তিতম্।’—ইহাদের বিচারের অনুকূলে, তত্ত্বসিদ্ধান্তের অনুকূলে যে-সব লিখিত গ্রন্থ, প্রকরণ গ্রন্থ, সেগুলোও শাস্ত্র বলে প্রকীর্তিত। “অতোহনুগ্রন্থাবস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্জ্য তৎ ॥” বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত—এই-সকল গ্রন্থের বিরোধী বিচারবিশিষ্ট যেগুলো, সেগুলো শাস্ত্র নয়। সেগুলো পড়লে মহা অজ্ঞান হবে। যদি শিব, ব্রহ্মা এসে আমাদের বলেন, আর তার ভিতরে যদি ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাকথা বর্ণন না থাকে, আমি সেটা পড়ব না, প্রতিজ্ঞা। নিষেধ করা আছে।—

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে ।

ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥

স্বয়ং ব্রহ্মা এসে বললেও আমি ওটা পড়ব না—এই বিচারগুলো দেখানো আছে । এটা নির্ভার কথা । যে গ্রন্থের মধ্যে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলার কোন বর্ণনা নাই, তাহা আলোচ্য নয়, সেটাকে বাদ দিতে হবে । সাধন-ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তিগণ সেটাকে সময়ে পরিহার করবেন । যার ভিতরে উটোপান্টা তত্ত্বসিদ্ধান্ত আছে, সেগুলো পড়লে অপরাধ হবে । সহজিয়াদের লেখা বই এই কারণে আলোচনা করা নিষেধ আছে । যারা কন্মজ্জড়স্মার্ত্ত, চিঞ্জড় সমন্বয়বাদী, জীব-ব্রহ্মৈকবাদী—তাদের কোন বই আলোচনা করলে কোন সুবিধা হবে না । তাহলে কি করা হবে ? চেতনকে জড় বলছে যারা, তারা জড়বাদী । তারাই চিঞ্জড় সমন্বয়বাদী—যারা প্রাকৃত বস্তুকে অপ্রাকৃত বলছে, আবার অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত বলছে । এটাই হল প্রাকৃত সহজিয়াবাদ । এ জিনিষটাকে সকল মহাজন, পূর্ব পূর্ব গোস্বামিগণ, গুরুবর্গগণ খণ্ডন করেছেন । এ বিচার আমরা নেব না । শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের যে ব্যাখ্যা আছে, গোস্বামিবর্গের যে ব্যাখ্যা আছে, সেগুলো আমরা নেব ।

বাজারে ত' অনেক রকম তন্ত্রের বই পাওয়া যায় । সাঁওতালী বশীকরণ তন্ত্র, কামাক্ষ্যা বশীকরণ তন্ত্র থেকে আরম্ভ করে কোন্ বইয়ের অভাব আছে বাজারে ? সবই ত' পাওয়া যায় । কিন্তু বাজার থেকে কিনে পড়লে কোন কাজ হবে না । তত্ত্বদর্শনটা আমাদের শিখতে হবে, জানতে হবে । এটাই হল উপদেশ আমাদের প্রতি ।

(রূপ সম্বন্ধে) সৌন্দর্য্য-বিশেষদ্বারা উৎকর্ষ-বিশেষ দেখাচ্ছেন—মাতা যশোদার ভয়ে ধাবিত হওয়াতে অথবা সতত বাল্যক्रीড়া-বিশেষ-পরত্নহেতু নিরন্তর লোলতা নিবন্ধন ঘাঁর গণ্ডুগুণে মকরকুণ্ডলদ্বয় ক্রীড়াশীল । ইহাদ্বারা শ্রীমুখের শোভা-বিশেষ বলা হল । ‘লসৎ-কুণ্ডলং’ বাক্যের অগ্ণ অর্থ,—মকর-কুণ্ডলদ্বয়ের শ্রীগণ্ড-চুষনরূপ মহা-সৌভাগ্যহেতু সকলভূষণের মধ্যে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব-বশতঃ তাহাদ্বারা সকল অঙ্গস্থিত সমস্ত ভূষণেরই সৌভাগ্য-বিশেষ উপলক্ষিত হচ্ছে । ‘ভূষণং ভূষণাঙ্গম্’ এর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এখানে । অলঙ্কার পরলে শরীরের শোভা বৃদ্ধি হয় । আর এখানে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন—ভগবানের শ্রীঅঙ্গে শ্রীঅঙ্গই শোভা বৃদ্ধি করছে ঐ অলঙ্কারের । অলঙ্কার পরলে শরীরের শোভা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু ভগবানের শ্রীঅঙ্গ এমনই শোভাযুক্ত যে, ঐ মকরকুণ্ডল ইত্যাদিকে গ্লান করে দিচ্ছে ভগবানের শ্রীঅঙ্গের শোভা । ভূষণং ভূষণাঙ্গম্’-এর অর্থ এটাই । এর তাৎপর্য্য এই যে,—যাঁহা হতে (ঘাঁর অঙ্গশোভা

হতে) কুণ্ডলদ্বয় শোভাযুক্ত; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ—ভূষণেরও ভূষণ। অতএব ভাগবত দশমে গোপীগণ বলেছেন,—শ্রীকৃষ্ণের রূপ এতই মনোহর যে, তাতে কৃষ্ণের নিজেরও বিশ্বয় উৎপাদন হয়। নিজের শ্রীঅঙ্গের শোভা দর্শন করে নিজে অবাক হয়ে যাচ্ছেন। নিজের শোভায় নিজে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে যাচ্ছেন—এটা কি করে হয়! তাহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণেরও ভূষণ (অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যের মধ্যে পরম অলৌকিক)। নিজের চেহারা দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে যাচ্ছেন—এটা কি! এটা কোথা থেকে আসছে? আশ্চর্য্য ব্যাপার!

পরিবার-বিশেষদ্বারা উৎকর্ষ-বিশেষ বলছেন; গোকুলে—গোপ-গোপী-গোবৎসাদির বাসস্থানে, যিনি ‘ব্রাজমানং’ অর্থাৎ যোগ্যস্থান-বিশেষে পূর্ব হতেও (পূর্ব পূর্ব লীলা হতেও) উৎকর্ষ-বিশেষ প্রকাশের দ্বারা অথবা গোকুলেরই স্বাভাবিক শোভাবিশেষের দ্বারা যিনি শোভমান, তাহা দশম স্কন্ধাদিতে বর্ণিত হয়েছে—“সিদ্ধ-যোগিগণ হৃদয়-পুণ্ডরীক-মধ্যে ধীর আসন কল্পনা করে থাকেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মীর (শোভার) আশ্রয়াস্পদ কলেবর প্রকটিত করে গোপী-প্রদত্ত আসনে উপবেশনপূর্বক গোপীগণের সভায় তাঁদের দ্বারা পূজিত এবং শোভিত হয়েছিলেন।” (ক্রমশঃ)

স্বধামে শ্রীযশোদানন্দন ব্রজবাসী প্রভু

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ১০ই মধুসূদন, ৫১০ গৌরাদ, ৩০শে চৈত্র, ১৪০২ (ইং ১৩৪৯৯৬), শনিবার বরুথিনী একাদশী-তিথিতে দিবা ২।২০ মিনিটে শ্রীপাদ যশোদানন্দন ব্রজবাসী প্রভু শ্রীগোলোকগঙ্গ গোড়ীয় মঠে সম্ভ্রানে ভগবৎস্মরণ করিতে করিতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সেবাময় জীবনের আদর্শ ক্রিয়াকলাপ আর প্রত্যক্ষ করিতে পারিবা না।

১৩২৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত সরপাতালি-নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন শ্রীচন্দ্রকুমার দাস এবং মাতা ছিলেন শ্রীমতী বিপুলা দাস। ম্যাট্রিক পাশ করিবার পর তিনি কিছুদিন মণ্ডুয়া প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। শিক্ষক-জীবনে তিনি শ্রীগোড়ীয় ভাবধারায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারে আকৃষ্ট হন এবং গৃহত্যাগ করিয়া ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে যোগদান করেন। ঐ বৎসরই তিনি শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ

১০৮শ্রী শ্রীমন্ত্ত্রিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে শ্রীনাম-দীক্ষা গ্রহণপূর্বক একনিষ্ঠভাবে শ্রীহরিভজনে প্রবৃত্ত হন ।

পরবর্তিকালে শ্রীশ্রীল সভাপতি-মহারাজের নির্দেশে শ্রীমন্ত্ত্রিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজের আনুগত্যে শ্রীসমিতির আসাম-প্রদেশস্থ অগ্রতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীগোলোক-গঞ্জ গোড়ীয় মঠে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের মনোহরীষ্ট পূরণে সেবায় ব্রতী হন । তদবধি সেখানকার শ্রীমন্দির-নির্মাণকল্পে ও অগ্গাণ্ড সেবায় নিষ্কপটে নিয়োজিত থাকিয়া তাঁহার সেবাসুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন । তাঁহার বৈষ্ণবোচিত স্নিগ্ধ ব্যবহারে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বৈষ্ণবগণ সর্বদা প্রীতি লাভ করিতেন । বার্লুক্যাবস্থাতেও নিরলসভাবে সেবার দায়িত্ব পালন করাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত ।

শ্রীগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠের প্রতি তাঁহার এতই প্রগাঢ় অহুরাগ ছিল যে, বিগত শ্রীগৌর-জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমায় যোগদান করিয়া অস্থস্থ হইয়া পড়া সত্ত্বেও তিনি গোলোকগঞ্জ মঠেই ফিরিয়া যান । অনেকে তাঁহাকে জীবনাবসান পর্য্যন্ত নবদ্বীপে থাকিতে বলেন । কিন্তু তিনি বলেন যে, গোলোকগঞ্জ মঠে থেকে আমি শ্রীমন্নহাপ্রভুর লীলাঙ্গলী শ্রীগৌরধাম—শ্রীনবদ্বীপের স্মরণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিব । নচেৎ ধামে থেকেও বহির্চিন্তায় আমাকে ধাম ও নাম স্মরণ করিতে দিবেন কিনা বুঝিতে পারিতেছি না । গোলোকগঞ্জই আমার সেবার স্থান এবং সে-স্থান হইতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা ও ধামের স্মরণ যেন আমার জাগরিত থাকে—ইহাই আমার মনোহরীষ্ট ।

তাই তিনি শ্রীগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন এবং অল্পদিন-মধ্যেই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব ও ধামের কথা বলিতে বলিতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন । তাঁহার অন্তর্দ্বানে সমিতি একজন স্বেচ্ছা নিষ্ঠাবান্ সেবক হারাইলেন । তিনি আমাদের প্রতি অহৈতুকী রূপাবর্ষণ করুন —যাহাতে আমরাও তাঁহার গায় সেবাময় জীবন লাভ করিতে পারি ।

—জনৈক বিরহী

ভ্রম-সংশোধন

বর্তমান ৮ম সংখ্যার ২৮৮ পৃষ্ঠার পর ভুলবশতঃ পৃষ্ঠা নং ২৭৯ হইতে ২৯৪ মুদ্রিত হইয়াছে । উহা ২৮৯ হইতে ৩০৪ পৃষ্ঠা হইবে ।

—প্রকাশক

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির

সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক মহারাজের পাশ্চাত্যদেশে

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম-প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহ-সভাপতি এবং সাধারণ-সম্পাদক মদীয় শিক্ষাগুরুদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ সপ্তমপুতি দিবস পাশ্চাত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত প্রেমধর্মের প্লাবন ঘটাইয়া সর্গোরবে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। প্রচার-যাত্রার প্রাকালে শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য—অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ এবং শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক—অস্মদীয় শিক্ষাগুরু শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের শুভেচ্ছা, অস্মদীয় উর্দ্ধতন গুরুবর্গ—পরিব্রাজকাচার্য ১০৮শ্রী শ্রীমন্ত্তিসৌরভ সার গোস্বামী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য ১০৮শ্রী শ্রীমন্ত্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য ১০৮শ্রী শ্রীমন্ত্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ষাদ এবং সর্বোপরি নিজ আরাধ্যদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংসকুলচূড়ামণি ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্ত্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অহৈতুকী কৃপাশীর্ষাদ গ্রহণ করেন।

বিগত ২২শে বৈশাখ, ১৪০৩, (ইং ৫ ৫।২৬) রবিবার দিল্লী হইতে শুভযাত্রা করিয়া হল্যাণ্ডের রাজধানী আমস্টারডামে পৌঁছান। হল্যাণ্ডে **The Hauge (International Court of Justice)-এ, Utrecht, Rijswijk, Lekkerkark, Bovenluwen** প্রভৃতি স্থানে শ্রীল মহারাজ বক্তৃতা প্রদান করেন। জার্মান, স্পেন, ইটালী, ডেনমার্ক, পোল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের বহু ভক্ত হরিকথা শ্রবণ করিতে আসিয়াছিলেন। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, খেলাধুলা প্রভৃতিতে হল্যাণ্ড ভারতবর্ষ অপেক্ষা উন্নত হইলেও সময়ের ব্যবধানে সাড়ে তিন ঘণ্টা পিছনে রহিয়াছে এবং সমস্ত পাশ্চাত্যদেশ পারমাণ্বিক দিক দিয়া বহু পিছনে থাকিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারধারা শ্রবণের অত্যাৎকণ্ঠা উৎসাহ পাশ্চাত্যের সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়।

৩।৫।২৬ তারিখে হল্যাণ্ডের **Driebergen Rysenburg**, ৭।৫।২৬ তারিখে আমস্টারডামের অন্তর্গত **Sportstrart** এ এবং সন্ধ্যায় **Plato School of Philosophy**-তে হরিকথা প্রসঙ্গে ম্যাক্সমুলার (**Max Muller**)-এর মত খণ্ডন, পাশ্চাত্য দর্শনের হেয়তা, অল্পপাদেয়তা, অবয়বতা প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মসুত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য, গায়ত্রীর ভাষ্য ও বেদের তাৎপর্যদ্বারা সম্বন্ধিত প্রমাণ-শিরোমণি অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের “কর্মণ্যারভমানানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।

পশ্চাৎ পাকবিপর্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃনাম্ ॥” শ্লোকের তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এই স্থানে হল্যাণ্ডের সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিজীবীগণ বাস করেন। ধর্মসভার ব্যবস্থাপক ও কর্তৃপক্ষগণ শ্রীল মহারাজের বক্তৃতাতে মুগ্ধ হইয়া বিতালয়ের প্রধানকক্ষে শ্রীল মহারাজের আলোকচিত্র স্থাপন করেন এবং হল্যাণ্ডে বারবার আগমনের আমন্ত্রণ জানান। **School-এর Rector Paul G Van Oyen** শ্রীল মহারাজকে স্বাগত সম্ভাষণ করেন। ৮।৫।২৬ তারিখে পূর্বাহ্নে **Boven Luwen-এ** এবং সাংকালে বিশ্বের বৃহত্তম পোতাশ্রয় **Rotterdam Auditorium-এ** (পাতঞ্জল যোগ সেন্টারের নিকট) হরিকথা প্রসঙ্গে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের ব্যাখ্যাস্তে ভক্তিযোগের উৎকর্ষতা প্রদর্শন করেন এবং ভক্তিযোগের দ্বারাই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হন, তাহা বর্ণন করেন। এজন্য কর্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে ঔদার্যময় বিগ্রহ শ্রীমন্নহাপ্রভু ‘এহো বাহ’ এবং শুদ্ধাভক্তিকে ‘এহো উত্তম’ ইত্যাদি বলিয়াছেন।

২।৫।২৬ তারিখে পূর্বাহ্নে শ্রীনাম-দীক্ষা অনুষ্ঠান এবং সন্ধ্যায় **Boven Luwen** এ, ১০।৫।২৬ **Lekkerkark-এ**, ১১।৫।২৬ **Den Hag (The Hauge—International Court of Justice)-এ** এবং সন্ধ্যায় **Rijswijk-স্থিত** সেবাদাম মন্দিরে হিন্দীভাষায় ‘ভগবন্তজনের প্রয়োজনীয়তা’ প্রসঙ্গে আধুনিক শিক্ষার অনুপাদেয়তা দর্শাইয়া ভারতীয় সংস্কৃতিতে সৎগুরু মহিমা-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া প্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যানদ্বারা শ্রীনারদ ঋষির শিক্ষাদানের উৎকর্ষতা এবং শুক্রাচার্যের আনুগত্যে ষণ্ডামর্কের শিক্ষার হেয়তা বর্ণন করেন। ষোঁমার বয়স হইতে যে হরিঃজন করা আবশ্যক, তাহা আলোচনা করেন।

১২।৫।২৬ তারিখে পূর্বাহ্নে **Boven Luwen-এ**, অপরাহ্নে **Soest-এ** এবং রাত্রে **Amersfoort-এ** হরিকথা প্রসঙ্গে যথাক্রমে শ্রীমন্নিষ্ঠ্যানন্দ প্রভুর মহিমা, সংস্কার মহিমা ও ব্রহ্মমোহনলীলার রহস্য বর্ণন করেন। ১৩।৫।২৬ তারিখে **Den Hag-এ** ‘মনুষ্য জীবনই ভজনের মূল’, অণু কোন জন্মে যে অসম্ভব, তাহা যুক্তি-তত্ত্বসিদ্ধান্তদ্বারা প্রমাণ করেন। ১৪।৫।২৬ **Den Hag-এর** বিভিন্নস্থানে পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ন ও রাত্রিতে ভাষণ প্রদান করিয়া ১৫।৫।২৬ তারিখে আমস্টারডাম বিমান বন্দর হইতে রওনা হইয়া লণ্ডনের বৃহত্তম বিমানবন্দর **Heathrow-তে** অবতরণ করিলে ইংল্যান্ডবাসী ভক্তবৃন্দ শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল, করতালের ধ্বনিতে মহামন্ত্রযোগে পুষ্পমাল্যদ্বারা শ্রীল মহারাজকে সাদর অভিনন্দন জানান। (ক্রমশঃ)

—শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, বিতালকার

॥ শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমন্ত্ৰিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
২৮শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব



নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।

শ্রীশ্রীমন্ত্ৰিপ্রজ্ঞান কেশব ইতি নামিনে ॥

শ্রীদেবা নন্দ গৌড়ীয় মঠ

শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

ফোন—৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

২১ ছষীকেশ, ৫১০ শ্রীগৌরানন্দ

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবনুতিপূর্ববিকেষম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ববিকেষম্—

আগামী ২৯শে পদ্যনাভ, ৯ই কার্তিক, ১৪০৩ (২৬।১০।৯৬) শনিবার
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী গৌড়ীয় মঠসমূহের
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্বদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমন্তকিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথিপূজা
উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ২৮শ বর্ষপূর্তি
বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে ।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে
আপনি সবাঙ্কবে যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার
দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা । পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের
ক্রটি মাজ্জনীয় । ইতি—১লা আশ্বিন, ১৪০৩

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

নভ্যবন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—: সেবা-সূচী :—

৯ই কার্তিক (ইং ২৬।১০।৯৬), শনিবার—

প্রাতে—মহাজন-পদাবলী কীর্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের
অতিমর্ত্য চরিত্র আলোচনা ।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ ।

অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন ।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবাসুকুল্য প্রেরণ করিতে হইলে
“সাধারণ-সম্পাদক”-এর নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ,
জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য ।

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিষ্মশূন্য ॥

অস্ত ধর্ম সৃষ্টরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই ভ্রম ॥

৪৮শ বর্ষ } ২১ দামোদর, ক্ষীরোদশায়ী, ৫১০ শ্রীগোরাঙ্গ
৩০ কার্তিক, শনিবার, ১৪০৩, ইং ১৬/১১/৯৬ { ৯ম সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রীশ্রীমুকুন্দাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীশ্রীমুকুন্দায় নমঃ

বলভিভূপল-কান্তি-দ্রোহিণি শ্রীমদঙ্গে

ঘুম্ভণ-রস-বিলাসৈঃ সৃষ্টু-গান্ধর্বিকায়্যাঃ ।

স্বমদন-নৃপ-শোভাং বর্দ্ধয়ন্ দেহ-রাজ্যে

প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূজিৎ মুকুন্দঃ ॥ ১ ॥

ইন্দ্রনীলমণির ঘণাকারী স্বীয় অঙ্গস্থিত কুকুম রনের বিলাসদ্বারা শ্রীরাধার দেহরাজ্যে যিনি স্বীয় মদন-নৃপতির শোভা সুন্দররূপে বর্দ্ধন করিতেছেন অর্থাৎ অত রাজ্যও যেমন প্রজার বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত সর্বদাই রাজ্যমধ্যে ভ্রমণ

করিতে করিতে রাজ্যস্থ উত্তম উপকরণ প্রজার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া আপনার শোভা বৃদ্ধি করেন, তদ্রূপ যিনি শ্রীরাধার দেহ-রাজ্যস্থিত কুঙ্কুমোপকরণ আলিঙ্গনদ্বারা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় শোভাকে বৃদ্ধি করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥ ১ ॥

উদিত-বিধু-পরাদ্বি-জ্যোতিরুল্লজ্জি-বক্তে,
নব-তরুণিম-রজ্যদ্বাল্য-শেষাতিরম্যঃ ।
পরিষদি ললিতালীং দোলয়ন্ কুণ্ডলাভ্যাং
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥ ২ ॥

যাহার বদন পরাদ্বি-সংখ্যক সমুদিত চন্দ্রের কান্তিকে উল্লঙ্ঘন করিতেছে, যাহার নবতরুণ্যদ্বারা বাল্যাবস্থার শেষভাগ রঞ্জিত হইয়াছে অর্থাৎ তদ্বারা যিনি রমণীয় হইয়াছেন এবং যিনি কুণ্ডল-যুগলদ্বারা সখী-সমাজে ললিতার বয়স্থা শ্রীরাধাকে চঞ্চল করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥ ২ ॥

কনক-নিবহ-শোভা-নিন্দি পীতং নিতম্বে
তদুপরি-নব-রক্তং বস্ত্রমিখং দধানঃ ।
প্রিয়মিব কিল বর্ণং রাগযুক্তং প্রিয়ায়াঃ
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥ ৩ ॥

যিনি নিতম্ব-দেশে কনকরাশি বিনিদিত পীতবসন এবং তদুপরি রক্তবস্ত্র এই প্রকারে ধারণ করিয়াছেন যে, তাহাতে যেন প্রিয়তমা শ্রীরাধার প্রিয় রাগযুক্ত বর্ণ বলিয়া নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥ ৩ ॥

সুরভি-কুসুম-বৃন্দৈর্বাসিতান্তঃ-সমুদ্রে
প্রিয়-সরসি নিদাঘে সায়মালী-পরীতাম্ ।
মদন-জনক-সেকৈঃ খেলয়ন্তেব রাধাং
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥ ৪ ॥

রাধাকুণ্ডে গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ন-সময়ে সখীগণ পরিবৃত্তা শ্রীরাধাকে, যিনি সুরভি-কুসুমে সুবাসিত স্ততরাং কামোৎপাদক জলসেচনদ্বারা ক্রীড়া করাইতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥ ৪ ॥

পরিমলমিহ লব্ধ্বা হস্ত গান্ধবিকায়াঃ
পুলকিত-তনুরুচৈরুদন্তংক্ষণেন ।

নিখিল-বিপিন-দেশাধাসিতানেব জিহ্বন্

প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্তিঃ মুকুন্দঃ ॥ ৫ ॥

কি আশ্চর্য্য! এই শ্রীরাধাকুণ্ডমধ্যে শ্রীরাধার অঙ্গ-পরিমল লাভ করিয়া
ভৎসনাৎ পুলকিত-তনু ও উন্নত হইয়া যিনি নিখিল বনপ্রদেশ হইতে সমাগত
ও সুবাসিত গন্ধসমূহ আশ্রয় করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট
পূর্ণ করুন ॥ ৫ ॥

প্রণিহিত-ভুজ-দণ্ডঃ স্বক্কদেশে বরাজ্যাঃ

স্মিত-বিকসিত-গণ্ডে কীর্তিদা কণ্ঠকায়াঃ ।

মনসিজ-জনি-সৌখ্যং চুষ্মনেনৈব তম্বন্

প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্তিঃ মুকুন্দঃ ॥ ৬ ॥

উত্তমাসী কীর্তিদা-কণ্ঠা শ্রীরাধার স্বক্কদেশে ভুজদণ্ড স্থাপন করিয়া যিনি তদীয়
স্মিত-বিকসিত গণ্ড-প্রদেশে চুষ্মন করিয়াই কন্দর্পজন্তু সুখ বিস্তার করিতেছেন,
সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥ ৬ ॥

প্রমদ-দম্বুজ গোষ্ঠ্যাঃ কোহপি সম্বর্তবহ্নি-

ব্রজভূবি কিল পিত্রোর্মৃতিমান্ স্নেহপুঞ্জঃ ।

প্রথম-রস-মহেন্দ্রঃ শ্যামলো রাধিকায়্যঃ

প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্তিঃ মুকুন্দঃ ॥ ৭ ॥

যিনি বৃন্দাবনে মদমত্ত দানবগণের অনির্বচনীয় প্রলয়াগ্নি, পিতামাতা নন্দ-
যশোদার মৃতিমান্ স্নেহরাশি এবং যিনি রাধার সম্বন্ধে শ্যামবর্ণ রসরাজ শৃঙ্গার-
স্বরূপ, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥ ৭ ॥

স্বকদন-কথয়াঙ্গীকৃত্য মৃদ্বীং বিশাখাং

কৃতচটু-ললিতান্ত প্রার্থয়ন্ প্রৌঢ়শীলাম্ ।

প্রণয়-বিধুর-রাধা-মান-নির্বাসনায়

প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্তিঃ মুকুন্দঃ ॥ ৮ ॥

প্রণয়-বিকলা শ্রীরাধার মানভঞ্জন-নিমিত্ত স্বীয় পরমোদ্বেগ কথায় যিনি মৃদু
স্বভাবা বিশাখাকে অঙ্গীকার করিয়া প্রগল্ভ-স্বভাবা ললিতাকে চাটুবাক্যে প্রার্থনা
করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥ ৮ ॥

পরিপঠতি মুকুন্দশ্রাষ্টকং কাকুভির্ঘঃ

ফুটমিহ বিষয়েভ্যঃ সংনিয়ম্যেদ্রিয়ানি ।

ব্রজনব-যুবরাজো দর্শয়ন্ স্বং সরাধং

স্বজন-গণন-মধ্যে তং প্রিয়ায়াস্তনোতি ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়-সংযমনপূর্বক স্পষ্টরূপে চাটুবাফ্যে এই মুকুন্দাষ্টক পাঠ করেন, ব্রজের নবীন যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত মিলিত স্বীয় শ্রীমূর্তি দর্শন করাইয়া শ্রীরাধার স্বজনের মধ্যে তাঁহাকে পরিগণিত করেন ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮৮ পৃষ্ঠার পর]

১। ভাব কাহাকে বলে ? উহা প্রেমভক্তির কোন্ অবস্থা ?

“প্রেমভক্তিই সাধন-ভক্তির কল । প্রেমভক্তির দুইটী অবস্থা,—প্রথমাবস্থা—‘ভাব’ এবং দ্বিতীয়াবস্থা—‘প্রেম’ । ‘প্রেম’কে সূর্য্যের সহিত উপমা করিলে ‘ভাব’ তাহার কিরণস্বরূপ বলা যায় । ভাব—বিশুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ, রুচি দ্বারা চিত্তকে মগ্ন করে । পূর্বে যে ভক্তি-সামান্য-লক্ষণে কৃষ্ণানুশীলন-কার্য্যের উল্লেখ আছে, তাহাই যে-অবস্থায় বিশুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ হয় এবং রুচির দ্বারা চিত্তকে মগ্ন করে, সেই অবস্থাকে ‘ভাব’ বলা হয় । ভাব মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া মনোবৃত্তির স্বরূপতা লাভ করে । তদ্বৎ ভাব স্বয়ং প্রকাশরূপ, কিন্তু মনোবৃত্তিগত হইয়া প্রকাশরূপে ভাসমান হয় ।” —চৈঃ শিঃ ৫।১

২। বৈধ-সাধনাভিনিবেশজ ও রাগানুগ-সাধনাভিনিবেশজ ভাবের উদাহরণ কি কি ?

“শ্রীমন্নরদের জীবনই বৈধ-সাধনাভিনিবেশজ ভাবের উদাহরণ ; পদ্মপুরাণোক্ত রাগানুগা ভক্তা স্ত্রীর ভাব-প্রাপ্তিই রাগানুগ-সাধনাভিনিবেশজ ভাবের উদাহরণ ।”

—চৈঃ শিঃ ৫।১

৩। ভাবভক্তের জীবনে কি কোনও অবৈধ-কার্য্য দৃষ্ট হয় ?

“ভাব-জীবন যে বৈধজীবনের এককালীন পরিবর্তন করে, তাহা নয় ; কিন্তু ভাবুকের কার্য্যসকল বিধি-স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয় । প্রকৃতিস্থ পূর্ণরতি তাহার সমস্ত কার্য্যের নিয়ামক হয় । ভাবুক স্বৈর-ভাবাপন্ন হইলেও তাঁহার দ্বারা কোন উৎপাতের সম্ভাবনা নাই । আদৌ ভাবুকের কোনপ্রকার পুণ্য-পাপে রুচি থাকে

না, কর্তব্য কৰ্ম বলিয়াও ভাবুক কোন কৰ্ম করেন না, কাহারও অনুকরণ করিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না ; শরীর, মন, আত্মা, সমাজ ইত্যাদির সংরক্ষণ-ক্রিয়া পূৰ্ব্ব-পূৰ্ব অভ্যাসবশতঃ অনায়াসেই হইয়া থাকে। পুণ্যকার্যেই যখন তাঁহার তাচ্ছিল্য, তখন পাপ-কার্য্য কোনপ্রকারেই তাঁহার দ্বারা সম্ভব হয় না।”

—চৈঃ শিঃ ৫।১

৪। ভাবভক্তের প্রতি অবজ্ঞা-ফলে বৈধ-ভক্তের কি গতি হয় ?

“জাতভাব-ব্যক্তি সর্বতোভাবে কৃতার্থ। তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা করিলে বৈধ-ভক্তের ভক্তিধন ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। ভাবভক্তের জীবন সাধন-ভক্তের জীবনের প্রায় সদৃশ।”

—চৈঃ শিঃ ৫।১

৫। ভাবোদয়ে কি কি বাহ্য-লক্ষণ প্রকাশ পায় ?

“প্রেমের প্রথমাবস্থা ‘ভাব’ নাম তার।

পুলকাশ্চ স্বল্প হয় সাত্ত্বিক বিকার ॥”

—ভঃ রঃ ষষ্ঠ্যামসাধন, ‘ভাব’

৬। ভাবাকুরের উদয়ে কি কি অন্তঃভাব লক্ষিত হয় ?

“ক্ষোভের কারণ সত্ত্বে ক্ষোভ নাহি হয়।

সদা কৃষ্ণ ভজে, নাহি করে কালক্ষয় ॥

কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি সদা রয়।

মান থাকিলেও অভিমানী নাহি হয় ॥

অবশ্য পাইব কৃষ্ণকৃপা—আশা করে।

কৃষ্ণ ভজে অহরহঃ ব্যাকুল-অন্তরে ॥

হরেকৃষ্ণ-নামগানে রুচি নিরন্তর।

শ্রীকৃষ্ণের গুণাখ্যানে আসক্তি বিস্তর ॥

প্ৰীতি করে সদা কৃষ্ণবসতির স্থানে।

এই অন্তঃভাব ভাবাকুর বিজ্ঞমানে ॥”

—ভঃ রঃ ষষ্ঠ্যামসাধন, ‘ভাব’

৭। ভাবভক্তে অষ্টসাত্ত্বিক উদিত হয় কি ?

“স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, কম্প, স্বর-ভেদ।

বৈবৰ্ণ্য, প্রলয়, অশ্রুবিকার—প্রভেদ ॥”

—ভঃ রঃ ষষ্ঠ্যামসাধন, ‘ভাব’

৮। ভাবভক্ত কিরূপভাবে জীবন যাপন করেন ?

“লজ্জা ছাড়ি’ কৃষ্ণনাম সদা পাঠ করে।

কৃষ্ণের মধুর লীলা সদা চিতে স্মরে ॥

তুষ্টমনাঃ, স্পৃহা-মদ-শৃণু, বিমৎসর ।
জীবন যাপন করে কৃষ্ণেচ্ছা-তৎপর ॥”

—ভঃ রঃ ষষ্ঠ যামসাধন, ‘ভাব’

৯। ভাবভক্তের বেদ-লোকবাহু আচরণ কিরূপ ?

“ভাবোদয়ে কভু কঁাদে, কৃষ্ণচিন্তা-ফলে ।
হাসে আনন্দিত হয়, অলৌকিক বলে ॥
নাচে গায়, কৃষ্ণ-আলোচনে স্থখ পায় ।
লীলা অনুভবে হয়, তুষ্টীভূত প্রায় ॥”

—ভঃ রঃ ষষ্ঠ যামসাধন, ‘ভাব’

১০। ভাবভক্ত কি শ্রীশ্যামসুন্দরের দর্শন পান ?

“ক্ষণে ক্ষণে দেখে শ্যাম হিরণ্য-বলিত ।
বনমালা, শিখিপিঞ্জ, ধাত্বাদি-মণ্ডিত ॥
নটবেশ, সান্নিধ্য-ক্লে গুস্ত পদ্মকর ।
কর্ণভূষা, অলক-কপোলে স্মিতাধর ॥”

—ভঃ রঃ ষষ্ঠ যামসাধন, ‘ভাব’

১১। ভাবভক্ত-হৃদয়ে ভগবদ্ভগ্ন কিরূপভাবে স্মৃতি লাভ করে ?

“কি পুণ্যে কালীয় পায় পদরেণু তব ।
বুঝিতে না পারি কৃষ্ণ-কৃপার সম্ভব ॥
যাহা লাগি’ লক্ষ্মীদেবী তপঃ আচরিল ।
বহুকাল ধৃতব্রতা কামাদি ছাড়িল ॥”

—ভঃ রঃ ষষ্ঠ যামসাধন, ‘ভাব’

১২। সহজ-বৈরাগ্যবান্ ভাবভক্তের কিরূপ দৈন্য ও সিন্ধি-লালসা উদ্ভিত হয় ?

“দুস্ত্যজ্য আর্ঘ্য-পথ স্বজন ছাড়ি’ দিয়া ।
শ্রুতিমৃগ্য কৃষ্ণপদ ভজে গোপী গিয়া ॥
আহা ! ব্রজে গুল্ম-লতা-বৃক্ষ-দেহ ধরি ।
গোপীপদরেণু কি সেবিব ভক্তি করি ??”

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামসাধন, ‘ভাব’

১৩। রূঢ়ভাবাপন্ন গোপিকাগণের কি ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা আছে ?

“ভবভীত মূনিগণ আর দেবগণ ।
ঐহার চরণ-বাঁজা করে অনুক্ষণ ॥

সে গোবিন্দে রুচ্যতাপন্ন গোপী ধন্য ।

কৃষ্ণরস আগে ব্রহ্ম-জন্ম নহে গণ্য ॥”

—ভ: র: ষষ্ঠ যামসাধন, ‘ভাব’

১৪। জাতভাব-ব্যক্তি কোন্ বিষয়ে আসক্তি প্রকাশ করেন ?

“জাতভাব-পুরুষ ভগবদ্গুণাখ্যানে সর্বদা আসক্তি প্রকাশ করেন ।”

—চৈ: শি: ৫।২

ভক্ত্যঙ্গ

১। পরমার্থ বস্তুটি কি ?

“ভগবানের শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকেই ‘পরমার্থ’ বলা যায় না ।”

—‘প্রয়াস’, সং: তো: ১০।৯

২। ভক্তিব্রত-সমূহ কি নিরর্থক ?

“ভক্ত্যঙ্গ-ব্রতসমূহ বৃথা প্রয়াস নয় ।”

—‘প্রয়াস’, সং: তো: ১০।৯

৩। সর্বশ্রেষ্ঠ পঞ্চাঙ্গ সাধন কি ?

“শ্রীমূর্তিসেবা, রসিক-জনের সহিত ভাগবতের অর্থ-আন্বাদন, সজাতীয় বাসনা-দ্বারা স্নিগ্ধ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ, নাম-সংকীৰ্ত্তন ও মথুরাবাস—এই পাঁচটি অঙ্গ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ইহাতেও সংক্ষেপ করিতে গেলে শ্রীনাম-সংকীৰ্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবাই সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে ।”

—‘তত্ত্বকর্মপ্রবর্তন’, সং: তো: ১১।৬

৪। শ্রীতুলসীর ভজন কয় প্রকার ?

“তুলসীর দর্শন, তুলসীর স্পর্শন, তুলসীর ধ্যান, তুলসীর কীৰ্ত্তন, তুলসীর নমস্কার, তুলসীর মাহাত্ম্য-শ্রবণ, তুলসীর রোপণ, তুলসীতে জলসেবা, তুলসীর পূজা—এই নয় প্রকার তুলসীর ভজন ।”

—‘তত্ত্বকর্মপ্রবর্তন’, সং: তো: ১১।৬

৫। তদীয় সেবার মধ্যে কোন্টি প্রধান ?

“তুলসী-সেবা—তদীয় সেবার মধ্যে প্রধান ।”

—‘তত্ত্বকর্মপ্রবর্তন’, সং: তো: ১১।৬

৬। শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমণ কাহার আনুগত্যে করা উচিত ?

“গৌর আমার, যে-সব স্থানে, করল ভ্রমণ রঙ্গে ।

সে-সব স্থান, হেরিব আমি, প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥”

—শ:

৭। ভক্ষ্যাচ্ছাদন-প্রাপ্তি ও অপচয়ে ভক্তের কর্তব্য কি ?

“যদি ভক্ষ্য ও আচ্ছাদন না পাওয়া যায় বা প্রাপ্ত হইয়া হাত-ছাড়া হয়,

তাহাতে ভক্তের কোন বিকার হওয়া উচিত নয় ; শান্তমতি হইয়া কৃষ্ণস্বরূপে নিযুক্ত হইবেন ।” —‘তত্ত্বকর্মপ্রবর্তন’, সঃ তোঃ ১১।৬

৮। শ্রেষ্ঠ সাধন-পঞ্চকের অন্তর্শীলনে কোন্ বিষয়ে লোভ জন্মে এবং তাহার ফলই বা কি ?

“শ্রীমূর্ত্তিসেবা, রসিকগণের সহিত শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যাস্বাদন, আপন হইতে শ্রেষ্ঠ রাগমার্গীয় সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন ও শ্রীমথুরামণ্ডলে স্থিতি—নিরপরাধ-চিত্তের সহিত এই পঞ্চাঙ্গ-সাধনের সম্বন্ধানুষ্ঠান করিলে যে স্বকৃতি হয়, তদ্বারা প্রাপ্ত সংকুপা-প্রভাবে রাগপ্রাপ্ত ব্রজবাসিনগণের কৃষ্ণরূপ ইষ্টের দাস্ত্রে পুরুষের (সাধকের) লোভ জন্মে । সেই লোভ হইতে ব্রজবাসীর ভাবানুগা কৃষ্ণসেবারূপা রাগানুগা-নামে বেদান্তীতা সাধন-ভক্তি উদ্ভিত হয় । সেই ভক্তি সাধন করিতে করিতে স্বল্পকালের মধ্যে বিমুক্তা অর্থাৎ কেবলা প্রীতি উদ্ভিত হইয়া পড়ে,— ইহাই শ্রীমন্নহাপ্রভুর গূঢ় শিক্ষা ।” —শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদামন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে

শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্র-রত্নমালা

(বঙ্গানুবাদ-সহ)

আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন ।

“শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট”-এর অনুকূলে প্রদত্ত যাবতীয় দান আয়কর-মুক্ত । চেক্, ড্রাফট্, মানি অর্ডার ইত্যাদি “শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট” (Shri Goudiya Vedanta Samiti Trust) এর অনুকূলে প্রদেয় ।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথায়ত

কৃষ্ণ পরমচেতনময় । শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ । যদি জড়ের কথা কাণে লইয়া কৃষ্ণকথা শুনিতে যাই, শ্রীশুক্রপাদপদ্ম ও শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের কথাকে তিক্ত মনে করি, তাহা হইলে কোনদিনই অমঙ্গলের হাত হইতে উদ্ধার পাইব না ।

শ্রীশুক্রদেব গৌরাভিন্নবিগ্রহ । তিনি শ্রীগৌরান্দ্র হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব, গৌরান্দ্রের প্রকাশবিগ্রহ । তিনি আশ্রয়-জাতীয় ভগবত্তত্ত্ব ।

শ্রীবার্ধভানবী সর্বতোভাবে কৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁহার গায় শ্রীকৃষ্ণের সেবক আর কেহই হইতে পারে না । শ্রীবার্ধভানবীতে সমস্ত বিচার শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ সেবার জ্ঞান পূর্ণভাবে রহিয়াছে ।

কৃষ্ণ একমাত্র অর্থ অর্থাৎ নিত্য রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দযুক্ত নিত্য বাস্তববস্তু অর্থাৎ চিন্তনীয় ব্যাপার, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু—শ্রীকৃষ্ণ চক্ষুদ্বারা দর্শনযোগ্য বস্তু, কর্ণদ্বারা শ্রবণযোগ্য বস্তু, নাসিকাদ্বারা আত্মাণযোগ্য বস্তু, ত্বকের দ্বারা স্পর্শযোগ্য বস্তু সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ; কিন্তু ঐ কৃষ্ণবস্তু কাহার ও কোন্ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার ? তিনি কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার নহেন । যাহার দ্বারা মাপিয়া লওয়া যায়, তাহার নাম মায়া । অধোক্ষজ বা অতীন্দ্রিয় বস্তুকে মায়া মাপিয়া লইতে পারে না । অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন না ।

চৈতন্যচন্দ্রের কৃষ্ণকথা যে পরিমাণে বাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে চৈতন্যের সেবায় লুপ্ত হইয়াছেন । যিনি পূর্ণভাবে সেই পরিপূর্ণ চেতনবিগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছেন । শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বোলকলাবিশিষ্ট পরিপূর্ণ বস্তু ; সুতরাং তাঁহার চেতনময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে বোল আনা তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে । যিনি আংশিকভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজকে প্রদান করিয়াছেন । যতদিন পর্য্যন্ত জীব দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্র, কায়মনোবাক্য—যথাসর্বস্বদ্বারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবায় নিরন্তর উন্মত্ত না হইয়াছে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার বোল-আনা শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ করা হয় নাই, জানিতে হইবে ।

কৃষ্ণকীর্তন—ভবমহাদাবাগ্নিনির্কাপণকারী। কৃষ্ণকীর্তনেই একমাত্র চরম শ্রেয়োলাভ হয়। উহা পরমসিদ্ধ। কৃষ্ণকীর্তন বিদ্যাবধুজীবনস্বরূপ। লেখা-পড়া ও পাণ্ডিত্যের শেষ কথা—“শ্রীহরিনাম”। পণ্ডিত না হইলে হরিনাম হয় না।

যুগপর্যায়ে সত্যের অবনতি

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিটি যুগ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত। পরন্তু এই চারিযুগের মাহাত্ম্য সমান নহে—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। সত্যযুগে সত্যের পূর্ণপ্রকাশ বর্তমান ছিল, ক্রমশঃ সত্যের একপাদ করিয়া অবলোপ বর্ণিত হইয়াছে। ত্রেতায় সত্য তিনপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ এবং কলিতে সত্য একপাদ নির্দিষ্ট হইলেও তাহা ক্রমশঃ ক্ষয়িষ্ণু হইয়া অবলোপমুখী। সুতরাং কলিকালে মিথ্যার দুন্দুভিনিদা সর্বত্রই প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষানীতি—সর্বত্র সত্যের অবলোপ এবং মিথ্যার তাণ্ডব অশ্বীকার্য্য নহে। একরূপ পরিস্থিতিতে হীনতাকে শ্রেষ্ঠতা বলিয়া সর্বত্রই সমাদৃত দেখা যাইতেছে। ধর্মজগতে ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব এমনকি অস্তিত্ব নাই বলিয়া বিচারের প্রাবল্য। সবার উপরে মানুষ তাহার উপরে কেহই নাই বাক্যে এবিধ মতবাদের প্রতিধ্বনি।

যজ্ঞার্থং কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচার ॥

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেঘ বোহস্তিষ্টকামধুক ॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ ।

পরস্পরং ভাবয়ন্তুঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্যথ ॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।

তৈর্দত্তানশ্চদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিঞ্চিভৈঃ ।

ভুঙ্কতে তে ত্বং পাপা যে পচন্ত্যত্মকারণাং ॥

ঈশ্বরের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। অতএব, তুমি ভগবানের উদ্দেশ্যে অনাসক্ত হইয়া বর্ণাশ্রমোচিত সর্ব কর্ম কর। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা সদা সমৃদ্ধ হও; এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্টপ্রদানে কামধেনুতুল্য হউক। এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা ইন্দ্রাদি দেবগণকে সংবর্দ্ধনা কর এবং দেবতাগণও তোমাদিগকে বৃষ্টাদিদ্বারা শস্ত্রাদি উৎপাদনপূর্ব্বক অনুগ্রহীত করিবেন। এইরূপ পরস্পরের ভাবনাদ্বারা তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করিবে। দেবতাগণ যজ্ঞদ্বারা আরাধিত হইয়া তোমাদিগকে বাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তু প্রদান করিবেন। সুতরাং এই দেবতাপ্রদত্ত বস্তু দেবতাদিগকে নিবেদন না করিয়া যিনি ভোগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই চোর। যে-সকল সদাচারি-ব্যক্তি যজ্ঞাবশেষ (নিবেদিত অন্ন) ভোজন করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। পাপিগণ কেবল নিজের জন্য অন্নপাক করত পাপ-ভোজন করে।

গীতাশাস্ত্রে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মানুষকে সবার শ্রেষ্ঠ বলেন নাই। মনুষ্য অপেক্ষা দেবতাদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বশাস্ত্রেই কীৰ্ত্তিত আছে। দেবতাদের আরাধনাদ্বারা মনুষ্য আহাৰ্য্যাদি জীবিকা স্ফুটভাবে লাভ করে। দেবতারা মনুষ্যের বহুবিধ কামনা-বাসনা পূরণ করেন বলিয়া সনাতন ধর্মে দেবপূজার বিধি বর্তমান। দেবতারা শারীরিক, মানসিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে মানুষ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদিগকে মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ না বলিলে সত্যের অপলাপ অবশ্যই হইবে। মানুষকে সবার উচ্চ স্থান দেওয়া কখনই সত্য হইতে পারে না। পরন্তু কলিকালে এরূপ অসত্য মতবাদ সর্বত্র সমাদৃত দেখা যায়।

ভগবত্ত্ব বিষয়েও এইপ্রকার সত্যের পরিপন্থী মতবাদ কলিতে প্রবল। ভগবানকে মানুষ এবং মানুষকে ভগবান্ বলা এই কলিযুগের সার্বজনীন মতবাদ। এমন কি ভগবান্ শব্দ উচ্চারণ বা তাঁহার নাম গ্রহণ করা অভদ্রতা বা অসত্যতা বলিয়া বর্তমান উন্নতাভিমানী ব্যক্তিদের বিচার। মনুষ্যজাতির ইন্দ্রিয়তর্পণ করাই যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উন্নতের সেবা না করিয়া অনুন্নতের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাই বর্তমান কলিযুগের প্রচাৰ্য্য বিষয়। দীনদরিদ্রের সুখবিধানের নামে তাহাদের গ্ৰায্য প্রাপ্যে বঞ্চিত করিয়া আত্মসাৎরূপ কপটতাই মহানুভবতারূপে সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছে। সরকার প্রদত্ত অর্থাদির যৎকিঞ্চিৎ দুর্গতের জন্য ব্যয় করত পত্রিকাদিতে বিস্তৃত বিবরণী মহানুভবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শাস্ত্রোক্ত “মহৎসেবাং দ্বারমাহ বিমুক্তোঃ” বাক্যাদির পরিবর্তে দুষ্চরিত্রের ইন্দ্রিয়তোষণই মানবিকতার বিচার হইয়াছে। শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করাই যুগধর্ম্বে

পরিণত। ধনপতি, অভিনেতা ও অভিনেত্রী, নৃত্যকুশলী, ক্রীড়ানিপুণ ব্যক্তির আনুগত্যে ধর্মের উৎকর্ষ বিবেচিত হইতেছে। সুরশিল্পীদের নৈপুণ্যদ্বারা ধর্মোন্নতির প্রকাশ দৃষ্ট হইতেছে।

ভগবান্ কে?—তাহা লইয়া বাদানুবাদের কোনই আবশ্যকতা নাই। সকল ধর্মই এক বলিলে কোন গণ্ডাগাল নাই। কোন্ ধর্ম শ্রেষ্ঠ তাহার কি প্রয়োজন? এক ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলিলে অন্য ধর্মকে নিকৃষ্ট করা অহুদারতা। সব ধর্মই সমান বলিলে আর ধর্মাক্রান্ত নাই।—এই সমস্ত কথা অতীব মুখরোচক—সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে সত্যের অপলাপ, মিথ্যাকেই অঙ্গীকার করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে ইহাকে মূঢ়তা বলা হইয়াছে।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তন্মুমাশ্রিতম্।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ (গী: ৯।১১)

মূঢ়লোক আমার এই সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিকে মানব-তনু মনে করিয়া অবজ্ঞান করে। এই স্বরূপেই যে আমি সমস্ত ভূতের মহেশ্বর এবং জ্ঞান ও আনন্দময়, তাহা তাহারা জানিতে পারে না।

মায়াবদ্ধ জীব তাহার ইন্দ্রিয়দ্বারা ভগবানকে জানিতে পারে না। তাঁহার বিগ্রহকেও মনুষ্যদেহ অর্থাৎ সত্ত্ব-রজস্তমো গুণের বিকার বলিয়া মনে করে। তাহা যে ত্রিগুণাতীত ও অপ্রাকৃত তাহা বিশ্বাস ও অনুভব করিবার যোগ্যতা মায়াগ্রস্ত জীবের নাই। বদ্ধজীবের দেহ পাঞ্চভৌতিক বা ক্ষিত্যপভেজমক্করোম-দ্বারা নিষ্মিত। ভগবানের শ্রীবিগ্রহকেও বদ্ধজীব তাহাই বিচার করিয়া থাকে। তাহা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিস্ময় তাহা তাহার ইন্দ্রিয়দ্বারা বুঝা যায় না। এজন্যই তাঁহার মাহাত্ম্য বদ্ধজীব বুঝিতে অক্ষম। তাঁহাকে অস্ত্রশস্ত্রাদিদ্বারা নষ্ট বা বিনাশ করিবার দুর্কৌশল তাহাদের প্রকাশ পায়। তাঁহাকেও বদ্ধজীবের শ্রায় জন্ম ও মৃত্যুর অধীন মনে করে। তাঁহার ক্রিয়াকর্মও অপ্রাকৃত, তাহা বুঝা যায় না। ভগবান্ স্বয়ং এবং তাঁহার তত্ত্ববিদগণ তাহা প্রকাশ করিলেও বদ্ধজীব তাহা ধারণা বা বিশ্বাস করিতে সক্ষম হয় না। “জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহজ্জুন”। অর্থাৎ হে অর্জুন, আমার জন্ম ও কর্ম বদ্ধজীবের শ্রায় মায়িক নহে, তাহা অপ্রাকৃত; তাহা যখন জীব বুঝিতে সক্ষম হয় তখন সে মুক্তিলাভ করত ভগবদ্ধামে গমন করে। এরূপ স্পষ্ট উক্তিকেও জ্ঞানান্ধ ব্যক্তি তাঁহাকে অপ্রাকৃত বা সচ্চিদানন্দ বলিয়া জানিতে পারে না। তবে তাঁহার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া তাঁহার জন্ম-কর্মাদিকে রজস্তমোগুণাত্মক না বলিয়া

কেবল সাত্ত্বিকগুণের বিকার বলিয়া থাকে। পরন্তু ‘দিব্যম্’-শব্দে তাহা যে ত্রিগুণাতীত, সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব তাহার ধারণা হয় না। সর্বশ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের রূপায় তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার শ্রীবিগ্রহকে “স্বেচ্ছাময়স্ত ন তু ভূতময়স্ত” বলিয়া বর্ণনা করিলেও জ্ঞানাত্মক ব্যক্তির পেচকাত্ম-ভাবে আলোকাত্মতা প্রকাশ করে। তাঁহার দিব্যত্ব সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াও তাহার জ্ঞানোদয় বা সচ্চিদানন্দ-বোধ হয় না। পুতনার বিষপান, অত্যন্ত শিশুরূপের পদাঘাতে শকটাসুর নিধন, তৃণাবর্ষহনন, মাতা যশোদাদেবীকে ও অজ্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন, সর্বব্যাপক হইয়াও মা যশোদার বন্ধন স্বীকার, যমলাজ্জুন বৃক্ষোৎপাটন ও কুবের-পুত্রদ্বয়কে উদ্ধার, বৎসাসুর ও বকাসুর বধ, অঘাসুর মোচন ও ব্রহ্মবিমোহন, ধেনুকাসুর বধ, কালীয়া-কর্তৃক দংশন ও তাহাকে দমন, দাবানল পান, প্রলম্বাসুর বধ, ত্রিভুবনাকর্ষী বংশীবাদন, বস্ত্রহরণ লীলায় জিতেন্দ্রিয়তা প্রদর্শন, গোবর্দ্ধন ধারণ, বক্রণলোক হইতে নন্দমহারাজকে উদ্ধার, যমপুরী হইতে গুরুপুত্র উদ্ধার, দ্বারকাবাসী মৃত ব্রাহ্মণপুত্রের আনয়ন, রাসলীলা ও মহিষীবিবাহের প্রভাব প্রকাশ ও বৈভব প্রকাশ প্রভৃতি অপ্রাকৃত ও চিন্ময়লীলায় অচিন্ত্যশক্তিমত্তা প্রকটিত হইলেও তাঁহাকে সত্ত্বগুণময় বলিতে যাহাদের কুণ্ঠাবোধ হয় না তাহারা কতদূর মায়ামুগ্ধ তাহা বর্ণনাযোগ্য। এরূপ তত্ত্বাত্মক ব্যক্তির বর্ণিত ভগবান্ বা অবতার কতদূর সত্য হইতে পারে তাহাও বিচার্য। তাহারা জীবকে শিব, লক্ষ্মীছাড়াকে লক্ষ্মীপতি-নারায়ণ বলিয়া পূজার প্রচলনও করিতেছে। কাহাকেও অবতার, কাহাকে আবার যুগাবতার, কাহাকে বা ছন্দাবতার বলিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। কেহ বা কালধর্ম্মে নিজ নিজ গুরুকেই বিষয় ভগবান্ বলিতেছেন ও সুরহং মন্দির নির্মাণ করত মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া প্রচার চালাইতেছেন। কেহ বা কমিশন এজেন্টস্বরূপে গুরুর কার্য্যে জগন্মঙ্গলে ব্রতী হইয়াছেন। এগুলিকে কালগত সত্যের অবলুপ্তি বলিলে কি ভুল হইবে?

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর হইতে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি অবতার (?) আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ইহার বিশেষ কারণ, শ্রীচৈতন্যদেবকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া বিচার করিবার সৌভাগ্য অধিকাংশের হয় নাই। তাঁহাকে মনুষ্যবুদ্ধি ব্যতীত স্বয়ং কৃষ্ণতত্ত্ব বলিয়া বিশ্বাস করা ভাগ্যহীন ব্যক্তির পক্ষে প্রায় অসম্ভব। শাস্ত্রসমূহে বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার অবতার স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইলেও ভাগ্যহীন ব্যক্তি তাহা বিশ্বাস করিতে অক্ষম। তাঁহার অবতারিত্ব স্বীকৃত হইলে অন্তের পক্ষে অবতার হইতে বাধা কেন হইবে?—এরূপ বিচারই অধিকাংশস্থলে প্রবল। পরন্তু শাস্ত্র যাহাকে ভগবান্ বলিয়াছেন তিনি সন্দেহাতীতভাবে

ভগবান্। শাস্ত্রে উক্ত হইলে সকলেই তাহাকে ভগবান্ বলিতে কোনরূপ দ্বিধা করিতে পারে না। পক্ষান্তরে কোনও শাস্ত্রে অবতার বলিয়া উল্লেখ না থাকিলে তাহাকে ভগবান্ বলা সঙ্গত হয় না। শ্রীগীতায় বর্ণিত হইয়াছে—

“তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।”

সুতরাং মনগড়া বা ভুঁইফোঁড় ভগবান্ কলিকালে বিশেষরূপে প্রচারিত হইতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমন্নহাপ্রভুকে তত্ত্ববিদগণ একই তত্ত্ব বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। একই তত্ত্ব হইয়াও মহাবদান্ততাপ্তগে গৌরচন্দ্রে অধিক মাহাত্ম্য—ইহাই তত্ত্ব-বিদগণের উক্তি। বিরহাত্মক ব্রজপ্রেম কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগৌররূপেই স্বয়ং আশ্বাদন ও বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রেম বিতরণই সর্বোত্তমতা। পরন্তু বদ্ধজীব ইহাকে পরম লাভজনক বলিয়া বুঝিতে অক্ষম। আত্মধর্মের সর্বোত্তম বিকাশই বিপ্রলস্তাত্মক প্রেম, তাহাই শ্রীমন্নহাপ্রভু কৃষ্ণরূপে আশ্বাদন করিতে অক্ষম হওয়ায় আশ্রয়জাতীয় ভাব অঙ্গীকার করত গৌররূপের লীলা। তাঁহার এই লীলার অনুভবকারী সর্বোত্তম অধিকারী ব্যতীত সাধারণ ভক্ত নহে। শ্রীমন্নহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকরূপ একমাত্র অবদানে ইহাই চরমে বর্ণিত হইয়াছে।—

আশ্লিষ্ট বা পাদরতাং পিনষ্টুমামদর্শনান্মর্ষহতাং করোতু বা।

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ ॥

যাহারা গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহকেই পরম লাভ জ্ঞান করে, তাহারা শ্রীমন্নহাপ্রভুর অবদানকে সর্বোত্তম বলিয়া সমাদর করিতে সর্বতোভাবে অক্ষম—ইহা অতীব সত্য। নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানী ইহা হইতে অনন্ত যোজন দূরে—ইহাই ব্রহ্মাজীর “জ্ঞানে প্রয়াসনুদপান্ত” শ্লোকে অভিযুক্ত হইয়াছে।

ভগবান্ বরাহদেবের বিগ্রহ ও শূকরের দেহ এক নহে। বরাহদেবের প্রসাদ সকলে সেবা করে, কিন্তু বিট্-বরাহের খাতি বিষ্ঠাকে লোকে ঘৃণা করে। তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীমন্নহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ ও মানুষের শরীর বা দেহ প্রাকৃত চক্ষে ভেদহীন উপলব্ধ হইলেও তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন তত্ত্ব। একটা সচ্চিদানন্দ ও অপরটা মায়িক। যুগধর্মের বিপর্যয় প্রবল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্টিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

অসংসঙ্গ কেন সংসঙ্গ ?

সঙ্গপ্রভাবে মানুষ সং বা অসং হইবার যোগ্যতা লাভ করে। “সংসর্গজা হি গুণদোষা ভবন্তি সর্বৈ”—ইহা সকল শাস্ত্রেই উল্লেখ রহিয়াছে। আবার সকল শাস্ত্রেই ‘সং’ অর্থাৎ সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে কীর্তন করিয়াছেন। “সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥” চাণক্য বলিয়াছেন,—“তাজ দুর্জ্জন সংসর্গং ভজ সাধুসমাগম্।” “সংসঙ্গ সর্ব জড়বিষয়ের আসক্তিবিনাশক”—ইহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্তবকে (ভাঃ ১১।১২।১) বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতে নিমি মহারাজ নবযোগেন্দ্রকে বলিয়াছেন,—“এই সংসারে যদি ক্ষণাধিকালও সংসঙ্গ লাভ করা যায়, তাহা হইলে তাহা পরমনিখিলাভ-স্বরূপ আনন্দজনক হইয়া থাকে।” সংসঙ্গপ্রভাবে ভগবৎ-সেবাধর্মে অবস্থিত হইলে জীবের সর্বতোভাবে কল্যাণ সাধিত হয়। স্পর্শমণির সংযোগে যদ্রূপ অপকৃষ্ট ধাতুও স্বর্ণে পরিণত হয়, সংসঙ্গে জীবের মলিন চিত্তও তদ্রূপ অপকৃষ্টতা দূর হইয়া ‘সং’ নামের যোগ্য হয়। সংসারে স্থথের আশা ক্ষীণ হইলে সমুদ্র-বক্ষে বায়ু বিতাড়িত তৃণ-কণার স্থায় জীব সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়ায়, তখনই তাহারা ভক্তিরূপ ভেলার সাহায্যে জীবন রক্ষার্থে উন্মুখ হয়। সেই অবস্থায় সংসঙ্গ বিশেষ মঙ্গলকর। সংসার-দগ্ধ মানবগণ একমাত্র সং-সংসর্গেই শান্তির বিমল ছায়া লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সাধুগণ অপরের গুণ ব্যতীত দোষ গ্রহণ করেন না। কিন্তু অসংলোক গুণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল দোষই গ্রহণ করিয়া থাকে। শিশুগণ যে স্তন হইতে অমৃতকল্প দুগ্ধপান করিয়া আনন্দলাভ করে, জলোকা তাহাতে সংলগ্ন হইলে শোণিত শোষণ করিয়াই উদগার করিয়া থাকে। ‘সং’ ও ‘অসং’র কার্যকলাপের মধ্যে তদ্রূপ বিরাট পার্থক্য বিद्यমান। কণ্টকের আবরণ (বেড়া) যেমন ফলিত বৃক্ষের ফলপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক হয়, দুর্জ্জন অর্থাৎ অসং সংসর্গও সেইরূপ সংসঙ্গের বাধা জন্মায়। দুর্জ্জনের মুখে মধুর কথা, কিন্তু হৃদয় হলাহলে পরিপূর্ণ। নীতিশাস্ত্রে রহিয়াছে,—

দুর্জ্জনঃ পরিহর্ষব্যো নৈতদ্ বিদ্বাস-কারণম্।

মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলম্ ॥

এই প্রসঙ্গে অচ্যুতও পাওয়া যায়,—

আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শান্নিস্বাসাং সহভোজনাং।

সংসরন্তি চ পাপানি তৈলবিন্দুমিবাস্তসি ॥

“একবিন্দু তৈল পুষ্করিণীতে পতিত হইলে উহা যেমন অতি সত্ত্বর সমস্ত পুষ্করিণীর জলে বিস্তার লাভ করে, তদ্রূপ অসত্তের সহিত আলাপে, গাত্র সংস্পর্শে, নিশ্বাসে ও একত্র ভোজনে তদ্ব্যবসায় মায়িক জীবগণের হৃদয়কে গ্রাস করিয়া অতি সত্ত্বর নীচ প্রবৃত্তিযুক্ত করিয়া তোলে।”

‘অস্’ ধাতু হইতে ‘সৎ’ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অস্-ধাতুর অর্থ থাকা। যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহাই সৎ ও নিত্য। আর ‘অসৎ’ এর অর্থ যাহার অস্তিত্ব নাই। যাহা থাকে না, আসে যায়, তাহা অসৎ ও অনিত্য। ‘সৎ’ শব্দের ব্যাখ্যায় শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

আদাবন্তে চ মধ্যে চ সৃজ্যং সৃজ্যং যদঘ্নিয়াং ।

পুনস্তৎপ্রতিসংক্রামে যচ্ছিন্বেত তদেব সৎ ॥ (ভাঃ ১১।১৩।১৬)

“যে বস্তু উৎপত্তি ও প্রলয়ে কারণরূপে এবং স্থিতিকালে আশ্রয়রূপে সৃজ্য বস্তু হইতে সৃজ্য পদার্থান্তরে অনুগমন করে এবং প্রলয়ান্তেও যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সৎ।” একই স্থানে অবস্থান করিলে বা এক নৌকায় নদী পার হইলে সঙ্গ হয় না, উভয়ের প্রীতি ও আসক্তির সহিত কোন কর্ম কৃত হইলেই তাহাকে ‘সঙ্গ’ বলে। অসত্তের সঙ্গে প্রীতিসহকারে অসৎ বিষয়ের আলোচনা করাই অসৎসঙ্গ। বাজারে দ্রব্যাক্রয়-সময়ে যেরূপ নূতন ব্যক্তির সহিত কেবল বাহ্য ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার সংসঙ্গাকাজী ব্যক্তিগণের সঙ্গে করিতে হইবে, নতুবা অসৎসঙ্গের ফাঁদে পড়িয়া পরমার্থ ধন হারাইতে হইবে। সর্বক্ষণ ও সর্বস্থলে অসৎসঙ্গ পরিত্যাগই বৈষ্ণবগণের আচরণ।

শাস্ত্রবহির্ভূত নতুন ধর্মের প্রবর্তকগণ বা অনুশীলনকারিগণ সনাতনপন্থী নহেন, তাহারা ‘সৎ’ এর মুখোশে ঘোরতর ‘অসৎ’ ; অতএব তাহাদের সঙ্গ কখনও মঙ্গলপ্রদ নহে।

পৃথিবীতে যেরূপ নিম্নবৃক্ষ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মনোজ্ঞ চন্দন বৃক্ষের সংখ্যা অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয় ; তদ্রূপ জগৎ অন্তের দ্বারাই পরিপূর্ণ, ‘সৎ’ ব্যক্তির সংখ্যা এখানে অত্যন্ত নগণ্য। যাহারা বিষয়-জীবনে সর্বদাই অনুরক্ত, তাহাদিগকে ‘অসৎ’ বলা হয়, অথচ তাহারা নিজেদের ‘সৎসঙ্গী’ বলিয়া গর্বপ্রকাশ করেন,—ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। মিথ্যাভিমानी ক্ষুদ্র লোক কদাচ আত্মনীচতা উপলব্ধি করিতে পারে না। বিদ্বান্ ব্যতীত যেরূপ বিদ্যা-উপার্জনের পরিশ্রম আর কেহ জানিতে পারে না, অথবা বন্ধ্য। নারী যেরূপ অতি ভয়ঙ্কর প্রসববেদনা বুকিতে পারে না ; তদ্রূপ যাহারা অহর্নিশ অসৎকথার আলোচনাতেই ব্যস্ত, তাহারা সৎসঙ্গের মহিমা কিরূপে বুঝিবে ? সর্প যে-

সকল সম্ভাবন উৎপাদন করে, তাহারা যেরূপ সর্পাকৃতিই হইয়া থাকে, তদ্রূপ অসত্যের আকারে কিরূপে সং-এর জন্ম হইতে পারে? অসত্যের দ্বায় অধর্ম জগতে আর কিছুই নাই। তাই বলি মহারাজ শ্রীভাগবতে (ভাঃ চাঃ ১০।৪) বলিয়াছেন,—

ন হৃদ্যত্যাং পরোহধর্ম ইতি হোবাচভূরিয়ম্ ।

সর্বং সোচু মলং মন্তে হৃতেহলীকপরং নরম্ ॥

“অসত্য অপেক্ষা গুরুতর অধর্ম আর কিছুই নাই। সেইজন্যই পৃথিবী বলিয়াছেন যে,—আমি অসত্যবাদী মনুষ্য ব্যতীত যাবতীয় ভার বহন করিতে সমর্থ বলিয়া নিজেকে মনে করি।” আজকাল যে-সকল ধর্ম ‘সনাতন’ আখ্যায় আধ্যাত্মিক হইতেছেন, তাহাদের অধিকাংশই অবৈদিক ধর্ম, কর্মকাণ্ডীয় বা জ্ঞানকাণ্ডীয় দেহধর্ম ও মনোধর্ম। সর্বত্রই অসত্যের কারবার। এইসব কল্লিত-ধর্মকে সনাতনধর্ম মনে হইলে বঞ্চিত হইতে হইবে, তাহাতে প্রকৃত শান্তি মিলিবে না।

অসত্যের প্রতি দান ও অসত্যের নিকট গ্রহণ যদি প্রীতিসহকারে হয়, তবে অসংস্কৃত হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়-তর্পণপ্রিয় মনুষ্যকে যে যত পরিমাণে ইন্দ্রিয়তর্পণের ইচ্ছন যোগান দিতে পারে, সে অসং হইলেও তাহার নিকট অত্যন্ত প্রিয়। মধুতে বিষ মিশ্রিত করিয়া খাইলে মিষ্টই লাগিবে, কিন্তু পরিণামে যেরূপ মৃত্যু অবধারিত; তদ্রূপ অসত্যের কথা শুনিতে খুবই কোমল, কিন্তু পরিণামে বড়ই তুঃখপ্রদ—তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বলির পশুর পূজার দুর্কা-বিষপত্র চর্কণের দ্বায় খল বা অসত্যের আপাতমধুর বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া নিজের জীবনের দক্ষিণাশ করিবার কোন অর্থ হয় না। ধর্মের নামে বর্তমানে যাহারা সকলকে বিপদগামী করিতেছেন, তাহাদের নিকট হইতে বঞ্চিত হওয়াই বর্তমান-কালের একটা যুগধর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেখানে মান্না-বশ্য অজ্ঞ ক্ষুদ্ৰ-জীবাধমকে মান্নাধাশ ‘পুরুষোত্তম’ সাজাইয়া তাহার পূজা, অর্চন বা আরাধনা করা হয়, সেখানে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও অসত্যের কারবার ছাড়া আর কি থাকিতে পারে? গুজ্জাল মাত্রই যাহাদের ভূষণ সেই বনচরগণের নিকট স্বর্ণালঙ্কারের যেরূপ কোন গুরুত্ব নাই, তদ্রূপ কাল্পনিক ভাবনা-চিন্তাই যাহাদের জীবনের একমাত্র সম্বল, সেই সংস্কৃত নামধারিগণের নিকট শাস্ত্রসম্মত তিলক, তুলসীর মালা, শিখা প্রভৃতি বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণের কি মূল্য থাকিতে পারে?

প্রকৃত সং ব্যক্তি শাস্ত্রবহির্ভূত লোকের মনযোগানো কথা বলিয়া বঞ্চনা করেন না। তিনি জানেন,—“যে-সকল বাক্য নশ্বর বস্তু সম্বন্ধে গীত বা শ্রুত হয়, সেইগুলি

অকিঞ্চিৎকর ও অনিত্য। যাহাতে অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীহরি কীৰ্ত্তিত হন না তাদৃশ অসৎকথাপূৰ্ণ মিথ্যাবচনরাশি অসৎ। যাহাতে ভগবদ্গুণরাশির অভ্যুদয় হয় তাদৃশ বাক্যই সত্য, তাহাই মঙ্গলপ্রদ ও তাহাই পুণ্যজনক জানিতে হইবে (ভাঃ ১২।১২।৪২)।” খাঁটি জিনিষ জগতে দুর্লভ, তাহা সহজলভ্য নয়, তাই জগতে খাঁটির আদর কম। খাঁটির গ্রাহক অপেক্ষা মেকীর গ্রাহকই বেশী। “গোরস গলি গলি কিরে, সুরা বৈঠল বিকায়।” কলির প্রাবল্যের জন্য বোধ হয় লোকে সংসঙ্গ অপেক্ষা অসংসঙ্গকেই বহুমানন করিয়া থাকেন।

(প্রকৃত) সংসঙ্গ ব্যতীত বাঁচিবার অন্য কোন উপায় নাই

শ্রীভগবান্ ভাগবতে (ভাঃ ১১।২৬।২) উক্তবকে বর্ণিয়াছেন,—“মঙ্গলাকাজ্জী ব্যক্তি কখনও শিশ্নোদর তর্পণরত অসঙ্গের সহিত সঙ্গ করিবেন না, যেহেতু তাদৃশ একজনের অনুবর্তন করিলেই অন্ধানুবর্তী অন্ধের গায় নরকে পতিত হইতে হয়।” অনিত্য নশ্বর জগতের সহিত সঙ্গ স্থির করিয়া যে সঙ্গের উদয় হয়, সেই সঙ্গকে নিত্য পরমকল্যাণদায়ক সঙ্গ বলা যাইবে না। পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গ তাঁহার সঙ্গিগণের সঙ্গ হইতেই লভ্য হয়। হুঃসঙ্গ হইলে ভগবৎ-লাভ হয় না। হুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সর্বদা সংসঙ্গে থাকিতে হইবে। সংসঙ্গ হইতে তফাৎ হইলে আমাদের প্রভু হইবার দুর্ব্বুদ্ধি আনিয়া সর্বনাশ করিবে। হুঃসঙ্গ দ্বারা অর্থাৎ কৃষ্ণছাড়া অন্য বস্তুর দ্বারা আমাদের সত্য সত্যই অমঙ্গল হয়। তাই একটুকুও সময় নষ্ট না করিয়া সংসঙ্গে থাকিয়া সত্য ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকিলে আমাদের দুর্লভ মনুষ্যজন্ম সাংক্য হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

জীবের কৃত্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০৭ পৃষ্ঠার পর]

স্বাভাবিকভাবেই আমাদের পাপকর্ম ও পুণ্যকর্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান আছে। কুর্কর্মের কুফল যেমন আছে, তেমনই সুকর্মেরও সুফল দৃষ্ট হয়। কোনও সরকারী উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি অগ্রায় বে-আইনী অসৎ উদ্দেশ্যমূলক কার্য্য করলে তাকে নিম্নপদে নামিয়ে দেওয়া হয়; আবার কোন গ্রায়সঙ্গত আইনানুগ হিতকারী কার্য্য করলে তাকে আরও উন্নততর পদে অধিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে। জীবগণেরও পুণ্যকর্মের ফলে উন্নতগতি, আর পাপকর্মের ফলে অধোগতি

হয়ে থাকে। সরকারী পদাধিকারী ব্যক্তিদের যেমন সুকর্মে ও কুকর্মের ভিত্তিতে যথাক্রমে **Promotion** ও **Demotion** হয়ে থাকে, তেমনই ভগবানের এই মায়িক রাজ্যে সুকর্মের ফলে উর্দ্ধলোকে যেতে হয় ও কুকর্মের ফলে নিম্নলোকে জন্ম নিতে হয়। নিম্নতর প্রাণী হতে উচ্চতর প্রাণীতে জন্ম যেমন ক্রমবিকাশবাদ (**Evolution**) পদ্ধতিতে হয়ে থাকে, সেরূপ উচ্চতর প্রাণী হতে নিম্নতর প্রাণীতে জন্ম অবগমনবাদ (**Devolution**) পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। শুভ-অশুভ, পুণ্য-পাপ যেমন আছে, তেমন **Promotion-Demotion**, এবং **Evolution-Devolution**ও আছে। মনুষ্য-জীবনে কর্মের বিচার আছে। কিন্তু মনুষ্যোত্তর প্রাণী তথা পশু-পক্ষী প্রভৃতির জীবনে বেদ-বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান নেই বলে তাদের জীবনে কর্মের বিচার নেই। শাস্ত্র-বিচার পশু-পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীদের জীবনে সম্ভব নয়। “তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্যাকার্যাব্যবস্থিতৌ”—(গীতা ১৬।২৪)—যা’ কিছু কর্তব্য ও অকর্তব্য তাহা নির্ণয় করতে গেলে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ—গীতার এই বাণীর তাৎপর্য একমাত্র মনুষ্যই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-মতে চলিতে সক্ষম হয়। ভগবান্ নিজ মায়াশক্তির দ্বারা মনুষ্য ব্যতীত সমস্ত প্রাণীদের সৃষ্টি করার পর সন্তুষ্ট হতে না পেরে অবশেষে মনুষ্য সৃষ্টি করে সন্তুষ্ট হলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে অবধূত-সংবাদে বর্ণিত হয়েছে,—

“সৃষ্ট্বা পুরানি বিবিধান্ভজয়া আত্মশক্ত্যা

বৃক্ষান্ সরীসৃপ পশূন্ খগদন্দশূকান্ ।

তৈস্তৈরতুষ্ট হৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়

ব্রহ্মাবলোকধীষণং মুদামাপ দেবঃ ॥” (ভাঃ ১১।৯।২৮)

“ঈশ্বর নিজশক্তিভূতা মায়াদ্বারা বৃক্ষ, সরীসৃপ, পশু-পক্ষী এবং হিংস্র প্রাণীরূপ বিবিধ শরীরের সৃষ্টি করে তৎসমুদয়ে সন্তুষ্ট হতে না পেরে পরিশেষে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযোগী জ্ঞানযুক্ত এই মনুষ্যশরীর সৃষ্টি করে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।” ভগবান্ যে মনুষ্য-শরীর নির্মাণ করলেন সেই মনুষ্য-শরীর ব্রহ্মবস্ত্র অবলোকন করবার ধিষণা-বুদ্ধি বা বিবেক-বিশিষ্ট। মনুষ্য-শরীর ব্যতীত আর যে পশু-পক্ষী প্রভৃতির দেহ সৃষ্টি করলেন, সেই দেহ-বিশিষ্ট জীবগুলি শব্দাদি বিষয়ের ভোক্তা হয়ে বারবার এই সংসারেই যাতায়াত করতে থাকবে। প্রকৃতির নিয়মানুসারে তাদের ক্রমে ক্রমে উন্নত দেহ প্রাপ্তির পর মনুষ্য-শরীর পেতে বহুকাল অতীত হয়ে যাবে। মনুষ্যোত্তর পশ্বাদি প্রাণীগুলি প্রকৃতির নিয়মানুসারে ভগবৎসকাশে পৌঁছাতে পারবে না বলে দয়াল ভগবান্ তাদের সৃষ্টি করেও

নিজে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাই তখন বিবেক-বুদ্ধিবৃত্ত মনুষ্যজাতি সৃষ্টি করেছিলেন। মনুষ্যগণ শাস্ত্র-জ্ঞান লাভ করে শব্দাদি বিষয়-ভোগের হেয়তা ও তুচ্ছতা বুঝতে পেরে শুদ্ধ-ভক্তিপথে স্বীয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের পরিচয় অবগত হয়ে ভগবৎ-সান্নিধ্যে ভগবৎ-সেবাসুখ লাভ করতে সমর্থ হবে। এই মনুষ্য-শরীর ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই মনুষ্য-জীবনে আমরা শাস্ত্রসম্মত-ভাবে জীবনধারণ করে ভগবানের স্মৃতি ভজনাদিতে মগ্ন হয়ে ভগবৎসকাশে পৌঁছাতে পারি এবং ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করে নিরন্তর ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকতে পারি। আবার আমরা অশাস্ত্রীয় পথে স্বেচ্ছাচারী হয়ে জীবনধারণ করে পশু-জীবনের তুল্য হতে পারি। শাস্ত্র স্পষ্টই জানিয়েছেন—“ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ”—অর্থাৎ যে মানুষ ধর্ম্য মানে না, ধর্ম্য-পথে চলে না, সে পশুর সমান। শাস্ত্র-বিধি উল্লঙ্ঘনের ফল,—

“যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামচারতঃ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥” (গীতা ১৬।২৩)

“যে ব্যক্তি শাস্ত্র-বিধি উল্লঙ্ঘনপূর্বক স্বেচ্ছাচারে রত হয়, সে ব্যক্তি সিদ্ধি, সুখ বা পরাগতি প্রাপ্ত হয় না।”

শাস্ত্র কাকে বলে? শাস্ত্র-ধাতু স্ট্রিন্-প্রত্যয় করে শাস্ত্র-শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। যে-নকল মহাগ্রন্থ আমাদেরকে শাসন করে বিধি-নিষেধাত্মক বাক্যদ্বারা আমাদের প্রকৃত কল্যাণ বিধান করেন, তাহাই শাস্ত্র। পদ্মপুরাণে কথিত হয়েছে,—

“স্মর্তব্য সততং বিষ্ণুবিষ্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ।

সর্বে বিধি-নিষেধাঃ স্মারেতয়োরেব কিস্করাঃ ॥”

অর্থাৎ “বিষ্ণুকে সর্বদাই স্মরণ করবে,—ঈহাই বিধি; কখনও তাঁকে ভুলবে না—ইহাই নিষেধ। অগ্ৰাণ্য যাবতীয় বিধি ও নিষেধ উক্ত মূল বিধি ও নিষেধদ্বয়ের কিস্কর।” উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় তাঁর ‘অমৃত-প্রবাহ-ভাষ্যে’ লিখেছেন—“বাহ্য অবলম্বন করলে ভগবান্ স্মরণপথে আসেন, তাহাই কর্তব্য বলে ‘বিধি’, যে কার্যদ্বারা ভগবানের বিস্মরণ হয়, সেই কার্যই ‘নিষেধ’।” কোন্ কোন্ মহাগ্রন্থকে ‘শাস্ত্র’ বলে স্বীকার করা যাবে? তদুত্তরে শাস্ত্র বলেন,—

“ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ক্যাক্ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।

মূলরামায়ণকৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥

যচ্চানুকূলমেতস্ম তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীৰ্তিতম্ ।

অতোহগ্ৰহবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবৰ্ম তৎ ।”

(মধ্বভাষ্যযুক্ত স্বান্দবচন)

“ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব—এই চারি বেদ এবং মহাভারত, মূল-রামায়ণ ও পঞ্চরাত্র—এই সকল ‘শাস্ত্র’ বলে কথিত হয়েছে। ইহাদের অনুকূল যে-সকল গ্রন্থ, তাহাও ‘শাস্ত্র’মধ্যে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত যে-সকল গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র ত’ নয়ই, বরং তাকে কুবৰ্ম’ বলা যায়।”

এই পৃথিবীতে দুই প্রকারের মানুষ আছেন; যথা—দৈবভাবাপন্ন ও অসুর-ভাবাপন্ন। উভয় শ্রেণীর মানুষকে দেখতে একই প্রকার হ’লেও উভয়ের প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান্ নিজেই অর্জুনকে বলেছেন,—“হো ভূতসর্গো লোকেহস্মিন্ দৈব আহুর এব চ ।” (গীতা ১৬।৬)

অর্থাৎ—“হে পার্থ! এই সংসারে দৈব ও আহুর—দুই প্রকার ভূত সৃষ্টি হয়েছে।” ভগবান্ আরও বলেছেন—

“দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা ।” (গীতা ১৬।৫)

অর্থাৎ—“দৈবী-সম্পদ মোক্ষলাভের হেতু, আর আসুরী-সম্পদ বন্ধনের কারণ বলে কথিত হয়।” সত্ত্ব সংস্কৃতির উদ্দেশে যে-সকল কর্মের ব্যবস্থা সেগুলিই দৈবী-সম্পদ এবং যে-সকল কার্যের দ্বারা জীবের সত্ত্ব সংস্কৃতির ব্যাঘাত হয়, সে-সকলই আসুরী-সম্পদ। পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়—“বিষ্ণুভক্তঃ স্তুতো দৈব আহুরস্তদ্বিপর্ধ্যয়ঃ”—অর্থাৎ শাস্ত্রীয় অর্থানুধাবনকারী বিষ্ণুভক্তগণই দৈব এবং অশাস্ত্রীয় ধর্মসমূহ আচরণকারী ও বিষ্ণু ব্যতীত অগ্নি দেব-দেবীর উপাসনাকারিগণ অসুর শ্রেণীভুক্ত। যারা শ্রীভগবন্তকে মায়াময়ী মনে করে অবজ্ঞা করে তারাও অসুর প্রকৃতির আশ্রিত। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীভগবদ্ভক্তি, যথা—

“অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তন্মশ্রিতম্ ।

পরং ভাবমজ্ঞানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।

রাক্ষসীমাসুরীকৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥” (গীতা ৯।১১-১২)

অর্থাৎ—“সর্বভূতের মহেশ্বর আমার পরমতত্ত্ব অবগত হতে না পেরে মূর্খগণ আমাকে মনুষ্য-শরীরধারী বলে অবজ্ঞা করে অর্থাৎ মায়াময় প্রাকৃত মনে করে। ভগবন্তকে অবজ্ঞাকারী মূর্খগণ বিকল আশা সম্পন্ন, নিষ্ফলকর্মা, বৃথা জ্ঞানী ও বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়ে বুদ্ধিমোহকারী তামসী ও রাজসী প্রকৃতিকেই আশ্রয় করে।”

রাক্ষসী ও আসুরী স্বভাবযুক্ত ব্যক্তিগণ মহাপাপী ও নরকবাসযোগ্য হয়ে অবস্থান করে এবং অবশেষে তাদের রাক্ষস ও আসুর স্বভাবদ্বারা দৈবী-প্রকৃতি লুপ্ত হয়ে পড়ে।

পাপিষ্ঠ ব্যক্তিগণের পরিণামে দুর্গতির কথা প্রসঙ্গে ভগবান্ আরও বলেছেন,—

“তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান্।

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষেব যোনিবু ॥” (গীতা ১৬।১২)

অর্থাৎ—আমি পরমাত্মপরায়ণ-সাধু-বিদেষী, ক্রুর, অশুভকর্মকারী, নরাধম ব্যক্তিগণকে এই সংসারে আসুরী যোনিতেই সর্বদা নিক্ষেপ করি।

পাপ-কর্মের দ্বারা বিষয়-ভোগ অধিককাল স্থায়ী হয় না। পাপ বা অধর্মের তাণ্ডব অল্পকালেই বিনষ্ট হয়। মনু তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে লিখেছেন,—

“অধর্মেনেধতে তাবনরোভদ্রাণি পশ্চতি।

ততো মপত্নান্ জয়তি সমুদন্ত বিনশ্চতি ॥”

“অধর্মের দ্বারা হয়ত প্রথমে অনেক উন্নতি দেখা যাবে, সাময়িক সুখ-ভোগ লাভ করবে, শত্রুকে দমন করবে, কিন্তু পরিণামে সমূলে বিনষ্ট হবে।” পাপ কর্মের ফলে এই জীবনে ত’ দুঃখ পেতেই হয়, আবার পাপের অধিক মাত্রাহুসারে নীচ যোনিতেও জন্ম হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপে বলা যায়,—ভগবানের আবেশাবতার পরম বৈষ্ণব শ্রীল পৃথু মহারাজের পিতা বেণ রাজা মহা নাস্তিক ও মহাপাপী ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পর নরকে গিয়ে তথায় বহু বৎসর নানাবিধ ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করে এই ভারতবর্ষে স্নেচ্ছকূলে জন্মগ্রহণ করেন ও গলিত কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়ে বহু বৎসর যন্ত্রণা ভোগ করেন। তৎপরে দেবর্ষি নারদের নিকট পৃথু মহারাজ তাঁর পিতার এইরূপ দুর্দশা শুনে তাঁকে কুরুক্ষেত্র-তীরে পৃথুকুণ্ডে স্নানাদি করিয়ে সেই ভীষণ দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত করেন।

আরও দৃষ্টান্ত যথা,—রাজা ইক্ষ্বাকুর পুত্র নৃগরাজা একবার বহু গাভী বহু ব্রাহ্মণদের দান করেন। সেই রাজা-কর্তৃক এক ব্রাহ্মণকে দান-করা একটি গাভী সেই ব্রাহ্মণের গৃহ হতে হঠাৎ পালিয়ে এসে পূর্ব-মালিক রাজার গো-শালায় প্রবেশ করে। রাজা পরদিন ঐ ব্রাহ্মণের গৃহ-হতে পালিয়ে আসা গাভীটিকে চিন্তে না পেয়ে অতঃপর এক ব্রাহ্মণকে ঐ গাভীটিই দান করেন। ঐ গাভীটির দ্বিতীয় গ্রহীতা ব্রাহ্মণের কাছে, প্রথম গ্রহীতা ব্রাহ্মণ গাভীটিকে দেখে তাহা তারই বলে দাবী করলে উভয়ের মধ্যে বিবাদ শুরু হল এবং ক্রমে বিবাদ চরমে উঠল। তখন ব্রাহ্মণদ্বয় উভয়ে সুবিচার পাবার জন্য রাজ-দরবারে উপস্থিত

হল এবং রাজার নিকট উভয়েই ঐ গাভীটির প্রকৃত মালিক বলে ঘোষণা করে সুমীমাংসা প্রার্থনা করল। রাজা ব্রাহ্মণদ্বয়ের বিবাদের মীমাংসাকল্পে ঐ একটা গাভীর পরিবর্তে ব্রাহ্মণদ্বয়ের মধ্যে যে কোন একজনকে একলক্ষ গাভী দিতে চাইলেন। কিন্তু উভয় ব্রাহ্মণের কেহই ঐ গাভীটির দাবী ত্যাগ করে তৎ-পরিবর্তে একলক্ষ গাভী নিতেও সম্মত হলেন না এবং রাজার বিচারে অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেলেন। যথাসময়ে নৃগরাজা দেহত্যাগ করলে তাঁকে যমরাজের নিকট আনা হলে তিনি রাজাকে পুণ্য-পাপের মধ্যে কোনটি সর্বাগ্রে ভোগ করতে ইচ্ছুক—তাহা জিজ্ঞাসা করলেন। রাজা অগ্রে পাপ-ফল ভোগ করতে সম্মত হলে তাঁকে পাপের ফল-স্বরূপ ‘কুকলাস’ জন্ম গ্রহণ করে এক জলহীন কূপে বাস করতে হয়েছিল। পরে ভগবান্ বালগোপাল কৃপা করে তাঁকে নিজ বাম-করে উত্তোলন করার গোপালের কর-স্পর্শে তিনি মুক্তিলাভ করেন। এই ঘটনায় শিক্ষা পাওয়া যায় যে, ভুলবশতঃও ব্রহ্মস্ব, দেবস্ব প্রভৃতি হরণ করলে চেতনা সঙ্কুচিত হয়ে ‘কুকলাস’ জন্মের মত পশু জন্ম পেতে হয়। পাপ-কর্মের কলে নীচ যোনিতে জন্ম-প্রসঙ্গে আরও অসংখ্য উদাহরণ শাস্ত্রাদির উপাখ্যান-গুণিতে বর্ণিত আছে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি

হে মহাজীবন,

কৃষ্ণপ্রেমে ঢালি চিত্ত পূত-শুদ্ধ হিয়া
সংসার-দাবান্নি-দাহ করি নির্বাপিত—
পরাবিচা-বধু-সঙ্গ লভি সংকীৰ্তনে—
যবে তুমি আশ্বাদিলে ব্রজসুখা-রস
সেইদিন চরিতার্থ পরমার্থ তব।
তাই বুঝি বিরাজিছ লীলা-সঙ্গিরূপে
কৃষ্ণপাদপদ্মে লভি পরম আশ্রয়—
মর্ত্যালীলা সংবরিয়া চিদানন্দধামে ॥

পেয়েছিলে পুণ্যফলে স্মৃতির টিকা,
 করি' আত্মসমর্পণ পেলে সাধু-কৃপা—
 গুরুপাদপদ্ম লভি । অজ্ঞান-তিমির
 গেল দূরে, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিল তব ।
 কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা উদিল অন্তরে—
 খুলি' দিল দ্বার । মাধুর্য্যরসের সিক্ক
 হ'ল উদ্বেলিত । আশ্বাদিলে ব্রজরস
 নিত্য নিত্য প্রতিক্ষণে জীবনচর্য্যায় ।
 তৃপ্ত হ'ল ক্ষুধা তব শ্রীমূর্তিসেবনে,
 নামামৃত করি' পান তৃষ্ণা গেল দূরে ।
 জ্ঞান তুমি, “কান্তা-প্রেম—সর্বসাধ্য-সার”—
 সাধ্য-শিরোমণি যেথা রাধা যুথেশ্বরী—
 গঞ্জে যার উন্মাদিত মাধব-হৃদয়—
 সেইভাবে সাধিয়াছ সাধনার ধারা ।
 অগোচর নহে তব,—যেথায় হলাদিনী—
 দেয় শক্তি, করে কৃষ্ণে আনন্দবর্দ্ধন,
 সেইভাবে আরাধিয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দনে—
 ব্রজবধু-কল্লিত সেই সাধনার পথে—
 উপাস্ত করিলে যুগ্ম-রাধাকৃষ্ণনাম ।
 ভেদাভেদ-শূন্য যেথা শক্তি-শক্তিমানে,
 যুগলের তত্ত্বমূলে যুগ্ম-উপাসনা ।

হে সাধক,

সংসার-আশ্রমে মাখি বৈরাগ্যভিলক
 চেয়েছিলে অবিচার গ্রন্থি-বিমোচনে—
 ব্রজপ্রেমে মুগ্ধ তুমি হ'লে আত্মহারা—
 আশ্বাদিলে ভূমানন্দ উপলব্ধি-মাঝে ।
 সামীপ্য-সায়ুজ্যমুক্তি চাহ নাই তুমি,
 মোক্ষবাঞ্চা ? সেত' আনে কৈতবপ্রধান—
 কৃষ্ণভক্তি যাহা হ'তে হয় অন্তর্হিত ।

শ্রীপাদপদ্ম-মধুলুক তুমি ভৃঙ্গসম
 লীন হ'তে চেয়েছিলে অমিয়সাগরে ।
 বাঞ্ছা তব—ভক্তিবলে কৃষ্ণানুশীলনে—
 অন্ম অভিলাষশূন্য হিয়া পূজি হৃদীকেশে—
 লভিবারে পরমার্থ প্রেমভক্তি পথে ।
 সিদ্ধ যদি সাধনায় ?? ধনীশ্রেষ্ঠ তুমি !!

হে সাধক,

পূজিয়াছ রমঘন আনন্দস্বরূপে—
 স্থিতি যার শুদ্ধসত্ত্ব হৃদি-বৃন্দাবনে—
 ভক্ত লাগি' নিত্যলীলা করে শ্যামরায়—
 সেথা মোরে নিয়ে যাবে ? সাধকপ্রধান !
 তরী বেয়ে সঙ্গে তব ভবাক্রির পারে ?
 যেইদিন ঘনাইবে গোধুলির ছায়া—
 রক্তরাগে আয়ুসূর্য্য যবে অস্তে যাবে—
 ওপারের ধ্রুবজ্যোতি করিবে আহ্বান—
 এপারের অন্ধকার ছেড়ে দিবে পথ ?
 জ্বালিয়া রাখিছু তাই আরতি-প্রদীপ
 দীপ্ত অনির্ব্বাণ !! সর্ব্ব কৰ্ম্ম-অবসানে ॥
 তুমি যেথা ব্রজরস উদ্দীপিয়া চিতি—
 ঢাল ঢাল কৃষ্ণরস কৃষ্ণবহিন্মুখে ।
 রাখিলাম পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম ॥

—ডাঃ মণীন্দ্রনাথ রায় (সাহিত্য-বিশারদ)

শ্রীঝুলনযাত্রা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্যে শ্রীহিন্দোল-লীলা-
বর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

“উর্দ্ধেবার্দ্ধেবার্দ্ধ শ্যাম শাখা সহস্রৈঃ পীতৈঃ পুষ্পৈঃ স্তম্ভমার্মনৈর্মরনৈঃ ।

শম্পাস্তোদ শ্রীজয়িত্তাং বিশস্তৌ নীপাটব্যাং রেজতুস্তৌ লসন্তৌ ॥”

বনশোভা দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ কদম্ববনে গিয়া উপস্থিত হইলেন ।
সেই কদম্ববনে ক্রমশঃ উর্দ্ধ উর্দ্ধস্থিত শ্যামবর্ণ হাজার হাজার শাখার উপর পীতবর্ণ
অসংখ্য প্রস্ফুটিত কুসুম হইতে মধু বর্ষণ হওয়ায় দেখিলেই মনে হয় বিদ্যাম্বুজ
মেঘরাশির শোভাকে জয় করিয়াছে । সেই কদম্ববনে সারি সারি বেদীর উপর
অনবরত কদম্বফুল পড়িতেছে এবং সুন্দর ভ্রমরগণ মত্ত রহিয়াছে । এক একটা
বেদীর দুই পার্শ্বে স্তম্ভের ন্যায় কদম্বশৃঙ্গ পুষ্প সুসজ্জিত । সেই দুই দুই বৃক্ষের
শাখায় বাধা হিন্দোলিকা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার উপর আরোহণ করিলেন এবং
শ্রীরাধারূপীকে আকর্ষণপূর্বক হিন্দোলিকার উপরে বসাইলেন । অলিসমূহ গান
করিতে করিতে যেন পুষ্প আরতি করিতে লাগিল ।

“দেখ সখী ঝুলত যুগলকিশোর । নীলমণি জড়াওল কাঞ্চন ডোর ॥

ললিতা বিশাখা সখী ঝুলাওত সুখে । আনন্দে মগন হেরি দৌহে দৌহা মুখে ॥

গরজত গগনে সঘনে বন ঘোর । রঞ্জিনী সঙ্গিনী ঘেরত চৌদ্দর ॥

বিবিধ কুসুমে সবে রচিয়া হিন্দোলা । দোলায় যুগল সখী আনন্দে বিতোলা ॥

ঝুলাওত সখীগণ করতালি দিয়া । সুবদনী কহে পাছে গিরয়ে বঁধুয়া ॥

বিগলিত হৃকূল উদিত শ্বেদবিন্দু । অমিয়া ঝরয়ে যেন হুঁহু মুখ ইন্দু ॥

হেরি সব সখীগণ দৌহাকার শ্রম । চামর বীজন লেই করয়ে সেবন ॥

ভ্রমর কোকিল সবে বসি তরুডালে । জয় জয় রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বলে ॥

কহে জগন্নাথ কবে হবে শুভদিনে । সখীসহ দৌহাকারে হেরিব বিপিনে ॥

(বৃহত্তত্ত্বসার)

“দোলা বেগাদিকা কামো স্বপদ্যাম্ আক্রম্যেতাং স্বাবনতুন্নতিভ্যাম্ ।

স্বং স্বং সর্বাঃ কৌশলং দর্শয়ন্তৌ প্রেমানন্দং তুন্দিলং চক্রতুস্তৌ ॥”

“শ্রীরাধাকৃষ্ণ দোলা অধিকবেগে দোলাইতে অভিলাষ করিয়া পদযুগলদ্বারা
দোলা আক্রমণ করিয়া নিজ অবনতি ও উন্নতিদ্বারা দোলা দোলন-কৌশল দেখাইয়া
সখীদিগকে প্রেমানন্দে উদ্ভাসিত করিলেন ।”

“রাধাকৃপা এক আত্মা ছুঁছ দেহ ধরি ।

অগোচ্রে বিলাসে রস আশ্বাদন করি ॥”

কুলনথাত্রা একটা সন্তোগময়ী লীলা । ব্রজগোপীগণ রাধারানী ও কৃষ্ণকে হিন্দোলে বসাইয়া রাধাকৃষ্ণের সন্তোগ করাইয়া থাকেন । একমাত্র মুক্ত চিত্ত-বৃত্তিতেই এই লীলা স্মরণ সম্ভব এবং ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও আছে ।

“বৈকুণ্ঠাণ্ডে নাহি যে লীলার প্রচার ।

সে-সে-লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥”

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।২৮)

কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন,—“বৈকুণ্ঠে (গোলোকে) আদিতে যে-যে-লীলার প্রচার নাই সেই সেই লীলা এই কৃষ্ণ-অবতारे আমি প্রচার করিব । অধিক কি, এই লীলাতে আমিও স্বয়ং চমৎকৃত হইব । আমি এই সমস্ত রূপের নির্ঘাস আশ্বাদন করিব এবং ভক্তগণকে প্রদত্ত হইয়া দান করিব ।”

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলাতে অনন্ত বিচিত্রতা আছে । তাঁহার সমস্ত লীলার মধ্যে এই কুলনলীলা, রাসলীলার বৈচিত্র্য অদ্ভুত । অনেকে ইহার তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া অনেক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । জড় মেধা অথবা পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভগবানের এই চিল্লীলার উপলব্ধি সম্ভব নয় । এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

“বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদম্ব বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধাষ্মিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হ্রদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥”

যে ব্যক্তি গোবিন্দের ব্রজবধুসহ এই অপূর্ব লীলাবৃত্তান্ত শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ বা বর্ণন করেন, তিনি উৎকৃষ্ট ভগবদ্ভক্তিতে অচিরকাল মধ্যে জীবদ্দশাতেই জিতেন্দ্রিয় হইয়া হৃদয়রোগ কামনাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন—সন্দেহ নাই ।

আকুমাৰ ব্রহ্মচারী জনযোগী পরমহংস ব্যাসনন্দন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ঋষিগণের সভায় তাঁহাদের উপস্থিতিতে মুমূর্ষু পরীক্ষিত মহারাজের নিকট কল্যাণকর যে লীলা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কখনই প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার ক্রীড়া হইতে পারে না । তিনি একজন মৃত্যুপথযাত্রীকে প্রতারণা করিতে পারেন না । শমীক মুনীর পুত্র শৃঙ্গীর অভিশাপ মোচনের জন্ত যিনি প্রায়োপবেশন করিয়াছেন, অসংখ্য ঋষি যেখানে উপস্থিত সেই সভায় সকলের বিভিন্ন মতবাদকে তুচ্ছ করিয়া শ্রিয়মান ব্যক্তির মঙ্গলের কথা কীৰ্ত্তন করিয়াছেন—সেই সমূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূতনা-বধ, শকট-ভঞ্জন, তৃণাবর্ত-বধ, বৎসাসুর, বকাসুর, অঘাসুর, ধেনুকাশুর, অরিষ্টাশুর, ব্যোমাসুর, কেশী প্রভৃতি বধ, যমলার্জুন-ভঞ্জন, ব্রহ্ম-বিমোচন, কালীস-

দমন, যাজ্ঞিক বিপ্রেস উপাখ্যান, ইন্দ্রপূজা বারণ, বরুণ হইতে নন্দোদ্ধার প্রভৃতি নৈমিত্তিক লীলা বর্ণনাস্থে নিত্যলীলা—যাহা সমস্ত লীলার উপরিভাগে অবস্থিত রাস-পঞ্চাধ্যায় বর্ণন করিয়াছেন—উহা কখনই কামক্ৰীড়ার উপাখ্যান হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাকথা যদি কেহ অন্ধাসহকারে সর্বদা শ্রবণ ও কীৰ্ত্তন করেন তাঁহার নিশ্চয়ই হৃদরোগ দূরীভূত হইবে এবং শুদ্ধাভক্তি লাভ হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিতাছেন,—

“চড়ি’ গোপী মনোরথে, মন্থথের মন মথে,
নাম ধরে মদনমোহন।”

শ্রীভগবানের কোনরূপ বিষয়-সম্বন্ধ বা কাম অধীনতা কোনরূপই থাকিতে পারে না। তিনি আত্মারাম। “আত্মনি যঃ রমন্তে”—অর্থাৎ যিনি আত্মাতে সম্যক্ রমণশীল, তিনি আত্মারাম, আত্মারামের আনন্দভোগে কোনপ্রকার বাহ্য বস্তুর প্রয়োজন হয় না। তিনি আত্মারাম হইয়াও রমণ করিয়াছিলেন—তাহা কি-প্রকার? শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

“এবং পরিস্বঙ্গকরাভিমর্ষ স্নেহেষ্কণোদাম বিলাস হাসৈঃ।

রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্ষথার্তকঃ স্বপ্রতিবিম্ব বিভ্রমঃ ॥”

(ভাঃ ১০।৩৩।১৬)

ক্ৰীড়ামোদী বালক যেমন দর্পণে প্রতিবিম্বিত নিজ মূর্ত্তির সহিত ক্ৰীড়া করে, শ্রীভগবান্ও তদ্রূপ নিজ প্রতিবিম্ব-স্বরূপা গোপীগণের সহিত রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় দেখা যায়,—

“আনন্দ-চিন্ময়রস প্রতিভাতিভি স্তাভির্ষ এব নিজ-রূপতয়া-কলাভিঃ।

গোলোক এব নিবসতি অখিলাগ্ভূতো গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজ্যামি।

ব্রজদেবীগণের সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের কান্তা-কান্তভাবময়ী লীলা প্রাকৃত কাম-ক্ৰীড়া বিলাস নহে। ফ্লাদিনী শক্তির বিলাসবৈচিত্র্য মাত্র। কারণ ব্রজদেবীগণ তাঁহার নিত্যলীলার পরিকর ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নহে।

“আনন্দবৃন্দ—পরিতুন্দিলমিন্দিরায়ী

আনন্দবৃন্দ—পারিনন্দিত নন্দপুত্রম্।

গোবিন্দসুন্দর—বধু পরিনন্দিতং তং

বৃন্দাবনং মধুর মূর্ত্তং অহং নমামি ॥”

“আমি ব্রজে যে নির্মল রাগ প্রকট করিব তাহা ভক্তগণ যাবতীয় আখ্যা-অনাখ্যা ধর্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে রাগমার্গে ভজন করিবেন।” শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বিষয়। আর সমস্তই তাঁহার আশ্রিত।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

“বিধিমার্গরত-জনে, স্বাধীনতা রত্নদানে,
রাগমার্গে করান প্রবেশ ।

রাগ-বশবর্তী হয়ে, পারকীয়-ভাবাশ্রয়ে,
লভে জীব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ ॥

প্রেমামৃত-বারিধারা, সদা পান রত তাঁরা,
কৃষ্ণ তাঁহাদের বন্ধু পতি ।

সেইসব ব্রজজন, সুকল্যাণ-নিকেতন,
দীনহীন বিনোদের গতি ॥”

“অল্পগ্রহায় ভূতানাং মাস্ত্বং দেহমাস্রিত ।

ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রদ্ধা তৎপরো ভবেৎ ॥”

ভগবানের এই দেহ ধারণ বা নিত্যলীলা কেবলমাত্র সংসারে দুঃখসন্তপ্ত মানব-
গণের উদ্ধারের জন্য জানিতে হইবে ।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১৫ পৃষ্ঠার পর]

মূলের ‘ঘশোদা’ ইত্যাদি অর্ধশ্লোকে লীলা-বিশেষদ্বারা উৎকর্ষ-বিশেষ বলেছেন ;
‘ঘশোদায়াঃ’—মাতার নিকট হতে, ‘ভিরা’—দমি-ভাণ্ড ভগ্ন করা ও নবনীত চুরি
করা প্রভৃতি অপরাধের জন্য তাড়ন-ভয়ে ‘উদুখলাৎ’—(উর্দ্ধস্থানে সংরক্ষিত)
শিক্যস্থিত নবনীত চুরি করার জন্য (নিকটস্থ) উদুখলকে উন্টিয়ে তার তলদেশে
সমাক্রান্ত অর্থাৎ উপবিষ্ট হয়েছিলেন । (এমন সময় যষ্টি-হস্তে মাতাকে আসতে
দেখে) তথা হতে ‘ধাবমানম্’—(যিনি) বেগে পলায়ন করেছিলেন । এ
বিষয়ে যিনি বিশেষ জানতে ইচ্ছা করেন তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের নবম
অধ্যায়ের (৮) শ্লোক বিশেষভাবে অনুসন্ধান করবেন ।

“শ্রীকৃষ্ণ তখন বিপরীতভাবে বিগন্ত উদুখলে উপবিষ্ট হয়ে শিক্যস্থিত
নবনীত প্রভৃতি দ্রব্য বানরদ্বয়কে যথেষ্টরূপে বিভাগ করে দিচ্ছিলেন ।
বানরকে দিচ্ছিলেন কেন ? আর কাকেও দিতে ত’ পারতেন । বানরকে

দেওয়ার কারণ আছে। ভগবানের সেবার যে দ্রব্য সেটা যদি ভগবানের সেবার না দেওয়া যায়, তাহলে যে দোষ-ত্রুটি হয় সেটা দেখাচ্ছেন। ভগবৎসেবার উপযোগী দ্রব্যাদি ভগবৎসেবার না লাগিয়ে জমিয়ে রেখে কি হবে? আমি কার সেবার লাগাব, যদি ভগবানের সেবাই না হল তা দিয়ে? গুরু-বৈষ্ণবের সেবার জন্ত, ভগবানের সেবার জন্ত ত' জিনিষ জমিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু সেটা যদি নষ্ট হয়ে গেল, সেবার না লাগল, তাহলে সে জমানোর কি মূল্য? টাকা-পয়সা অনেক জমালাম, কিন্তু ঠিক সেবার লাগানো হল না, দ্রব্যাদি অনেক সংগ্রহ করলাম, কিন্তু সেবার লাগানো হচ্ছে না, অনেক বস্ত্র-পোশাকাদি পাওয়া গেল, বাক্সবন্দী করে রাখা হল, পোকায় সব কেটে দিল, সেবার লাগানো হল না কেন? সব ত' নষ্ট হয়ে গেল। সেবার লাগাতে হবে জিনিষগুলো। সেবার লাগানোর কথা এর মধ্যে আছে। বানরকে বিলিয়ে দিচ্ছেন কেন?—যদি আমারই সব হয়, তোমরা আমার খাচ্ছ-পরছ অথচ আমার জিনিষ আমাকে দিচ্ছ না কেন? ওগুলো জমিয়ে রেখে নষ্ট করছ কেন? এই কারণে সব বানরকে বিলিয়ে দিচ্ছে। 'উৎপাতের কড়ি চিৎপাতে যাক'। জমিয়ে রাখা জিনিষটা ভগবানের সেবার, ভক্তের সেবার লাগুক—এটাই হল কথা।

একবার জগন্নাথক্ষেত্র পুরীতে এক ঘটনা ঘটেছিল। প্রতিদিন যেমন ভোগরন্ধন হয় তেমন সব রান্না হয়েছে। কিন্তু বাইরের কতকগুলো লোক এসে সেখানে ঢুকে পড়েছে ভোগের আগে। রান্না করা সব জিনিষ মাটিতে পুঁতে দেওয়া হল। নেটা আর ঠাকুরের ভোগে লাগে নাই। আবার রান্না হয়েছে। এই নিয়ম খবরের কাগজে অনেক Report বের হল। ওদের বিচার—মাটিতে ওগুলো না পুঁতে দিয়ে গরীব-দুঃখীদের দিয়ে দিলে হত। গুরুদেবকে Reportটা দেওয়া হল। তিনি বললেন,—ধরু কলম। গুরুদেব লিখলেন যে, না, ওটা নষ্ট হয় নাই, ওটা রক্ষা করা হয়েছে। ঠাকুরের ভোগের আগে ভোগের জিনিষ কেউ যদি খাওয়ার জন্ত লোভ করে, তাহলে সেই জিনিষ আর ভোগে লাগে না। ঠাকুরের ভোগের জন্ত যে রান্না হয়েছে, সেই জিনিষ যদি বিড়ালে দেখে ফেলে, কুকুরে দেখে ফেলে, কাকে দেখে ফেলে বা অন্য কোন গৃহপালিত পশু যদি দেখে ফেলে, তাহলে ঐ দ্রব্য আর ভোগে লাগে না। ওদের দৃষ্টি খুব খারাপ। সেবাপরাধের মধ্যে রয়েছে এগুলো। ঠাকুরের ভোগ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেটা যদি কাকে, কুকুরে, বিড়ালে দেখে, তাহলে সেই জিনিষ আর ভোগ দেওয়া যাবে না—বৈষ্ণবশ্রুতিতে লেখা আছে। অতএব ঠাকুরের (জগন্নাথের) ভোগের জন্ত যে রান্না হয়েছিল, বাহিরের লোক এসে

ওগুলোতে লোভ করায় ওগুলো ঠাকুরের ভোগে না লাগিয়ে নষ্ট করে ফেলা হল। এটা হল শাস্ত্রীয় **Discipline**।

আর একটা **Discipline** হল, লোককে দিতে গেলে প্রসাদ দেওয়া উচিত। যেটা ঠাকুরের ভোগে লাগে নাই, সেটা প্রসাদ হয় নাই। সে-কারণে কাহাকেও দেওয়া উচিত নয়। ফলে বিচার তাঁরা ঠিকই করেছেন। এই বিচারের পরে মাতঙ্গরি, গুরুর পরে গুরুগিরি—এটা চলবে না। জাগতিক লোকের প্রাকৃত বিচার, এরা বোঝে না কিছু। ঠাকুরের ভোগের জিনিষ ঠাকুরকে না দিয়ে খেলে চুরির দায়ে পড়তে হয়। আপনারা ত' গীতা আলোচনা করছেন, গীতার মধ্যে লেখা আছে,—

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্তন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।

তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥

ভগবানের দেওয়া জিনিষ, ভগবানের ভোগের জিনিষ যদি ভগবানকে না দিয়ে নিজে নিজে খেয়ে ফেলা যায় তাহলে ‘তেন এব সঃ’ চুরির দায়ে পড়তে হবে, চোর বলে আখ্যা পাওয়া যাবে। এই হল বিচার। মায়েরা রান্নাবান্না করছেন ঠাকুরের জন্ত। আগে ঠাকুরের ভোগের জন্ত তুলে রেখে দিয়ে তারপরে অন্তকে দাও। সেটা ত' বুঝতে হবে। ঠাকুরের ভোগের জিনিষ ঠাকুরকে দিতে হবে। আর যেটা ভোগে লাগান হচ্ছে না, সেটা খাওয়া যাবে না, খেলে পরে পাপ। পাপ তার ভিতরে প্রবেশ করছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কীর্তনের মধ্যে এক জায়গায় বললেন,—

“গৌর-প্রিয়, শাক-সেবনে, জীবন সার্থক মানি ॥”

কোন শাক?—বাজারের কেনা শাক নয় কিন্তু, মহাপ্রভুর প্রিয় শাক যেটা, সেটা হল স্বচ্ছন্দ বনজাত শাক। ‘সচ্ছন্দ বনজাতেন শাকেন।’ যে শাক কেউ চাষ করে নাই, সেই শাক গৌর-প্রিয়। কেন? তাতে পাপ প্রবেশ করে নাই। যে শাক চাষাবাদ করে হচ্ছে, তার মধ্যে ঐ চাষীর চিত্তবৃত্তি প্রবেশ করে।

প্রমত্তক্রমে একটা কথা মনে পড়ে গেল। “বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হৈলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥” এই নিয়ে মঠে অনেক জায়গায় ঠেলাঠেলি হয়। এর ব্যাখ্যাও দিতে হয়। বিষয়ী কে? যারা গুরুপদাশ্রয় করে সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত, যারা নিত্য ঠাকুরের সেবা-পূজা করছেন, যারা হরিনাম করছেন, যারা সবটাই ভগবানের সেবার জন্ত আছি আমরা এখানে—এই বোধ নিয়ে চলছেন, তাঁদের কি আমি বিষয়ী বলব? না, যারা

হরিতজন করেন না, সাধন-ভজন বোঝেন না, আত্মকল্যাণ বোঝেন না, তাদের বলব ? সকলের ঘাড়ে সবটা চাপিয়ে দিলে ত' হবে না। যারা বলছেন—‘বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন’ তারা কোন্ বিষয়ী। বিষয়ী ত' ভূটো শব্দ। কোলকাতায় যেতে যেতে দেখি সাইনবোর্ডে **Advertisement**—‘প্রিয়গোপাল বিষয়ী’—কাপড়ের দোকান। বিষয়ী কাকে বলব ? কৃষ্ণসেবা যিনি করেন, রাধাগোবিন্দের, রাধামাধবের যিনি সেবা করেন, তিনি কৃষ্ণ-বিষয়ী। আর যারা রাধাগোবিন্দের সেবা করেন না, যাদের নিত্য সেবাপূজা নাই, তারা হলেন মায়া-বিষয়ী। এটা ভুলে যাই কেন আমরা ? বিষয়ী দুঃকর্ম। ভগবানই যেখানে বিষয়, ভগবানই যেখানে আরাধ্য, সেখানে ত' কোন কথা নাই। আর ভগবানকে বাদ দিয়ে আমি চলছি সবটাই, সেটা ত' প্রাকৃত বিষয়, জড় বিষয় : সেটা নিয়ে ত' সমালোচনা চলবে না।

অন্ত একটা পক্ষের বিচার হল, যিনি বলছেন—‘বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।’ সেই ব্যক্তির অধিকার কি ? সদ্বিষয়ী কে, আর জড়বিষয়ী কে ?—এটার পার্থক্য করবার যিনি ক্ষমতা অর্জন করেছেন, সেই ব্যক্তি হওয়া চাই। রামা-শ্যামা, যত্ন-মধু বললে হবে না। কেননা, তারা ত' ঠিক স্ববিচারক নন। তারা **Judgement** দিতে পারবেন না, তাদের **Judgement** দেওয়ার ক্ষমতা নাই। শাস্ত্রীয় বিচার, যুক্তি-তত্ত্বসিদ্ধান্ত-সম্মত রায় দিতে হবে। সেটা ত' সাধারণ ব্যক্তির অধিকার নয়, বিশেষ ব্যক্তির অধিকার। যদি জিজ্ঞাসা করেন, কার বিশেষ অধিকার ?—তত্বতরে বলতে হয়,—কনিষ্ঠ পাপিষ্ঠের ত' কোন অধিকারই নাই, অন্ততঃ মধ্যমাধিকারী হওয়া চাই, তিনি বলবেন এটা। উত্তম অধিকারী যিনি, তিনি ত' এসবের মধ্যে নাই, তিনি এসব ঠেসাঠেলি গুঁতোগুঁতের মধ্যে নাই। তিনি ওটা বলতে যাবেন না। উত্তমাধিকারীর বিচার হল—‘গৌরের আমার সব ভাল।’ সুতরাং এই বিচার কে করতে যাবেন ?—মধ্যমাধিকারী।

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু বিষংস্থ চ।

প্রেমমৈত্রীকুপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥

ঈশ্বরে প্রেম যার আছে, তদধীন ভক্তে যার মৈত্রী আছে, স্নেহ-মমতা, ভালবাসা যার আছে, ‘বালিশেষু’ অর্থাৎ অজ্ঞ, অতাত্ত্বিক যারা, তত্ত্বজ্ঞান যাদের নাই, তাদের প্রতি কৃপা, আর ভগবদ্বিদ্বেষী, ভক্তবিদ্বেষী যারা তাদের প্রতি উপেক্ষা—এই চারটা গুণ নিয়ে যিনি চলছেন, তিনি হলেন মধ্যমাধিকারী। তিনি ওটা বিচার করবেন, সাবধান করবেন—এটা এটা কর, ভাল জিনিষ,

গুরু-বৈষ্ণবগণ খুশী হবেন ; ওটা ওটা কর না, ভীষণ খারাপ জিনিষ, তোমার সাধন-ভজন হবে না, দোষ-ত্রুটি এসে যাবে ।

যদি কোন কনিষ্ঠাধিকারী আছেন—প্রাকৃত ভক্ত যার নাম, তিনি কেন বলতে যান ? তিনি কেন বলবেন ? তাকে শাসন করার অধিকার কে দিচ্ছে ? তাকে সমালোচনা করবার অধিকার কে দিল ?—এসব বিচার করতে হবে । আমি আমার অধিকার বিচার করব, বিচার করে কথা বলতে হবে । আমাকে যদি গুরুকম ভার দেওয়া হয়েছে উপর থেকে, তাহলে আমি কিছু দেখব, কিন্তু সর্বতোভাবে আমি আমার নিজেরটা নিয়ে বিচার করব । তারপরে যদি গুরু-বৈষ্ণবগণ আদেশ করেছেন—তুমি একটু দেখো, তাহলে দেখতে হবে । আর যার উপরে কোন দায়িত্ব অর্পিত হয় নাই, তিনি কেন ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন ? তার কি প্রয়োজন আছে ? বৃথা সমালোচনা । যাদের সময় বেশী থাকে তারাই লোকের সমালোচনায় তৎপর হয় । যাদের হরিনাম করার সময় হচ্ছে না, যারা নির্দিষ্ট সেবাকাজ করে সময় পাচ্ছে না, একটু গ্রন্থাদি আলোচনা করার সময় হচ্ছে না, ঠাকুরের সেবাপূজা করে সময় হচ্ছে না, তাদের আবার ওসব কথা কেন ? কে ক'বার হাঁচলো, কে ক'বার কাশলো—এসব হিসাব নেওয়ার কি দরকার তাদের ? নিজের কাজ করার সময় পাচ্ছে না ।

পরসমালোচক যারা, সাধন-ভজন হয় কোনদিন তাদের ?—কোনদিন সাধন-ভজন হবে না এদের । এরা সব মরবে । এরা যারা মঠ-মন্দিরে এসেছে, সব মরবার জন্ত এসেছে, বাঁচবার জন্ত আসে নাই । সাধন-ভজন জিনিষটা এত সস্তার নয়, অপরাধে মরে । কেহ তরে, কেহ মরে । ‘ভাগবত পড়িয়াও কাহার কাহার বুদ্ধিনাশ ।’ কেউ ভাগবত পড়ে তরবার জন্ত, তত্ত্বসিদ্ধান্ত লাভ করবার জন্ত, আর কেউ পড়ে মরবার জন্ত । এ সবগুলো শাস্ত্রে বুকানো আছে । আমি ত’ তত্ত্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহ করব, তত্ত্বসিদ্ধান্ত শিখব । কেন ?—তত্ত্বসিদ্ধান্ত না শিখলে সাধন-ভজন হয় না । সেইজন্ত আমাকে তত্ত্বসিদ্ধান্ত শিখতে হবে । কোন্টা ভাল, কোন্টা মন্দ শাস্ত্রীয় বিচারে, সেটা তত্ত্বসিদ্ধান্ত না জানলে পরে ঠিক করা যাবে না । আমার খেয়ালখুশীমত নয় । আমি যাকে বলি ভাল, সেটা নয় । শাস্ত্রীয় বিচারে, শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন্টা ভাল, কোন্টা মন্দ, ওটা আমার শিখতে হবে । তা না হলে আমি হরিভজন করতে পারি না, সেবা করতে পারি না ।

পবিত্র-অপবিত্র জ্ঞান নাই আমার । কাকে বলে পবিত্র, কাকে বলে অপবিত্র—সাধারণ মানুষ বলুক দেখি । ভগবানের সেবার উপযুক্ত যে বস্তু, সেটা

পবিত্র এবং ভগবানের সেবার অল্পপযুক্ত বস্তু যেটা, সেটা অপবিত্র—এই হল শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা। বৈষ্ণবস্বত্বিতে এই ব্যাখ্যা আছে। ভগবানের সেবায় লাগবার উপযুক্ত বস্তু হল পবিত্র—এটা হল প্রাথমিক ব্যাখ্যা। পরে যখন সেবায় লাগছে তখন ত' পবিত্র হয়েই গেল। যেটা সেবায় লাগছে না, সেটা অপবিত্র বস্তু। সব জিনিষটার পিছনে বিচার আছে। আমি যে বস্তুকে পবিত্র বললাম, ওটা পবিত্র নয় ; আমি যেটাকে অপবিত্র বললাম, ওটা অপবিত্র নয়। শাস্ত্র যাকে বলছেন পবিত্র-অপবিত্র, সেটাকে মানতে হচ্ছে। অনেকে বলেন—অমুক দেশে এটা চলে, অমুক দেশে ওটা চলে না। দরকার নাই, শাস্ত্র যেটা বলেছেন সেটা মান।

পিঁয়াজ, রসুনকে কোন কোন প্রদেশে বলছে সবজি। তাদের গুণানে হয়ত' সবজি, কিন্তু কি জাতীয় সবজি, সেটা বিচার হোক। সবজিটা এল কোথা থেকে ? লগুন—রসুন, গুঞ্জন—গাজর, পলাও—পিঁয়াজ, কবকানি-অর্থে ব্যাঙের ছাতা—এগুলো বহুলোক খাচ্ছে। কোন কোন জায়গায় সবজি বলে চলছে। কিন্তু শাস্ত্রে ত' নিষেধ করছেন।

লগুনং গুঞ্জনকৈব পলাওঃ কবকানি চ।

অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্য-প্রভবানি চ।

‘অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনাম’। কেন এগুলো খাওয়া নিষেধ ? ‘অমেধ্যপ্রভবানি চ’—অমেধ্য থেকে জাত এগুলো। শাস্ত্রে যেগুলো নিষেধ করা আছে সেগুলো খাব না। যারা তত্ত্বসিদ্ধান্ত শিখেছেন, যারা ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা পেয়েছেন, তারা কেন ওটা করবেন ?

ঋষিগণ যজ্ঞ করছিলেন এক জায়গায়। যজ্ঞে গাভী লাগে। স্বর্ণগাভী রাখা হয়েছে। মন্ত্রপূতঃ করা হয়েছে সেই গাভীকে। ঋষিগণ যাগযজ্ঞ শেষ করে দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিয়ে চলে গেছেন। স্বর্ণগাভীর লোভে রাত্রে এক ডাকাতদল যজ্ঞস্থলে এসে ঐ গাভীকে চুরি করে নিয়ে যায়। রাস্তার তেমাথার মোড়ে গাভীকে কেটে সোনা ভাগ করবে, কিন্তু মন্ত্রপূতঃ জীবন্ত গাভীটা চিৎকার করে উঠেছে। গাভীর চিৎকার শুনে ডাকাতরা পালিয়ে গেছে। কিন্তু ততক্ষণে ত' গাভীটা বধ হয়ে গেছে। ঋষিগণ সকালে যজ্ঞস্থলে এসে দেখেন সব লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে, আর গাভীটা নাই। তাঁরা অভিসম্পাত করলেন। সেই গাভীর মাংস থেকে পিঁয়াজ, হাড় থেকে রসুন এবং রক্ত থেকে মুসুরীকান্—মুসুর ডাল হয়েছে। এই হল এদের উৎপত্তি। শাস্ত্রে এর বর্ণনা আছে। আমরা সবই জানলাম, সবই বুঝলাম, অথচ এতে আর কি আছে, ওতে কিছু হবে না। নিজের ছেলে যদি মাকড় মারে, তাহলে ‘মাকড় মারলে ধোকড় হয়’ ; আর অন্যের ছেলে যদি মাকড় মারে,

তাহলে দু-তিন হাজার টাকার প্রায়শ্চিত্তের ফর্দ হয়ে যায়। এমন করলে ত' হবে না। আগে আমার বিচারটা হয়ে পরে অন্নের বিচার হবে। সব জিনিষটা এইরকম হয়ে যায়। আমার বেলায় একরকম, অপরের বেলায় আর একরকম, তা হবে না। নিরপেক্ষ বিচার হওয়া চাই। যদি বিচারে নিরপেক্ষতা না থাকে, তাহলে সব নষ্ট হয়ে যায়। নিরপেক্ষতা থাকা চাই। “নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম না যায় রক্ষণে।” যদি কেউ নিরপেক্ষ না হতে পারেন, তাহলে তার ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে, বরবাদ হয়ে যাবে। সাধন-ভজন ক্ষেত্রে প্রতি পদে পদে নিরপেক্ষতার দরকার আছে। আমার ছেলের বেলায় একরকম, আর অপরের ছেলের বেলায় আর একরকম, তা হবে না। সবটা বুঝতে হবে আমাদের।

শ্রীকৃষ্ণ তখন বিপরীত-ভাবে বিস্তৃত উদ্বল উপবিষ্ট হয়ে শিকাস্থিত নবনীত প্রভৃতি দ্রব্য বানরগণকে যথেষ্টরূপে বিভাগ করে দিচ্ছিলেন। চৌর্য্যবশতঃ তাঁহার নয়নযুগল শঙ্কাগ্রস্ত ছিল। “চুরি করছেন ত', সেইজন্য শঙ্কা আছে, না জানি কখন মা এসে পড়ে, মারধোর করে। যশোদা তাঁকে এই অবস্থায় দেখে স্বীরে দীরে পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ মাতাকে যষ্টি-হস্তে আসতে দেখে সত্ত্বর উদ্বল হতে অবতরণপূর্ব্বক ভয়ানক ব্যক্তির গায় পলায়ন করলেন। যোগিগণের তপোবলে প্রেরিত চিত্ত ব্রহ্মে লীন হওয়ার যোগ্য হলেও যাকে পেতে পারে না, সেই পুত্র কৃষ্ণকে ধরবার জন্য যশোদাদেবী তাঁর পশ্চাৎ ধাবিতা হলেন। “যোগিগণ যারে ধ্যানে নাহি পায়। সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায়।” যোগিগণও যাকে ধ্যানে পাচ্ছেন না—এমন ব্যক্তি হলেন কৃষ্ণ। শ্রীভাগবতে স্তব করছেন যার,—যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্রকুর্জমরুতস্তয়ন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-

কৈবৈঃ সাদৃশ্যপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।

ধ্যানাস্থিততদগতেন মনসা পশুন্তি যং যোগিনো

যশ্রান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

যোগিগণ যাকে ধ্যানে পাচ্ছেন না, ব্রহ্ম-শিবাদি দেবতা যাকে চিন্তার মধ্যে আনতে পারছেন না, এমন যে দুর্লভ বস্তু তাঁকে ধরতে যাচ্ছেন মা যশোদা। মা যশোদা তাঁকে ধরতে পারেন, সে ক্ষমতা ভগবান্ দিয়ে রেখেছেন। বিষ্ণুক বাৎসল্যপ্রেমে যিনি ভগবানকে আরাধনা করছেন, তিনিই মা যশোদা, তিনিই নন্দমহারাজ। বিষ্ণুক বাৎসল্য স্নেহ, সেখানে ঐশ্বর্যের লেশমাত্র নাই। ভগবান্ রক্ষিত হচ্ছেন, তিনি নিখিল বিশ্বকে রক্ষা করছেন সবসময় বিপদাপদ থেকে, আর মা যশোদা কি করছেন? যখনই কোন বিপদাপদ হচ্ছে তখনই বলছেন,—হে নারায়ণ! তুমি আমার ছেলেকে রক্ষা কর, আমার ছেলেকে বাঁচাও। ছেলের যে স্বাভাবিক ভগবত্তা, ওতে তাঁর বিশ্বাস নাই। যদি বিশ্বাস হয়ে যায় তাহলে তাঁর আর বাৎসল্যস্নেহ থাকে না, বিষ্ণুক বাৎসল্যভাব থাকে না। তুমি হও না কেন

ভগবান্, আমার ছেলে হয়ে এসেছ যখন নিশ্চয় আমি শাসন করব তোমায় । সেখানে কাঁচুমাচু নাই, হাতজোড় নাই, উল্টোপাল্টা করলে পেটাব—এই ভাবটা হল বিপুল বাৎসল্য ।

মা যশোদা কতবার হাতজোড় করেছেন বলুত ত' ?—কখনও হাতজোড় করেন নাই । কিন্তু দেবকীদেবী বহুবাব হাতজোড় করেছেন, বসুদেব বহুবাব হাতজোড় করেছেন । ভাগবত খুললে আমরা দেখব সাত আট জায়গায় হাতজোড় করেছেন কৃষ্ণ-বলদেবের কাছে । ঐশ্বর্য্যভাব, মেজন্তু হাতজোড় আসছে । মা-যশোদা, নন্দবাবার কাছে ওসব নাই । ছুঁইমি করলে পিটিয়ে চামড়া তুলব—এই বলে বসে আছেন । (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

বস্তু দুই প্রকার—বাস্তব বস্তু ও অবাস্তব বস্তু । যাহা অনাদি, অনন্ত, অবিনশ্বর, অপরিবর্তনীয় ও সনাতন অর্থাৎ যাহা পূর্বে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে, তাহাই বাস্তব বস্তু । যাহা ক্ষণিক, তাৎকালিক, পরিবর্তনশীল ও ধ্বংসশীল, তাহাই অবাস্তব বস্তু । এই সূত্রানুযায়ী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বাস্তব বস্তু এবং তাঁহার নাম, ধাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরাদিও বাস্তব বস্তু । এতদ্ভিন্ন সকলই অবাস্তব বস্তু ।

“কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ ।” শ্রীভগবানের লীলারসাস্বাদন তাঁহার ভক্তবাতীত সম্ভব নয় । এই শ্রীজন্মাষ্টমী-লীলা ভগবান্ ও ভক্তের এক অনির্কচনীয় মিলনসূত্র । “যদা যদা হি ধর্ম্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত । অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্ত তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥” (গীতা ৪।৭) অর্থাৎ হে ভারত ! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তখন আমি আমাকে সৃজন (প্রকট) করি । জন্মযোগী শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও বলিয়াছেন,—“যদা যদা হি ধর্ম্মস্ত ক্ষয়ো বৃদ্ধিচ্চ পাপায়ণঃ । তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ ॥” (ভাঃ ৯।২৪।৫৬) । অধর্ম্ম, অসুর, আগাছা, পরগাছা প্রভৃতি আবাহন, নিবেদনের অপেক্ষা করে না । ইহারা স্বতঃই দগ্ধভরে আসিয়া উপস্থিত হয় । তাই ইহাদের অভ্যুত্থান কেবলমাত্র অনিষ্টের জন্মই । কিন্তু বিষয় বা ফসল যত্নসহায়ে চাষ করিয়া আগাছা দমন করিয়া সৃজন করিতে হয় এবং তাহাই একমাত্র জগজ্জীবের কল্যাণের কারণ ।

অধর্ম্মের অত্যাচারে অতিষ্ঠ, ভক্ত-হৃদয়ের আর্ত-আহ্বানে ও তাঁহাদের উৎকণ্ঠিত

অপেক্ষার পর ক্রমে ক্রমে আটটি সাধনার ধাপ অতিক্রম হইলে, অবশেষে চিৎসূর্য্য-রূপ কৃষ্ণচন্দ্র এক ক্রান্তিক্ষণে জন্মগ্রহণ করিলেন। ভক্ত-হৃদয়ে আনন্দের হিলোল বহিল। আনন্দের বহিঃপ্রকাশই—‘উৎসব’ আর চরম আনন্দের বহিঃপ্রকাশ—‘মহোৎসব’। ইহা নিত্য। সে-কারণে অত্মপিও প্রতি বৎসরের সঞ্চিত গ্লানিকে ধ্বংস করিবার জন্য প্রতি বৎসরই শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসবের আবির্ভাব হয় এবং ভক্তগণ আনন্দে আগ্রুত হন। তদনুসারে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীধাম-নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র ও শাখামঠসমূহে শ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব মহাসমারোহে উদ্ঘাষিত হয়।

শ্রীমেঘালয় গোড়ীয় মঠ, মেঘালয়, তুরা

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বর্তমান বর্ষে শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ঙ্গ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে ও আনুগত্যে সমিতির অন্ততম প্রচারকেন্দ্র শ্রীমেঘালয় গোড়ীয় মঠে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের গুণাবির্ভাব-তিথি তথা জন্মাষ্টমী-উৎসব বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে শ্রীমন্দিরসহ উৎসব-প্রাঙ্গন বিশেষভাবে সুসজ্জিত করা হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা, রামায়ণ ও মগভারতের বিভিন্ন লীলাসমূহের মনোহারী প্রদর্শনী দর্শকবৃন্দের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয় হইয়াছিল। ১৮ই ভাদ্র, ১৪০৩ (ইং ৪।৯।৯৬) বুধবার সন্ধ্যায় সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরান্দ-গান্ধারিকা-গিরিধারী-রাধাবিনোদবিহারীজীউ এবং সর্ববিঘ্ন-বিনাশকারী শ্রীনৃসিংহদেবের জয়দানপূর্ব্বক এই মহোৎসবের সম্বল গ্রহণ করা হয়।

মেঘালয়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রতিকূল থাকায় প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নগর-সকীর্্তনের অনুমতি পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ভক্তগণের উচ্ছ্বাসকে অবদমিত করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহারা যথারীতি ১২শে ভাদ্র, ৫ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার তুরা শহরের কয়েকটা রাজপথ পরিক্রমা করেন। পরিক্রমান্তে সারাদিবস শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী গ্রন্থের পারায়ণ হয়। বৈকাল ৫ ঘটিকায় ব্রহ্মচারিগণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরান্দের জয়দানপূর্ব্বক মহাজন-পদাবলী কীর্্তন করেন। কীর্্তনান্তে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভায় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ। অনন্তর ‘ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অণ্ডারবাদ’ সম্পর্কে প্রধান অতিথি Mr. T. K. Das (Ex. Principal, Tura Govt. College), Mr. K. P. Chowdhury (Tura Govt. College), পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত আচার্য্য

মহারাজ, শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ, শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ প্রমুখ বক্তাগণের বক্তৃতান্তে শ্রীল সভাপতি মহারাজ তাঁহার স্বভাবসিক্ত ওজস্বিনী ভাষায় ভাবগম্ভীর ও দার্শনিক বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীশ্রামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী রামায়ণ গান পরিবেশন করেন।

২০শে ভাদ্র, ৬ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার শ্রীনন্দোৎসব-দিবসে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে চতুঃসহস্রাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। বৈকাল ৫ ঘটিকায় যথারীতি মহাজন-পদাবলী কীর্তনান্তে শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত বামন গোষাষী মহারাজের সভাপত্যত্বে ও পরিচালনায় শ্রীরাম নরেশ পাণ্ডে (প্রধান শিক্ষক, তুরা হিন্দী হাইস্কুল) প্রধান অতিথি হিসাবে এবং পূজ্যপাদ শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ, শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব' প্রসঙ্গে বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর শ্রীল সভাপতি মহারাজের শাস্ত্রীয় যুক্তি-তর্ক-সিদ্ধান্তপূর্ণ ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন। পরিশেষে শ্রীশ্রামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী রামায়ণ গান পরিবেশন করেন।

পরদিবস ২১শে ভাদ্র, ৭ই সেপ্টেম্বর, শনিবার শ্রীসমিতি-পরিচালিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বিদ্যালয়ের (English Medium School) ছাত্রছাত্রীগণের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ আবৃত্তি, নাচ, গান, নাটক প্রভৃতি পরিবেশন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্কুলের শিক্ষিকা শ্রীমতী পূর্ণিমা দে। অনুষ্ঠান-শেষে বিদ্যালয়ের বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন অধ্যক্ষ শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন।

এই উৎসবকে সাক্ষ্যামণ্ডিত করিবার জন্ত স্থানীয় সুধী ভক্তবৃন্দের সহযোগিতা বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহাদের এইরূপ সহযোগিতার জন্ত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা

অগ্ণাত বৎসরের গ্রায় বর্তমান বর্ষেও শ্রীসমিতির অগ্রতম প্রচারকেন্দ্র কলিকাতাস্থ শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব শ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব মহানমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। বৈদ্যুতিক আলোকমালায় শ্রীমঠ ও মন্দির

বিশেষভাবে স্নানজ্জিত করা হয়। শ্রীমঠের প্রবেশদ্বারে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিভিন্ন লীলার প্রদর্শনীও করা হইয়াছিল।

১৯শে ভাদ্র, ৫ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার মঙ্গলারাত্রিকান্তে নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন করা হয়। তৎপরে সারাদিবস সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ ধারাবাহিকভাবে ‘শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিনী’ গ্রন্থের পারায়ণ করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও বিভিন্ন বক্তৃগণ ‘সনাতন ধর্ম ও শ্রীজন্মাষ্টমী’ সম্বন্ধে তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ বক্তৃতা প্রদান করেন। রাত্রি ১২টার পর শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ অভিষেক-ক্রিয়া ও আরাত্রিকাদি স্তম্পন্ন হয়। বলাবাহুল্য শ্রীমন্দিরে এত জনসমাগম হইয়াছিল যে তিলধারণের জায়গা ছিল না।

পরদিবস শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে আহুত, অনাহুত, রবাহুত প্রায় দ্বি-সহস্রাধিক ব্যক্তিকে মধ্যপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বহু বিশিষ্ট, সম্ভ্রান্ত ও প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের সমাগমে এই উৎসব প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

এই মহোৎসবের সর্বাঙ্গীন সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য শ্রীসমিতির সেবকগণের সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। বস্তুতঃ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে এইরূপ বৃহদুষ্ঠানের সাফল্য অসম্ভব।

—নিজস্ব সংবাদ—

স্বধামে শ্রীপাদ অচিন্ত্যগৌর ব্রজবাসী প্রভু

বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ১০ই শ্রাবণ, ১৪০৩; ইং ২৬শে জুলাই, ১৯২৬ শুক্রবার শয়ন-একাদশী-তিথিতে দিবা ১২।৪০ মিনিটে শ্রীপাদ অচিন্ত্যগৌর ব্রজবাসী প্রভু শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম-নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে সজ্জানে হরিনাম করিতে করিতে চিরতরে আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন। তিনি অধুনা বাংলা-দেশের পাবনা জেলার দেলুয়া গ্রামে ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ৩রা পৌষ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সাহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা ছিলেন শ্রীমতী সরোজিনী সাহা। তাঁহার পূর্বনাম ছিল শ্রীঅমূল্যভূষণ সাহা।

ব্যবসায়ের প্রয়োজনে পরবর্তিকালে তিনি পশ্চিমঙ্গের শিলিগুড়িতে স্থায়িতাবে বসবাস করিতেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ যখন ১৩৭০ সালে (ইং ১৯৬৩) শিলিগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে শ্রীমন্নহাপ্রভুর প্রেম-

ধর্ম-প্রচারে যাত্রা করেন তখন তাঁহার বিশেষ আস্থানে তাঁহার গৃহে পদার্পণ করেন। শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণ করিয়া তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ঐ সময়েই অক্ষয়-তৃতীয়া-তিথিতে সঙ্গীক শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া “শ্রীঅচিন্ত্যগৌর দাসাধিকারী” নামে পরিচিত হন।

শ্রীনাম-দীক্ষা গ্রহণ করত গৃহস্থাশ্রমে কিছুদিন থাকিবার পর সংসারের প্রতি তাঁহার বিরাগ জন্মে। ইং ১৯৮০ সালে সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীমমিতিতে



যোগদান করেন। তদবধি তিনি শ্রীমমিতির পরিচালন-কমিটির নির্দেশানুসারে শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ, পুরী ; শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ, বৃন্দাবনে কিছুদিন মঠরক্ষক এবং নবদ্বীপ, চুঁচুড়া প্রভৃতি মঠে পূজার্চনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। শিলিগুড়ির শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ-স্থাপনে তাঁহার যথেষ্ট অবদান স্বীকৃত। জীবনের অন্তিম দিবস পর্যন্ত তিনি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিঃপটভাবে

শ্রীপাদ অচিন্ত্যগৌর ব্রজবাসী প্রভু নিজকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে এবং নিকট আত্মীয়-স্বজনগণকেও শ্রীহরিভজনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক-গমনে তাঁহার প্রতি স্নেহশীল নিকট আত্মীয়-স্বজনগণ, বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ আমরা বিশেষভাবে তাঁহার অভাব অনুভব করিতেছি। তাঁহার ন্যায় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের একজন বিশ্রুত সেবককে হারাইয়া আমরা নিজদিগকে বড়ই অসহায় ও দুর্ভাগা বলিয়া ভাবিতেছি। তিনি তাঁহার সাধনোচিত ধাম হইতে আমাদের গুরুসেবানিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করুন—ইহাই প্রার্থনা।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশঙ্করগোরাঙ্গো জয়তঃ

*	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।	*
ধর্মঃ সমুচ্চিহ্নতঃ পুংসাং বিষকুসেন-কথাশ্রুতঃ ।		নোংপাদয়েদ্যদি রুতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
*	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়ান্না সুপ্রসীদতি ॥	*

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরমম্ ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিরশূন্য ॥

অন্য ধর্ম স্বরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৮শ বর্ষ	২১ কেশব, সঙ্কর, ৫১০ শ্রীগোরাঙ্গ ৩০ অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৪০৩, ইং ১৬/১২/৩৬	১০ম সংখ্যা
----------	--	------------

সান্নুবাদঃ

শ্রীগোরাঙ্গ-স্তবকম্পতরুঃ

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-প্রভুবরেন বিরচিতঃ]

শ্রীগোরাঙ্গায় নমঃ

গতিং দৃষ্ট্বা যস্ত প্রমদ-গজবর্যোহখিল জনা

মুখঞ্চ শ্রীচন্দ্রোপরি দধতি থুংকার-নিবহম্ ।

স্বকাত্ম্য যঃ স্বর্ণাচলমধরয়চ্ছীধু চ বচ

স্তবঙ্গৈর্গৌরাঙ্গে হৃদয়ং উদয়ন্যং মদয়তি ॥ ১ ॥

জনসকল বাহার গমন ও শ্রীমুখচন্দ্র সন্দর্শন করিয়া মদ-মত্ত মতঙ্গজ-শ্রেষ্ঠ
এক পূর্ণচন্দ্রের উপরি ফেণতুল্য মুখবারিসমূহ পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং যিনি

স্বীয় কান্তিদ্বারা স্ববর্ণ-গিরিকে স্ব-মাধুর্য্যে শোভিত করেন, সেই শ্রীগৌরাদ্দ আপনার সুধাময় বাক্য-তরঙ্গদ্বারা আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আমোদিত করিতেছেন ॥ ১ ॥

অলং কৃত্যাত্মানং নব-বিবিধ রত্নৈরিব বল-
 দ্বিবর্ণত্ব-স্তম্ভাফুট-বচন-কম্পাশ্রু-পুলকৈঃ ।
 হসন্-স্বিত্তমৃত্যন্-শিত্তি-গিরিপতেনির্ভর-মুদে
 পুরঃ শ্রীগৌরাদ্দো হৃদয় উদয়মাং মদয়তি ॥ ২ ॥

যেমন কোন ব্যক্তি নূতন বিবিধ রত্নদ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া নৃত্য করে, তদ্রূপ যিনি মাথুর-বিরজিণী শ্রীরাধার হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভা-জ্ঞানিত আনন্দ-ভরে ভাবিতান্তঃকরণ হইয়া নব বিবিধ রত্ন-স্বরূপ অতিশয় বিবর্ণত্ব, স্তম্ভ, অফুট-বচন, কম্প, অশ্রু ও পুলকসমূহদ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে অতিশয় আনন্দবশতঃ হাস্য করিতে করিতে ঘণ্টাঘু-লিগু কলেবরে নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাদ্দ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষিত করিতেছেন ॥ ২ ॥

রসোল্লাসৈ-স্তির্ঘাণ্ গতিভিরভিত্তো বারিত্তিরলং
 দৃশোঃ সিঞ্চল্লোকান্নরুণ-জল-যন্ত্তমিতয়োঃ ।
 মুদা দন্তৈর্দষ্ট্বা মধুরমধরং কম্পচলিতৈ-
 নটন শ্রীগৌরাদ্দো হৃদয় উদয়মাং মদয়তি ॥ ৩ ॥

যিনি রসোল্লাস-জগু আনন্দ হেতুক সর্বতোভাবে ইতস্ততঃ চরণদ্বয়ের সঞ্চালনে তথা অরুণ-বর্ণ জলযন্ত-সদৃশ নয়ন সলিলসমূহে সংসার-সেচন করত কম্পিত দন্ত-পঙ্ক্তিদ্বারা সুমধুর অধর দংশিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাদ্দ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন ॥ ৩ ॥

কচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতি-সুতস্তোরু-বিরহাৎ
 শ্লথচ্ছৌ-সন্ধিতাদদধদধিক-দৈর্ঘ্যং ভুজ-পদোঃ ।
 লুঠন্-ভূমৌ কাকা বিকল-বিকলং গদগদ-বচা
 রুদন্ শ্রীগৌরাদ্দো হৃদয় উদয়মাং মদয়তি ॥ ৪ ॥

কোনদিন কাশীমিশ্র-গৃহে ব্রজপতি-সুত (শ্রীনন্দনন্দনের) অতিশয় বিরহ হেতুক যে ভুজ ও চরণদ্বয়ের শোভা এবং সন্ধিস্থানগুলি শ্লথ হইয়াছিল, সেই ভুজ ও চরণদ্বয়ের অতি দীর্ঘত্ব-ধারণ করত যিনি ভূমি-লুণ্ঠিত হইয়া বিকল হইতে

বিকল, এতাদৃশ কাকু, গদগদ-বাক্যদ্বারা রোদন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরঙ্গ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে আহ্লাদিত করিতেছেন ॥ ৪ ॥

অমুদঘাট্য দ্বার-ত্রয়মুরু চ ভিত্তি-ত্রয়মহো

বিলজ্যোচ্চৈঃ কালিজ্জিক-সুরভিমধ্যে নিপতিতঃ ।

তনুতং সঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরু বিরহাদ্-

বিরাজন্ গৌরাজ্ঞো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৫ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব সঙ্কীৰ্ত্তনান্তর শ্রমাপনোদন-নিমিত্ত ভক্তগণ-কর্তৃক গৃহ-মধ্যে শায়িত হইয়াছিলেন, তিনি পরমোৎকর্থা-প্রযুক্ত গৃহমধ্যে অবস্থান করিতে অশক্ত হইয়া বহির্গমনদ্বার অপ্রাপ্তি-হেতুক দ্বারত্রয় উদঘাটন না করিয়া গৃহোদ্ধর্গমনদ্বার দিয়া অতি উচ্চ প্রাচীরত্রয় উল্লঙ্ঘনপূর্বক কলিজ-দেশোত্তর গো-সকলের মধ্যে গিয়া পতিত হইয়াছিলেন এবং অতিশয় শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-হেতু শরীরে যে সঙ্কোচ (কুস্ত্র) উদ্ভিত হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত যিনি কৃষ্ণের গায় বিরাজিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরঙ্গ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে মোদিত করিতেছেন ॥ ৫ ॥

স্বকীয়স্তু প্রাণার্ঘবুদ-সদৃশ-গোষ্ঠস্তু বিরহাৎ

প্রলাপানুন্মাদাৎ সতত-মতি-কুর্বন্ বিকলধাঃ ॥

দধন্তিতৌ শশ্বদদন-বিধু ঘর্ষণে রুধিরং

ক্ষতোথং গৌরঙ্গঃ হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৬ ॥

যিনি স্বীয় অসংখ্য প্রাণ-সদৃশ শ্রীবৃন্দাবনের বিরহ-জ্ঞাত উন্মাদ-হেতুক নিরন্তর প্রলাপ করত ব্যাকুল-বুদ্ধি হইয়া অবিরত প্রাচীরে মুখোস্ত ঘর্ষণ করায়, ক্ষত হইতে উখিত রুধির সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরঙ্গ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে আশ্চর্যান্বিত করিতেছেন ॥ ৬ ॥

ক মে কাস্তুঃ কৃষ্ণস্তুরিতমিহ তং লোকয় সখে

ভ্রমেবেতি দ্বারাধিপমভিদধনুন্মদ ইব ।

দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদ্বক্তেন ধৃত-তদ্

ভুজাস্তো গৌরাজ্ঞো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭ ॥

কোনদিন শ্রীচৈতন্যদেব পুরীদ্বারে গমন করত উন্মাদের গায় সখি-ভ্রমে দ্বারপালকে কহিয়াছিলেন,—“হে সখে ! আমার সেই কান্ত শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ? তুমি তাঁহাকে শীঘ্র আনয়ন করিয়া দর্শন করাও”—এইরূপ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বারপাল তাঁহাকে কহিয়াছিল,—“তুমি প্রিয় দর্শনার্থে শীঘ্র গমন কর”—

এই প্রকার দ্বারপাল-কর্তৃক উক্ত হইলে, যিনি দ্বারপালের হস্ত ধারণ করিয়া-
ছিলেন, সেই শ্রীগৌরানন্দ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দে আপ্ত
করিতেছেন ॥ ৭ ॥

সমীপে নীলাদ্রেশচটক-গিরিরাজস্য কলনা-
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধন-গিরিপতিং লোকিতুমিতঃ ।
ব্রজলক্ষ্মীতাক্তা প্রমদ ইব ধাবন্নবধূতো
গণৈঃ শৈবগৌরান্দো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৮ ॥

যিনি নীলাচল-সমীপবর্তী চটক-গিরিরাজের দর্শন-হেতুক কহিয়াছিলেন—
“অয়ে স্বরূপাদি ! আমি বৃন্দাবনস্থ গোবর্দ্ধন গিরিপতি দর্শন-নিমিত্ত এই ক্ষেত্র
হইতে গমন করি”—এই বলিয়া স্বীয় ভক্তবৃন্দের সহিত প্রমত্তের ন্যায় ধাবিত
হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরানন্দ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষান্বিত
করিতেছেন ॥ ৮ ॥

অলং দোলা-খেলা-মহসি বরতন্মণ্ডপ-তলে
স্বরূপেণ স্বেনাপর-নিজগণেনাপি মিলিতঃ ।
স্বয়ং কুব্বন্নাম্মামতি মধুর-গানং মুরভিদঃ
সরঞ্জো গৌরান্দো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৯ ॥

যিনি দোলার খেলা অর্থাৎ লীলাকৌতুকদ্বারা শোভাবিশিষ্ট মণ্ডপতলে
স্বীয় স্বরূপের সহিত ও নিজগণের সহিত মিলিত হইয়া মুরারি শ্রীকৃষ্ণের নাম-
দ্বারা স্বয়ং অতিশয় মধুর গান করত তদভিনয়বিশিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরানন্দ
আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আমোদিত করিতেছেন ॥ ৯ ॥

দয়াং যো গোবিন্দে গরুড় ইব লক্ষ্মীপতিরলং
পুরীদেবে ভক্তি য ইব গুরুবর্যো যত্নবরঃ ।
স্বরূপে যঃ স্নেহং গিরিধর ইব শ্রীল-শুবলে
বিধত্তে গৌরান্দো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১০ ॥

লক্ষ্মীপতির গরুড়ে যাদৃশী দয়া তাদৃশী দয়া যিনি ভক্ত-শ্রেষ্ঠ গোবিন্দের প্রতি
বিধান করিয়াছিলেন, তথা সান্দীপনি মূনির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যাদৃশী ভক্তি ছিল,
তাদৃশী ভক্তি যিনি ঈশ্বরপুরী-দেবে বিধান করিয়াছিলেন এবং গিরিধর শ্রীকৃষ্ণের
শ্রীশুবলে যে-প্রকার স্নেহ ছিল, তদ্রূপ স্নেহ যিনি স্বরূপ-গোস্বামীর প্রতি ধারণ
করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরানন্দ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে পুলকিত
করিতেছেন ॥ ১০ ॥

মহা-সম্পদাদ্যপি পতিতমুদ্ধত্য কৃপয়া

স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং শ্রুত্ব মুদিতঃ ।

উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধন-শিলাং

দদৌ মে গৌরাক্ষো হৃদয় উদয়ন্থাং মদয়তি ॥ ১১ ॥

পতিত এবং কুৎসিত জন যে আমি, আমাকে যিনি কৃপাদ্বারা মহাসম্পৎ এবং কলত্রাদি চাইতে উদ্ধার করত স্বীয় স্বরূপের নিকট স্থাপন করিয়া প্রমোদিত হইয়াছিলেন এবং যিনি প্রিয়ত্বরূপে স্বীকার করিয়া আমার বক্ষঃস্থলে গুঞ্জাহার এবং (ভজনের উৎকর্ষ-জ্ঞাত) আমাকে গোবর্দ্ধন-শিলা দান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাক্ষ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীগৌরাক্ষোদাত-বিবিধ-সম্ভাব-কুসুম

প্রভা-ভ্রাজৎ-পট্যাবলি-ললিতশাখং সুরতরুং ।

মুহূৰ্যোহাত শ্রদ্ধৌষধি-বরবলং পাঠ-সলিলৈ-

রলং সিঞ্চেন্নিন্দেং সরস-গুরুতল্লোকন-ফলম্ ॥ ১২ ॥

এই প্রকার শ্রীগৌরাক্ষে বিজ্ঞমান বিবিধ সম্ভাব-কুসুম-প্রভা এবং ললিত ল্লোকশ্রেণী যাহার শাখা, এবস্তৃত সুরতরু-সদৃশ এই স্তবটী যে-ব্যক্তি নিরন্তর অতিশ্রদ্ধারূপ উৎকৃষ্ট ঔষধিদ্বারা সংশোধিত পাঠস্বরূপ সলিলসমূহে স্নেহ করেন, তিনি রস-বিশিষ্ট গুরুর কৃপা-দৃষ্টিক্রমে পরম ফল লাভ করেন ॥ ১২ ॥

প্রশ্নোত্তর

নবম ভক্তি

১। শ্রবণানুশীলন কয় প্রকার ?

“শ্রবণগত অনুশীলন ত্রিবিধ—শাস্ত্র শ্রবণ, ভগবদ্ভ্যাস ও ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত-শ্রবণ ও ভক্তিপূর্ণ বক্তৃতার শ্রবণ। ভগবত্তত্ত্ব-বিচার, ভগবত্তীলাদির বর্ণনরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র, বৈষ্ণব-জীবন-চরিত্র ও বৈষ্ণব-সংসারের পৌরাণিক ইতিহাসাদির শ্রবণকে ‘শাস্ত্র-শ্রবণ’ বলা যায়। বেদান্ত-তাৎপর্য্য-সহকারে অবৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-নিরসনপূর্ব্বক যে-সকল তত্ত্ব-গ্রন্থ মহানুভবগণ-কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করাও প্রধান ভগবদনুশীলন-কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে।” —চৈঃ শিঃ ৩।২-

২। হরিকথা বা সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিলে কি হয় ?

“হরিকথা ও হরিতত্ত্ব শুনিতে শুনিতে শাস্ত্রচর্চা হয়।” —জৈ: ধ: ৮ম অ:

৩। হরিকথা শ্রবণের দ্বারা কি প্রত্যাহার ও ভজন হয় ?

“হরিকথার শ্রবণের দ্বারা পরাতুশীলন ও প্রত্যাহার,—এই উভয়ই সম্পাদিত হয়।” —ত: সূ: ৩৪ সূ:

৪। শ্রবণের অবস্থা-ভেদ কিরূপ ?

“শ্রবণের দুই অবস্থা—শ্রদ্ধা উদয়ের পূর্বে সাধুগণের মুখে যে কৃষ্ণগুণাত্মবাদ শ্রবণ করা যায়, তাহা একপ্রকার শ্রবণ, সেই শ্রবণ হইতেই শ্রদ্ধার উদয় হয় ; শ্রদ্ধা উদিত হইলেই গাঢ় পিপাসার সহিত কৃষ্ণনামাদি শ্রবণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে ; তদনন্তর গুরু-বৈষ্ণবের মুখ-নিঃসৃত যে কৃষ্ণনামাদি শ্রবণ করা যায়, তাহারই নাম দ্বিতীয় শ্রবণ।” —জৈ: ধ: ১২শ অ:

৫। সাধনকালের শ্রবণের দ্বারা কি সিদ্ধিকালের শ্রবণের কোন সহায়তা হয় ?

“সাধনকালে গুরু-বৈষ্ণবের মুখ হইতে শ্রবণ করিতে করিতে সিদ্ধিকালের শ্রবণ উদিত হয়।” —জৈ: ধ: ১২শ অ:

৬। শ্রবণ-দশা হইতে সম্পত্তি-দশা পর্যন্ত ক্রম কি ?

“শ্রীশুকুর মুখে তত্ত্ব-শ্রবণই সাধকের ‘শ্রবণ-দশা’ ; সাধক ব্যাকুল হইয়া সেই তত্ত্বগত ভাব অঙ্গীকার করেন, তাহাই ‘বরণ-দশা’ ; রনস্মৃতিদ্বারা সেই ভাব অভ্যাস করেন, তাহাই ‘স্মরণ-দশা’ ; আপনাতে সেই স্মৃষ্টভাবে আনার নাম ‘আপন বা প্রাপ্তি-দশা’ এবং এই পার্থিব অনিত্য সত্তা হইতে পৃথক্ হইয়া স্বীয় বাঞ্ছিত স্বরূপ স্থিরীকৃত হওয়ার নাম ‘সম্পত্তি-দশা’ ” —‘ভজন-প্রণালী’, হ: চি:

৭। কীর্তনগত অনুশীলন কি কি ?

“কীর্তনগত অনুশীলন অতিশয় উৎকৃষ্ট। পূর্বোক্ত মত শাস্ত্র-কীর্তন, নাম-লীলাদি-কীর্তন, স্তব-পাঠরূপ কীর্তন, বিজ্ঞপ্তি ও জপ—এই পঞ্চবিধ কীর্তন। নাম-লীলাদির কীর্তন বক্তৃতা, কথা, ব্যাখ্যা ও গীতের দ্বারা হইয়া থাকে। বিজ্ঞপ্তি তিনপ্রকার,—প্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা ও লালসাময়ী।” —চৈ: শি: ৩২

৮। সকল ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গ কি ?

“অগ্র সকল অঙ্গ অপেক্ষা কীর্তনই শ্রেষ্ঠাঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।”

—জৈ: ধ: ১২ শ অ:

৯। কীর্তন সর্বপ্রধান কেন ?

“শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ—এই তিন অঙ্গের মধ্যে কীর্তন সর্বপ্রধান ; যেহেতু, শ্রবণ ও স্মরণ কীর্তনের অন্তর্ভূত হইয়া থাকিতে পারে।” —জৈ: ধ: ১২শ অ:

১০। কীর্তন সার্বজনীন-ধর্ম কেন?

“The principle of Kirtan invites, as the future church of the world, all classes of men without distinction of caste or clan to the highest cultivation of the spirit. This church, it appears, will extend all over the world and take the place of all sectarian churches, which exclude out-siders from the precincts of the mosque, church or the temple.”

—Chaitanya Mahaprabhu's Life & Precepts

১১। স্মরণানুশীলন কি কি?

“কৃষ্ণের, নাম, রূপ, গুণ, লীলার স্মরণের নামই—‘স্মরণ’। স্মরণ পঞ্চবিধ—যৎকিঞ্চিৎ মনন বা অনুসন্ধানের নাম—‘স্মরণ’; পূর্ব বিষয় হইতে চিন্তকে আকর্ষণ করত সামান্যাকারে মনোধারণের নাম—‘ধারণা’; বিশেষরূপে রূপাদির চিন্তনের নাম—‘ধ্যান’; অমৃতধারার জায় অনবচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম—‘কুবাস্মৃতি’ এবং ধোয়বস্তুর স্মৃতির নাম—‘সমাধি’।”

—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

১২। অমোঘ প্রাশ্চিত্ত কি?

“শ্রীবিষ্ণু-স্মরণের অপেক্ষা গুরুতর প্রাশ্চিত্ত জগতে নাই।”

—‘দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞান’, হঃ চিঃ

১৩। স্মরণ ও ধ্যানে পার্থক্য কি?

“স্মৃতি ও ধ্যানের ভেদ এই যে, ‘স্মৃতি’তে নাম, মন্ত্র, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদির কথঞ্চিৎ উদয় হয়। ‘ধ্যানে’ রূপ, গুণ, লীলার সূচরূপে চিন্তা হইয়া থাকে। ধ্যানকে দীর্ঘকাল রাখার নাম—‘ধারণা’। ধ্যানকে গাঢ় করিতে পারিলে ‘নিদিধ্যাসন’ হয়। অতএব ধ্যানই ধারণা ও নিদিধ্যাসনকেই ক্রোড়ীভূত করিয়াছে।”

—চৈঃ শিঃ ৩।২

১৪। স্মৃতি কয় প্রকার ও কি কি?

“স্মৃতি দুই প্রকার—নাম-স্মৃতি ও মন্ত্র-স্মৃতি। তুলসী-মালায় সংখ্যা করিয়া যে হরিনাম করা, তাহার নাম—নাম-স্মৃতি এবং করে সংখ্যা রাখিয়া যে মন্ত্র স্মরণ করা যায়, তাহার নাম—মন্ত্র-স্মৃতি।”

—চৈঃ শিঃ ৩।২

১৫। অষ্টকাল-সেবার কিরূপে উদ্দীপন হইতে পারে?

“শিক্ষাষ্টক চিন্ত, কর স্মরণ-কীর্তন।

ক্রমে অষ্টকাল-সেবা হ’বে উদ্দীপন ॥

সকল অনর্থ যাবে, পাবে প্রেমধন।

চতুর্দশ ফল-প্রায় হ’বে অদর্শন ॥”

—ভঃ রঃ প্রথম যামসান

১৬। পাদসেবন কি ? তদন্তর্গত কি কি ভক্ত্যঙ্গ আছে ?

“পাদসেবা’ বা ‘পরিচর্যা’ ভক্তির চতুর্থ অঙ্গ। শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ-সহকারে পাদসেবা কর্তব্য। পাদসেবা-কার্যে নিজের অকিঞ্চনত্ব, সেবায় অযোগ্যত্ব-বুদ্ধি এবং সেবা-বস্তুর সচ্চিদানন্দঘনত্ব-বুদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পাদসেবা-কার্যে শ্রীমুখ-দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা, অণুব্রজন, ভগবদ্ভক্তি-গঙ্গা-পূর্ববোক্তম-দ্বারকা-মথুরা-নবদ্বীপাদি তীর্থস্থান দর্শনাদি অন্তর্ভাব্য। শ্রীকৃষ্ণগোস্বামী ভক্তির চতুষ্টয় অঙ্গ বর্ণন-প্রসঙ্গে এইসকল বিষয় পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীতুলসী-সেবা ও মাধু-সেবাও এই অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।”

—জৈঃ ধঃ ১২শ অঃ

১৭। অর্চন-ক্রিয়ার আবশ্যকতা কি ?

“নাম-সকীর্তনে সর্বসিদ্ধি হয়, তথাপি ভক্তিময়-জীবনযাত্রার জন্ত কিছু অর্চন-ক্রিয়ায় বিশেষ উপকার হয়।”

—ভঃ রঃ ‘সংক্ষেপার্চন-পদ্ধতি’

১৮। অর্চনমার্গে বিশেষ শ্রদ্ধা হইলে কি করা প্রয়োজন ?

“অর্চনমার্গে অধিকার ও প্রক্রিয়া-বিচার অনেক—শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণে নিযুক্ত হইয়াও যদি অর্চনমার্গে শ্রদ্ধা উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মশ্রয়-পূর্বক মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করত অর্চন-প্রক্রিয়া করিবে ”

—জৈঃ ধঃ ১২শ অঃ

১৯। অর্চনমার্গে দীক্ষাদি গ্রহণ না করিলে কি অসুবিধা হয় ? কি কি বিষয় অর্চনমার্গের অন্তর্গত ?

“দেহাদি সম্বন্ধে জীব কদম্ব-বিষয়ে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হওয়ায় সেই চিত্ত সঙ্কোচ-করণাভিপ্রায়ে মর্যাদামার্গে স-মন্ত্ৰার্চন-বিধি নিকৃপিত হইয়াছে। বিষয়-লোকের পক্ষে দীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রে ‘সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধারি’-বিচারের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষাই জীবের পক্ষে অত্যন্ত শুভকর। জগতে যত মন্ত্র আছে, সকল মন্ত্র অপেক্ষা কৃষ্ণমন্ত্র প্রবল। সৎগুরুর নিকট মন্ত্রলাভ করিবামাত্র অধিকারী জীবের কৃষ্ণবল লাভ হয়। শ্রীগুরুদেব জিজ্ঞাস্তকে অর্চনাঙ্গ-সকল বলিয়া থাকেন। *** সংক্ষেপতঃ ইহাই জ্ঞাতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম, কার্তিক-ব্রত, মাঘ-স্নানাদি—সকলই অর্চনমার্গের অন্তর্গত। কৃষ্ণার্চন-বিষয়ে একটা বিশেষ কথা আছে—কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণভক্তের অর্চনও নিতান্ত প্রয়োজনীয়।”

—জৈঃ ধঃ ১২শ অঃ

(ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথায়ত

শ্রীগুরুপাদপদের রূপা হইলেই কৃষ্ণ পাওয়া যায়। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ ব্যতীত কার্কে করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। কৃষ্ণই প্রয়োজক-কর্তা, আর প্রয়োজ্য-কর্তৃত্ব শ্রীগুরুপাদপদের।

বৈষ্ণবের পূজা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই। শ্রীগৌর-সুন্দর জগতে গুরুদেবের কার্য্য করিয়া আমাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ হইতেও শ্রীগুরুপাদ-পদের অধিক প্রয়োজনীয়তাই জানাইয়াছেন। গুরু ভগবান্ হইতে অভিন্ন হইলেও ভগবন্তের প্রধান তত্ত্বরূপে গুরুত্বের অবস্থান।

প্রকৃত সাধুসঙ্গ-কলে শ্রবণ-কীর্তন-রূপ ভজনক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং বিজ্ঞাবধুনাথ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক কীর্তন যতটা হইতে থাকে, ততটা অনর্থ-নিবৃত্তি সাধিত হয়। অনর্থ-নিবৃত্তি পর্য্যন্ত সাধকজীবন। অনর্থমুক্তির কলে অর্থাৎ সিদ্ধির পথে প্রথম পদবিক্ষেপই নিষ্ঠা বা নিরন্তর হরিকীর্তনে অভিনিবেশ। তাহার ফলে স্বাভাবিকী রুচির উদয়ক্রমে আসক্তি ও তৎপরে স্থায়িত্ব বা প্রেমের পূর্বাবস্থা লাভ হইবে।

প্রত্যহ চব্বিশ ঘণ্টা হরিনাম করিতে হইবে। সকল সময়ে যাহার ভজনে অধিকার হইয়াছে, তিনি 'সকল লোক হরিভজন করিতেছে, আমারই হরিভজন হইল না'—এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন।

অনর্থযুক্ত জীব কৃষ্ণের বিষয়ের অনুশীলনকেই কৃষ্ণানুশীলন বলিয়া ভুল করে। যদি কাণে কৃষ্ণকথা ছাড়া অন্য কোন কথা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অমঙ্গল হইল। যে কোন শব্দ উচ্চারিত হউক না কেন, তাহাতে কি-প্রকারে কৃষ্ণসেবা হইতেছে, সেই শব্দে কি-প্রকার সেবন-ধর্ম্ম অধিষ্ঠিত আছে, তাহা অনুভব করিবার বৃত্তি হইলেই সর্ব্ব অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপাদ-পদের অপ্রাকৃত শব্দ-বাক্যের সেবোন্মুখ কর্ণে প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত জীবের বধিরতা দূর হয় না।

যিনি প্রতিমুহূর্ত্তে স্বীয় পাদপদে আমাকে আকর্ষণ করিয়া রাখেন, আমি সেই শ্রীগুরুপাদপদ হইতে যে মুহূর্ত্তে ভ্রষ্ট হই, সেই গুরুপাদপদ বিষ্মত হই, সেই মুহূর্ত্তে আমি নিশ্চয়ই সত্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছি।

সত্য জানিবামাত্রই তাহাতে আমার নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের জীবনের সময় যাহার যতটুকু আছে, উহার এক মুহূর্ত্তও বিষম-কার্য্যে নিযুক্ত না রিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা উচিত।

প্রত্যেক বস্তুতে আমার গুরুপাদপদ্ম প্রতিফলিত। কৃষ্ণ—অর্দ্ধেকটা, আশ্রয়জাতীয়-অর্দ্ধেকটা; এতদুভয়ের বিলাস-বৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি কৃষ্ণ, আর আশ্রয়জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি—আমার গুরুপাদপদ্ম।

জীবনব্যাপী ভগবানের সেবা করিতে হইবে—ইহা সর্বক্ষণ দেখাইতেছেন যিনি, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সেই গুরুপাদপদ্ম প্রতি জীবহৃদয়ে আশ্রয়-জাতীয়রূপে, প্রতি বস্তুতেই প্রতিবিম্বিত হইতেছেন। তিনি প্রতি বস্তুতেই বিরাজমান।

শ্রবণ করা ব্যতীত অদ্বয়জ্ঞানবস্তু-সম্বন্ধে অণু কোন প্রকার চেষ্টা করিতে হইবে না। অদ্বয়জ্ঞানবস্তু যখন স্বয়ং আসিয়া যাইবেন, তখনই অদ্বয়জ্ঞানের সেবা করিতে হইবে। প্রণিপাতদ্বারাই শ্রবণাধিকার লাভ হয়—শ্রদ্ধাবৃত্তিদ্বারাই শ্রবণে অধিকার। শ্রবণ অর্থাৎ দেবা প্রবৃত্তি ব্যতীত সেই বস্তুর অভিজ্ঞান কোনদিনই হইতে পারে না।

মহাস্তগুরুদেবকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্তি না বলিলে কোনদিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হইবে না। সাক্ষাৎ ভগবান্কে যেরূপ বিচার করিবে—গুরুদেবকে সেইরূপ বিচার করিবে; কোনও অংশে কম মনে করিবে না। সাধুসকল, পণ্ডিতসকল—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণসকলের কর্তব্য হইতেছে—ভগবানের গায় গুরুকে জানা—পূজা করা, সেবা করা। যদি তাহা না করেন, তবে শিষ্ঠ-স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যাইবেন। ভগবান্ নিজেই নিজের সেবানিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মুকুন্দ—সেব্য-ভগবান্, বিবয়-ভগবান্, আর মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্, আশ্রয়-ভগবান্। আমার শ্রীগুরুদেবের তুল্য প্রিয় ভগবানের আর কেহ নাই।

যে কয়টা দিন জীবন আছে, সেই শেষ কয়টা দিন যদি হরিভজন করা যায়, তাহা হইলেই সুবিধা হইবে। জগতের তথাকথিত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা এই বিশ্ব—কিছুই থাকিবে না। চব্বিশ ঘণ্টা যদি হরিভজন না করি, তাহা হইলে সন্ধ্যোগ পাইয়াও হারাইয়া ফেলিলাম।

“শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট”-এর অনুকূলে প্রদত্ত যাবতীয় দান আয়কর-মুক্ত। চেক্, ড্রাফট্, মানি অর্ডার ইত্যাদি “শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট” (Shri Goudiya Vedanta Samiti Trust), ২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০০০৪ এর অনুকূলে প্রদেয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পারতমত্ব

তত্ত্ববিদগণ অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ক্রমবিচার দুইপ্রকার—উর্দ্ধ ও নিম্ন। ‘ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে’-বাক্যে উর্দ্ধগ বিচার প্রকাশ পাইয়াছে। তজ্জন্ত তত্ত্বত্রয়-বিচারে সর্বনিম্ন তত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্বেরই উল্লেখ প্রথমে দৃষ্ট হইতেছে। পরমাত্মতত্ত্ব মধ্যবর্তীতত্ত্ব এবং ভগবান্-তত্ত্ব সর্বোচ্চ তত্ত্ব বলিয়া সর্বশেষে উক্ত হইয়াছেন। শাস্ত্রের সর্বত্রই এইরূপ বিচার সুরক্ষিত দৃষ্ট হয়। পরমব্রহ্ম ও পরমাত্মা-শব্দদ্বয় বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন পদ; ইহাকে কর্মধারয় পদ বলিলে শাস্ত্রবিচারের সঙ্গতি বিঘ্নিত হয়। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা শব্দ উন্নততম পদ নহে বলিয়াই উক্ত পদদ্বয়ে “পরম” শব্দ যোজিত হইয়া থাকে। পরন্তু ‘ভগবৎ’-শব্দে ‘পরম’-শব্দের যোজনা নাই। ভগবান্ই সর্বোচ্চ তত্ত্ববিধায়, ইহাতে ‘পরম’-শব্দের যোজনা অপ্রচলিত। বিশেষতঃ ব্রহ্মতত্ত্বের দুইপ্রকার বিচার বিশেষ প্রবলরূপে প্রচলিত—সবিশেষ ব্রহ্ম ও নির্বিশেষ ব্রহ্ম। নির্বিশেষ ব্রহ্মকে মায়াবাদ বলা হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর ইহা নিজমুখেই প্রকাশ করিয়াছেন। মায়া-শব্দের অর্থ অসত্য বা মিথ্যা। অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব নির্বিশেষ নহেন; তাহাকে নির্বিশেষ বলিলে মিথ্যা বলা হয়। বৌদ্ধগণ বেদপ্রতিপাত্ত ‘ব্রহ্ম’কে অস্বীকার করত “শূন্যবাদ” প্রচার করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করও তদ্রূপ ভক্তিপথের সুরক্ষণ-নিমিত্ত অস্বরগণকে ভক্তিপথ হইতে মিথ্যাজ্ঞানের চাক্চিক্যে আকৃষ্ট করিতে মায়াবাদরূপ অসৎ বা মিথ্যা শাস্ত্রের প্রচার করিয়াছেন। যথা—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।

ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণমূর্তিনা ॥ (পদ্মপুরাণ)

শাস্ত্রের প্রকৃত সিদ্ধান্ত বিচারেও ব্রহ্মতত্ত্ব নির্বিশেষ বলিয়া উক্ত হয় নাই। ব্রহ্মের সবিশেষত্বই শাস্ত্রের একমাত্র মর্ম্ম। ভগবানের মহাশক্তিমান্ দাস শঙ্করই স্বীয় প্রভুর আদেশ পালনার্থে ইহাকে নির্বিশেষ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। যথা,—

স্বাগমৈঃ কল্লিতৈস্তৃণ জনান্নদ্বিমুখান্ কুরু।

মাঞ্চ গোপয় যেন স্ত্রাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥ (পদ্মপুরাণ)

শ্রীহরি মহাদেবকে কহিলেন,—তুমি নিজকল্লিত আগমশাস্ত্রদ্বারা জনগণকে আমা হইতে বিমুখ কর, আমাকে এরূপভাবে গোপন কর যাহাতে বহিঃস্মৃৎ জীব

বিমুখ হইয়া উত্তরোত্তর সৃষ্টিকার্য্যে প্রসক্ত হয়। আচার্য্য শঙ্কর ভগবদ্ভক্ত হওয়ায় ভক্তিপথের সংরক্ষণার্থ তাঁহার এরূপ অম্লমোহন-লীলা।

প্রকৃত সংসিদ্ধান্তবিদের ব্রহ্ম নির্বিশেষ নহেন, তাহা সর্বিশেষ বলিয়াই বিবেচিত।—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভি-
সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।

—এই উপনিষদ্বাক্যের প্রকৃত অর্থ পরমপূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস. কবিরাজ
গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণন করিয়াছেন।—

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥
অপাদান, করণ, অধিকরণ—কারক তিন।
ভগবানের সর্বিশেষে এই তিন চিহ্ন ॥
ভগবান্ অনেক হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত-শক্তিতে তখন কৈল বিলোকন ॥
সেকালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন-নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত—ব্রহ্মের নেত্র-মন ॥

* * *

অপাণিপাদ-শ্রুতি বর্জে প্রাকৃত পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে—শীঘ্র চলে, করে সর্ব গ্রহণ ॥
অতএব শ্রুতি কহে, ব্রহ্মা—সর্বিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি' লক্ষণাতে মানে নির্বিশেষ ॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তিক করি' তাঁরে করহ নিশ্চয় ॥

ব্রহ্মসূত্রের বিচার বিষয়েও শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—

জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাগ্য গুনিলে হয় সর্বনাশ ॥
পরিণামবাদ—ব্যাস-সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত ॥
মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর, তবু অধিকার ॥

ব্যাস—ভ্রান্ত বলি' সেই সূত্রে দোষ দিয়া ।

বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥

জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি, সেই মিথ্যা হয় ।

জগৎ কতু মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয় ॥

প্রণব যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্তি ।

প্রণব হৈতে সর্ববেদ, জগতে উৎপত্তি ॥

তত্ত্বমসি—জীব-হেতু প্রাদেশিক বাক্য ।

প্রণব না মানি' তারে কহে মহাবাক্য ॥

এইমতে কল্লিত ভাঞ্জে শত দোষ দিল ।

ভট্টাচার্য্য পূর্বপক্ষ অপার করিল ॥

অতএব ব্রহ্মের নির্বিশেষ বিচার মিথ্যা, সবিশেষই যথার্থ সত্য জানা যায় । এই ব্রহ্মতত্ত্বকে স্পষ্টভাবে ভগবন্তত্ত্বের অসম্যক প্রকাশ বলা হইয়াছে । ইহা ভগবন্তত্ত্বেরই আশ্রিত তত্ত্ব । শ্রীগীতাতে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন ।—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ অমৃতশ্রাব্যশ্চ চ ।

শাস্বতশ্চ চ ধর্মশ্চ সূখশ্চৈকান্তিকশ্চ চ ॥ (১৪।২৭)

অর্থাৎ—আমি নিশ্চয়ই অব্যয়, অমৃত, শাস্বত, ধর্মপ্রাপ্য ঐকান্তিক সূখের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয় তত্ত্ব ; আমাকে আশ্রয় করিয়াই ব্রহ্ম প্রভৃতি তত্ত্বের বর্তমানতা ।

শ্রুতিমধ্যে 'অপানি', 'অপাদো', 'অচক্ষু', 'অকর্ণ', প্রভৃতি নির্বিশেষপর বাক্যের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র বলিয়াছেন,—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব ।

বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥

অর্থাৎ—যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে নির্বিশেষ বলিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন ।

পরমাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

পরমাত্মা য়েঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ ।

আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব-অবতংস ॥

এ বিষয়ে কবিরাজ গোস্বামী ভাগবতের প্রমাণ দিয়াছেন ।—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্ ।

জগদ্ধিতায় যোহপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া । (ভাঃ ১০।১৪।৫২)

অখিলাআর আত্মস্বরূপ বলিয়া এই শ্রীকৃষ্ণকে জান, জগতের হিত-কামনায় তিনি এখানে অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে মনুষ্যের গায় প্রকট হইয়াছেন ।

শ্রীগীতা হইতেও তিনি প্রমাণ দিয়াছেন ।—

অথবা বহ্নৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন ।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ (১০।৪২)

হে অজ্জুন, অধিক কি বলিব, আমি এক অংশে পরমাত্মারূপে অখিল জগতে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত ।

বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরী, বারাণসী প্রভৃতি সর্বত্র দার্শনিক পণ্ডিতগণকে শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৭।১০ শ্লোকটির বিচারদ্বারা ভগবত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে তদীয় আশ্রিত তত্ত্বরূপে উপদেশ করিয়া সত্যের নির্ণয় করিয়াছেন । সমস্ত দার্শনিক জগৎ এই বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করত তাহার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব গান করেন ।

আত্মারামাশ্চ মনয়ো নিগ্রহা অপ্যকৃত্রমে ।

কুর্কন্ত্যহৈতুকীঃ ভক্তিমিথস্তু তত্ত্বগো হরিঃ ॥

জীবমুক্ত আত্মারাম মনিসকলও শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তিবিধান করেন ; ইহার কারণই তাঁহার উপযুক্ত গুণ ।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু তত্ত্ববিচারে সর্বতোভাবে এক হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার বৈশিষ্ট্যরূপে ঐদার্য্যক্ষেত্রে পারতমত্ব প্রকাশিত । বারিখণ্ডের পথে ইহার বিশেষরূপ অভিব্যক্তি লক্ষিত হইয়াছে । ব্যাঘ্র ও মৃগীগণের তাঁহাকে দর্শন, স্পর্শন ও তাঁহার শ্রীকণ্ঠোচ্চারিত “হরেকৃষ্ণ” নাম শ্রবণ করত স্বভাবজাত হিংসা ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পরের মুখ চুষনকার্য্য শ্রীকৃষ্ণের অত্র কোন লীলায় উল্লেখ নাই । ইহা কি মহাপ্রভুর নিজস্ব লীলা পারতমত্ব নহে ? শ্রীবৃন্দাবনের স্বাভাবিক ধর্ম্মে তথায় হিংসার বর্ত্তমানতা না থাকিলেও এরূপ পরম শত্রুর সহিত প্রেমচুষন পরিলক্ষিত হয় নাই । এতৎ সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা,—

নির্জ্ঞান বনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লৈয়া ।

হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুরে দেখিয়া ॥

পালে পালে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, শূকরগণ ।

তার মধ্যে আবেশে প্রভু করিল গমন ॥

দেখি ভট্টাচার্য্যর মনে হয় মহাভয় ।

প্রভুর প্রতাপে তারা একপাশ হয় ॥

একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন ।

আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ ॥

প্রভু কহে,—কহ কৃষ্ণ, ব্যাঘ্র উঠিল ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥

বর্তমান শিক্ষিতাভিমानी জগতের ইহা অবিশ্বাস্ত হইলেও, ইহা মিথ্যা বা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে ; পরন্তু জড়বিজ্ঞায় ইহা অনুভবনীয় ও বিশ্বসনীয় নহে । শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ববিষয়ে অজ্ঞতাই ইহাতে অবিশ্বাসের কারণ । যথা,—

দেখিয়া না দেখে যৈছে অভক্তের গণ ।

উল্কে না দেখে যৈছে সূর্যের কিরণ ॥

অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয়ধূলিতে ।

কেমনে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে ??

জড়বিজ্ঞানীরা এই দৃশ্য দৃষ্ট হয় না । ইহা সম্পূর্ণ চিহ্নিজ্ঞান (**Spiritual Science**) । কোনও সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আজ পর্যন্ত আত্মাকে (**Soulকে**) দেখিতে পান নাই বা তাহাকে দর্শন করিবার উপযুক্ত কোন যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই—ইহা স্মৃত্য ।

যাহার ইচ্ছামাত্রেই অসম্ভব সম্ভব হয় সেই মহাপ্রভুর পবিত্রতম পাদম্পর্শ লাভের কি ফল তাহা এস্থলে প্রকটিত হইয়াছে । ব্যাঘ্রের ও মৃগীর আত্মার মায়িক আবরণ বিদূরিত হইয়া চেতনের পূর্ণ বিকাশ হওয়ায় তাহারা বৃন্দাবনীয় প্রেমলাভে সমর্থ হওয়ায় পরস্পর চুম্বন করিতেছেন—ইহা চিহ্নিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা । “চেতন হৈতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে, শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ ।”—ইহাই প্রকটিত হইল ।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিহিন্দন্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে সর্বকর্মাণি ময়ি দৃষ্টে অখিলাত্মনি ॥ (১১।২০।৩০)

সর্বাস্তব্যামী পরমাত্মরূপী আমার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে জীবের অহংকার বিনষ্ট, সর্বসংশয় ছিন্ন এবং কর্মরাশি ক্ষীণ হইয়া থাকে ।

আরদিনে মহাপ্রভু করে নদী-স্নান ।

মত্তহস্তীযুথ আইল করিতে জলপান ॥

প্রভু জলে কৃত্য করেন আগে হস্তী আইলা ।

কৃষ্ণ কহ বলি' প্রভু জল ফেলি' মারিলা ॥

সেই জলবিন্দুকণা লাগে যার গায় ।

সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে, প্রেমে নাচে গায় ॥

কেহ ভূমে পড়ে, কেহ করয়ে চীৎকার ।
 দেখি' ভট্টাচার্যের মনে হয় চমৎকার ॥
 পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ-নামসংকীৰ্ত্তন ।
 মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীগণ ॥
 ভাহিনে-বামে ধ্বনি শুনি' যায় প্রভুসঙ্গে ।
 প্রভু তার অঙ্গ মুছে, শ্লোক পড়ে রঙ্গে ।

* * *

হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইল পাঁচসাত ।
 ব্যাঘ্র-মৃগী মিলি' চলে মহাপ্রভুর সাথ ॥
 দেখি মহাপ্রভুর 'বৃন্দাবন'-স্মৃতি হৈল ।
 বৃন্দাবন-গুণ-বর্ণন শ্লোক পড়িল ॥
 “যত্র নৈসর্গদুর্ভৈরাঃ সহাসন্ নৃ-মৃগাদয়ঃ ।

মিত্রাণীবাজিতবাস-ক্রত-রুট্‌তর্ষণাদিকম্ ॥” (ভাঃ ১০।১৩।৬০)

যে-স্থলে নর-ব্যাঘ্রাদি নিসর্গবশতঃ পরস্পর বিরুদ্ধচেষ্ট হইয়াও মিত্রভাবে একত্র
 বাস করে এবং কৃষ্ণের আবাসস্থল বলিয়া ক্রোধ-লোভাদি যে ধামকে
 পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিয়াছিল, ব্রহ্মা সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-ধাম দেখিতে
 পাইলেন ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ, মহাপ্রভু যে বলিল ।
 কৃষ্ণ কহি' ব্যাঘ্র-মৃগ নাচিতে লাগিল ॥
 নাচে, কাঁদে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ-সঙ্গে ।
 বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব রঙ্গে ॥
 ব্যাঘ্র-মৃগ অগোষ্ঠে করে আলিঙ্গন ।
 মুখে মুখ দিয়া করে অগোষ্ঠে চুম্বন ॥
 কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিল ।
 তা-সবাকৈ তাহাঁ ছাড়ি' আগে চলি' গেলা ॥
 ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুরে দেখিয়া ।
 সঙ্গে চলে, কৃষ্ণ বলি' নাচে মত্ত হৈয়া ॥
 হরিবোল বলি' প্রভু করে উচ্চধ্বনি ।
 বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত, সেই ধ্বনি শুনি' ॥
 ঝারিথণ্ডে স্থাবর-জঙ্গম আছে যত ।
 কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্নত ॥

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু “অনর্পিতচরীং চিরাৎ” শ্লোকে এই পারতমত্বই প্রকাশ
 করিয়াছেন ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

গেরুয়া বসন

অকৃতদার নৈষ্ঠিক ও উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারিগণের জন্য ব্রহ্মচর্যা, কৃতদার গৃহস্থগণের জন্য গার্হস্থ্য, সংসার-ক্ষয়োন্মুখ বানপ্রস্থিগণের জন্য বানপ্রস্থ এবং ত্যক্তসংসার ভিক্ষু-গণের জন্য সন্ন্যাস—সাধারণতঃ এই চারিটী আশ্রমের কথা বিভিন্ন শাস্ত্রাদিতে পরিলক্ষিত হয়। আশ্রমাতীত অবস্থা শাস্ত্রে অবধূত পরমহংস অবস্থারূপে চিহ্নিত। আশ্রমাতীত অথবা আশ্রমাত্তর্গত কোন অবস্থাই নহে, সেই যে আশ্রম-বহির্ভূত অবস্থা তাহা বিশৃঙ্খলতায় পরিপূর্ণ ও অমঙ্গলজনক। আশ্রম-বহির্ভূত বিশৃঙ্খলতারূপ অবিধি ও আশ্রমাতীত সুশৃঙ্খলতারূপ বিধির অতীত ব্যাপার সমপর্যায়ের পরিদৃষ্ট হইলেও তাহাদের মধ্যে বিরাট্ পার্থক্য বিद्यমান রহিয়াছে। অবধূত ও পরমহংসগণ আশ্রমবিধি নষ্ট করিয়া তুর্নৈতিক হইবার অভিলাষ মনে পোষণ করেন না; পরন্তু আশ্রম-বিধিদ্বারা যে সুফল লাভ ঘটে, তাদৃশ ফললাভে তাঁহারা সিদ্ধ হইয়া বিধির উদ্দিষ্ট ব্যাপারই সাধন করেন। নিম্নাধিকারে বিধিরই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। স্বয়ং শ্রীমন্নহাপ্রভু সাধারণ তুর্ধ্যাশ্রম-বিধির অতীত অবস্থার সৌন্দর্য্য হানি করেন নাই, আবার সেই আশ্রমবিধির সৌন্দর্য্য-সংরক্ষণ-মানসে তিনি বিধি-বাধ্য হইবার যে লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তদ্বারা বিশৃঙ্খল রাজ্যের অবৈধ ক্রিয়ার পোষণ সম্পূর্ণরূপে অননুমোদিত হইয়াছে। সাধারণ জীবের পক্ষে আশ্রম বিধির স্তূষ্ট পালনই পারমাথিক উন্নতির একমাত্র সোপান—ইহা শ্রীগৌরহরি স্পষ্ট-রূপে আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

হরিভজনপরায়ণ ত্যক্তগৃহ সাধক ভক্তগণের পক্ষে ব্রহ্মচর্যা বা সন্ন্যাসাশ্রমে অবস্থিত হইয়া তত্বচিত বেধ গৈরিক বসনাদি পরিধান করা শাস্ত্রসম্মত অর্থাৎ বৈধ। ত্যক্তগৃহ বানপ্রস্থীরা চতুর্থাশ্রমীর অন্তর্গত হওয়ায় তাহাদের কেহ কেহ গেরুয়া বসন ধারণ করিয়া থাকেন, ইহাতে দোষের কিছুই নাই। পরন্তু গৃহস্থ সাধক ভক্তগণের পক্ষে গেরুয়া বসন পরিধান করা অশাস্ত্রীয় ও দোষাবহ। শাস্ত্রবিধি ও মহাজন-বাণী লঙ্ঘন করিলে অমঙ্গল অবশুস্তাবী। ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর যে গেরুয়া বসন ধারণ শাস্ত্রসম্মত, তাহা স্কন্দপুরাণোক্ত স্মৃতসংহিতায় পাওয়া যায়,—

শিখী যজ্ঞোপবীতী স্রাং ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।

স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা ॥

“ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী শিখা রাখিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ, কমণ্ডলু গ্রহণ, গৈরিক বসন পরিধান এবং সর্বদা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবেন।” এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রের অন্তত্ৰ পাওয়া যায়,—

দণ্ডং কমণ্ডলুং রক্তবস্ত্রমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ ।

নিত্য প্রবাসী নৈকত্র স সন্ন্যাসীতি কীর্তিতঃ ॥

(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)

“দণ্ড, কমণ্ডলু ও রক্তবস্ত্র (গেরুয়া বসন) ধারণ করিয়া যিনি নিত্য প্রবাসে থাকেন, তিনি ‘সন্ন্যাসী’ নামে কীর্তিত ।” “গেরুয়া” বা “কাষায়” বলিতে সাধারণতঃ অল্পজ্বল রক্তবর্ণকে (Red ochre) বুঝায় । “রক্তবস্ত্র” বলিতে যদি রক্তের তায় উৎকট লালবর্ণকে নির্দেশ করে, তাহা হইলে অতি অবশ্যই তাত্ত্বিকগণের পরিধানযোগ্য ঐরূপ রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবগণের পরিধান করা কখনও উচিত নহে । এই প্রসঙ্গে হুসিংহপুরাণে উল্লেখ রহিয়াছে,—

ন রক্ত মুম্বনং বাসো ন নীলঞ্চ প্রশস্ততে ।

মলাক্তঞ্চ দশাহীনং বর্জয়েদম্বরং বুধঃ ॥

“উৎকট রক্তবর্ণ, নীল, মলাক্ত, দশাহীন অর্থাৎ জীর্ণ, ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করা প্রশস্ত নহে, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঐরূপ বস্ত্র অবশ্যই পরিত্যাগ করিবেন ।”

শ্রীগৌড়ীয়-গুরুবর্ণগণ কাষায় বস্ত্র পরিহিত ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসী । আজও গেরুয়া বেষধারিগণ ভাগবতোক্ত ও বেদোক্ত ত্রিদণ্ডবিধি গ্রহণ করিয়াই শ্রীকৃপানুগ সমাজে প্রবেশ লাভ করেন । বেষধারণ পরাঅনিষ্ঠা মাত্র, উদ্দেশ্য কৃষ্ণসেবা ।

পরোঅনিষ্ঠা মাত্র বেষধারণ ।

মুকুন্দসেবায় হয় সংসার তারণ ॥ (১৫: ৮: মধ্য ৩৮)

কৃষ্ণসেবারত ব্যক্তির সাংসারিক অসংসঙ্গ তাগ অপরিহার্য, তাহা না হইলে মনোব্যাসঙ্গ ধ্বংস হয় না । কৃপানুগ বৈষ্ণবের গেরুয়া বসন ধারণপূর্বক ত্রিদণ্ডবিধি ব্যতীত কৃষ্ণে অমুরাগের সম্ভাবনা নাই । কৃষ্ণসেবা প্রবল না হইলে বিদ্বৎ সন্ন্যাস বা পারমহংস ধর্ম্মে অবস্থান সম্ভবপর নহে । এই প্রসঙ্গে জগদগুরু শ্রীম ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—“শ্রীকৃপানুগগণ সকলেই ত্রিদণ্ডী । ত্রিদণ্ড গ্রহণ ব্যতীত কাহারও পার্থিব বিষয় লোভের হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই । অগৃহীত-ত্রিদণ্ডের পার্থিব অভিনিবেশ ঘুচে না বলিয়াই শ্রীকৃপানুগ হওয়া তাহার ভাগ্যে ঘটে না । শ্রীকৃপানুগ কখনও বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মে আবদ্ধ নহেন । সাদা কাপড়ে, গৈরিক বসনে, কোপীনে বা ত্রিকচ্ছে আবদ্ধ নহেন । ঐগুলি ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিচারের কথা । বর্ণ বা আশ্রমধর্ম্ম চতুষ্টয়প্রকার ভক্ত্যঙ্গ নহে । ইহা শরণাগতের আনুকূল্য সংস্কল্প ও প্রাতিকূল্য বর্জন-নামক ষড়ঙ্গ শরণাগতজনের ধর্ম্মদ্বয় । দুঃসঙ্গ পরিহার ও সংসঙ্গ গ্রহণ ব্যতীত কৃপানুগত্বের সম্ভাবনা নাই ।”

ত্রিদণ্ডগ্রহণ ও কাষায় বেষগ্রহণ প্রভৃতি উচ্চ পরমহংস বেষ নহে, ইহা কৃপানুগগণ

জানেন। সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাগমার্গীয় পরমহংস বৈষ্ণবগণের মর্যাদামার্গোচিত কাষায়বস্ত্র পরিধানের বাধ্য-বাধকতা নাই। এইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সহজ রাগ-মার্গীয়কুলের আদর্শ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায়,—“রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়।” উক্ত পয়ারের অন্তর্ভাষ্যে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—“বৈষ্ণবগণ পরমহংস ও অকিঞ্চন, স্তূতরাং বৈধ সন্ন্যাসিগণের পরিধেয় গৈরিকবসন পরিধান করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় পরমহংসাত্ম্য নির্দেশ বা প্রদর্শন করিতে হয় না।” প্রশ্ন আসিতে পারে, রাগমার্গীয় পরমহংসগণের কাষায়-বস্ত্র পরিধান যদি নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, তবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ প্রেমিক গুরুবর্গ তাহা কেন ধারণ করিয়া থাকেন? ইহার উত্তর এই যে,—“পরমহংসবেষে কাষায়-বস্ত্রাদির অপেক্ষা নাই সত্য, কিন্তু যাহারা আপনাদিগকে পরমহংস গুরুর বেষে সজ্জিত না করিয়া দৈন্যভরে পরমহংস-দাসাভিমাণে আশ্রমস্থ অভিনয় করিয়া আচার্যের কার্যাদি করেন, তাহারা গুরু-বৈষ্ণবের অযোগ্য তুর্ধ্যাত্মোচিত গৈরিক বসনাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রেমিক গুরুবর্গ পরমহংসগণের অবৈধ অনুকরণ বা মর্কটোচিত মুখভঙ্গী হইতে অনর্থগ্রস্ত জীবকুলকে রক্ষা করিবার জন্য বর্ণাশ্রমীয় ত্রায় গুরুবর্গের মর্যাদা স্থাপন ও অত্ৰ্যদিকে দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম প্রচারোদ্দেশ্যে ক্রম-মঙ্গলের পথ প্রশস্তের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।”

মোটকথা, গেরুয়া বসন পরিধানপূর্বক প্রকাশ্য ত্রিদণ্ড গ্রহণ করুন বা না করুন ত্রিদণ্ডবিধি হইতে বিপথগামী হইয়া কৃষ্ণভজন হইতে পারে না,—ইহা শ্রীকৃপের সিদ্ধান্তিত কথা। শ্রীগৌরসুন্দর—যিনি রাগানুগপথের উপদেষ্ট্যরূপে শ্রীল রূপ-গোস্বামীর রাগানুগ-পথের নিদর্শনলীলা দেখাইয়াছেন, তিনি স্বয়ংই বৈদিকানুশাসন পালন-লীলাভিনয়কারী গৈরিক বসনধর দণ্ডি-সন্ন্যাসী। ব্রজমণ্ডলের কাম্যবনে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ ত্রিদণ্ড ও গৈরিকবসন গ্রহণপূর্বক আচার্য-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীমাধবাচার্য্য ত্রিদণ্ড ও কাষায় বস্ত্রগ্রহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচার করিয়া-ছিলেন। শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্ব প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এবং তদীয় অনুগত বৈষ্ণববৃন্দ সকলে গৈরিক বসন ধারণ করিয়াছিলেন ও বর্তমানেও ধারণ করিতেছেন। গোড়ীয় সন্ন্যাসী স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভুও গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। সুপ্রাচীন বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় হইতে বিষ্ণুমঙ্গল, শ্রীধরস্বামী, আলবন্দারু ঝাষি, লক্ষণ-দেশিক, নিহতাস্বর, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ ব্রজমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও গোড়-মণ্ডলে ত্রিদণ্ডি-লীলা প্রকাশপূর্বক গৈরিক বসন ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্নহা-প্রভুর সমসাময়িক ভক্তিকল্পবৃক্ষের মধ্যমূল শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী এবং তাঁহার নয়জন শিষ্য সকলেই গৈরিক বসন ধারণ করিতেন।

যাহারা ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীর পরিধানযোগ্য গেকর্যা বসন ধারণপূর্বক আখড়া বাঁধিয়া স্ত্রী-পুত্রের সাথে গৃহস্থের তায় বসবাস করেন, তাহারা ‘বাস্তানী’ উপাধি লাভের যোগ্য। আবার অবৈষ্ণব বাস্তানী গৃহব্রতের বা মর্কট বৈরাগীর অনেকে নিজেদের জগতের লোকের নিকট পরমহংস তথা রূপান্তর প্রচার করিয়া পরমহংসের শ্বেতবস্ত্র ও কোপীন ধারণপূর্বক ধর্মপ্রচারের দ্বারা উদর ভরণ করেন। ইহারা কলির কবলে কবলিত হতভাগ্য জীব। হরিসেবা-বৃত্তি বাদ দিয়া অপকাবস্থায় পরমহংস-গণের বেধ-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে বর্ণ ও আশ্রমের অতীত বলিয়া প্রচার-পূর্বক বর্তমানে কতই যে অবৈধ কপট যোষিৎসঙ্গী ও বাস্তানী সম্প্রদায় বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। অবিদ্বৎ বিবিৎসা সন্ন্যাসের অনুপযোগী অনধিকারী ও অকালপক ব্যক্তিগণের পরমহংসগণের আচরণের অনুকরণপ্রবৃত্তি লইয়া বড় হইবার চেষ্টা ‘নিজের পায়ে কুড়াল মারিবার’ তায় ধ্বংসাত্মক। বিবিৎসাযোগ্য কালে ‘গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি’ বা ‘ইচড়ে পাকা’ হইয়া শাস্ত্রবিধি ত্যাগকেই বিশৃঙ্খলতা না জানিয়া যাহারা বিদ্বৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন, তাহাদের কোনকালে মঙ্গললাভ সম্ভবপর হয় না। যাহার যে অধিকার নাই সেই অধিকারবিশিষ্ট বলিয়া আত্মন্তরিতা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতার পরিচয় মাত্র। ‘শাল’-নামক যতুকুমারকে ‘কুমারী’ সাজাইয়া ঋষিগণের নিকট ‘সেই গর্তে কি সন্তান আছে’ ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে যাওয়ায় সত্যের যেরূপ অমর্যাদা হইয়াছিল, তদ্রূপ অবৈষ্ণব বাস্তানী গৃহব্রতের বিবিৎসা বা বিদ্বৎ সন্ন্যাসীর বেধগ্রহণ করিবার ধৃষ্টতা সত্যের অপলাপ মাত্র।

অবৈষ্ণব বাস্তানী গৃহব্রতকে বা মর্কট বৈরাগীকে পরমহংস বা রূপান্তর জানিতে হইবে না। আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া প্রভৃতি তেরটি অপসম্প্রদায় মুখে নিজেদের ‘গৌরভক্ত’ বলিয়া অভিমান করিলেও বাস্তবে তাহারা গৌরবিরোধী তথা শাস্ত্রবিরোধী কন্ম করিয়া নিজেদের তথা জগতের সর্বনাশ করিয়া থাকেন। তেরটি অপসম্প্রদায়ের সহিত অবৈষ্ণব বাস্তানী গৃহব্রতের বা মর্কট বৈরাগীর কোন পার্থক্য নাই। তেরটি অপসম্প্রদায়ের ব্যবহার অবৈধ ও বৈষ্ণবধর্ম তথা শাস্ত্রের বিরোধী হওয়ায় তাহাদের সহিত বৈষ্ণবগণের কোন সম্পর্ক থাকিতেই পারে না। যাহারা শুদ্ধভক্তি ত্যাগ করিয়া শাঠ্য অবলম্বন করিয়াছেন, মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিগণের তাহাদের সঙ্গে কি প্রয়োজন আছে? গুরুবর্গের পরমহংসবেষের সম্মান করিবার জন্ত বর্ণাশ্রমধর্মোপযুক্ত বেধধারণ করিয়া হরিসেবায় উন্মুখ হওয়াই হরিভক্তনেচ্ছু মানব মাত্রেরই কর্তব্য।

—ত্রিদিগ্ভিমামী শ্রীমন্তকিবোদান্ত বোধায়ন মহারাজ

জীবের কৃত্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ২ম সংখ্যা, ৩৪৩ পৃষ্ঠার পর]

পুণ্যকর্মের দ্বারা এ জীবনে অধিককাল বিষয়-সুখ ভোগ হয় এবং মৃত্যুর পর বাসনাছসারে যথোপযুক্ত গৃহে তথা ধনী সুখী পরিবারে সুখ ভোগার্থে জন্মলাভ হয়। আবার অধিক পুণ্য সঞ্চয় করলে সেই পুণ্যবলে স্বর্গাদি উচ্চ-লোকসমূহেও অবস্থিতি হয় ও পুণ্যক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত সেই সেই লোকে সুখ ভোগ হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কথিত হয়েছে,—

“তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি ।

এবং ত্রয়ীধর্মমতুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ (গীতা ৯.২১)

ভগবন্নিম্মুখ কামকামী ব্যক্তিগণ সেই বিপুল স্বর্গসুখ উপভোগ করে পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে থাকে। এইরূপে বেদত্রয়োক্ত-ধর্মের অনুসরণকারী কামকামিগণ পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্ম-মৃত্যু লাভ করে থাকে। শাস্ত্র আরও বলেছেন,—

“তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে ।

ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ক্সাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ ॥” (ভাঃ ১১।১০।২৬)

“যে-কাল পর্য্যন্ত ভোগের দ্বারা পুণ্যের সমাপ্তি না হয়, সে-কাল পর্য্যন্ত পুরুষ স্বর্গ-গত সুখ ভোগ করেন। অনন্তর পুণ্যক্ষয় হলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কালদ্বারা চালিত হয়ে অধঃপতিত হয়।”

ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত লোকই অনিত্য। শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক শুদ্ধভক্ত ব্যতীত কেহ কর্মাজ্জিত পুণ্যবলে কোনও উচ্চতর লোক এবং এমনকি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হলেও পুণ্যক্ষয়ে তাকে পুনরাবর্তন করতে হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাণী এতৎপ্রসঙ্গে স্মরণীয় ;—

“প্রাপ্ত্বান্নাত্মলোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ।

মামুপেত্য তু কোন্তেষ পুনর্জন্ম ন বিত্ততে ॥” (গীতা ৮।১৬)

“হে অর্জুন ! ব্রহ্মলোক হতে যাবতীয় লোক বা লোকবাসীর পুনরাবর্তন বা পুনর্জন্ম হয়, কিন্তু হে কোন্তেষ ! আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না।” মানব-পরিমিত মহত্ব চতুষ্টয়ে ব্রহ্মার একদিন ও তদ্রূপ তাঁর এক রাত্রি। এইপ্রকার একশত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়া। ব্রহ্মার আয়ু শেষ হলে ব্রহ্মার পতন ঘটে ; এমতাবস্থায় ব্রহ্মলোকবাসীর নিত্যত্ব কোথায় ?

দেহী জীব বা আত্মা সনাতন বস্তু,—তার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। জীবাত্মাকে এই সংসাররূপ কৰ্ম্মচক্রে স্বকৰ্ম্মানুসারে বাসনাভুযায়ী পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করে অল্প নূতন দেহ ধারণ করতে হয়। জীবাত্মার পুরাতন দেহ পরিত্যাগকে মৃত্যু ও নূতন দেহ ধারণ করাকে জন্ম বলা হয়ে থাকে। মৃত্যুদশায় জীব সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ আশ্রিত ও মায়া-সম্বন্ধ শূন্য; কিন্তু বুদ্ধদশায় জীব মন ও পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়কে স্বকীয় তত্ত্ববোধে আকর্ষণ করে থাকে। বুদ্ধদশায় জীব কিভাবে দেহান্তর লাভ করে, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলেছেন,—

“শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥” (গীতা ১৫।৮)

“দেহস্থায়ী জীব যখন কোন শরীর গ্রহণ করে এবং শরীর হতে নির্গত হয়, তখন বায়ু যেরূপ পুষ্পকোষ হতে গন্ধ গ্রহণপূর্বক নিয়ে যায়, সেইপ্রকার জীবও এই সকল ইন্দ্রিয়কে সঙ্গে নিয়ে গমন করে।”

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন,—

“মনঃ কৰ্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিযুক্তম্ ।

লোকাল্লোকং প্রয়াতাগ্ৰ আত্মা তদনুবর্ততে ॥”

(ভাঃ ১১।২২।৩৭)

“কৰ্ম্মসংস্কারযুক্ত মনই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত এক দেহ হতে দেহান্তরে গমন করে। আত্মা ইহা হতে ভিন্ন হলেও অহঙ্কারের দ্বারা সেই মনের অনুগমন করে থাকে।” এস্থলে জীবাত্মা যে দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদি হতে সম্পূর্ণ পৃথক্—তাহা ব্যক্ত হয়েছে। জীবাত্মা সনাতন হওয়ায় জীবাত্মার জন্মান্তর স্বীকার করাই সমীচীন। জীবাত্মার জন্মান্তর না থাকলে সনাতন জীবাত্মা মৃত্যুর পর কোথায় যাবে? জন্মান্তর আছে বলেই লোকে এই জন্মে দান, খয়রাতি, স্ত্রী-পুত্রাদির জন্ম অর্থ-সঞ্চয়, গৃহাদি নির্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। জন্মান্তর না থাকলে সংকৰ্ম্ম ও অসংকৰ্ম্মের শ্রেণী বিভাসের কি প্রয়োজন হত? শুধু মরবার জন্মই যদি মানুষের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে মানুষের কর্তব্য ও অকর্তব্য-বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন থাকে কি? ক্ষয়িষ্ণু নাশবান্ জড় পদার্থের কি কোন চিন্তা থাকে? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে জীবাত্মা সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছেন, তাহা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,—

“ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সৰ্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥” (গীতা ২।১২)

“আমি পরমাত্মা ইতঃপূর্বে কখনও ছিলাম না, ইহা কিন্তু নয়, তুমি

অর্জুন কখনও ছিলে না—তাও নয়, এই নরপতিগণ কখনও ছিলেন না—ইহাও নয়। ইহার পর আমি, তুমি বা এই নরপতিগণ আমরা সকলেই থাকব না—তাও নয়। কেননা জগৎসৃষ্টিকর্তা সর্বচেতন মূল আমি (ভগবান্) যেকোন নিত্য, অচ্যুত চৈতন্যগণও তদ্রূপ নিত্য, সূতরাং শোকাতীত।”

জন্মান্তর-রহস্য সম্বন্ধে গীতা প্রমাণ,—

“বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণাণ্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥”

(গীতা ২।২২)

“মানুষ যে-প্রকার জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে অপর নব বস্ত্র পরিধান করে, সেই প্রকার জীবাত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে অপর নূতন দেহ ধারণ করে থাকে।”

মহাজন-গীতিতে পাই,—

“নিজ কর্ম-গুণ-দোষে যে যে জন্ম পাই।

জন্মে জন্মে যেন তব নামগুণ গাই ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ শ্লোকে জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি প্রার্থনা করার জন্ত উপদেশ প্রদত্ত হয়েছে।

“ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতান্ত্তিরহৈতুকী তয়ি ॥”

(শ্রীশিক্ষাষ্টক ৪র্থ শ্লোক)

“হে জগদীশ! আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না, আমি মনে মনে এই কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হোক।”

জীবের সনাতনত্ব ও কর্মফলানুসারে পুনর্জন্ম-প্রাপ্তি সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর একটি অত্যাশ্চর্য্য লীলার সংক্ষিপ্তভাবে অবতারণা করছি ;—

একদা নবদ্বীপে পরম বৈষ্ণব শ্রীবাস পণ্ডিতের একমাত্র শিশুপুত্র পরলোক গমন করলে শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই মৃত শিশুকে কিছু প্রশ্ন করেন এবং মৃত শিশু তৎক্ষণাৎ জাগরিত হয়ে সেই প্রশ্নের উত্তর দান করেন ;—

“মৃত-শিশু প্রতি প্রভু বলেন বচন।

শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি’ যাও কি কারণ ?”

শিশু বলে,—“প্রভু, যেন নির্বন্ধ তোমার।

অনুথা করয়ে শক্তি আছেয়ে কাহার ?”

মৃত-শিশু উত্তর করয়ে প্রভু-মনে ।
 পরম অদ্ভুত শুনে সর্ব ভক্তগণে ॥
 শিশু বলে—“এ দেহেতে যতেক দিবস ।
 নির্বন্ধ আছিল ভুঞ্জিলাঙ্ সেই রস ॥
 নির্বন্ধ ঘুচিল, আর রহিতে না পারি ।
 এবে চলিলাঙ্ অন্ত নির্বন্ধিত-পুরি ॥
 এ দেহের নির্বন্ধ গেল রহিতে না পারি ।
 হেন কৃপা কর যেন তোমা’ না পাসরি ॥
 কে কাহার বাপ, প্রভু কে কার নন্দন ।
 সবে আপনার কৰ্ম করয়ে ভুঞ্জন ॥
 যতদিন ভাগ্য ছিল শ্রীবাসের ঘরে ।
 আছিল্যাঙ্, এবে চলিলাম অন্ত পুরে ॥
 সপার্বদে তোমার চরণে নমস্কার ।
 অপরাধ না লইহ, বিদায় আমার ॥”
 এত বলি’ নীরব হইলা শিশুকায় ।
 এমত কোতুক করে শ্রীগৌরানন্দ-রায় ॥
 মৃত-পুত্র-মুখে শুনি’ অপূর্ব কথন ।
 আনন্দ-সাগরে ভাসে সর্ব-ভক্তগণ ॥”

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫।৫৭-৬৭)

শ্রীমন্নহাপ্রভু শ্রীবাসের মৃত-শিশুর মুখে জন্মান্তরবাদের বিচার জগজ্জীবকে জানালেন। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর চিরস্থায়ী নয়। জীবাত্মা বাসনানুসারে কৰ্ত্তৃত্বাভিমানবশে স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরদ্বয়কে আবরণরূপে গ্রহণ করে এবং আবরণদ্বয়কে প্রয়োজনমত পুনরায় পরিত্যাগ করে। কৰ্ম-জ্ঞান ভূমিকায় আত্মা বিচরণ করে না। ভুক্তি ও মুক্তির আধারদ্বয় আত্মার অবস্থিতির যোগ্য নয়। ভুক্তি-মুক্তি পিপাসা ও ভগবৎসেবা-বিমুখতা যাদের মধ্যে বর্তমান তাদের বদ্ধদশা হতে বিমুক্তি ঘটে না। আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ কৰ্মফল ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের কৰ্মগুলি বর্তমান জন্মকে নির্দ্ধারিত করছে; আবার এ জন্মের কৰ্ম ভবিষ্যৎ জন্মকে নির্দ্ধারিত করবে। এইভাবে পূর্ব পূর্ব জন্মের কৰ্ম পরবর্তী জন্মে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। সু-কৰ্মের ফল সদগতি, আর কু-কৰ্মের ফল অসৎ গতি বা নরকগতি। সংকৰ্ম বা কৰ্মমিশ্রাভক্তি কখনই বিশুদ্ধ হরিপর কৰ্ম বা শুদ্ধভক্তি নয়। যারা অত্যন্ত বদ্ধ, দেহৈক সৰ্ব্বদা, তারাই সংকৰ্ম করে। ‘কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাই’—শুদ্ধ ভাগবতগণের বিচার।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন মায়িকগুণ জীবের বন্ধনের হেতু। জীবাত্মা প্রাকৃত গুণসকল ও গুণ-কার্যসমূহ হতে পৃথক্ভূত ও সম্বন্ধ-শূন্য ; তথাপি জীবাত্মা বিষয়সমূহে আসক্ত হয় কেন ? তদন্তর এই যে,—জীবাত্মা প্রাকৃত গুণসমূহ-কর্তৃক সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। ভূতগ্রস্ত মানুষ যেমন নিজকে ভূতই মনে করে, তেমনই প্রাকৃত গুণাবিষ্ট জীবগণ আপনাদিগকে গুণই মনে করে। যথা—গীতা প্রমাণ—
 “প্রকৃতেশ্চৰ্ণসংমুঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকৰ্ম্মসু।” (গীতা ৩।২৯) অর্থাৎ—প্রাকৃত গুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গুণকার্য্য বিষয়সমূহে আসক্ত হয়। সাত্ত্বিকগুণ অপেক্ষাকৃত নির্মল হলেও উহা মায়িক সূত্র ও মায়িক জ্ঞান অভিমানদ্বারা আবদ্ধ করে, তাই উহাও অন্ধস্বরূপ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের তারতম্যে প্রাপ্য লোকসমূহের কথা শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বর্ণিত আছে ;—

“উৰ্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বা মধ্যো তিষ্ঠন্তি রাজস্যাঃ।

জঘন্তগুণবৃতিস্থাঃ অধো গচ্ছন্তি তামস্যাঃ॥” (গীতা ১৪।১৮)

সত্ত্বগুণস্থ জনগণ স্বর্গাদি উৰ্দ্ধলোক সমূহে গমন করে থাকে, রজোগুণাবৃত্তি লোকেরা নরলোকে স্থান লাভ করে, এবং নিকৃষ্ট তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ নরকাদি অধোলোকে গমন করে। আবার তমোগুণের তারতম্যে পশু, পক্ষী, স্থাবরাদি ঘোনিও লাভ করে থাকে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

নূতন খেলা

(১)

জীবন বেলায়, নূতন খেলায়,
 খেলিতে আমায় আবার কে,
 আনিল টানিয়া, কি ছলে ছলিয়া,
 কি মোহে মোহিয়া মানস রে ?

(২)

কি আবার খেলা, খেলিব এ বেলা,
 ভব-পার-ভেলা বাঁধিতে যে,

হ'বে গো এখন, করি দরশন,
পাথার ভীষণ ঐ গরজে !

(৩)

আনমনা হ'য়ে, এমন সময়ে,
খেলাধুলা ল'য়ে কিসে থাকি ?
খেলি বা কেমনে, শুনিয়ে শ্রবণে,
ও-কাল-গর্জনে ! হয় তা' কি ?

(৪)

কেরে তুই খেলী, বাছ দু'টী মেলি',
ধ'রে ল'য়ে এলি মোরে হেথা !
শুধু ধূলা খেলা, তোর সারা বেলা,
তোর সনে খেলা মোর বৃথা !

(৫)

ভুলায়ে রাখিবি, কত খেলা দিবি,
তুই ত' খেলিবি ভোর দিবা,
এ পারেই বাস, তোর বার মাস,
হবে তাহে নাশ তোর কিবা ?

(৬)

মরিতে মরিব, আমিই মজিব,
আঁধারে হইব পথহারা ;
ল'য়ে মিছে খেলা, কাজে করি হেলা,
পাথারে অবেলা হ'ব সারা ।

(৭)

মিনতি আমার, ওরে সংসার,
করিস্ না আর টানাটানি ;
আছে খেলী শত, খেল সাধ যত,
দে আমায় পথ, কাদে প্রাণী !

(৮)

বেলা বয়ে যায়, কথায় কথায়,
 পারে যে আমায় যেতে হবে ;
 এই বেলা যাই, বাঁধি ভেলা ভাই,
 আর কাজ নাই করবে !

(৯)

হরিনাম-গান, হরি সেই জান,
 ল'য়ে অবিরাম হরিকথা,
 মিলি' সাধুজনে, শ্রীহরি চরণে,
 থাকি মতি সনে পতিরতা !

(১০)

অকূল-কাণ্ডারী, কেশব কংসারি,
 পদসেবা তাঁরি ভব-ভেলা,
 মিলিবে তা' হ'লে, তরির কুশলে,
 ভীম ভব-জলে করি হেলা !

(১১)

চুপে চুপে কানে, তখন স্মৃতানে,
 কহিল কে জানে মোরে ডাকি',
 কি কহ পাগল, কাহারে বিফল ?
 রাখ এ সকল হৃদে ঢাকি' !

(১২)

“খেলনা !—খেলিবে, প্রাণ কেন দিবে ?
 পরাণ সঁপিবে হরি পদে ;
 পারিবে জিনিতে, এ বাজি হুরিতে,
 হবে না মজিতে মোহমদে !!”

—শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়, বর্ধমান

গুরু-সেবা

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্র সকল শাস্ত্রই তারস্বরে উদ্ভবাহ হইয়া নৃত্য করিতে করিতে গুরু-সেবার গৌরব-গাথা কীর্তন করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন,—সেই শাস্ত্র, ‘শাস্ত্র’ নহে, যাহাতে হরিভক্তি দৃষ্ট না হয়, এমন কি, তাহা “যদি ব্রহ্ম স্বয়ং বদেৎ।” কিন্তু সেই ‘হরিভক্তি’ আদৌ হরিভক্তিই নহে, যদি তাহা “আদৌ গুরুপূজাময়ী” না হয়। “আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ”, “তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ”, “যশ্চ দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরো”, “আচার্য্যদেবো ভব” প্রভৃতি অসংখ্য শ্রুতি গুরু-সেবা ব্যতীত যে হরি-সেবার আভাসও সম্ভব হইতে পারে না, তাহা তারস্বরে কোটিকণ্ঠে জানাইয়াছেন। “তা’তে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥” প্রভৃতি মহাপ্রভুর উপদেশবাক্য আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও পাঠ করি।

কিন্তু ‘গুরু-সেবা’ করিতে হইলে আমাদের দুইটা বিষয় স্মৃতি-পথে উজ্জল রাখা আবশ্যক। “গুরু”র নামে “লঘু”র সেবা হয় না; আর ‘সেবা’র নামে ‘ভোগবুদ্ধি’র আবাহন না হয় অর্থাৎ সেবার নামে কপটতা সেবা অপেক্ষা অধিকতর লোক-দেখাইবার বাসনা হৃদয়ে উদ্ভিত না হয় কিংবা গুরুদেবকে বস্তুতঃ মর্ত্যাব্যক্তি-বিশেষ মনে করিয়া গুরুকে দেখাইয়া নিজের সেবার বিজ্ঞাপন প্রচার-বাসনা অর্থাৎ সাধারণ লোককে ঘেরূপ তোষামোদ করিলে বা তাহার ভোগের জগু কিছু কার্য্য করিয়া দিলে তাহার নিকট হইতে ‘বাহবা’ (জড়া প্রতিষ্ঠা) পাওয়া যায়, এইরূপ কপটতা, ভোগবুদ্ধি ও মর্ত্যাবুদ্ধি লইয়া যেন গুরু-সেবার চলনা প্রদর্শিত না হয়।

ঐরূপ কপটতা থাকিলে জানিতে হইবে, গুরু-সেবায় রুচি-মান্দ্য উপস্থিত হইয়াছে অথবা আমি বঞ্চিত বা বঞ্জনাকামী হইয়াছি। ভাগ্যমন্দ হইলে কিংবা কুচক্রী দেবতাগণের চক্রান্তে পতিত হইলে সৎগুরুদেবের পাদপদ্মপ্রায়ের অভিনয় করিয়াও ঐরূপ দুর্দশা ঘটে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন,—

সাধকস্ত গুরৌ ভক্তিং মন্দীকুর্বন্তি দেবতাঃ ।

যন্নোহতীত্য ব্রজেবিস্মুং শিষ্যো ভক্ত্যা গুরৌ ক্রবন্ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৪র্থ বিঃ ১৩৯)

দেবতাগণ সাধকের গুরুর প্রতি ভক্তি বা সেবাবৃত্তি অনেক সময় মন্দীভূত করিয়া দেন। তাহার কারণ, ঐ সকল দেবতা মনে করেন, শিষ্য একমাত্র গুরুদেবে অচলা ভক্তিপ্রভাবেই তাঁহাদিগকে (দেবতাগণকে) লজ্জন করিয়াও নিশ্চিতরূপে হরিপাদপদ্ম লাভ করিবে।

যাহার নিকপট গুরু-সেবারূপে আছে, তিনিই হরিভজন করেন, তিনিই বৈষ্ণব, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ । অমল সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকৃত হইয়াছেন, বড়বেগজয়ী হইয়া ব্রহ্মে বিচরণ করিতেছেন, নিরাহারে কঠোর তপস্শারত আছেন, এ সকল কথার কোনও প্রত্যয় বা মূল্য নাই, হরিপাদপদ্ম তাঁহাদের নিকট স্তূৰ্ণভ । কিন্তু নিকপট গুরু-সেবক বাহ্যে যত সাময়িক অনর্থযুক্তরূপেই প্রতিভাত হউন, তাঁহার মঙ্গল স্থনিশ্চিত—

কামক্রোধাদিকং যদ্যদান্ননোহনিষ্টকারণম্ ।

এতৎ সর্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হৃৎস্বা জয়েৎ ॥

বাধ্যমানোহপি মন্ত্ৰভো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত)

আত্ম-অহিতকর যে কাম-ক্রোধাদি অনর্থ, তাহা সকলই শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভক্তি-প্রভাবে পুরুষ তৎক্ষণাৎ জয় করিতে পারেন ।

যদিও আমার ভক্ত অজিতেন্দ্রিয় হইয়া বিষয়ের বশীভূত হন, তথাপি নিকপট ভক্তির প্রভাবে তিনি কখনও বিষয়ে মগ্ন হন না ।

সুতরাং শ্রীগুরুসেবায় নিকপটতাই সর্বমঙ্গলজননী । **নিকপটতাই বৈষ্ণবতা**—**নিকপটতাই সেবার বাহন—ভক্তির বাহন** । সেবাদেবী নিকপটতা-বাহনে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেম-বর প্রদান করিতে আগমন করেন । শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃ পুনঃ শ্রীগুরু-সেবায় নিকপটতার কথা কার্তন করিয়াছেন । শ্রীগুরু-সেবায় (?) কপটতা থাকিলে উহা ত' প্রোজ্জিতকৈতব-ভাগবত ধর্মের বিরুদ্ধ কার্য বা কস্মকাণ্ড-মাত্র হইল । কপটতাই শ্রীগুরুতে মর্ত্যবুদ্ধির মূল—কপট গুরুসেবক (?) শ্রীগুরুতে মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া প্রাকৃত নায়ক-পূজার অধ্যাসে আত্মভোগ বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ সাধন করিতে চাহিতেছেন । তাহা কিরূপে গুরুসেবা হইবে ? এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

যশ্চ সাক্ষাৎগবতি জ্ঞানদীপ-প্রদে গুরৌ ।

মর্ত্যাসন্ধীঃ শ্রুতং তশ্চ সর্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥

যাহার সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রকাশ-স্বরূপ দিব্য-জ্ঞানদীপদাতা শ্রীগুরুদেবে অসতী মর্ত্যবুদ্ধি, তাহার শ্রবণাদি সকলই হস্তিস্থানের গ্রাস্য নিরর্থক । অর্থাৎ ঐরূপ কপট-ব্যক্তি গুরুপাদসন্নিধানে শ্রবণের অভিনয় করিলেও এবং উহাতে সাময়িক পবিত্র হইলেও তাহারা কপটতা-গুণ বাহজগতের ধূলি-কঙ্করাদি সংগ্রহ করিয়া পুনরায় মুহূর্তমধ্যেই সকল শ্রবণরূপ স্নান-ফল ব্যর্থ করিয়া দেয় ।

কপট ব্যক্তি উত্তম বস্তু ভোগদ্বারা জিহ্বা-লাম্পট্য বুদ্ধির জন্ম যে “বিষমাসী”র

ছলনা প্রদর্শন করে, ভগবৎস্বরূপ নিত্যমুক্ত গুরুদেবের উত্তম যান-শয্যাসন প্রভৃতি উপভোগ কিংবা ঐ সকল বস্তু গ্রহণের অন্তরঙ্গ-বিজ্ঞায় দীক্ষা লাভ করিবার জন্য যে “অন্তেবাসী”র অভিনয় করে, তাহাতে গুরুদেবে অতিমর্ত্যবুদ্ধি বা নিকপট গুরু-সেবার পরিচয় নাই। নিকপট বিষমাসী অচিরেই প্রপঞ্চ জন্ম করেন ; নিকপট অন্তেবাসী নিশ্চিতই ঐ বিষ্ণুপাদ গুরুপাদপদ্ম-সন্নিধানে বাস করিয়া বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন।

যথা সিক্করসম্পর্শাত্মং ভবতি কাঞ্চনম্ ।

সন্নিধানাদগুরোরবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৭শ বিঃ ১৩০)

যেদ্রুপ সিক্ক পারদ-সংস্পর্শে তাম্র স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রুপ সদ্গুরু-সমীপে বাস-ফলে শিষ্যও বিষ্ণুময় হইয়া উঠেন।

ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীগুরুপাদপদের নিকপট বিষ্ণুময় সেবকগণের অহৈতুকী কৃপা-প্রভাবে এই অনর্থযুক্ত পতিত দুরাচার কবে নিকপট-বিষমাসী ও নিকপট-অন্তেবাসী হইতে পারিবে ? সে দিন কবে হইবে ?

তৎ শ্লাঘ্যং জন্ম ধন্যং তদ্দিনং পুণ্যাথ নাড়িকা ।

যস্য্চাং গুরুং প্রণমতে সমুপাশ্র তু ভক্তিতঃ ॥

গুরুশ্রবণং নাম সর্বধর্মোত্তমোত্তমম্ ।

তস্ম্যাং ধর্ম্যাং পরো ধর্মঃ পবিত্রং নৈব বিদ্যতে ॥

শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৩৫৬ পৃষ্ঠার পর]

পুত্র শ্রীকৃষ্ণ একদা কুরুক্ষেত্র করে পলায়ন করছে দেখে মা যশোদাও তখন কৃষ্ণ অপেক্ষা অত্যন্ত দ্রুতবেগে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়ে তাঁর পৃষ্ঠদেশ ধরে ফেললেন। কিন্তু প্রথম মুখে ধরতে পারেন নাই। ধরে ফেললাম বললে সঙ্গে সঙ্গে ধরা যায় নাই। বহু খেলিয়ে তবে মাকে ধরা দিয়েছেন। কখন ?—যখন গোপীগণ ঠাট্টা করছেন মা যশোদাকে—নিজের ছেলেকে নিজে ধরতে পারে না, ভারি বাহাদুরি। এই কথা যখন বলছে তখন কৃষ্ণের গায়ে লেগেছে। আমার মা সাধারণ মা নাকি ! আমি যাকে মা বলে মেনেছি, সে কি সাধারণ মা, যে সে মা ! তোমরা তাঁকে

ঠাট্টা করছ। আমাকে বাঁধ মা। মায়ের অবমাননা সহ্য হয় নাই। সত্যই ত' ভগবান্ বাঁধের মা, বাবা বলে মেনেছেন, তাঁরা যে সে ব্যক্তি নন। তাঁদের ত' ভীষণ অধিকার। সেই অধিকার সাধারণ মানুষ সব বুঝতে পারছে না। সেইজন্য সাবধান করে দিচ্ছেন ভগবান্।

খবরদার! আমি সর্বশক্তিমান্ ভগবান্, আমার মা, যে সে মা নন। 'কৃপরাসীৎ স্ববন্ধনে' ভাগবতে বলা আছে। ভগবান্ কৃপা করে, দয়া করে বন্ধনদশা স্বীকার করলেন। মাকে বললেন,—মা, বাঁধতো। যত রশি ছিল সব রশি বেশী হয়ে গেছে। আর আগে ত' কিছুতেই বাঁধা পড়ছিলেন না। প্রত্যেকবারে দু'আঙ্গুল করে রশি কম পড়ছিল। কিন্তু এখন সব রশি বেশী হয়ে গেল। বাচ্চা যেমন ধরা পড়ে, অল্প রশিতে বাঁধা যায়, ঠিক তেমন হল। তার আগে—কে আমার বাঁধতে পারে বাঁধুক দেখি। তার মানে যতক্ষণ আমাদের প্রাকৃত অহমিকা অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবান্ ধরা দেন না। এটাই হল শিক্ষা, এটাই হল বিচার। যখন আমরা পরাজয় স্বীকার করি ভগবানের কাছে, তখন ভগবান্ বলেন—ঠিক আছে, এটাই তোমার শরণাগতি, এটাই তোমার আত্মসমর্পণ। এখানে সেইকথাই বলছেন।

“পুত্র শ্রীকৃষ্ণ এরূপ কুকর্ম করে পলায়ন করছে দেখে মাতা যশোমতীও তখন কৃষ্ণ অপেক্ষা অত্যন্ত দ্রুতবেগে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়ে তাঁর পৃষ্ঠদেশ ধরে কেললেন। ‘ততোদ্রুত’-পদে সমাস-হেতু একপদ হওয়ায় ‘যপ্’ প্রত্যয় হয়েছে। ‘শ্রীকৃষ্ণ হতে অত্যন্ত দ্রুতবেগে’—এই উক্তিদ্বারা মাতা যশোমতীরও স্তন-নিতম্ব-স্থলভাদি-সৌন্দর্যবিশেষ এবং পুত্রস্নেহ-বিশেষই সূচিত হচ্ছে।” মা যশোদা খুব মোটানোটা ছিলেন। ‘স্থলকায়া’, তিনি কি আর বাচ্চা ছেলের মত দৌড়াতে পারবেন? কিন্তু ছেলেটাকে ধরতে হবে। রাগ হয়েছে। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি, বেশী দৌড়াতে পারছেন না। পুত্রের প্রতি স্নেহ আছে, অথচ ছেলে বদমায়েসি করছে, তাকে শাসন করতে হবে, সে চিন্তাও আছে। “গোপ্যা” এই প্রেমোক্তি পরিপাটিদ্বারা গোপ-জাতিরই এরূপ মহাদৌভাগ্য ঘটেছিল—ইহা স্বনিত হচ্ছে। শুধু মা যশোদা নন, তাঁর সঙ্গে, তাঁর সান্নিধ্যে আরও ত' গোপী এসেছেন। ‘পরামৃষ্টং’ অর্থাৎ কৃষ্ণ পৃষ্ঠদেশে ধৃত হয়েছিলেন—ইহাদ্বারা সেই যশোদা-মাতার প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ-বিশেষ (ভক্ত-বাৎসল্য) স্বনিত হচ্ছে।” কৃষ্ণ পৃষ্ঠদেশে ধৃত হয়েছিলেন। ভগবান্ যদি প্রতিজ্ঞা করেন—আমি ধরা দেব না, তাহলে কারও সাধ্য নাই। কিন্তু যেহেতু ভগবান্ ভক্তিবশ, প্রেমবশ, সেহেতু তিনি ধরা দিচ্ছেন। অতএব তাঁর স্নেহ-মমতা কম নয় কোন

অংশে। যশোদার যেমন পুত্রস্নেহ আছে, তেমন কৃষ্ণেরও স্নেহ-মমতা আছে।
এস্থলে বিশেষ জিজ্ঞাসুর পক্ষে ভাগবতের ১০।৯।১০ শ্লোকের অর্থ অল্পসঙ্কেত।

শ্রীকৃষ্ণের অনুধাবনকারিণী স্তম্ভমধ্যমা (ক্ষীণকটী) যশোদাদেবীর স্থূল চঞ্চল
নিতম্ব-ভারে গতি মন্থর হ'ল। দ্রুত গমন-হেতু কেশবন্ধন হতে পুষ্পসকল অলিত
হয়ে তাঁর অন্তঃগমন করতে লাগল। মা যশোদার মাথার চুলের খোপার ফুল,
মালা গোঁজা ছিল। সেগুলো সব খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে, খোপা খুলে গেছে।
এইরূপে গমন করতে করতে তিনি কৃষ্ণকে ধরে ফেললেন। মা যশোদার অবস্থাটা
এখানে বর্ণনা করেছেন।

অবধমানা জননী বৃহচ্চলচ্ছোণীভরাক্রান্ত-গতিঃ স্তম্ভমধ্যমা।

জবেন বিশ্রংসিত-কেশ-বন্ধন-চ্যুত প্রস্থনানুগতিঃ পরামৃশং ॥

এখানে প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষ করেছেন। ইতি শ্রীশ্রীদামোদরাস্তিকের
প্রথম শ্লোকের শ্রীশ্রীল-ননাতন-গোস্থামিকৃত দিগ্‌দর্শিনী-নামক টীকার বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত।

রুদন্তং মুহূর্নেত্র-যুগ্মং মৃজন্তং করাস্তোজ-যুগ্মেন দাতক-নেত্রম্।

মুহুঃশ্বাস-কম্পত্রিরেখাঙ্ক-কণ্ঠ-স্থিত-গ্রৈব-দামোদরং ভক্তি-বদ্ধম্ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ—মাতৃ-হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা প্রহৃত হইবার ভয়ে যিনি ক্রন্দন করতে
করতে করকমলদ্বারা পুনঃ পুনঃ স্বীয় চক্ষুদ্বয় যুগপৎ মার্জ্জন করছিলেন, যার
নেত্রযুগল দাতিশয় ভীতিপূর্ণ নিরীক্ষণযুক্ত, যার রোদনাবেগে মুহূর্হঃ শ্বাসের দ্বারা
শঙ্খবৎ ত্রিরেখাঙ্কিত কণ্ঠ-শোভিত মূলা-হারাদি গ্রীবাভূষণ কম্পমান্ এবং যার
উদর মাতার বাৎসল্যভক্তি-হেতু রজ্জ্বদ্বারা আবদ্ধ, আমি সেই দামোদরকে বন্দনা
করি।

টীকানুবাদ—“তদনন্তর লীলা-বিশেষ বর্ণন-মুখে ভাগবতের (১০।৯।১১)
শ্লোকের তাৎপর্য গ্রহণ করছেন, যথা—মাতা যশোদা দেখলেন যে, অপরাধী
বালক তখন রোদন করতে করতে নিজ হস্তে নয়ন-যুগল ঘর্ষণ করছে, রোদনাবেগে
তাঁর নেত্রস্থ কজ্জল নয়ন-জলে সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে, এবং মাতা যশোদাকে যষ্টিহস্তে
আনতে দেখেই তাঁর নেত্রদ্বয় ভয়ে বিহ্বল হয়েছে—এরূপ অবস্থায় যশোদা মাতা
পুত্রের হস্ত ধারণপূর্বক ভয় প্রদর্শন-সহকারে তাঁকে ভৎসনা করতে লাগলেন।

ভাগবতের এই লীলা গ্রহণ করে দ্বিতীয় শ্লোকটা বলছেন,—‘রুদন্তমিতি’—
মাতৃ-হস্তে যষ্টি দেখে তার দ্বারা মা তাড়ন করবেন—এই আশঙ্কা করে ‘তাড়নের
ভয়েই তিনি নিজে ভীত হয়েছেন’—ইহা দেখে মা আর যষ্টিদ্বারা প্রহারাদি
করবেন না—এরূপ ভেবে অর্থাৎ মাতার তাড়ন হতে অব্যাহতি পাবার জন্য যিনি

ক্রন্দন করছিলেন, এবং কমলের ত্রায় করযুগলদ্বারা নয়নদ্বয় যুগপৎ বারম্বার মার্জ্জান করছিলেন। ইহা বাল্য-লীলা-বিশেষের স্বভাব-সিদ্ধ।

‘করাস্তোজ-যুগেন নেত্রযুগাং মৃজন্তম্’—এই বাক্যের অর্থ প্রকার অর্থ এই যে—ভয়ের আবেশদ্বারা চক্ষুতে সত্ত-সত্তই অশ্রুর উদগম হয়ে থাকে; সেই অশ্রু অপসারণের জন্য যিনি পুনঃ পুনঃ চক্ষু দুটী মার্জ্জান করছিলেন অথবা অশ্রু-ধারাসমূহকে অপসারণের জন্য—এরূপ অর্থও হতে পারে।

‘সাতক্শনেত্রম্’—মাতার তাড়নভয়ে ষাঁর নয়ন-যুগল শঙ্কাযুক্ত হয়েছিল, এমনকি তাঁর মনও ভীত ও শঙ্কিত হয়েছিল। উক্ত বাক্যের অর্থ—ভীতিযুক্ত দৃষ্টি-সমন্বিত নেত্রদ্বয় ষাঁর। তাড়ন-পরিহারের নিমিত্ত ইহাকেও আর একটী গোপনীয় লীলা বলা হয়।

পুনরায় তিনি কিরূপ? ‘মুহঃশ্বাসেন’—বারবার রোদনাবেশদ্বারা, ‘কম্পাৎ’ ‘কম্পমান’, ‘ত্রিরেখাক্’—শঙ্কের মত রেখাত্রয়-যুক্ত, যাকে বহুবক্ণ বলা হয়। ‘কণ্ঠে স্থিতং গ্ৰৈবাং’—কণ্ঠে অবস্থিত সমস্ত মুক্তাহারাদি গ্রীবাভূষণ ষাঁর এবং ষাঁর উদরে দাম অর্থাৎ রজ্জু (সেই দামোদরকে)। ইহাদ্বারা—‘যশোদামাতা প্রাকৃত মাতা যেরূপ নিজ দুষ্টপুত্রকে বন্ধন করেন, সেরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নিজপুত্র মনে করে সাধারণ বালকের ত্রায় তাঁকে রজ্জুদ্বারা উদুখলের সঙ্গে বন্ধন করেছিলেন।

রজ্জুদ্বারা উদরে এবং উদুখলে উভয়দিকেই বন্ধনটী উক্ত হচ্ছে, (অর্থাৎ রজ্জুর একদিক উদরে অপরদিক উদুখলের সঙ্গে বন্ধন করেছিলেন, উদ্দেশ্য এই যে, গোপালকে আবদ্ধ করে রাখা; যেহেতু এত ভারী উদুখল নিয়ে ক্ষুদ্র বালক পালাতে পারবে না,—এরূপ বর্ণনাভিমুখে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবশুতা-বিশেষের দ্বারা উৎকর্ষ-বিশেষ দেখাচ্ছেন। ‘ভক্ত্যেব’—যিনি ভক্তির দ্বারাই অর্থাৎ মাতার পক্ষে পুত্র-বাৎসল্যময়ী ভক্তির দ্বারা এবং কৃষ্ণের পক্ষে ভক্ত-বশুতারূপ মাতৃ-ভক্তিদ্বারাই, ‘বন্ধম্’—বন্ধন স্বীকার করেছিলেন।” এই জিনিষটা ব্যাখ্যা করেছেন দশম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে। একটা বন্ধনদশার সময় দু’আঙ্গুল করে রজ্জু কম পড়ছিল। প্রত্যেকবার দু’আঙ্গুল কম, ব্যাপারটা কি?—এক আঙ্গুলে বলছেন সাধক-সাধিকার প্রচেষ্টা, আর দ্বিতীয় আঙ্গুলি হল ভগবৎ-প্রচেষ্টা। এই দুটো জিনিষ বন্ধন যোগযুক্ত হয়, তখনই আমাদের সাধনে সিদ্ধি আসে। গোপালকে যতবার বন্ধন করার চেষ্টা করছিলেন প্রত্যেকবারই রজ্জু কম হয়ে যাচ্ছিল এবং কম হচ্ছিল দু’ আঙ্গুল করে প্রত্যেকবারই। চার আঙ্গুল বা দশ আঙ্গুল নয়, দু’ আঙ্গুল হিসাব করে। সেই দু’ আঙ্গুলের ব্যাখ্যা হচ্ছে জীবের সাধন-প্রচেষ্টা এবং ভগবানের রূপা।

আমরা যতদিন পর্যন্ত নিজেদের অহমিকা রাখি, আমাদের নিজেদের চেষ্টা দ্বারা সবকিছু করতে পারি, ততদিন পর্যন্ত আমরা কৃতকার্য হব না কোন বিষয়ে, অন্ততঃ ভক্তিতার্থে। সেই জিনিষটা দেখাচ্ছেন ওখানে। যখন আমরা আমাদের জড় অহঙ্কার, প্রাকৃত অহঙ্কার পরিত্যাগ করতে পারি, তখন থেকেই ভগবানের কৃপা শুরু হয়। তা না হলে হয় না। ভগবান্ও দেখেন, তিনি কম পরীক্ষক নন, তিনি বড় পরীক্ষক।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৮০/৮১ অধ্যায়ে কৃষ্ণ-সুদামার উপাখ্যানেও একটা বিচার দেখিয়েছেন। এই সাধন এবং কৃপার বিচারটাও সেখানে আছে। আমি যতদিন পর্যন্ত অহমিকা প্রকাশ করি যে, আমি ভগবান্কে জেনে নিতে বুঝে নিতে পারব আমার ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে, আমার জ্ঞান-গরিমার মধ্যে, ততদিন ভগবান্ এগিয়ে আসছেন না। যখন দেখছেন এর কোন অহঙ্কার নাই, শুধু কৃপা প্রার্থনা আছে এবং সেটা আন্তরিকভাবে, তখন ভগবান্ এগিয়ে আসছেন। সব জিনিষটা নির্ভর করে দুটো জিনিসের উপর। আমি কিছু করব না, ভগবান্ আমাকে দয়া করবেন, এটা এক তরফা বিচার, এটা হয় না। আবার আমি চেষ্টা করে সব জেনে নেব, ভগবান্কে লাগবে না—এটাও ভ্রান্ত বিচার। দুটোই লাগবে একসঙ্গে যুগপৎ—**Simultaneously**। সেই শিক্ষাই আছে। আমার প্রচেষ্টার দরকার, আবার ভগবৎকৃপারও প্রয়োজন।

যদি প্রশ্ন করা যায় এখানে—সাধন ও কৃপার মধ্যে কোনটা জরুরী এবং কোনটা বড়? তখন তুলনামূলকভাবে বিচার করে বলছেন যে, ভগবৎকৃপাই বড়। একটা শিশু খুব কান্নাকাটি করছে, সে মা-বাবার কাছে যাবে। কিন্তু মা-বাবা অল্প কাজে ব্যস্ত। এমন কাজে ব্যস্ত যে সে-সময় আসবার অবসর নাই। সেখানে তিনি নাও আসতে পারেন। কিন্তু আসতে পারেন কখন?—কান্না যদি খুব জোরদার এবং আন্তর্ভূর্ণ হয় তখন। বহু শিশু কান্নাকাটি করে ততটা প্রয়োজন নাই অভিভাবকের। আমাদের বৈষ্ণবীয় ভাষায় বলা হয় “মৌভাগ্যভরণ প্রকাশয়িত্বম্।” নিজের মৌভাগ্য প্রকাশ করবার জন্য আমরা অনেক সময় কান্নাকাটি করি। যার এক নাম প্রায় লোক দেখানো কান্না। এটাও হয় অনেক সময়। ঝর ঝর করে চোখ দিয়ে জল এসে গেল। চিন্তা-ভাবনার কোন ব্যাপার নাই। নিমর্গপিচ্ছিল স্বভাবে এটা হয়। সামান্য কারণে এমনি চোখে জল এসে গেল। ভগবান্ও বুঝতে চান অন্তর্ধামিস্থত্রে, ঠিক ঠিক কান্দছে কি না, আমার সান্নিধ্য দরকার কি না, আমার সাহায্য-সহযোগিতা ওর প্রয়োজন কি না। ভগবান্ এটাও পরীক্ষা করেন। ভগবান্ সবসময় পরীক্ষক, পরীক্ষার্থী নন; পরীক্ষার্থী আমরা।

ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৮৮ অধ্যায় আপনারা মনে করুন। ভগবানের বহু লীলাকথা শ্রবণ করেছেন পরীক্ষিৎ মহারাজ, বহু উপদেশ-নির্দেশ পেয়েছেন শ্রীল গুরুদেব গোস্বামীর কাছ থেকে। একটা জায়গায় এসে প্রশ্ন করছেন, ঠাকুর একটা বিষয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে। হরিকথা শুনলে সন্দেহ আসে দুইভাবে। দুইভাবে কি কি? একটা হল আমার নিজের কতকগুলো দোষ আছে, সেই কথগুলো হয়ত' প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে আলোচনার মধ্যে এসে যাচ্ছে। সেইরকম ধরনের কিছু হয়। আবার উদ্দীপনা বলে একটা জিনিষ আছে। ভগবৎকথা শ্রবণ করতে করতে অধিকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে তত্তল্লীলার উদ্দীপনা বা স্ফুর্তি হচ্ছে থাকে।

এতাবৎকাল ভাগবতের বহু উপদেশ-নির্দেশ আপনার কাছে শ্রবণ করলাম, বহু ভগবল্লীলাকথা সব শ্রবণ করলাম। কিন্তু একটা আমার মহান্ সন্দেহ! কি সন্দেহ?— দেবাস্ত্র-মনুষ্যেযু যে ভজন্ত্যশিবং শিবম্।

প্রায়স্তে ধনিনো ভোজা ন তু লক্ষ্ম্যাঃপতিং হরিম্ ॥

দেব, দানব, অসুর, মনুষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় শঙ্কর—শিবঠাকুর এবং ব্রহ্মাদির উপাসনা করছেন অনেকে। “প্রায়স্তে ধনিনো”—তাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় সব ধনী, জ্ঞানী, গুণী, মানী। তারা কিন্তু ভগবানের সেবাপূজা করছেন না। “ন তু লক্ষ্ম্যাঃপতিং হরিম্।”—লক্ষ্মীপতি নারায়ণ, কৃষ্ণের উপাসনা করছেন না। আর যারা ভগবানের শরণাপন্ন হচ্ছেন, তাদের অবস্থাটা খারাপ, খুব গরীব—দরিদ্র, খাওয়া, পরা, থাকার খুব কষ্ট। কি ব্যাপার প্রভু? এই দুইরকম প্রভুর উপাসনায় ফল বৈপরীত্য ছরকম দেখি। একজাতীয় প্রভুর উপাসনা করতে বহু টাকা-পয়সা, ধন-রত্ন লাভ হয়, বৈষয়িক উন্নতি হয়। আর এক প্রভুর উপাসনা করতে গেলে দেখা যায় খুব যেন গরীব থেকে গরীব হতে হয়। কেন প্রভু এমন অবস্থা?

এতদেদিতুমিচ্ছামঃ সন্দেহোহত্র মহান্ নি নঃ।

বিরুদ্ধশীলয়োঃ প্রভেদাবিরুদ্ধা ভজতাং গতিঃ ॥

এ ব্যাপারে আমার মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। বিরুদ্ধ-স্বভাববিশিষ্ট দুই প্রভুর সেবায় সেবকগণের মধ্যে এরূপ গতি-বিপর্যয়ের কারণ কি? এক-জাতীয় প্রভুর সেবা করলে টাকা-কড়ি, মান-সম্মান, পার্থিব জগতের অনেক কিছু পাওয়া যায়। আর মূল মালিক যে প্রভু, তাঁর সেবা করলে সেখানে যেন ক্রমশঃ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর, দরিদ্রতম অবস্থা। কি করে হয় প্রভু এটা? এতে আমার মহান্ সন্দেহ।

সন্দেহ জিনিষটা খুব খারাপ। কিন্তু এখানে উনি যে সন্দেহের কথা বলছেন, সেটা খারাপ অর্থে নয়, ভাল অর্থে। আমরা গীতা আলোচনা করলে দেখছি, তিন রকম লোকের কখনও কল্যাণ হয় না।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধদানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্চতি।

নাযং লোকোহস্তি ন পরো ন স্মৃৎ সংশয়াত্মনঃ ॥

অজ্ঞ অতাত্ত্বিক ব্যক্তি—যাদের তত্ত্বদর্শন লাভ হয় নাই, তাদের কখনও কল্যাণ লাভ হয় না, আত্মমঙ্গল লাভ হয় না। আর ‘সংশয়াত্মা বিনশ্চতি’—**Sceptic mind**, ভগবান্ আছেন কিনা, ভগবান্ তিনি ভক্তবৎসল কিনা, তিনি আশ্রিত-জনপালক কিনা, তিনি বাহ্যকল্পতরু কিনা, ভক্তকে খাওয়াতে পরাতে পারেন কিনা, পরলোক আছে কিনা, ভক্তেরও এইরকম ধরনের যোগ্যতার হয়ত’ অভাব আছে—এইসব জাতীয় সংশয়। সাধন-ভজন করে কি হবে, পরলোক যদি না থাকে? আমাদের ভয়ের কি আছে? নাস্তিক চার্বাকের শিষ্যরা ত’ একথা বলে বসে আছেন। উপায় কি সেখানে, কি হবে? ঐ সন্দেহের কথাটা এনেছে ওখানে। প্রশ্নের উত্তরটা শুকদেব গোস্বামী নিজে দিতে চাচ্ছেন না। আমার নিজস্ব কোন বক্তব্য নাই, যা বক্তব্য আমার উপরওয়াল গুরুবর্গের বক্তব্য, ভগবানের বক্তব্য। সেটা আলোচনা করলে তোমার প্রশ্নের উত্তর হবে রাজা। আমি যা বলব সেটা আমার গুরুবর্গের বাণী। উপরওয়াল গুরুবর্গের ও ভগবানের বাণীই প্রমাণ। আমি অন্য কিছুকে প্রমাণ বলে মানি না। সুতরাং আমি বলছি—একথা বললে একটা মহাকার আসে, অহমিকা আসে। ফলে এটা বলা চলবে না। আমার কথা কেউ শুনবে না, কেউ মানবে না; কিন্তু ঐর কথা ত্রিভুবন মাগ্ন করে, সেই ভগবানের কথা সবাই মানতে বাধ্য আছেন। ত্রিকালজ্ঞ ঋষি, ভূত-ভবিষ্যৎ-দর্শী ঋষি, সিদ্ধমহাশ্রাগণের কথা মানতে বাধ্য আছেন সবাই। সেই কথা আমি বলব। তোমার (পরীক্ষিত মহারাজের) পিতামহ যুধিষ্ঠির এই প্রশ্ন করেছিলেন কৃষ্ণের কাছে। সুতরাং তুমি যে প্রশ্ন করলে আমার কাছে, এটা আমি তোমার নিজস্ব প্রশ্ন বলে মানব না। কেন না, এ প্রশ্ন ত’ আগে একবার হয়ে গেছে। কৃষ্ণ সেখানে এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন, আমি এখানে সেই উত্তরটা আলোচনা করব, তাহলে তোমার উত্তর হয়ে যাবে। কৃষ্ণ কি বলেছেন যুধিষ্ঠির মহারাজকে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন ওখানে।

কৃষ্ণ সেখানে কি বলেছেন? কৃষ্ণ বলেছেন,—ও যুধিষ্ঠির! তুমি না ধর্ম-রাজ, ধর্মরাজ হয়ে তোমার আবার সংশয় কেন, সন্দেহ কেন? ধর্মরাজের সন্দেহ, সংশয় থাকা ত’ উচিত নয়। কিন্তু তুমি ত’ সংশয়, সন্দেহের কথা বলছ। প্রশ্নটা

কি?—তোমার সাধন-ভজন করলে লোকে গরীব হয়, আর শিবাদির উপাসনা করলে সব বড়লোক হয়। এ প্রশ্ন তোমার মুখে শোভা পায় না। তাহলে শোন, এর কারণ কি। আমি সর্বোপরি মালিক, আমার উপর ওয়ালা মালিক কেউ নাই, আমি আমার ভক্তকে পালন-পোষণ করতে পারি না, এ কি কথা! আমি আমার ভক্তকে খাওয়াতে পরাতে পারি না, এ কেমন কথা! সব পারি আমি। পার্থিব জগতের যত কিছু প্রার্থনা, সব পূরণ করতে পারি আমি। আর অপার্থিব জগতের যা কিছু তাও পারি। আমি মুক্তি দিতে পারি, আমি সাধনভক্তি দিতে পারি, ভাবভক্তি দিতে পারি, প্রেমভক্তি দিতে পারি। তবে একটা ব্যাপার কি জান, ওটা তুমি চিন্তা করছ না। হুনিয়ার লোক সব কি করে জান? সবাই মিলে আমার পরীক্ষা নিতে চায়। আমি সর্বেশ্বরের, সর্বারাধ্যত্ব, পরমভজনীয় বস্তু—এটা ওরা ভুলে গিয়ে আমার সাধন-ভজন কেউ করতে চায় না। সন্তায় বাজিমাং করতে চায় সবাই। সেজন্ত তারা কি করে? তাদের যে প্রার্থিত বিষয়, তারা তা চাইতে জানে না। কি জিনিস চাইতে হবে তা তারা জানে না। আর যদি বা আছে সেটা উন্টোপাণ্টা। বোঝো না তারা কি চাওয়া উচিত ভগবানের কাছে।

মন্দিরে বসে বসে একজন অনেকক্ষণ মাথা ঠুকছে। একজন পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কি বললেন ঠাকুরকে এতক্ষণ ধরে আপনি। অনেক কিছু ত' বিড় বিড় করে বললেন, অনেক নাক কান মলা খেলেন। প্রথমে কিছুতেই বলতে চায় না, পরে মুখ খুললেন। বললেন—আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে খুব ঝগড়া, সেই ঝগড়া যাতে মিটে যায় সেজন্ত ঠাকুরকে বললাম। আর কি বললেন? আর বললাম—আমার সংসার খুব বড়, ছেলেমেয়ে অনেক, আয় খুব কম, যেন আমার ধন-সম্পত্তি একটু বাড়ে। আর কি বললেন?—অনেকগুলো আমলা-মোকদ্দমা আছে, সেগুলো যেন নিষ্পত্তি হয়ে যায়। সে কথা ঠাকুরকে জানালাম। যত কথা হল সব বিষয়কথা। পাশে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি বললেন—ঠাকুরকে ত' ওসব বলতে হয় না, ওগুলো বলতে নাই ঠাকুরকে। তাহলে কি বলতে হয় ঠাকুরকে?—ঠাকুর তোমার চরণে ভক্তি থাক, আমি যেন কখনও তোমার নাম না ভুলি, সবসময় যেন তোমার নাম স্মরণ করি, তোমার চরণে যেন আমার সর্বদা ভক্তি থাকে—এইসব বলতে হয়। এখন কি বলতে হয় সেটা আমরা কখনও শিখি নাই, জানি নাই। তাই মন্দিরে গিয়ে আমরা গুরুকম মাথা খুঁড়ছি।

যুধিষ্ঠিরকে বলছেন কৃষ্ণ,—আমার সামর্থ্য সম্পর্কে তোমার কোন দুশ্চিন্তার

কারণ নাই। যা লেখা আছে শাস্ত্রে আমি সেটা করি। তবে কোন্ ক্ষেত্রে করি ? —স্থান, কাল, পাত্র বিচার করে করি ওটা। আকাশে মেঘ হয়েছে। মেঘকে কি বলে ?—বারিদ। মেঘ কি দেয় ?—বৃষ্টি দেয়। বৃষ্টি যে দেয় তার কি দোষ ? দেশ বুঝে কি বৃষ্টি দেয় ?—না, বৃষ্টি ত' করে যায়। চাষী যারা আছেন তারা যার যেমন প্রয়োজন তেমন জল সব সামলে নেয় সময়মত। ভগবানের যে করুণা—সেটা করুণাবারিদ। রূপারূপ ওই মেঘ সব জায়গায় সমানভাবে চলে। তুমি যদি ধরে নিতে পার, তাহলে ভাল ; তুমি যদি বুঝে নিতে পার, তাহলে ভাল।

সমস্ত জগতের মালিক আমি, আমি সকলকে পরীক্ষা করব, তা নয়, জগতের লোক আমাকে সবসময় পরীক্ষা করছে। আমার পরীক্ষা তারা আগে নিতে চায়—ঠাকুর তুমি কতটুকু কি দিতে পার দাও। কিছু জিনিস পেতে গেলে যে যোগ্যতা, অধিকার থাকা দরকার, তা তারা বিচার করছে না। শুধু আমার কাছে দাও দাও করে। কিন্তু আমার উপাসনা তারা করে না—এটা বড় দুঃখের কথা ! কৃষ্ণ নিজেই একথা বলছেন ভাগবতের বাদশবন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে। কৃষ্ণ খুব দুঃখ করে বলছেন,—

যন্নামধেয়ং ত্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ অলন্ বা বিবশো গুণন্ পুমান্ ।

বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥

কলিজীব, কলির প্রজা পরমমঙ্গলময় যে ভগবানের নাম, তা উচ্চারণ করছে না। এটা তারা গ্রহণ করছে না, গ্রহণ করতে চাচ্ছে না। নামতত্ত্ব নষ্ট করে শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রে আছে,—

আশ্চর্য্যমেতৎ হি মনুষ্যলোকে, সূধাং পরিত্যজ্য বিধং পিবন্তি ।

নামানি নারায়ণগোচরাণি, ত্যক্তান্নবাচঃ কুহকাঃ পঠন্তি ॥

ইদং শরীরং পরিণামপেশলং পতত্যবশ্যং শতদন্ধি-জর্জরম্ ।

কিমৌষধং পৃচ্ছসি মৃত দুর্ম্মতে নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব ॥

এই মনুষ্য জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা বলছেন। “পরিণামপেশলম্”—সব ছাই হয়ে যাবে শেষকালে। “কিমৌষধং পৃচ্ছসি মৃত দুর্ম্মতে”—হে দুর্ম্মতে, এই রোগ নিরাময়ের তুমি কি ওষুধ চাচ্ছ ? “নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব”—কৃষ্ণনামরসায়ন পান কর তুমি। কৃষ্ণনাম সর্বরোগহর মহৌষধ, ব্যাধিনাশক। কথাগুলো বলছেন, কিন্তু আমরা বুঝছি না। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

ফোন—৪৬-১৫২৬

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ
মিলনপল্লী

ফোন—৪০০৬৮

পোঃ—শিলিগুড়ি (দার্জিলিং)

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ভক্তো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

ব্যাসকুল-শ্রমণসজ্জারাদ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত অগ্রতম প্রচারকেন্দ্র শিলিগুড়ি-সহরস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের উদ্যোগে আগামী ১০ই নারায়ণ, ৫১০ গৌরাদ ; ১৮ই পৌষ, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ (ইং ৩।১।২৭) শুক্রবার জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের ৭৬তম জন্মবার্ষিকী পৌষী কৃষ্ণা-নবমী তিথিতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরুপঞ্চক, তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। শ্রীহরিকীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তবপাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম প্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাক্ষব যোগদান করিলে সমিতির সেবকবৃন্দ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবানুখী শ্রুতি অজ্জিত হইবে। ইতি—৩০শে কা্তিক, ১৪০৩

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সেবকবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদিগ্বিশ্রামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজের নিকট উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

—: অনুষ্ঠান-সূচী :—

১৭ই পৌষ (ইং ২।১।১৯৯৭), বৃহস্পতিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্তন ।

অপরাহ্নে—নগর-সঙ্কীৰ্তন শোভাযাত্রা ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে মহাজন-পদাবলী ও অধিবাস-কীর্তন
এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ।

১৮ই পৌষ (ইং ৩।১।১৯৯৭), শুক্রবার—

ব্রাহ্মমুহূর্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্তন ।

প্রাতঃ—৬-৩০টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত মহাজন-পদাবলী কীর্তন
ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ।

দিবা—৮-৩০টা হইতে ১০-৩০টা পর্য্যন্ত শ্রীগুরুপূজা ও
শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ধর্মসভা—“শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-
তত্ত্ব” সম্বন্ধে আলোচনা ।

১৯শে পৌষ (ইং ৪।১।১৯৯৭), শনিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্তন ।

প্রাতঃ—৬-৩০টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত মহাজন-পদাবলী কীর্তন
ও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ।

মধ্যাহ্নে—ভোগরাগ ও আরতি-কীর্তন ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ধর্মসভা—“শ্রীগুরু-পরম্পরা ও
সম্প্রদায়-প্রণালী” সম্পর্কে বক্তৃতা ।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্তন স্বীকার্য ।



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৮শ বর্ষ	}	২১ নারায়ণ, প্রহ্লাদ, ৫১০ শ্রীগোরাঙ্গ ২২ পৌষ, মঙ্গলবার, ১৪০৩, ইং ১৪/১/৩৭	{	১১শ সংখ্যা
----------	---	---	---	------------

সানুবাদঃ

শ্রীললিতোক্ততোটকাষ্টকম্

নয়নরিত-মানসভূবিশিখঃ, শিরসি প্রচলপ্রচলাকশিখঃ ।

মুরলীধ্বনিভিঃ সুরভীস্বরয়ন্, পশুপীবিরহব্যসনং তিরয়ন্ ॥ ১ ॥

নয়নভঙ্গীচ্ছলে যিনি কন্দর্পশর নিক্ষেপ করিতেছেন, চঞ্চল শিখিপুচ্ছ ষাঁহার
মস্তকে সূশোভিত, বংশীধ্বনি করত যিনি গাভী চালনা করিতেছেন, যিনি
গোপাঙ্গনাগণের বিরহ-দুঃখ নিবারণ করিতেছেন ॥ ১ ॥

পরিতো জননীপরিতোষকরঃ, সখি ! লম্পটয়ন্নখিলং ভুবনম্ ।

তরুণীহৃদয়ং করুণী বিদধ,-স্তরলং সরলে ! করলস্বিগুণঃ ॥ ২ ॥

হে সখি ! যিনি যশোদা প্রভৃতি জননীগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন, যিনি

অখিলভুবনের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন, যিনি ব্রজযুবতীগণের চিত্ত চঞ্চল করিতেছেন, যিনি করুণাপরায়ণ এবং ঐহার হস্তে পশুবন্ধন-রজ্জু সুশোভিত ॥ ২ ॥

দিবসোপরমে পরমোল্লসিতঃ, কলশস্তনি ! হে বিলসদ্ধাসিতঃ ।

অতসীকুসুমং বিহসন্মহসা, হরিণীকুলমাকুলয়ন্ সহসা ॥ ৩ ॥

হে কলশস্তনি ! দিবাসানে তোমার দর্শন লালসায় উল্লসিত হইয়া যিনি মন্দ মন্দ হাস্য করিতেছেন, স্বীয় কান্তিপ্রভাবে অতসী কুসুমকেও (মসিনার ফুল) যিনি তিরস্কার করিতেছেন এবং বংশীধ্বনির প্রভাবে হরিণীগণকে যিনি আকুল করিতেছেন ॥ ৩ ॥

প্রণয়িপ্রবণঃ সুভগশ্রবণ,-প্রচলন্মকরঃ সসখিপ্রকরঃ ।

অদয়ন্নগরীভ্রময়ন্ ভ্রমরী,-মিলিতঃ কতিভিঃ শিখিনাং ততিভিঃ ॥ ৪ ॥

যিনি প্রণয়িগণের অধীন, ঐহার রমণীয় শ্রবণযুগলে মকর-কুণ্ডল সুশোভিত, যিনি বয়স্রগণে মিলিত হইয়া গোষ্ঠ হইতে আগমন করিতেছেন, যিনি দেবাজনা-দিগেরও চিত্ত চঞ্চল করিতেছেন, যিনি শ্রীঅঙ্গের সৌরভে ভ্রমরীদিগকে মত্ত করিতেছেন এবং যিনি কতিপয় মধুরগণে মিলিত হইয়া আগমন করিতেছেন ॥ ৪ ॥

অয়মুজ্জলয়ন্ ব্রজভূসরগীং, রময়ন্ ক্রমগৈর্মুহুভিধরগীম্ ।

অজিরে মিলিতঃ কলিতপ্রমদে, হরিরুদ্বিজসে তদপি প্রমদে ॥ ৫ ॥

হে শ্রীমতি ! সেই এই শ্রীকৃষ্ণ যুহু যুহু পদসঞ্চালনদ্বারা ব্রজের পথ উজ্জল ও ব্রজবজ্রাকুশাদি চিহ্নদ্বারা পৃথিবীকে কৃতার্থ করিয়া এক্ষণে তোমার আনন্দময় প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন । তুমি কি জ্ঞাত এত উদ্বিগ্ন হইতেছ ? ৫ ॥

বদ মা পরুষং হৃদয়ে ন রুষং, রচয় ত্বমতশ্চল বিভ্রমতঃ ।

উদিতে মিহিকাকিরণে ন হি কা, রভসাদয়িতং ভজতে দয়িতম্ ? ৬ ॥

অগ্নি রাধিকে ! তুমি হৃদয়ে ক্রোধ করিও না এবং ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পরুষ-বাক্য বলিও না, ঈদৃশ গুণবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব তুমি বিলাসের নিমিত্ত তাঁহার নিকটে গমন কর । এ প্রকার কোন্ রমণী আছে, যে চন্দ্ৰের উদয়ে ঈদৃশ গুণবান্ কান্তকে ভজনা না করিয়া থাকিতে পারে ? ৬ ॥

কলয় ত্বরয়া বিলসৎসিচয়ঃ, প্রসরত্যভিতো যুবতীনিচয়ঃ ।

নিদধাতি হরির্নয়নং সরণৌ, তব বিক্ষিপ সপ্রণয়ং চরণৌ ॥ ৭ ॥

হে সখি ! ঐ দেখ, শ্রীকৃষ্ণদর্শন-লালসায় ব্যগ্র হইয়া সুচিত্র বস্ত্র পরিধানপূর্বক যুবতীগণ চতুর্দিক্ হইতে আগমন করিতেছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোন দিকে দৃষ্টিপাত

না করিয়া কেবল তোমার পথের প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিতেছেন, অতএব তুমি প্রীতিসহকারে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের নিমিত্ত গমন কর ॥ ৭ ॥

ইতি তামুপদিশ্য তদা স্বসখীং, ললিতা কিল মানিতয়া বিমুখীম্ ।

অনয়ং প্রসভাদিব যং জবতঃ, কুরুতাং স হরির্ভবিকং ভবতঃ ॥ ৮ ॥

ললিতা অভিমানবশতঃ বিমুখী নিজসখী শ্রীরাধিকাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া অতিশীঘ্র যাহাকে শ্রীমতীর সহিত মিলিত কারলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তোমার মঙ্গল বিধান করুন ॥ ৮ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৬৮ পৃষ্ঠার পর]

২০। অর্চক কয় প্রকার? শ্রীমন্নহাপ্রভু কোন্ প্রকার অর্চককে অধিক আদর করেন?

“Shrimurti-worshippers are divided into two classes, the ideal and the physical. Those of the physical school are entitled from their circumstances of life and state of the mind to establish temple-institutions. Those who are by circumstances and position entitled to worship the Shrimurti in mind have, with due deference to the temple-institutions, a tendency to worship usually by Sravan and Kirtan, and their church is universal and independent of caste and colour. Mahaprabhu prefers this latter class and shows their worship in His Shikshastak.”

—Chaitanya Mahaprabhu's Life & Precepts

২১। সঙ্কল্পজ্ঞানযুক্ত শ্রীমূর্তি-সেবকের কৃত্য কি?

“সঙ্কল্প-জ্ঞানের সহিত শ্রীমূর্তি-সেবা করিতে হইলে কৃষ্ণ-পূজা ও ভক্ত-সেবা,—
হুইই এককালীন হওয়া উচিত।”

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

২২। অর্চনবিধি ও ক্রম কি ?

“শ্রীগুরুকে আসন, পাণ্ড, অর্ঘ্য, স্নানীয় বস্ত্র, আভরণ দিয়া পূজা করত তদনুমতি লইয়া যুগল-পূজা করিবে। পরে অগ্রে গুরুকে প্রসাদ, পানীয় ইত্যাদি দিয়া অন্ন বৈষ্ণব ও দেবাদিকে অর্পণ করিবে। পিতৃলোককেও প্রসাদ অর্পণ করিবে।”

—‘গুরুবজ্জা’, হঃ চিঃ

২৩। বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতার পূজা করা কি আবশ্যক নহে ?

“বিষ্ণু-পূজাতেই সর্বদেবতার পূজা ; অতএব অন্য দেবের পৃথক পূজা করা অনাবশ্যক।”

—‘দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞান’, হঃ চিঃ

২৪। ঐকান্তিক ভক্তগণের মধ্যে কোন্ প্রবৃত্তি প্রবলা ?

“ভক্তিসাধনে দুইপ্রকার প্রবৃত্তি আছে, একটা—অর্চন-প্রবৃত্তি, অপরটা—স্মরণ-কীর্তন-প্রবৃত্তি। উভয় সমীচীন হইলেও স্মরণ-কীর্তন-প্রবৃত্তিই ঐকান্তিক ভক্তদিগের মধ্যে প্রবলা। অনেক মহাজন নাম-মালাতেই কিয়ৎপরিমাণে স্মরণ ও কিয়ৎপরিমাণে নাম-কীর্তন করিয়া থাকেন। কীর্তনের বিশেষ লাভ এই যে, তাহাতে শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্তন—এই তিন অঙ্গেরই অনুশীলন হইতে থাকে।”

—‘ভজন-প্রণালী’, হঃ চিঃ

২৫। বন্দন কাহাকে বলে ? তাহা কয় প্রকার ?

“বন্দন’ বৈধ-ভক্তির ষষ্ঠাঙ্গ—পাদসেবা ও কীর্তনাদির মধ্যে বন্দন অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও তাহা পৃথক অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। নমস্কারই বন্দন। সেই নমস্কার দ্বিবিধ—‘একাক্ষ’ নমস্কার ও ‘অষ্টাক্ষ’ নমস্কার। নমস্কারে—একহস্ত-কৃত নমস্কার, বস্ত্রাবৃতদেহের সহিত নমস্কার, ভগবানের অগ্রে, পৃষ্ঠে, বামভাগে ও মন্দিরের অত্যন্ত নিকট-গর্ভে নমস্কার অপরাধরূপে গণ্য হইয়াছে।”

—জৈঃ ধঃ ১২শ অঃ

২৬। দাস্ত্রের অন্তর্গত কি কি ?

“‘স্বামি কৃষ্ণদাস’—এইরূপ অভিমানই দাস্ত্র। দাস্ত্র-সম্বন্ধের সহিত যে ভজন, তাহাই শ্রেষ্ঠ। নমস্কার, স্তুতি, সর্বকর্ম্মার্পণ, পরিচর্যা, আচরণ, স্মৃতি, কথা-শ্রবণ ইত্যাদি দাস্ত্রের অন্তর্ভাব্য।”

—জৈঃ ধঃ ১২শ অঃ

২৭। সখ্য কয় প্রকার ও কি কি ?

“কৃষ্ণের হিতচেষ্টাময় বন্ধুত্ব-লক্ষণই সখ্য। সখ্য দুই প্রকার—বৈধাঙ্গ-সখ্য ও রাগাঙ্গ-সখ্য। এস্থলে কেবল বৈধাঙ্গ-সখ্য গ্রহণ করিতে হইবে,—অর্চা-মূর্তি-সেবায় যে সখ্য সম্ভব হয়, তাহাই বৈধ সখ্য।”

—জৈঃ ধঃ ১২শ অঃ

২৮। আত্মনিবেদনের লক্ষণ কি ?

“দেহাদি শুদ্ধাত্মা পর্য্যন্ত কৃষ্ণে অর্পণ করার নামই—‘আত্মনিবেদন’। নিজের জ্ঞাত্য চেষ্টাশূন্য হইয়া কৃষ্ণের জ্ঞাত্য চেষ্টাময় হওয়া আত্মনিবেদনের লক্ষণ,—বিক্রীত-গো যেরূপ স্বীয় পালনের চেষ্টা করে না, তদ্রূপ। কৃষ্ণের ইচ্ছার অনুগত থাকা এবং স্বীয় ইচ্ছাকে তদধীন করাও তল্লক্ষণ।”

—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

আত্মধর্ম

১। নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম কাহাকে বলে ? নিসর্গ কি ?

“যে বস্তুর যাহা নিত্য স্বভাব, তাহাই তাহার নিত্যধর্ম। বস্তুর গঠন হইতে স্বভাবের উদয় হয়। কৃষ্ণের ইচ্ছায় যখন কোন বস্তু গঠিত হয়, তখন সেই গঠনের নিত্য সহচররূপ একটা স্বভাব হয়। সেই স্বভাবই সেই বস্তুর নিত্যধর্ম। পরে যখন কোন ঘটনাবশতঃ বা অগ্ন্য বস্তু-সঙ্গে সেই বস্তুর কোন বিকার হয়, তখন তাহার স্বভাবও বিকৃত হয় বা পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তিত স্বভাব কিছু দিনে দৃঢ় হইলে নিত্য-স্বভাবের জায় সঙ্গী হইয়া পড়ে। এই পরিবর্তিত-স্বভাব ‘স্বভাব’ নয়, ইহারই নাম—নিসর্গ। নিসর্গ স্বভাবের স্থলে বসিয়া আপনাকে ‘স্বভাব’ বলিয়া পরিচয় দেয়। যথা—‘জল’ একটা বস্তু, তারল্যই ইহার স্বভাব; ঘটনাবশতঃ জল যখন শিলা হয়, তখন কাঠিন্য তাহার নিসর্গ হইয়া স্বভাবের জায় কার্য্য করে। বস্তুতঃ নিসর্গ ‘নিত্য’ নয়, তাহা ‘নৈমিত্তিক’। কেননা, কোন ‘নিমিত্ত’ হইতে উহা উদ্ভূত হয় এবং সেই নিমিত্ত বিদূরিত হইলে উহা স্বয়ং বিগত হয়। কিন্তু স্বভাব নিত্য। বিকৃত হইলেও তাহা অক্ষুণ্ণ থাকে। কাল ও ঘটনাক্রমে স্বভাব অবশ্যই নিজ-পরিচয় দিতে পারে। বস্তুর স্বভাবই বস্তুর নিত্যধর্ম, বস্তুর নিসর্গই বস্তুর নৈমিত্তিক ধর্ম।”

—জৈঃ ধঃ ১ম অঃ

২। জীবের নিত্যধর্ম কি ?

“কৃষ্ণ—বৃহচ্চিদ্বস্তু এবং জীব—অহুচ্চিদ্বস্তু। চিদ্বর্ষে উভয়ের ঐক্য আছে; কিন্তু পূর্ণতা ও অপূর্ণতা-ভেদে উভয়ের স্বভাব-ভেদ অবশ্যই সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ—জীবের নিত্য-প্রভু, জীব—কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা স্বাভাবিক বলিতে হইবে। কৃষ্ণ—আকর্ষক, জীব—আকৃষ্ট; কৃষ্ণ—ঈশ্বর, জীব—ঈশিতব্য; কৃষ্ণ—দ্রষ্টা, জীব—দৃষ্ট; কৃষ্ণ—পূর্ণ, জীব—দীন ও ক্ষুদ্র; কৃষ্ণ—সর্বশক্তিমান, জীব—নিঃশক্তিক; অতএব কৃষ্ণের নিত্য আনুগত্য বা দাস্তাই জীবের নিত্য স্বভাব বা ধর্ম। ***

প্রেমই জীবের নিত্যধর্ম, জীব অজড় অর্থাৎ জড়াতীত বস্তু। চৈতন্যই ইহার গঠন ; প্রেমই ইহার ধর্ম। কৃষ্ণদাস্তই সেই বিমল-প্রেম। অতএব কৃষ্ণদাস্তরূপ প্রেমই জীবের স্বরূপধর্ম।” —জৈঃ ধঃ ১ম অঃ, ২য় অঃ

৩। বৈষ্ণবধর্মই নিত্যধর্ম কেন ?

“শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম লক্ষিত হয়, তাহা নিত্যধর্ম। জগতে যতপ্রকার ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে, সে-সমুদায়-ধর্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারেন,—নিত্য-ধর্ম, নৈমিত্তিক-ধর্ম ও অনিত্য-ধর্ম। যে-সকল ধর্মে ঈশ্বরের আলোচনা নাই ও আত্মার নিত্যতা নাই, সে-সকলই অনিত্য-ধর্ম এবং যে-সকল ধর্মে ঈশ্বর ও আত্মার নিত্যতা স্বীকার আছে, কিন্তু কেবল অনিত্য উপায়দ্বারা ঈশ্বর-প্রসাদ লাভ করিতে চায়, সে-সকল ‘নৈমিত্তিক’। যাহাতে বিমল প্রেমদ্বারা কৃষ্ণদাস্ত লাভ করিবার যত্ন আছে, সেই ধর্মই ‘নিত্য’। নিত্যধর্ম দেশভেদে, জাতিভেদে, ভাষাভেদে পৃথক্ পৃথক্ নামে পরিচিত হইলেও তাহা এক ও পরম উপাদেয়। ভারতে যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত আছে, তাহাই নিত্যধর্মের আদর্শ। আবার আমাদের হৃদয়নাথ ভগবান্ শচীনন্দন যে-ধর্ম জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই বৈষ্ণবধর্মের বিমল অবস্থা বলিয়া প্রেমানন্দী মহাজনগণ স্বীকার বা অবলম্বন করেন।” —জৈঃ ধঃ ২য় অধ্যায়

৪। কোন্ ধর্ম পবিত্রতম ?

“That religion is the purest, which gives you the purest idea of God, and the absolute religion requires an absolute conception by man of his own spiritual nature.”

—The Bhagavat, Its Philosophy, Its Ethics and Its Theology.

৫। কোন্ ধর্ম প্রকৃত ধর্ম-পদবাচ্য ?

“বিমল-প্রেম যে ধর্মের উদ্দিষ্ট তত্ত্ব, সেই ধর্মই ‘ধর্ম’।” —চৈঃ শিঃ ১।১

৬। ধর্ম কি এক ?

“মানবগণের ধর্ম কখনও বহুবিধ হইতে পারে না। যে-ধর্ম মানবের পক্ষে নিত্য, তাহা উত্তরকেন্দ্র বা দক্ষিণকেন্দ্র-ভেদে পৃথক্ পৃথক্ কখনও হইবে না। মূলে নিত্যধর্ম ‘এক’ বই দুই নয়।” —শ্রীমঃ শিঃ ১ম পঃ

৭। নিত্যধর্ম এক,—না বহু ?

“ধর্ম একই, দুই বা নানা নহে। জীব-মাত্রেই একটা ধর্ম ; সেই ধর্মের নাম —বৈষ্ণব-ধর্ম। ভাষাভেদে, দেশভেদে ও জাতিভেদে ধর্ম ভিন্ন হইতে পারে না।

অনেকে নানা নামে জৈবধর্মকে অভিহিত করেন ; কিন্তু পৃথক্ ধর্মের সৃষ্টি করিতে পারেন না। পরম বস্তুতে অণুবস্তুর যে নির্মল চিন্ময় প্রেম, তাহাই জৈবধর্ম অর্থাৎ জীব-সম্বন্ধীয় ধর্ম। জীব-সকল নানা প্রকৃতিসম্পন্ন হওয়ায় জৈবধর্মটি কতকগুলি প্রাকৃত আকারের দ্বারা বিকৃতরূপে লক্ষিত হয়। এইজন্য বৈষ্ণবধর্ম নাম দিয়া জৈবধর্মের শুদ্ধাবস্থাকে অভিহিত করা হইয়াছে। অত্যাগ্র ধর্মে যে পরিমাণ বৈষ্ণব-ধর্ম আছে, সেই পরিমাণেই সে-ধর্ম শুদ্ধ।” —জৈ: ধ: ২য় অ:

৮। শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম কি ?

“জগতে বৈষ্ণবধর্মের নামে দুইটি পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম চলিতেছে ; একটি — শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম, আর একটি—বিক্রবৈষ্ণবধর্ম। শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম তত্ত্বত: এক হইলেও রসভেদে চারি প্রকার—অর্থাৎ দাস্যগত বৈষ্ণবধর্ম, সখ্যগত, বৈষ্ণবধর্ম, বাৎসল্যগত বৈষ্ণবধর্ম, ও মধুর-রসগত বৈষ্ণবধর্ম। বস্তুত: শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম এক ও অদ্বিতীয়, ইহার অগ্ৰতর নাম—নিত্যধর্ম বা পরধর্ম। “যজ্জ্ঞাতে সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি”—এই শ্রুতিবাক্য শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্মকেই লক্ষ্য করেন।” —জৈ: ধ: ৪র্থ অ:

(ক্রমশ:)

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

জীব নিজে শত শত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বা নিজের মনোমত ভজনের অভিনয় করিয়া নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। যিনি অখণ্ডবস্তুর সেবা করেন, তাঁহার আনুগত্যদ্বারাই জীবের মঙ্গল লাভ হয়। বৈষ্ণবের নিত্যসম্পত্তি সাক্ষাৎ নারায়ণ। স্বয়ং নারায়ণ যদি নিজকে নিজে দিয়ে দেন, তাহা হইলেও তাঁহার কিছু দেওয়া বাকী থাকে, কিন্তু ভগবন্তক সম্পূর্ণভাবে ভগবানকে দিয়ে দিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বাণী শ্রবণ না করিলে পূর্ণতম শ্রীজগন্নাথ-দর্শন অসম্ভব। শ্রীচৈতন্যবাণী-সেবোন্মুখদ্বারাই শ্রীজগন্নাথ-দর্শন সম্ভব। শব্দ-শব্দীতে ভেদবুদ্ধি থাকিলে জগন্নাথ-দর্শন হইবে না। নিত্যসিদ্ধ বৈকুণ্ঠ-পার্বদ গরুড়ের পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহার কৃপায় জগন্নাথ-দর্শন হয়।

নিত্যবস্তু ভগবানের সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ। আমরা তাঁহার কথা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া তিনি এখন আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে আছেন।

সেবোন্মুখ কর্ণ ও জিহ্বাদ্বারা সর্বদা তাঁহার কথা শ্রবণ ও কীর্তন করিলে, তিনি আমাদের যাবতীয় পাপ—সকলপ্রকার অশুবিধা দূর করিয়া দিয়া তাঁহার সঙ্গ প্রদান করিবেন। সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ভগবৎপাদপদ্ম সেবায় আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত। পার্থিব জিনিষগুলি থাকে না; কিন্তু যে জিনিষ নিত্য—পরমমঙ্গলময়, তাঁহার সঙ্গবিচ্যুত হওয়া কর্তব্য নয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কীর্তন শ্রবণ করিয়া তাঁহার শতকরা শত পরিমাণ অপ্রতিহত সেবাস্বপ্ন যদি সৃষ্টভাবে দেখিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য পাই, তাহা হইলে আমরাও সেবা করিতে পারি। গুরুপাদপদ্ম ও তাঁহার বন্ধুবর্গ বহির্জগতের বস্তু নহেন। আমি মূর্খ, যে ভাষায় বলিলে আমার মূর্খতা যায়, তাঁহারা সেই ভাষায় বলিয়া আমার মূর্খতা অপনোদনের যত্ন করেন—আমাদিগের অন্তরে সাধুবৃত্তির সঞ্চার করেন। সাধুদিগের সঙ্গদ্বারা সাধুবৃত্তি লাভ হয়। অসদ্বস্ত্য ত্যাগ ও সদ্বস্ত্য গ্রহণের পরামর্শ ব্যতীত সাধুগণ অত্র পরামর্শ প্রদান করেন না।

জীবের যত প্রকার কর্তব্য আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুর সেবাই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। তাহা অপেক্ষাও বৈষ্ণবের সেবা অধিকতর শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। আমাদের কর্তব্য হইতেছে—রহস্যবিদ ব্যক্তির শরণাপন্ন হওয়া। ভক্তি আশ্রয় করিলে—ভগবানের উপর নির্ভর করিলে সমস্ত দায়িত্ব কাটিয়া যায়।

আত্মার কোনরূপ মলিনতার প্রয়োজন নাই। দৈহিক তাৎকালিক প্রয়োজন-সমূহই আবর্জনা। মন পুণ্যের অনুশীলনদ্বারা সাময়িকভাবে কথঞ্চিৎ নিয়মিত মনে হইলেও উহা স্বভাবতঃই বড় বিশ্বাসঘাতক; উহার উপর নির্ভর করা যায় না।

দেহ-মনের পরিচয়টী স্বরূপের পরিচয় নহে। গোপীভর্তা যে কৃষ্ণ, তাঁহার পদ-কমলের দাসাত্বদাস পরিচয়টী জীবের স্বরূপের পরিচয়। ভক্তভাব-সঙ্গীকারকারী শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বর্ণপরিচয় এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-বিচার আমাদের স্বরূপের বিচার নহে। বর্ণাশ্রমের অভিমান থাকিলে হরিভজন শুরু হয় না। বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মের মধ্যে যাহারা অবস্থিত হইবেন, তাঁহারা প্রেমময় সেবাজগতে প্রবেশ লাভ করিতে গেলে প্রত্যেক পদে বিপদ বরণ করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই একমাত্র কার্য্য। তাহার দ্বারা সাতপ্রকার মঙ্গললাভ হয়। চিত্তদর্পণ মলিন থাকিলে কৰ্ম্মজ্ঞানকাণ্ডে প্রবেশ হইবে। যাহাতে বিষয় প্রতিফলিত হইতেছে, সেই চিত্ত কলুষিত। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ণনে তাহা মার্জিত হইবে।

জীব যথার্থ সৎগুরুর আনুগত্যে চেতনরাজ্যের পরমোন্নতি লাভ করিতে পারে

হরিসেবা-ফলে প্রাকৃত অভিমান রহিত হইলে জীবের গোলোকপ্রাপ্তি হয়। জীব কৃষ্ণের ভেদাংশ হইলেও জাগতিক খণ্ডিত ভেদাংশ নহে। জীব নিকপট সেবাফলে মুক্তগণের, এমন কি, নিত্যমুক্তকুলের সমপর্যায়ভুক্ত হইতে পারেন। তখন এই সংসারের কথা মনে থাকে না।

আমরা লঘু হইতে লঘু, তদপেক্ষাও লঘু ; আর শ্রীগুরুপাদপদ্ম—যিনি বৃহত্তের সেবা করেন, তিনি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, তদপেক্ষাও বৃহৎ। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা করেন বলিয়া কৃষ্ণের প্রিয়তম। ভগবানের যাবতীয় প্রিয়জনের মধ্যে আমার মঙ্গলদাতা গুরুদেব সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়তম। গোস্বাম্যষ্টক—যাহারা ব্রজে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিচারে পাই,—কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, আর সকলেই আশ্রয়। বিষয় ও আশ্রয়ের যোগে লীলা সংঘটিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্বিচার করিতে হইবে।

অধিকারানুরূপই শাস্ত্রব্যবস্থা

“কৃষ্ণভক্তি বলবান্, কর্মফল

কেটে করে থান্ থান্।”

শাস্ত্র—কামধেনু। সকল অধিকারীই নিজের সমর্থনযোগ্য বাক্য শাস্ত্র হইতে প্রদর্শন করিতে পারেন। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সকলেরই সমর্থনবাক্য শাস্ত্রে বর্তমান। এমন কি, স্ত্রীসঙ্গ, মত্তপান, মৎস্য-মাংসাদি ভক্ষণেরও ব্যবস্থা শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রের মুখ্যতাপর্য্য গ্রহণ করা অতীব কঠিন বলিয়াই “মহাজনো যেন গতঃ সঃ পস্থাঃ ॥”—বাক্যের আবির্ভাব। এ বিষয়েও শ্রীযমরাজ বলিয়াছেন,—“প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোহয়ং, দেব্যা বিমোহিতমতি-ধৃতমায়য়ালম্।” অতএব মহাজন-বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করাও সহজ নহে।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—এই মার্গদ্বয় বিষয়ে বিচার্য্য—“প্রবৃত্তিরেবা ভূতানাং নিবৃত্তিষ্ঠ মহাফলা। কর্মমোক্ষায় কস্মাণি বিধত্তে হগধং যথা ॥” নিবৃত্তিকেই শাস্ত্রের মহাফল বলা হইয়াছে এবং নিবৃত্তিমার্গ হইতে প্রবৃত্তিমার্গে গমনকে অধঃপাত বা অধঃপতন বলা হয়। নিবৃত্তিমার্গে গমনকারীদের পতন হইতে রক্ষার জন্য সাবধান-বাক্য উপদিষ্ট হইয়াছে।—

“নিক্ষিঞ্চনশ্চ ভগবদ্ভক্তনোমুখশ্চ পারং পরং জিগমিষোর্বসাগরশ্চ ।

সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু ॥

শ্রীচৈতন্যদেব খেদের সহিত কহিলেন—হায়, ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার ষাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভক্তনোমুখ নিক্ষিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে বিষয়ীকে ও স্ত্রীলোককে সন্দর্শন করা বিষভক্ষণ হইতেও অমঙ্গলজনক ।

“অগ্ন্যভিলাষিতাশৃণুঃ জ্ঞানকর্মাগুনাবৃতম্ । আত্মকূল্যেন কৃষ্ণাঙ্গশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥”—বাক্যটিও একই তাৎপর্য্যাপর । অগ্ন্যভিলাষীর প্রবৃত্তিকে সর্ব্বত্রই গর্হণ করা হইয়াছে । এতৎসত্ত্বেও উত্তমাভক্তির অনধিকারী নিজের দুর্ব্বলতা ও অযোগ্যতাকে আচ্ছাদন ও গোপন করিবার জন্ত নিজ সমর্থনযোগ্য শাস্ত্রবাণী বা মহাবাক্য সংগ্রহ করিতে প্রযত্ন করে । এমন কি, স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখবাক্যের কদর্থ করিতেও ভীতিবোধ করে না ।—

“বৈরাগী হইয়া করে স্ত্রী-সন্তাষণ ।

দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন ॥”

“স্ত্রীপাং নিরীক্ষণ-স্পর্শসংলাপথেননাদিম্ ।

প্রাণীনো মিথুনীভূতানগৃহস্থোহগ্রতস্তজ্জৈঃ ॥”

—এই বাক্যগুলি গৃহস্থদিগকে বলা হয় নাই । ত্যক্তগৃহ বা সন্ন্যাসিগণের প্রতিই ইহা প্রযোজ্য । তাঁহাদের পক্ষে ইহা অমার্জ্জনীয় আচরণ ।

শ্রীমন্নুহাপ্রভু তাঁহার দক্ষিণঘাতার সঙ্গী কৃষ্ণদাসের প্রতি যে আচরণ করিয়াছেন, ছোট হরিদাস প্রভু কৃষ্ণদাস অপেক্ষা অল্পদোষী হইলেও, তাঁহার প্রতি সেইরূপ আচরণের পরিবর্তে অতীব কঠিন ব্যবস্থা করিয়াছেন । কৃষ্ণদাসকে ভট্টথারির কবল হইতে উদ্ধার করত তাহার মঙ্গলের জন্ত তাহাকে ভক্তগণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন । আর ছোট হরিদাস প্রভুকে ভক্তগণের কাতর অনুরোধ সত্ত্বেও কিছুতেই অঙ্গীকার করেন নাই । তাঁহার সেবাচ্ছলে স্ত্রীসন্তাষণরূপ সামান্য দোষকেও তিনি ক্ষমা করেন নাই । গলদেশে কলস বন্ধন করত যমুনায় প্রাণ বিসর্জন করাকেই তিনি উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । উদারতা প্রদর্শন করিতে গিয়া শাস্ত্রের অমর্যাদা কখনই সঙ্গত হয় না । ছোট হরিদাস গৃহত্যাগী আর কৃষ্ণদাস বৈরাগী ছিলেন না ।

শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই অধিকারাত্মক ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে । “ভেজীয়সাং ন দোষায়”—বাক্যে তাহাই প্রকাশিত । অনন্ত্যত্মক ব্যক্তি এবং নামবলে পাপবুদ্ধিকারীকে সমান অধিকারী বলিয়া বিচার করা কখনই সিদ্ধান্ত নহে । মহাপাপীর কণ্ঠাগমন এবং ব্রহ্মার কণ্ঠার প্রতি ব্যবহার এক বলিয়া বিচার করা মহামূর্থতা ও

অপরাধজনক। ‘অপি চেৎ স্তুরাচার’—বাক্যে পাপীর দুরাচার ও কুকর্মকে ‘ভজতে মামনন্ত্যাক্’ জ্ঞান করিয়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কখনই ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—“ভ্রমর ক্ষুধায় ম্রিয়মান হইলেও গোমহিষাদির ভক্ষ্য তৃণাদিতে আসক্ত হন না।” পুনরায় তাঁহার আপাতঃ বিরোধজনক উক্তি—“তদ্রূপ কৃষ্ণপাদ-পদ্মের মধুপানকারী ভক্তভ্রমরও কখন কখনও দুর্ব্বিষয়ে রত হইলেও, ভক্তত্ব হেতু পাপে রত হন না।” পুনরায় বলিয়াছেন—যদিও কনিষ্ঠ ভক্ত সেই বিষয়-সমূহের সেবা করেন, তাহাতে সেই সকল বিষয়কে পরিণামে দুঃখ ও গর্হণীয়জ্ঞানে অপ্ৰীতির সহিত সেবা করেন, কিন্তু প্রীতির সহিত রত হন না। পরবর্তী দৃষ্টান্তে দুই প্রকার অধিকারের বিচার উক্ত হইয়াছে। “প্রীতিমুখে ও গর্হণমুখে ভোগ।” কিন্তু যিনি গর্হণমুখে ভোগ না করিয়া প্রীতিমুখে ভোগ করেন, তাহাকে ‘ভজতে মামনন্ত্যাক্’—ভক্ত বলা সঙ্গত কি? লোকনিন্দা, তিরস্কার ও প্রহারদ্বারাও যাহার নিবৃত্তির উদয় হয় না, পরন্তু ভক্তের বেষ ও ভক্তের বুলিকে কুকার্য্যের পরম অঙ্গ-স্বরূপে ব্যবহার করে, তাহাকে কনিষ্ঠ ভক্ত বা অপি চেৎ স্তুরাচার-পাত্র বলিয়া জ্ঞান করিতে কি চক্রবর্তীপাদ মন্তব্য করিয়াছেন? কনিষ্ঠ ভক্ত ও ধর্ম্মধর্ম্মী-ধর্ম্মঘাতী কি সমান অধিকারী হইবে? কুকর্ম্মী, চোর, ডাকাত ও পরদারলোভী সকলেই জানে তাহারা অগ্নায় করিতেছে। তজ্জন্ত গোপনে, নিশাভাগে ও সাবধানে কুকার্য্য সম্পাদন করে। তাহাদের এই জানা বা জ্ঞানকে গর্হণমুখে ভোগ বলিলে অগ্নায় হইবে না কি?

নামবলে পাপবুদ্ধি কখনই নামভজন হইতে পারে না। পাপী যতদিন না অমৃতপ্ত হয়, ততদিন তাহাকে উদারতা প্রদর্শন করা কতদূর সঙ্গত তাহা সুধীগণের বিচার্য্য। জগাই-মাধাইর ক্ষেত্রে দেখা যায়—প্রভু কহে,—“তোরা আর না করিস পাপ। জগাই-মাধাই বলে—আর নারে বাপ।” এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমন্নহাপ্রভুর লীলাই আমাদের জীবাতু হউক।—

একদিন আচার্য্য প্রভুরে কৈল নিমন্ত্রণ।

ঘরে ভাত করি’ করে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥

‘ছোট-হরিদাস’ নাম প্রভুর কীর্তনীয়া।

তাহারে কহেন ডাকি’ আপনে আনিয়া ॥

‘মোর নামে শিখি-মাহিতির ভগিনী-স্থানে গিয়া।

গুরুচাউল এক মান আনহ মাগিয়া ॥’

মাহিতির ভগিনীর নাম—মাধবী-দেবী।

বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী ॥

প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার 'গণ' ।
 জগতের মধ্যে 'পাত্র'—সাড়ে তিন জন ॥
 স্বরূপ গোসাঞি আর রায় রামানন্দ ।
 শিথি-মাহিতি—তিন, তাঁর ভগিনী—অর্দ্ধজন ॥
 তাঁর ঠাঞি তগুল মাগি' আনিল হরিদাস ।
 তগুল দেখি' আচার্যের অধিক উল্লাস ॥
 মেহে রাঙ্কিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন ।
 দেউল-প্রসাদ, আদা-চাকি, লেঘু-সলবণ ॥
 মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা ।
 শাল্যন্ন দেখি' প্রভু আচার্যে পুছিলা ॥
 উত্তম অন্ন এত তগুল কাঁহাতে পাইলা ?
 আচার্য্য কহে,—মাধবী-পাশ মাগিয়া আনিল ॥
 প্রভু কহে,—‘কোন যাই’ মাগিয়া আনিল ?
 ছোট-হরিদাসের নাম আচার্য্য কহিল ॥
 অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা ।
 নিজগৃহে আসি' গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা ॥
 ‘আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা ।
 ছোট-হরিদাসে ইহা আসিতে না দিবা ॥’
 দ্বার মানা, হরিদাস দুঃখী হৈল মনে ।
 কি লাগিয়া দ্বার-মানা, কেহ নাহি জানে ॥
 তিন দিন হরিদাস করে উপবাস ।
 স্বরূপাদি সবে পুছিলা প্রভুর পাশ ॥
 “কোন্ অপরাধ’ প্রভু’ কৈল হরিদাস ?
 কি লাগিয়া দ্বার-মানা, করে উপবাস ॥”
 প্রভু কহে—“বৈরাগী করে প্রকৃতি সন্তাষণ ।
 দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন ।
 দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ ।
 দারু-প্রকৃতি হরে মূনেরপি মন ॥
 “মাত্রা স্বসা হুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ ।
 বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কৰ্ষতি ॥”

[অমুবাদ—মাতা, ভগ্নী এবং হুহিতার সহিত নির্জনে কখনও থাকিবে না,
 কেননা, বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে ।]

ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া ।
 ইন্দ্রিয় চরাঞ্চল বুলে প্রকৃতি-সন্তাষিয়া ॥”
 এত কহি’ মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা ।
 গোসাঞির আবেশ দেখি সবে মৌন হৈলা ॥
 আর দিনে সবে মেলি প্রভুর চরণে ।
 হরিদাস লাগি কিছু কৈলা নিবেদনে ॥
 অল্প অপরাধ, প্রভু করহ প্রসাদ ।
 এবে শিক্ষা হইল না করিবে অপরাধ ॥
 প্রভু কহে—“মোর বশ নহে মোর মন ।
 প্রকৃতিসন্তাষী বৈরাগী না করে দর্শন ॥
 নিজ কার্যে যাহ সবে, ছাড় বৃথা কথা ।
 পুনঃ যদি কহ আমা না দেখিবে হেথা ॥”
 এত শুনি সবে নিজ-কর্ণে হস্ত দিয়া ।
 নিজ নিজ কার্যে সবে গেল ত’ উঠিয়া ॥
 মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি’ গেলা ।
 বুঝন না যায় এই মহাপ্রভুর লীলা ॥
 আর দিনে সবে পরমানন্দপুরী-স্থানে ।
 ‘প্রভুকে প্রসন্ন কর’—কৈলা নিবেদনে ॥
 তবে পুরী-গোসাঞি একা প্রভুস্থানে আইলা ।
 নমস্কারি’ প্রভু তাঁরে সন্তমে বসাইলা ॥
 পুছিল—‘কি আজ্ঞা ? কেন হৈল আগমন ?
 হরিদাসে প্রসাদ লাগি’ কৈলা নিবেদন ॥
 শুনিয়া কহেন প্রভু,—“শুনহ গোসাঞি ।
 সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞি ॥
 মোরে আজ্ঞা হয়, মুঞি যাও আলালনাথ ।
 একলে রহিব তাই, গোবিন্দ-মাত্র সাথ ॥”
 এত বলি’ প্রভু যদি গোবিন্দে বোলাইলা ।
 পুরীতে নমস্কার করি’ উঠিয়া চলিল ॥
 আস্তে-বাস্তে পুরী-গোসাঞি প্রভু আগে গেলা ।
 অহুনয় করি’ প্রভুরে ঘরে ফিরাইলা ॥
 “তোমার যে ইচ্ছা, কর, স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
 কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর ?”

লোক-হিত লাগি' তোমার সব ব্যবহার ।
 আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার ॥”
 এত বলি' পুরী-গোসাঞি গেলা নিজ স্থানে ।
 হরিদাস স্থানে গেলা সব ভক্তগণে ॥
 স্বরূপ-গোসাঞি কহে—“শুন, হরিদাস ।
 সবে তোমার হিত বাঞ্ছি, করহ বিশ্বাস ॥
 প্রভু হঠ পড়িয়াছে, স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
 কতু কৃপা করিবেন দয়ালু অন্তর ॥
 তুমি হঠ কৈলে তাঁর হঠ সে বাড়িবে ।
 স্নান ভোজন কৈলে, আপনে ক্রোধ যাবে ॥”
 এত বলি' তারে স্নান ভোজন করাঞা ।
 আপন ভবন আইলা তারে আশ্বাসিয়া ॥
 প্রভু যদি যান জগন্নাথ-দরশনে ।
 দূরে রহি হরিদাস করেন দরশনে ॥
 মহাপ্রভু—কৃপাসিন্ধু, কে পারে বুঝিতে ?
 নিজ ভক্তে দণ্ড করেন 'ধর্ম' বুঝাইতে ।
 দেখি' ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে ।
 স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রী-সন্তাষণে ॥
 এইমতে হরিদাসের এক বৎসর গেল ।
 তবু মহাপ্রভুর মনে প্রসাদ নহিল ॥
 রাত্রিশেষে প্রভুরে দণ্ডবৎ হৈঞা ।
 প্রয়াগেতে গেল কারেহ কিছু না বলিয়া ॥
 প্রভুপদপ্রাপ্তি লাগি' সঙ্কল্প করিল ।
 ত্রিবেণী প্রবেশ করি' প্রাণ ছাড়িল ॥
 সেই ক্ষণে প্রভুস্থানে দিব্যদেহে আইলা ।
 প্রভু কৃপা পাঞা অন্তর্দ্বানে রহিলা ॥
 গন্ধর্ব্ব-দেহে গান করেন অন্তর্দ্বানে ।
 রাত্রে প্রভুরে শুনায়ে, অণ্ডে নাহি জানে ॥
 একদিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে ।
 “হরিদাস কাঁহা ? তারে আনহ এখানে ।”
 সবে কহে,—হরিদাস বর্ষপূর্ণ দিনে ।
 রাত্রে উঠি কাঁহা গেলা, কেহ নাহি জানে ॥

শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা ।
 সব ভক্তগণ-মনে বিস্ময় জন্মিলা ॥
 একদিন জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ ।
 কানীশ্বর, শঙ্কর, দামোদর, মুকুন্দ ॥
 সমুদ্রস্নানে গেলা সবে, শুনে কথো দূরে ।
 হরিদাস গায়েন, যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে ।
 মনুষ্য না দেখে, মধুর গীতমাত্র শুনে ।
 গোবিন্দাদি সবে মেলি কৈল অনুমানে ॥
 বিবাদি থাঞা হরিদাস আত্মঘাত কৈল ।
 সেই পাপে জানি 'ব্রহ্মরাক্ষস' হৈল ॥
 আকার না দেখি, মাত্র শুনি তার গান ।
 স্বরূপ কহেন,—এই মিথ্যা অনুমান ॥
 আজন্ম কৃষ্ণকীর্তন প্রভুর সেবন ।
 প্রভু-কৃপাপাত্র, আর ক্ষেত্রের মরণ ॥
 দুর্গতি না হয় তার, সদগতি সে হয় ।
 প্রভু-ভঙ্গী এই, পাছে জানিবা নিশ্চয় ॥
 প্রয়াগ হৈতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপে আইল ।
 হরিদাসের বার্তা তেঁহো সবারে কহিল ॥
 যৈছে সংকল্প, যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল ।
 শুনি' শ্রীবাসাদির মনে বিস্ময় হইল ॥
 বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লঞা ।
 প্রভুরে মিলিলা আসি' আনন্দিত হঞা ॥
 'হরিদাস কাঁহা ?' যদি শ্রীবাস পুছিল ।
 'স্বকর্মফলভুক্ পুমান্'—প্রভু উত্তর দিলা ।
 তবে শ্রীবাস তার বৃত্তান্ত কহিল ।
 যৈছে সংকল্প, যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল ।
 শুনি' প্রভু হাসি' কহে স্প্রসন্ন-চিত্ত ।
 'প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত ॥'

—ত্রিদাণ্ডস্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

অর্চন

নববিধা ভক্তির অগ্রতম প্রধান অঙ্গ হইল ‘অর্চন’। নারদ, বেদব্যাসাদি মহাজনগণ ভগবানের অর্চনই মনুষ্টিগণের নিঃশ্রেয়সজনক বলিয়া পুনঃ পুনঃ কীর্তন করিয়াছেন। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ভগবানের মুখনিঃসৃত অর্চন-বিষয়ক কথা ভৃগু প্রভৃতি পুত্রগণকে উপদেশ দিয়াছেন এবং স্বয়ং পরম বৈষ্ণব শিবঠাকুরও পার্শ্বতীর নিকট এই অর্চন-বিষয়ে কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৭।৪) ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—“হে মানদ! আপনার এই অর্চনই সর্ববর্ণ ও সর্বাশ্রমস্থিত পুরুষগণের এবং স্ত্রী-শূদ্রগণেরও সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া মনে করি।” শ্রীবিষ্ণুরহস্তের মধ্যে পাওয়া যায়,—

শ্রীবিষ্ণোরর্চনং যে তু প্রকুর্কন্তি নরা ভূবি।

তে যান্তি শান্তং বিষ্ণোরানন্দং পরমং পদম্ ॥

“এই পৃথিবীতে যে মানবগণ বিষ্ণুর চরণ প্রকৃষ্টরূপে অর্চন করেন, তাঁহার নিত্যানন্দ ও শ্রীবিষ্ণুর পরমধাম প্রাপ্ত হন।” শ্রীবিষ্ণুরহস্তের অগ্রত্রে ও উক্ত হইয়াছে,—

অর্চয়ন্তি সদা বিষ্ণুং মনোবাক্কাযকর্ম্মভিঃ।

তেষাং হি বচনং গ্রাহ্যং তে হি বিষ্ণুসমা মতাঃ ॥

“যাহারা কায়মনোবাক্যে সদা অর্থাৎ প্রত্যহ বিষ্ণুর অর্চন করেন, তাঁহাদেরই বাক্য গ্রহণযোগ্য, যেহেতু তাঁহারা বিষ্ণুতুল্যরূপে সম্মত।” এই প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণে বৈষ্ণব-মাহাত্ম্যে কথিত হইয়াছে,—

আগমোক্তেন মার্গেন স্ত্রীভিঃ শূদ্রৈশ্চ পূজনম্।

কর্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিষ্ণোশ্চিন্তয়িতা পতিং হৃদি ॥

শূদ্রানাক্ষৈব ভবতি নাম্না বৈ দেবতার্চনম্।

সর্বৈ চাগমমার্গেন কুর্য়ূর্বেদান্তসারিনা ॥

শ্রীনামপ্যধিকারোহস্তি বিষ্ণোরাধনাদিষু।

পতিপ্রিয়হিতানাঞ্চ শ্রুতিরেষা সনাতনী ॥

“স্ত্রী ও শূদ্রগণকর্তৃকও আগমোক্তমার্গানুসারে শ্রদ্ধাসহকারে বিষ্ণুপূজা করা কর্তব্য। তন্মধ্যে স্ত্রীগণ হৃদয়ে বৈষ্ণব পতির চিন্তা করিয়া বিষ্ণুপূজা করিবেন। শূদ্রগণেরও নামদ্বারাই দেবতার্চন হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই বেদান্তসারী আগমমার্গানুসারে পূজা করিবেন। ভক্তপতির প্রিয়হিতকারিণী রমণীদিগেরও শ্রীবিষ্ণুপূজাতে অধিকার আছে, শাস্ত্রে চিরকালই এইরূপ বিহিত হইয়াছে।”

কর্ম্মী-জ্ঞানী-পঞ্চোপাসকের অর্চনাভিনয়—অর্চনবিরোধ মাত্র

‘অর্চন’ স্বীকার করার অর্থ—অপ্রাকৃত সবিশেষ ভগবত্তার স্বীকার—ইহা **Personality of Godhead** স্বীকারের প্রথম সোপান। অনর্থযুক্ত সাধকের অর্চন ব্যতীত মঙ্গলের অণু কোন উপায় নাই। ভগবানের অর্চন কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপশ্চাদি অসচ্ছেষ্টরূপ অনর্থময় বৃত্তি হইতে জীবগণকে উদ্ধার করিয়া থাকে। সংকর্ম্ম ও অসংকর্ম্ম-প্রবৃত্তিরূপ অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ভক্তির অনুকূল পথে অগ্রসর হইতে হইলে অর্চনের একান্ত আবশ্যকতা রহিয়াছে। অর্চনের নিত্যতা অস্বীকার করিলে ভগবানের অপ্রাকৃত সবিশেষ ভগবতাকে অস্বীকার করা হয়, নির্বিশেষবাদী বা অদৈব অসং সাম্প্রদায়িক উপাধি লাভ করিতে বাধ্য হইতে হয়। কর্ম্মী-জ্ঞানী ও পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় অর্চনের নিত্যত্ব স্বীকার না করায় তাহাদিগকে ভগবদ্বিরোধী নাস্তিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হয়।

সাধারণতঃ অর্চনের দ্বারা খুব প্রাথমিক ভক্ত্যানুকূলের চেষ্টা সাধিত হয়। ‘অর্চন’কে প্রাথমিক অনুশীলন মনে করিয়া কোনও কোনও ভোগ-বিলাসী বিষয়ী বা তথাকথিত ত্যাগী ব্যক্তি অর্চনের প্রতি উদাসীন হইয়া ভজনের যে অভিনয় করেন, তাহা তাহাদের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। অর্চনের প্রতি উদাসীনতায় তাহাদের ভীষণ বিপদ সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অর্চনকে—কর্ম্ম ও ভক্তির তটরেখা বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। অর্চনের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইতে না পারিলে কর্ম্মরাজ্যের সীমানায় পতিত হইতে হয়। অর্চনে অত্যাগ্রহী, অতিবাড়ী, অত্যভিনিবিষ্ট হইলে সেবোন্মুখতা কমিয়া গিয়া কর্ম্মীর উপাধি বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হয়। অর্চন সূষ্ঠভাবে সাধিত হইলে ভক্তি বা কীর্ত্তনময় হয়। পাঞ্চরাত্রিক অর্চকগণ ভক্তিযোগাদি ব্যতীত ইতরযোগাদির প্রশ্রয় দেন না।

অদীক্ষিত ব্যক্তিগণের ভগবদর্চনে অনধিকার

অর্চনমার্গে নিয়তভাবে বিধির অপেক্ষা রহিয়াছে। পূর্বে দীক্ষাগ্রহণ কর্তব্য, অনন্তর শাস্ত্রীয়বিধান। বিধিমার্গস্থিত ব্যক্তির পক্ষে অর্চনাধিকার। আগমোক্ত আবাহনাদিক্রমবিশিষ্ট কৃত্যই ‘অর্চন’ নামে অভিহিত হয়। এই প্রসঙ্গে স্বন্দ-পুরাণের চাতুর্মাশ্র-মাহাত্ম্যে পাওয়া যায়,—

শুদ্ধিগাসাদি পূর্ব্বাঙ্গকর্ম্মনির্ব্বাহপূর্ব্বকম্।

অর্চনন্তুপচারানাং শ্রান্নস্ত্রেণোপপাদনম্ ॥

“ভূতশুদ্ধি, অঙ্গশ্রাদ্ধ, করন্যাসাদি পূর্ব্বকর্ম্ম সমাধান করত, মন্ত্রের দ্বারা উপাচার সমর্পণকে ‘অর্চন’ বলে।” উপনয়ন-মন্ত্রাদি আচার্য্যের নিকট হইতে লাভ হইয়া থাকে। শ্রীভাগবতে (১১।৩।৪৮) উক্ত হইয়াছে,—

লঙ্কানুগ্রহ আচার্য্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ ।

মহাপুরুষ ভার্চেন্মূর্ত্যভিমতয়াত্মনঃ ॥

“আচার্য্যের নিকট হইতে তৎকৃপাস্বরূপ উপনয়ন-মন্ত্রাদি লাভ করিয়া এবং অর্চনপ্রণালী অবগত হইয়া স্বীয় অভীষ্টমূর্তিতে ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিবেন ।”

দ্বিজানাম্পনীতানাং স্বকর্মাধ্যয়নাদিষু ।

যথাধিকারো নাস্তীহ শ্রাচোপনয়ণাদনু ॥

তথাত্রাদীক্ষিতানাস্ত মন্ত্রদেবার্চনাদিষু ।

নাধিকারোহস্ত্যতঃ কুর্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্ ॥ (আগম)

“অনুপনীত দ্বিজগণের যেরূপ নিজকর্ম্ম অধ্যয়নাদিতে অধিকার হয় না এবং উপনয়নের পর যেরূপ তদ্বিষয়ে অধিকার হয়, সেইরূপ অদীক্ষিত পুরুষগণের মন্ত্র ও দেবার্চনাদিতে অধিকার নাই । অতএব নিজকে দীক্ষিত করুন ।”

অর্চনক্রিয়ায় অচ্চাঁতে শ্রদ্ধাই মূল । উহার অভাবে অচ্চাঁনফলে ভগবদর্শনের স্থলে ভগবচ্চরণে অপরাধই লভ্য হয় । গরুড়পুরাণে উল্লেখ রহিয়াছে,—“যাঁহারা বিবিধপুষ্পদ্বারা বিধিসহকারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীহরির অর্চন করেন, তাঁহারা যম-নির্ধ্যাতন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন ।” শাস্ত্রীয় বিধান-শিক্ষা-বিষয়ে বিষ্ণুরহস্য-বচন,—

অবিজ্ঞায় বিধানোক্তং হরিপূজাবিধিক্রিয়াম্ ।

কুর্স্বন্ ভক্ত্যা সমাপ্নোতি শতভাগং বিধানতঃ ॥

“পুরুষ বিধিবচন না জানিয়া কেবল ভক্তিসহকারে শ্রীহরির অর্চন করিলে বিধানোক্ত অচ্চাঁনাপেক্ষা শতভাগের একভাগ ফললাভ করিয়া থাকেন ।” কেশবাদি গ্রন্থাস, মুদ্রা প্রভৃতির আবাহন করিয়া জড়ে অভিনিবিষ্ট হইলে শ্রীহরির অর্চন হয় না ।

দীক্ষিত ভক্তগণের ভগবদর্চন-বিমুখতা মহাদোষাবহ

স্কন্দপুরাণে প্রহ্লাদ-বচনে উক্ত হইয়াছে,—

কেশবাচ্চাঁ গৃহে যশ্চ ন তিষ্ঠতি মহীপতে ।

তস্মান্ন নৈব ভোক্তব্যমভক্ষণ সমং স্তুতম্ ॥

“হে রাজন্ ! যাহার গৃহে শ্রীহরির অচ্চাঁ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যিনি শ্রীহরির অর্চন করেন না, তাহার অন্ন ভক্ষণযোগ্য নহে, যেহেতু তাহা অভক্ষতুল্য কথিত হইয়াছে ।” অচ্চাঁনের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া অনেকে অচ্চাঁনকে ‘ভোগ’ ও ‘গৃহব্রতধর্ম্মের’ পরিপাক এবং পরিবর্দ্ধনের যন্ত্র মনে করিয়া মারাত্মক ভুল করেন ।

যাহারা সম্পত্তিশালী গৃহস্থ, তাঁহাদের অর্চনমার্গই প্রশস্ত বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যিনি গৃহস্থ হইয়া অর্থ বাঁচাইবার জন্ত অর্চন না করিয়া নিষ্কিঞ্চনের তায় কেবল স্মরণাদিতে নিষ্ঠাবান হন, তাহার বিত্তশাঠ্য দোষ হয় অর্থাৎ অর্থ-কার্পণ্য প্রতিপাদিত হয়। অর্চক হরিপ্রীতির জন্ত নানা উপকরণাদি সংগ্রহ করিতে করিতে নিজ ভোগবাসনারূপ অন্ত্যভিলাষ হইতে ক্রমে ক্রমে মুক্তিলাভ করেন। কদর্য স্বভাব, বিক্ষিপ্তচিত্ত, সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণের জন্ত অর্চনাদির একান্ত আবশ্যকতা রহিয়াছে।

অর্চনাদি কার্য্য অপরের দ্বারা অর্থাৎ ভাড়াটিয়া ব্রাহ্মণের দ্বারা সম্পাদন করাইবার চেষ্টা আলস্যের পরিচায়ক। শ্রদ্ধা-রাহিত্যহেতু তাদৃশ কার্য্যে গৃহস্থ 'হীন' বলিয়া পরিগণিত হয়। এস্থলে দেবাচর্চনরূপ যে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, তাহা মূল ত্যাগ করিয়া বৃক্ষের শাখা-পল্লবাদিতে জলসেচনের তায় নিষ্ফল। শ্রদ্ধাসহকারে ভগবানের অর্চন—বৃক্ষের মূলে জলসেচনরূপ মঙ্গলজনক কার্য্য। আলস্যাদি নিরসনে অর্চনের বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। ভোগীর—গৃহস্থথাষেধী ব্যক্তির মাঘমাসের অর্থাৎ শীতকালের ব্রাহ্মমুহুর্তে আলস্য করিয়া শয্যায় থাকিবার কোন উপায় নাই। তাহাকে সেই সময় উঠিতেই হইবে। উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া পবিত্র ও সংযত হইয়া ভগবৎ প্রবোধন ও মন্দির মার্জনাदि করিতেই হইবে। দীক্ষিত ভক্তসকল অর্চন না করিলে তাহাদিগকে নিরয়গামী হইতে হয়, শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে ইহা ক্রত হয়। যাহারা গোখর অর্থাৎ ধনমদমত্ত বৈষ্ণবক্রুরের অনর্থযুক্ত অর্চনচেষ্টার সহিত নিত্যসিদ্ধ মহাজনগণের অর্চনাদর্শকে সমপর্য্যায়ভূক্ত মনে করেন, তাহারা মঙ্গলের হস্ত হইতে চিরকালের জন্ত ভ্রষ্ট হইবে।

অর্চন-ফলে বৈষ্ণবসেবা প্রবৃত্তির উদয়

ভক্তের আনুগত্যেই অচ্চামুর্তির সেবা করা আবশ্যক। এই জন্তই পূজার আদিতে শ্রীগুরুপূজা এবং পূজার অন্তে ভক্তপূজার ব্যবস্থা রহিয়াছে। অনেকে মনে করেন,—“ঘরে স্বয়ং ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ আছেন, প্রত্যহ ঠাকুরের অর্চন করি, বৈষ্ণবের সেবা করিবার প্রয়োজন কি?” যাহারা অর্চার পূজা করিয়া ভক্তের পূজা করেন না, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শাস্ত্র সাবধান-বাণী প্রকাশ করিয়াছেন,—

অভ্যচ্ছিন্নিহা গোবিন্দং তদীয়ান্নাচ্ছয়ন্তি যে।

ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্ত ভাজনং দান্তিক্য জনাঃ ॥

(হরিভক্তিসুধোদয়)

“যাহারা শ্রীগোবিন্দের পূজা করিয়া সেই শ্রীগোবিন্দের ভক্তগণের পূজা না করেন, তাহারা দান্তিক—কখনই বিষ্ণুর রূপার পাত্র নহেন।”

অচ্চর্ম্মিতি সাক্ষাৎ ভগবান্ । আবার ভক্তের হৃদয়ে সাক্ষাৎ ভগবান্ সর্বদা সেব্যরূপে বিরাজিত । কিন্তু শ্রদ্ধার অভাবে অচ্চর্ম্মিতির বহুকাল সেবা করিলেও জীবের মঙ্গল হয় না, কিন্তু স্বল্পকাল ভক্তের সেবা করিলে তৎফলে শ্রদ্ধা লাভ হয় এবং অচ্চর্ম্মির অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি হয় ।

শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ ব্যতীত স্মৃষ্ণ অচ্চর্মন অসম্ভব

শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৮।১১) “স্বর্গাপবর্গয়ো পুংসাং” শ্লোকে পাওয়া যায়,—
—“স্বর্গ, মোক্ষ, পৃথিবী ও পাতালের সম্পদ এবং অনিমাди সর্বসিদ্ধির মূল শ্রীহরির চরণাচ্চর্ন অর্থাৎ তদ্বারা সর্বার্থ সিদ্ধ হয় ।” অচ্চর্নের উদ্দেশ্য নিজেদ্রিয়-তর্পণ নহে, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতিবাঞ্ছাই অচ্চর্নের প্রকৃত তাৎপর্য । শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শ রহিয়াছে । যে ‘অচ্চর্ন’ শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণের দ্বারা নিয়মিত নহে, যে অচ্চর্নের ফল শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণরূপ ভজন-প্রবৃত্তি নহে, সেই অচ্চর্ন অসম্পূর্ণ । এই কলিকালে অচ্চর্নাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ শ্রীহরিনাম-কীর্তন-সহকারেই করিতে হইবে—ইহা সকল শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ কীর্তন করিয়াছেন ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেন্দান্ত বোধায়ন মহারাজ

দুর্গাদেবী

সিদ্ধান্তগ্রন্থ ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মা দুর্গাদেবীর স্বরূপ-বিচারে বলেন,—

“সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনশক্তিরেকা

ছায়েব যশ্চ ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা ।

ইচ্ছানুরূপমপি যশ্চ চ চেষ্টতে সা

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥”

ভগবানের স্বরূপশক্তি একটী । তাঁহাকেই উপনিষদে পরাশক্তি বলা হইয়াছে । সেই স্বরূপশক্তির ছায়াস্বরূপ প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়-সাধিকা মায়াশক্তিই ভুবন রক্ষয়িত্রী “দুর্গা” ।

স্বারোচিষ মন্বন্তরে সুরথ রাজা ও সমাধি-নামক বৈষ্ণবের সময় হইতে পূজার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে । রাজা দেবীর আরাধনায় পুনরায় রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন এবং দেবী নির্ঝিল্লচিত্তে বৈষ্ণবে জ্ঞান লাভ হইবে বলিয়া বর প্রদান

করিলেন। জড়মায়া স্বরূপশক্তির ছায়া। তাঁহার প্রভাব ও কার্য্য প্রাকৃত বিমুখ ক্ষুদ্র জীবের উপর সম্ভব। অপ্রাকৃত চিন্ময়ধামে ভগবানের লীলা পুষ্ট করা যোগমায়ার কার্য্য। জীব তটস্থা শক্তিপ্রসূত অণুচিৎ, বিভিন্নাংশ। তাহারা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিবার জন্ত এই জগতে পতিত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছেন। ইহা দেবীধাম বা দুর্গাদেবীর দুর্গ। জীব শোকে মোহে আচ্ছন্ন এবং সর্বদাই অভাবগ্রস্ত মনে করে। তখনই দুর্গাদেবীর নিকট ধন, জন, পুত্র, পৌত্র, রূপবতী ভার্যা, যুদ্ধে জয়লাভ ইত্যাদি নানাপ্রকার কামনা করিয়া পূজা করিয়া থাকে। দুর্গাদেবীও তাহাদের কামনা অত্যাশী ধন-জনাদি দেন এবং কর্ম্মচক্রে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু যাহারা স্বকৃতিবান্ তাহারা ঐ সকল স্পৃহাকে মহামায়ার কপট রূপা জানিয়া বিষ্ণুমায়ার সৎ-স্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং স্বরূপদেহে চিৎশক্তি হ্লাদিনীর সেবায় নিযুক্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। ভগবানের চিন্ময় ধামে চিন্ময়ী যোগমায়া ভগবানের স্বরূপভূতা শক্তি। ইনি বৈকুণ্ঠে নিত্য সেবা-পরায়ণা। ব্রজরাজকুমারীগণ ভগবানের সেবা প্রার্থনা করিয়া ইহাকেই পূজা করিয়াছিলেন। সেই পূজায় কেবল ভগবৎপ্রীতি কামনা। নিজের ফলভোগ বা ফল ত্যাগ কামনা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দেখা যায়—

“কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিগুধীশ্বরী ।

নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ।

ইতি মন্ত্ৰং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাশ্চক্ৰুঃ কুমারিকাঃ ॥”

রোগীকে সুস্থ করিতে হইলে সুস্থ অবস্থার প্রতিবন্ধক রোগকে নিরূপণ করিয়া চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ যেমন অবশ্য কর্তব্য, সেইরূপ অজ্ঞানকে নিবারণ করিবার জন্ত জগৎ-প্রসবিনী মহামায়া জগদম্বার শরণাগত হওয়ার কথা শাস্ত্রে বর্ণন করিয়াছেন। মহাবিষ্ণুস্বরূপিনী ব্রহ্মশক্তিস্বরূপা পরমা বিতাই “দুর্গা” নামে অভিহিতা হইয়াছেন। ইনি ছায়াশক্তি। ইহার কার্য্য বিমুখমোহন। জগতে দুর্গা আরাধনা ছায়াশক্তির আরাধনা মাত্র।

নারদ পঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিজ্ঞা-সংবাদে দেখা যায়,—সেই পরমপুরুষ ভগবানের একটাই পরাশক্তি আছে। তাহাই স্বরূপাত্মিকা দুর্গা। এই মহাবিষ্ণুস্বরূপিনী পরাশক্তির বিজ্ঞান মাত্রেরই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি প্রেমসর্বস্ব-স্বভাবা হ্লাদিনী শক্তি। ইহার আশ্রয়ে আদিদেব অখিলেশ্বরকে সহজে জানা যায়। কিন্তু মহামায়া নামে ইহার একটা আবরণাত্মিকা শক্তি আছে। তাহার দ্বারা নিখিল জগৎ ও দেহাভিমানিগণ মুগ্ধ হইতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

“বিলজ্জমানয়া যন্ত স্নাতুমীক্ষাপথেহমুয়া ।

বিমোহিতা বিকথন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ ॥”

অর্থাৎ যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জা বোধ করেন, দুর্বুদ্ধি জীব সেই মায়াদ্বারা বিমোহিত হইয়া আমি, আমার এইরূপ জ্ঞাষা করে। ভগবানের অবিচিন্ত্য শক্তির নামই পরাশক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকীশক্তি জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াভেদে বিবিধ। সেই পরাশক্তি বিচিত্র বিলাসময়ী ও বিভিন্ন আনন্দ-বর্দ্ধিনী। সেই শক্তির অনন্ত প্রভাব থাকিলেও জীবের নিকট তিনটী প্রভাবের পরিচয় আছে। সেই তিনটী প্রভাবের নাম—চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। এই তিনটী শক্তির প্রভাবদ্বারা চিজ্জগৎ, জৈবজগৎ ও জড়জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বলিয়াছেন,—

“চিৎশক্তি স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা নাম ।

তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥

মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ কারণ ।

তাহার বৈভবান্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥”

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

“কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি’ ।

আবরণ সঘরিবে কবে বিশ্বোদরি ॥

শুনেছি আগমে বেদে মহিমা তোমার ।

শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখে বাঁধি করাও সংসার ॥

শ্রীকৃষ্ণ-সাম্মুখ্য যার ভাগ্যক্রমে হয় ।

তারে মুক্তি দিয়া কর অশোক অভয় ॥

এ দাসে জননী করি অকৈতব দয়া ।

বৃন্দাবনে দেহ’ স্থান তুমি যোগমায়া ॥

তোমাতে লজিয়া কোথা জীবে কৃষ্ণ পায় ॥

কৃষ্ণ রাস প্রকটিল তোমার কৃপায় ॥

তুমি কৃষ্ণ-অম্বুচরী জগৎ-জননী ।

তুমি দেখাইলে মোরে কৃষ্ণ-চিন্তামণি ॥

নিষ্কপট হয়ে মাতা চাহ মোর পানে ।

বৈষ্ণবে বিশ্বাস বুদ্ধি হ’ক প্রতিফল ॥

বৈষ্ণব-চরণ বিনা ভব-পারাবার ।

ভকতিবিনোদ নারে হইবারে পার ॥”

শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে দেখা যায়,—

জয় জয় জগৎ-জননী মহামায়া ।
 দুঃখিত জীবেরে দেহ রাক্ষা পদছায়া ॥
 জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটীশ্বরী ।
 তুমি যুগে যুগে ধর্ম রাখ অবতরি ॥
 জগৎস্বরূপা তুমি তুমি সর্বশক্তি ।
 তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা, তুমি বিষ্ণুভক্তি ॥
 নিখিল ব্রহ্মাণ্ডগণের তুমি মাতা ।
 কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা ॥
 সর্বাশ্রয় তুমি সর্ব জীবের বসতি ।
 তুমি আত্মা অবিকার্য পরমা প্রকৃতি ॥

* * * *

তোমার মায়ায় মগ্ন সকল সংসার ।
 তুমি না রাখিলে মাতা কে রাখিবে আর ॥
 সবার উদ্ধার লাগি' তোমার প্রকাশ ।
 দুঃখিত জীবেরে মাতা কর নিজ দাস ॥

কারণস্বরূপ বেদশাস্ত্রে চিন্ময়ীশক্তিকেই সকল প্রাকৃত সৃষ্টির বল বলিয়া থাকেন । চিন্ময়ী শক্তিই ত্রিজগতের কারণ । শক্তির স্মরণ করিলে জীব অশেষ প্রকার জাগতিক ধারণা হইতে বিমুক্ত হইয়া বিবর্ত পরিহার করিতে সমর্থ হয় । সেই চিন্ময়ী শক্তির অধীনে সেবা পরায়ণ না হইলে জীব আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুর্গতি লাভ করে । কিন্তু সেবোন্মুখ জীবগণের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া তিনি তাহাদের ত্রিবিধ দুঃখ অপসারিত করেন ।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

আমার নিজের কথা

(১)

আমি নিজে অপরাধী তবু গো অপরে,
গাহিয়া বেড়াই মন্দ ।
আমি নিজের দিকেতে চাহিনা ফিরিয়া,
দেখি, অপরের ভাল মন্দ ।

(২)

আমি, পরকে বিলাতে যাই গো অমিয়া,
দিতে, চাই না আপন মুখে ।
আমার পরদুখ দেখি' বুক ফেটে যায়,
নাহি দুখ নিজ দুখে ।
আমি, অপরে বিষয়ী বলি' ঘৃণা করি,
আপনার বেলা অন্ধ ।

(৩)

আমি অপরে পড়াই বিবিধ শাস্ত্র,
নিজে সেগুলি না বুঝিয়া ।
আমি সবারে শুনাই চিদ-রস কথা,
রহি, আপনি এ জড়ে মাতিয়া ।
পরে খুলে দিতে যাই তব শুভ পথ,
করি' আপনার পথ বন্ধ ।

(৪)

যাই, বশ-পিয়াসায় সবারি নিকটে,
তব সেবা-সুখ ভুলিয়া ।
প্রভো, কিসে বল পারি সেবিতে তোমারে,
অদোষদরশী হইয়া ।
প্রভো, দাও তব সেবা থাকিতে সময়,
করি' সমুচিত দণ্ড ।

—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

জীবের কৃত্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৫ পৃষ্ঠার পর]

“ধুমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্ ।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥” (গীতা ৮।২৫)

অর্থাৎ—“ধুম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, ছয়মাসরূপ দক্ষিণায়নকালে তদুপলক্ষিত দেবতামার্গে গমনশীল কৰ্ম্মযোগিগণ চন্দ্র-জ্যোতিঃস্বরূপ স্বর্গলোক লাভ করে উপভোগান্তে সংসারে পুনরাবর্তন করে ।”

জীবাত্মা যে স্থানেই গমন করুক, তার বিনাশ নেই,—সে নিত্য সনাতন ।
জীবাত্মার নিত্যত্ব দৃষ্টে গীতার বাণী,—

“নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থানুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥” (গীতা ২।২৩-২৪)

অর্থাৎ—এই জীবাত্মাকে অস্ত্রসকল ছেদন করতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করতে পারে না, জল ক্লেদযুক্ত করতে পারে না এবং বায়ু তাকে শুষ্ক করতে পারে না ।

এই জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য ; ইনি নিত্য, সর্বগত অর্থাৎ সর্বত্র গমনশীল, স্থিরভাবাপন্ন, পরিবর্তন-রহিত এবং সনাতন । জীবাত্মা ‘সর্বত্রগ’ বা সর্বত্রগামী হওয়ায় স্থলে, জলে, অনলে, অন্তরীক্ষে, বায়ুমণ্ডলে, উর্দ্ধ-লোকসমূহে, অধঃলোকে ও সর্বত্র যে কোন আবহাওয়ায় বা যে কোন পরিবেশে নানাভাবে অবস্থান করে থাকে বা পরিভ্রমণ করে থাকে । মাটির সঙ্গেও অসংখ্য সূক্ষ্ম আত্মা মিশে আছে । তাই যত্র তত্র আমরা লতা-গুল্ম প্রভৃতি স্থূল জীব প্রত্যক্ষ করে থাকি । এ পৃথিবী ব্যতীত আরও বহু উন্নততর ভুবন আছে এবং সেখানে উন্নত প্রাণীগণ বাস করেন । যেমন আমরা সূর্যকে দেখতে পাই যেন একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের দ্বারা দাউ দাউ করে জ্বলছে । জড় বিজ্ঞানীরাও সূর্যকে একটা অগ্নিপিণ্ড বলে থাকেন । কিন্তু ঐ অগ্নিপিণ্ডটি সূর্য নয়,—উহা সূর্যলোক বা তথাকথিত বৈজ্ঞানিকদের মতে একটা নক্ষত্র । ঐ অগ্নিপিণ্ড বা সূর্যলোক উত্তাপের একমাত্র আধার ও জগতের হেতু বলে অনেকে মন্তব্য করলেও ঐ সূর্যলোকের যিনি আধিকারিক দেবতা তাঁকে সূর্যদেব বলা হয় । সূর্যদেব জড় তেজঃসমষ্টি, একটা মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা । শ্রীব্রহ্মা গোবিন্দের স্তবে বলেছেন,—

“যচ্চক্ষুরেব সবিতা সকল গ্রহাণাং

রাজা সমস্তস্বরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ ।

যশ্চাজ্জয়া ভ্রমতি সংভূতকালচক্রে।

গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥” (ব্রঃ সং ৫।৫২)

“গ্রহসকলের রাজা, অশেষ-তেজোবিশিষ্ট স্বরমূর্ত্তি সবিতা বা সূর্য্য জগতের চক্ষুরূপ অর্থাৎ প্রকাশক, তিনি যার আজ্ঞায় কালচক্রাক্রুত হয়ে ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ।”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত হয়েছে,—

“সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্বিশেষ ।

ভিতরে সূর্য্যের রথ-আদি সবিশেষ ॥” (চৈঃ চঃ আঃ ৫।৩৪)

ঋগ্বেদেও বিষ্ণুকে পরতত্ত্ব ও সূর্য্য-প্রভৃতি দেবতার সৃষ্টি কর্ত্তারূপে বর্ণনা আছে ; যথা—“উরুং যজ্ঞায় চক্রথুরু লোক জনয়ন্তা সূর্য্যামুযাসমগ্নিম্”—(ঋগ্বেদ ৭।১৯।৪) অর্থাৎ—“হে বিষ্ণো ! আপনার যজ্ঞের জন্ত আপনি এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আপনি সূর্য্যকে, উষাকে ও অগ্নিকে জন্ম দিয়েছেন ।” যে জীবাত্মা অদাহ বা যাকে অগ্নি দগ্ধ করতে পারে না, সেই জীবাত্মা অগ্নিপিশুণ্ময় সূর্যালোকে যে থাকতে পারে না,—তা নয় । সেই জীবাত্মা প্রচণ্ড আগুনের মধ্যেও যথোপযুক্ত শরীরে বসবাস করতে পারে । এই পৃথিবীর আবহাওয়া (atmosphere), পরিবেশ (environment) প্রভৃতি যা কিছু জীবের বেঁচে থাকার পক্ষে উপযুক্ত, তাহা সূর্যালোকে কার্য্যকরী হয় না । এই পৃথিবীতে দেখা যায়, আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির উট তুন্ড্রা অঞ্চলে বাসের অযোগ্য ; আবার তুন্ড্রা অঞ্চলের বন্য হরিণ মরুভূমিতে থাকতে পারে না । তুন্ড্রা অঞ্চলের অধিবাসী এস্কিমোর বরফের দেশ ছেড়ে প্রচণ্ড গরমের দেশে বসবাস করতে চায় না । অষ্ট্রেলিয়ার কাঙারু স্তন্যপায়ী প্রাণী ও আন্টার্টিকার পেঙ্গুইন পাখী পৃথিবীর অগ্ন্য দেশে দেখা যায় না । এই পৃথিবীর একস্থানের জীব যদি অগ্ন্য বিপরীত মেরুস্থানে বসবাস করতে না পারে, তাহলে এই পৃথিবী হতে কয়েক লক্ষ যোজন দূরের সূর্যালোকে পৌঁছে এই পৃথিবীর জীব কি বাস করতে পারে ? সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করা এই পৃথিবীর কোন পার্থিব দেহধারী জীবের পক্ষেই সম্ভব নয় । এই পৃথিবীর মানুষ, পশু প্রভৃতির পার্থিব শরীর, আর আদিত্যালোক বা সূর্যালোকের অভ্যন্তরের জীবগণের তৈজস শরীর প্রসিদ্ধ । তাই এখানকার পার্থিব শরীরধারী জীবগণের পক্ষে সূর্যালোকে যাওয়া সম্ভব নয় । জগদগুরু শ্রীম ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদ বলেছেন,—“যে যে খোলসে যে যে ভুবনে বাস করা যায়, বাসনা পরিপূরণের

উপযোগী তদনুরূপ বাহ্য আবরণও লাভ হয়।” স্বর্গ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—এই পাঁচটি উদ্ধর্লোক এবং অন্তরীক্ষের কিয়দংশে সূক্ষ্ম শরীরধারীগণ থাকেন। তদ্ব্যতীত অগ্ন্যাত্ম লোকসমূহে স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর মিশ্রিত প্রাণীগণ থাকেন। ভুলোকে স্থূল দেহধারী প্রাণীগণ বসবাস করেন। জীবাত্মা যতকাল মুক্ত না হচ্ছেন, ততকাল স্থূল-সূক্ষ্ম জড়ীয় শরীর ধারণ করে বিভিন্ন লোকে যাতায়াত করেন। পাতাল হতে ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক পর্যন্ত চতুর্দশ ভুবন মায়িক গুণময় ভূমিকার অন্তর্গত। জীবগণ মায়াবদ্ধ থাকাকালীন এই মায়িক ভূমিকাতে স্ব-কর্মফলানুযায়ী বাসনানুসারে পাপ-পুণ্যের ফল ভোগার্থে উচ্চ-নীচ যোনি ভ্রমণ করতে থাকে। পাপের ফলবশতঃ জন্ম, আর পুণ্যের ফলবশতঃ জন্ম—এক নয়। পাপ-পুণ্য-ফলের নাগরদোলায় জীব কখনও পুণ্যবলে উদ্ধর্লোক তথা সত্যলোক পর্যন্ত গমন করে, আবার কখনও পাপ-ফলে অধোলোকে, এমনকি নরকেও প্রবেশ করে। জীব যতদিন মায়া-মুক্ত না হচ্ছে, ততদিন জীবকে এইভাবে জন্ম-মরণ-চক্রে ঘুরপাক খেতে হয়। শাস্ত্র ঘোষণা করেছেন,—

“যয়া ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা ।

সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞিতা ।

সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ততে ॥”

(১৮: ৮: মধ্য ৬।১৫৫-১৫৬)

“ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তিই জীবশক্তি ; সেই জীবশক্তি মায়াবৃত্তিরূপ অবিজ্ঞানদ্বারা আবৃত হয়ে সংসারে অখিল তাপ ভোগ করে। আবার সেই ক্ষেত্রজ্ঞ-নামী শক্তি অবিজ্ঞান-কুণ্ঠাবৃত হয়ে উচ্চ-নীচ যোনিতেও অবস্থান করে।” সূর্যালোক, স্বর্গলোক প্রভৃতি উদ্ধর্লোকসমূহ ভুলোক অপেক্ষা অধিকতর উন্নত। নিষ্পাপ না হওয়া পর্যন্ত ও সেই সেই উদ্ধর্লোকে যাবার উপযুক্ত গুণাবলী না থাকা পর্যন্ত তথায় প্রবেশ করা যায় না। আর এই পার্থিব শরীরে সূর্যালোক, স্বর্গলোক প্রভৃতি স্থানে কি গমন করা সম্ভব? সূর্যালোকে সূর্যদেব, স্বর্গলোকে ইন্দ্রদেব—এইভাবে বিভিন্ন উদ্ধর্লোকে দেবতাগণ বিরাজ করেন। সূর্যের উপাসক সূর্যালোকে গমন করে, ইন্দ্রের উপাসক ইন্দ্রলোকে বা স্বর্গলোকে গমন করে, ব্রহ্মার উপাসক ব্রহ্মলোকে বা সত্যলোকে গমন করে। এইভাবে দেবতাদের উপাসকগণ পুণ্যফলস্বরূপে নিজ নিজ উপাস্তদেবের সমীপে সেই সেই উদ্ধর্লোকে গমন করে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবদ্বাক্যে জানা যায়,—

“ত্রেবিজ্ঞা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।

তে পুণ্যমাসাত্ম স্বরেন্দ্রলোকমশ্ৰুন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥”

(গীতা ৯।২০)

অর্থাৎ—“বেদত্রয়োক্ত কৰ্মপরায়ণগণ বিবিধ যজ্ঞাহুষ্ঠানদ্বারা আমাকে পূজা করে, যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরস পানপূর্বক নিষ্পাপ হয়ে স্বর্গগমন প্রার্থনা করে, তারা পুণ্যফলস্বরূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গপুরে দিব্য দেবভোগ্য ভোগসমূহ উপভোগ করে।” ভগবান্ আরও বলেছেন,—

“যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদযাজিনোহপি মাম্ ॥” (গীতা ৯২৫)

“দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, পিতৃ-পূজকগণ পিতৃলোক লাভ করেন, ভূতপূজকগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন ও আমার পূজাপরায়ণগণ আমাকেই পেয়ে থাকেন।” এক্ষণে উক্ত শ্লোকে অত্র দেব-ভক্তগণের সহিত ভগবন্তের পার্থক্য ও উভয়ের প্রাপ্তি-ফলেরও পার্থক্য প্রদর্শিত হয়েছে। দেবগণ নশ্বর, তাই তাঁদের উপাসকগণ অনিত্য দেবলোকে বিনাশ-লাভরূপ নশ্বর ফল প্রাপ্ত হন ও পরিমিত স্থখ ভোগান্তে পুনরায় এই মর্ত্যে বা ভুলোকে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ভগবান্ অবিনশ্বর বলে তাঁর ঐকান্তিক ভক্তগণ তাঁকে প্রাপ্ত হয়ে তাঁর ধামে অবস্থান করে নিত্যকাল অনন্ত স্থখ অনুভব করেন এবং পুনরায় কখনও মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন না। স্বর্গাদি লোকসমূহ স্থখ-দুঃখ মিশ্রিত। স্বর্গাদি উচ্চলোকে অশ্রুদের আক্রমণের ভয় আছে, যে কোন সময় পতনের ভয় আছে, এবং নৈমিত্তিক লয়ে স্বর্গাদি ধামও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। স্বর্গাদিতে ভোগ-স্থখের ক্ষয় হলে আবার দুঃখময় মর্ত্যে আগমন করতে হয়। পুণ্যফলে স্বর্গাদি উচ্চলোক প্রাপ্তি ও পাপের ফলে নরকাদি দুঃখ-প্রাপ্তি—উভয়ই কক্ষের নাগরদোলায় উচ্চ ও নিম্ন অবস্থান মাত্র। জীবের ভোগ-বাসনাই যাবতীয় দুঃখের কারণ।

চুরি, ভাকাতি, খুন প্রভৃতি পাপ-কার্যের দ্বারা চিত্ত অশুদ্ধ হয়,—ইহা আমরা সকলেই স্বীকার করি। বস্ত্রদান, হাসপাতাল, বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর কার্যদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় মনে করি, আবার মন্ত্রী হওয়ার বাসনা, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জ্ঞাত বিদ্যালাভ, ধনী হওয়ার বাসনা,—প্রভৃতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা চিত্তের মালিণ্য-দোষ দূর করে—এরূপ চিন্তা আমরা পোষণ করে থাকি এবং এবিধ পুণ্যজনক কার্যগুলিকে আমরা চিত্ত-শুদ্ধির উপায় বলে মনে করি। বস্তুতঃ এই পুণ্যজনক কার্যগুলিও চিত্তকে অশুদ্ধ করে। আমরা সহজে বুঝতে পারি না যে, এই তথাকথিত পুণ্যময় কার্যগুলি করার আকাঙ্ক্ষা ভগবৎসেবেতর দুর্ভাসনা ব্যতীত আর কিছুই নয়! এই সকল দুর্ভাসনারূপ অশুদ্ধি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয় না। “কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান”—ইহা কি দুর্ভাসনা নয়? কোনও দক্ষ রাজনীতিবিদ বা কোন যশস্বী কূটনীতিবিদ কি সরলতা, অকৃতদ্রোহিতা প্রভৃতি সদগুণাবলীতে

ভূষিত হতে পারেন ? তাঁদের পক্ষে শুদ্ধভক্ত হওয়া কি সম্ভব ? রাজনীতির উচ্চ-পদাধিকারী, আর ভক্তিমার্গের উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তির মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ ; এঁদের একজন পাপ-পুণ্য পথাবলম্বী কর্মী, আর অগুজন ভক্তিপথাবলম্বী পরম স্মৃতিসম্পন্ন মহাত্ম্যাবান্ শুদ্ধবৈষ্ণব । লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা—এগুলি কি চিত্তের মলিনতা নয় ? পাপ যেমন মায়ার লোহ-শৃঙ্খল, পুণ্যও তেমনই মায়ারই স্বর্ণ-শৃঙ্খল মাত্র । পাপ ও পুণ্য—উভয়ই মায়ার শৃঙ্খল । ব্রহ্মা, শিবাদি দেবতাবৃন্দ একসময়ে ভগবৎ দর্শনের আকাজক্ষায় দ্বারকায় এসে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করে বলেছিলেন,—

“শুদ্ধি নৃণাং ন তু তথৈভ্য ছরাশয়ানাং

বিদ্যাশ্রতাধ্যয়ন দান তপঃ-ক্রিয়াভিঃ ।

সত্বান্নানামৃষভ তে যশসি প্রবুদ্ধ-

সচ্চক্ৰয়া শ্রবণসমুতয়া যথা স্ম্যৎ ॥” (ভাঃ ১১।৬।৯)

অর্থাৎ—“হে জগদ্বন্দনীয়, হে পুরুষোত্তম, ভবদীয় বিমল কীর্তি শ্রবণজনিতা প্রকৃষ্টা শ্রদ্ধা দ্বারা সাধুগণের যেরূপ বিশুদ্ধি লাভ হয়, বিষয়-বাসনায়ুক্ত মনুষ্যগণের উপাসনা, বেদার্থ-শ্রবণ, অধ্যয়ন, দান এবং তপস্বাদ্বারা তাদৃশ বিশুদ্ধি লাভ হয় না ।”

মায়িক চৌদ্দভুবনের মধ্যে কোথাও প্রকৃত সুখ বা আনন্দ নেই । স্বর্গাদি উচ্চলোকসমূহও ক্ষয়িষ্ণু ও বহুবিধ দুঃখযুক্ত । কামী ব্যক্তি কখনও কাম ভোগ করে তৃপ্তি পায় না । ধনী ব্যক্তি প্রচুর ধন-দৌলত পেলেও তার আশা মেটে না । অনিত্য অপূর্ণ মায়িক বিষয়ভোগে কি কারও সুখ হতে পারে ? তাই সেই সুখও দণ্ডাস্বরূপ । অশুদ্ধ চিত্তবিশিষ্ট মনুষ্যগণ কোনদিনই মায়াতীত তুরীয় বস্তুকে পেতে পারে না । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন,—

“কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ ।

কৃষ্ণভক্তি গন্ধ নাহি যাতে থণ্ডে বিষয় রোগ ॥” (চৈঃ চঃ)

পাপ-পুণ্যফলে মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ ও জড় বিষয় ভোগ হয়ে থাকে । জড়-বিষয়-ভোগে বদ্ধজীবগণ সন্তুষ্ট হতে পারে না এবং সেজন্য দুঃখ পেয়ে থাকে । ধারা জ্ঞান-বৈরাগ্য-বলে ব্রহ্ম-নির্বাণ বা সাযুজ্য মুক্তিকামী হন, তাঁরা স্বাত্মনাশরূপ একটা ব্রহ্ম-লয় গতি পেয়ে তাহা সুখ বলে মনে করেন ; কিন্তু তাহা আত্মহত্যা করে সুখী হওয়ার মত দণ্ড । মুক্তিতে সুখের অভিব্যক্তি দেখা যায় না । শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁর রচিত “শ্রীমদঃশিক্ষা” গ্রন্থের ৪র্থ শ্লোকে লিখেছেন,—“কথা মুক্তি-ব্যাঘ্রা ন শৃণু কিল সর্বাঅগিলনীঃ”, অর্থাৎ—“মুক্তিরূপা ব্যাঘ্রীর আত্ম-সত্তা

নাশিনী-কথা নিশ্চয়ই শ্রবণ করো না ।” কৰ্ম্মাদির কোন অহুষ্ঠানদ্বারা জীব বাস্তব সুখ বা পূর্ণানন্দ লাভ করতে পারে না । পাপের দণ্ড আমরা সহজে বুঝতে পারি, কিন্তু পুণ্যের দণ্ড ও মুক্তির দণ্ড আমরা বুঝতে পারি না । কৰ্ম্ম-জ্ঞানাদিরূপ সাধন ও তার ফল স্বর্গাদিপ্রাপ্তি ও মোক্ষলাভ প্রভৃতি বাসনা বর্জন করে যিনি একমাত্র অহৈতুকী ভক্তিলাভার্থ যত্ন করেন ও শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ করেন, তিনিই শুদ্ধভক্ত ও ভগবানের রূপায় ভক্তিলাভ করতে পারেন । কৰ্ম্ম ভক্তির বিক্ষেপক ও কৰ্ম্মাঙ্গের দ্বারা চিত্ত চঞ্চল হয় । আর জ্ঞান ভক্তি-বৃত্তিকে ক্ষীণ করে । তাই কৰ্ম্ম-জ্ঞান ভক্তিপর না হলে তার সার্থকতা থাকে না । ভক্তির বিষয় ভগবান্ আর ভক্তির আশ্রয় ভক্ত ; ভক্ত ও ভগবানের রূপা ব্যতীত ভক্তিলাভের অন্য উপায় নাই । ভক্তি-সুখের নিকট স্বর্গসুখ ও মোক্ষসুখ অতি তুচ্ছ । তাই পাপ, পুণ্য, মুক্তি সুখকর না হওয়ায় তাহা ত্যাগ করে শুদ্ধভক্তি-পথ গ্রহণ করাই কর্তব্য ।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় “প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা”-গ্রন্থে আমাদের সতর্ক করে দিয়ে লিখেছেন,—

“পাপ-পুণ্যময় দেহ, সকল অনিত্য এহ,

ধন-জন সব মিছা ধন্দ ।

মরিলে যাইবে কোথা, তাহাতে না পাও ব্যথা,

তবু কার্য্য কর সদা মন্দ ॥

রাজার যে রাজ্যপাট, যেন নটুয়ার নাট,

দেখিতে দেখিতে কিছু নয় ।

হেন মায়া করে যেই, পরম ঈশ্বর সেই,

তাঁরে মন কর সদা ভয় ॥

পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপিজন,

তারে মন দূরে পরিহরি’ ।

পুণ্য সে সুখের ধাম, তার না লইও নাম,

‘পুণ্য’, ‘মুক্তি’ দুই ত্যাগ করি’ ॥

প্রেমভক্তি-সুধানিধি, তারে ডুব নিরবধি,

আর যত ক্ষার নিধিপ্রায় ।

নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,

পরতত্ত্ব করিলে উপায় ॥

কর্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত, না হ'বে তার অনুরক্ত,

শুদ্ধ ভজনেতে কর মন ।

ব্রজজনের যেই মত, তাহে হবে অনুরক্ত,

এই সে পরম তত্ত্বধন ॥

প্রার্থনা করিব সদা, শুদ্ধভাবে প্রেম কথা,

নাম-মন্ত্রে করিয়া অভেদ ।

আস্তিক করিয়া মন, ভজ রাঙ্গা শ্রীচরণ.

গ্রন্থি পাপ হবে পরিচ্ছেদ ॥” (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯৮ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণ দুঃখ করে বলছেন,—আমি ত' সবই দিতে পারি, আমি সর্বোৎকর্ষের স্বর । আমার কাছে সবই আছে, যে যা চাইবে সবই দিয়ে দেব । কোনক্ষেত্রে এমনি চাইলেই দিয়ে দেই, আবার কোন ক্ষেত্রে বিচার করে, চিন্তাতাবনা করে দেই । কেউ কিছু চাইল আর দিয়ে দিল,—এটা একজাতীয় দেওয়া, সেখানে কোন রকমের discretion নাই । আবার ভগবান্ যখন বিচার করছেন সেটাও একটা ক্ষেত্র । এই বিচারের ক্ষেত্র যখন এসেছে ভগবানের, সেখানে তিনি সেবককে মেনে নিয়েছেন, উপাসক-উপাসিকাকে মেনে নিয়েছেন, তখন বিচারের ক্ষেত্র আসছে । আর তা না হলে যা চাইল এই নাও, যাও, তার মানে সেখানে পূর্ণ শরণাগতি—full surrender, আত্মসমর্পণ আসে নাই । সেখানে ভগবান্ যা চাচ্ছেন তা দিয়ে দিচ্ছেন, কথাটা বুঝানো আছে ।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া ।

কতু ভক্তিধন না দেন, রাখেন লুকাইয়া ॥

এটা হল সাধারণ অবস্থা । আর যখন তিনি নিজে কিছু বিচার করছেন—একে কি দেওয়া যাবে, এ যা চাচ্ছে—সাধারণতঃ যে জিনিষ কেউ চায় না, সেই জিনিষ যদি কেউ চায়, তখন তিনি বিবেচনা করছেন । অর্থাৎ সেই ব্যক্তি পাস করে গেছেন পরীক্ষায় । পরীক্ষাতীর্ণ ব্যক্তির জন্ত ব্যবস্থা নিচ্ছেন,—

আমি বিজ্ঞ সেই মুখে বিষয় কেনে দিব ।

স্বচরণায়ুত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥

তাহলে ভগবান্ বিচার করছেন । যদি কেউ বঞ্চিত হতে চায়, তাহলে তাকে প্রথমমুখে তিনি দিয়ে দিচ্ছেন । ‘কেন বঞ্চিত হও চরণে’ । আবার ঐ জিনিষ দিয়ে যখন সে কিছু স্থবিধা করতে পারছে না, তার ভাল কিছু হচ্ছে না, তখন পুনরায় আবার বলে,—ঠাকুর, যে জিনিষ চেয়েছিলাম সব ভুল করে চেয়েছিলাম । ভুল হয়ে গেছে, ঠাকুর, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার যাতে আত্মকল্যাণ হয় সেয়কম চিন্তা কর তুমি । ও জিনিষের আমার দরকার নেই । এ বুদ্ধিও আসে সাধক-সাধিকার ক্ষেত্রে ।

“দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥”

আমাকে যদি জানতে হয়, বুঝতে হয় আমি কিরকম, তাহলে আমার দেওয়া বুদ্ধি নিয়ে জানতে হবে । কিন্তু আমরা আগে নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে সব ঠিক করে ফেলি । আমরা নিজেরা বেশী বুদ্ধিমান মনে করি । বোকামি এটা । ভগবানের উপরে যখন ছেড়ে দিতে পারি, নির্ভর করতে পারি, তখন ভগবান্ মনে করেন এর জন্ত আমাকে চিন্তা করতে হবে । তখন তার জন্ত special চিন্তাভাবনা করেন ভগবান্ ।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন,—দেখ যুধিষ্ঠির, তুমি ধর্মরাজ হয়ে আবার আমার বাক্যে সন্দেহ করছ ! ভগবানকে অবিশ্বাস করা আর ভগবদ্বাক্যে অবিশ্বাস করা দুইই অপরাধ । তা চলবে না ।

যশ্চাহমনুগৃহ্মামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ ।

ততোহধনং ত্যজন্ত্যশ্চ স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্ ॥

যুধিষ্ঠির মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ বলছেন,—যুধিষ্ঠির, আমাকে ত’ সকলে পরীক্ষা করে, তা আমি জানি । ক্ষেত্রবিশেষে আমাকেও পরীক্ষা দিতে হয় এবং দিয়ে থাকি । কিন্তু আমি পরীক্ষায় ফেল করার ছেলে নই, সবসময়ই পাস করে যাই । কোন কোন ক্ষেত্রে দুটো একটা ছেলে বড় গাঙগোল করে, উন্টোপান্টা করে । তখন একটু মুস্কিল হয়ে যায় । যেমন ধরুন—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভীষ্মদেব প্রিয়মথা অর্জুনকে বাণে জর্জরিত করছিলেন । এইরকম ধরণের কিছু লোক উন্টোপান্টা প্রতিজ্ঞা করে বসে । ভীষ্মদেব বললেন,—ঠাকুর, তুমি ত’ প্রতিজ্ঞা করেছ কুরুক্ষেত্র মহাসমরে অস্ত্রধারণ করবে না । এইজন্ত কোচয়ান্গিরি (সারথি) আরম্ভ করেছ তুমি । আমিও প্রতিজ্ঞা করলাম—তোমাকে আমি অস্ত্রধারণ করাবই । এই ক্ষেত্রে ভগবানের কিছু চিন্তা-ভাবনা এসে গেল ।

সে-কারণে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে ভক্তের কাছে। অভক্তের কাছে তিনি কখনও পরাজয় স্বীকার করবেন না, কিন্তু প্রেমবশত ভগবান্ ভক্তের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। ওটা তাঁর স্বভাবে আছে। সেখানে বলছেন—তোমার কথাই (প্রতিজ্ঞা) থাক, তোমার কথা সত্য হোক, আমার প্রতিজ্ঞা নষ্ট হোক। ভগবানকে কিরকম অস্থবিধার মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন। উনি অস্থধারণ করবেন না, কিন্তু ভীষ্মদেব তাঁর প্রিয়সখা অর্জুনকে এমন বাণের দ্বারা জর্জরিত করছেন দেখে কৃষ্ণ আর থাকতে পারলেন না। রথ থেকে লাফ দিয়ে পড়েছেন, রথের চাকা খুলে নিয়ে ছুটে যাচ্ছেন ভীষ্মদেবের দিকে। রথের চাকা হলে কি হবে, ওটা তখন অস্ত্র হয়ে গেল। রথের চাকা আর বলা যাবে না। কৃষ্ণের ঐ অবস্থা দেখে ভীষ্মদেব হাঁটুগেড়ে বসে গেছেন। বুঝলাম ঠাকুর, আমার প্রতিজ্ঞাটা বড় করার জন্ত তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে। তুমি ত' প্রতিজ্ঞা করেছিলে অস্থধারণ করবে না, কিন্তু এই ত' অস্থধারণ করলে। যিনি চক্রধারী মুরারি, তিনি রথান্ধপানি বলেও সম্বোধিত হয়েছেন। 'রথান্ধপানি'-শব্দ ভাগবতে আছে।

শৃণু স্তুভদ্রানি রথান্ধপাণের্জন্মানি কৰ্ম্মানি চ যানি লোকে।

গীতানি নামানি তদৰ্থকানি গায়ন্ বিলজ্জে বিচরেদসঙ্গঃ ॥

চক্রপানির বদলে রথান্ধপানি শব্দটা এসেছে। চক্রপানি ভগবানের হাতে রথের চাকা উঠে এসেছে। ভগবান্ নিজের প্রতিজ্ঞা ছেড়ে দিচ্ছেন, আচ্ছা ভীষ্ম, তোমার প্রতিজ্ঞা থাক। ভীষ্মদেব সেখানে স্তব করছেন,—

সনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমদিকর্তুমবপ্লুতরথস্থঃ।

ধৃতরথচরণোহভয়াচন্দগুহীরিরিব হস্তমিব গতান্তোরীয়ঃ ॥

আমার প্রতিজ্ঞা সত্য করবার জন্ত তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ছেড়ে দিলে। এটা তোমার বিশেষ মহিমা, ভীষণ উদারতা। এ উদারতার তুলনা হয় না।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন,—দেখ যুধিষ্ঠির, আমার সব ক্ষমতা আছে, আমি সর্বশক্তিমান্, আমি ভক্তের দুঃখ মোচন করি। তাহলে আবার সন্দেহ কেন? যদি সব মাহুষের কাছে আমাকে এরকম পরীক্ষা দিতে হয় তাহলে ত' আমার সব শেষ! আমিও আমার ভক্তকে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করি। যে সংসারের জিনিস চায় না, আমার ভক্তি প্রার্থনা করে অর্থাৎ আমাকেই চায় সর্বদাকুলো, আমি তাকে পরীক্ষা করি। পরীক্ষার সময় তোমরা আমার ভক্তের কিছু কষ্ট দেখতে পাও। সেটা কেবলমাত্র পরীক্ষার সময়। পরীক্ষা যখন শেষ হয়ে যায় তখন আর তার কোন কষ্ট নেই। সেইকথা ওখানে বলছেন,—“যশ্চাহমহুগৃহ্মি হরিষ্যে তদ্বনং শনৈঃ।” আমি আমার ভক্তকে যখন পরীক্ষা করি তখন আমার প্রথম

পরীক্ষা হল—আমি তাকে যে বিষয়-সম্পত্তি, ধন-রত্ন দিয়েছিলাম, সেগুলো টানতে থাকি। এতে কি তুমি নিরস্ত হও?—না, ধনের পরে জনও আছে। আমি আত্মীয়-স্বজনও টানতে থাকি অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনকেও মেরে ফেলি। ধন গেল, জন গেল, আমি কি করে খাব, পরব? বাঁচব কি করে? মহাহুঁচিষ্ঠা দুর্ভাবনা তখন। “ততোহধনং ত্যজন্ত্যশ্চ স্বজনো দুঃখহুঃখিতম্॥” খাওয়ার টাকা-পয়সা নেই, কি করে খাব, কি করে বাঁচব? আত্মীয়-স্বজন নেই, থাকবার জায়গা নেই, কি করি আমি! ভক্ত তখন কান্নাকাটি আরম্ভ করে। তখন হয়ত’ বলেই ফেলে—‘এ জগতে কেউ ষার নাই, মরণ তুমি তার ভাই।’ কেউ যখন নেই তখন এ জগতে বেঁচে থেকে আর কি লাভ! এমতাবস্থায় ভগবান্ আবার ব্যবস্থা দিয়েছেন। কি ব্যবস্থা?—সাধুদল। যখন গুরুদেব পাগলের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন একজন ভক্তের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলেন। কি তুমি কাঁদছ কেন? কি হয়েছে তোমার? না, কিছু হয়নি, কিন্তু আমার পয়সা-কড়ি নেই, আত্মীয়-স্বজন নেই, বেঁচে থেকে কি হবে! এর থেকে মরাই ভাল। কেন তুমি মরবে? মরার কি আছে? জগন্নাথদেবের নাম শুনেছ?—হ্যাঁ, শুনেছি। জগন্নাথদেব আমাদের খাওয়ান পরান। মনে পড়ছে কি তোমার? একজন পদকর্তা লিখেছেন, —

তুংহ জগন্নাথ জগতে কহাওসি, জগবাহির নহ মুঞি ছার।

তিনি ত’ আমাদের সব। পালন-পোষণের সব দায়িত্ব তাঁর আছে। একবার তাঁর স্মরণ কর। তাঁকে স্মরণ করলে তোমার সব দুঃখের অবসান ঘটবে। খবরদার Suicide—আত্মহত্যা করো না। আত্মহত্যা ভীষণ খারাপ কথা, এতে আরও দ্বিগুণ পাপ, অশ্রায় হয়। ভক্ত তাকে আশ্বস্ত করছে। ভক্তের উপদেশ পেয়ে, সাধু-গুরুর উপদেশ পেয়ে পরীক্ষা শেষ। যখনই ভগবানের পরে নির্ভর করতে পারলেন, তখন পরীক্ষা শেষ। তখন ভগবান্ আগে যা ছিল ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, তার শতগুণ দিয়ে দিচ্ছেন। নাও, সব দিয়ে দিলাম। যুধিষ্ঠির, এই পরীক্ষার সময় আমার ভক্তের কিছু কষ্ট দেখতে পাও তোমরা। এটা বুঝতে পার না কেন? ভক্ত যদি আমাকে পরীক্ষা করেন, তবে আমিও ভক্তকে পরীক্ষা করি।

আমি ভক্তের কাছে পরীক্ষা দেই সবসময়, কোন আপত্তি করি না, কিন্তু তোমরা আপত্তি করছ কেন? তোমরাও পরীক্ষা দাও আমার কাছে। কথাটী ত’ এই। সব জিনিষটার একটা শিক্ষা আছে। আমরা ভগবানের কাছে পরীক্ষা দিতে চাচ্ছি না, ভগবানেরই পরীক্ষা নিতে চাচ্ছি। আমি চেষ্টা করছি না, সামান্য চেষ্টা করে বলছি,—বাবা! খেটে খেটে মরে গেলাম, কত কি করলাম। আসলে কিছুই হয় নাই, সামান্য হয়েছে।

শ্রীবাস-আদ্বিনায় নাম-সঙ্কীৰ্তন হচ্ছিল। মহাপ্রভু রয়েছেন, সকল পার্শ্বদগণকে নিয়ে কীর্তন হচ্ছে। এমন সময় মুকুন্দ নামে একজন ভাল কীর্তনীয়া কে কীর্তন-মণ্ডলী থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। বাইরে বারান্দায় বসে আছেন তিনি। কিন্তু ভগবান্ ত' ভক্তবৎসল। কীর্তন চলতে থাকলে কি হবে, তাঁর মনটা খুঁত খুঁত করছে। বাচ্চা যদি কান্নাকাটি করে, তাহলে Guardian কি থাকতে পারেন? অসম্ভব কথা। কীর্তন চলতে চলতে মহাপ্রভু দরজার বাইরে গিয়েছেন, দেখি কি করেছে মুকুন্দ। তিনি দেখেছেন—মুকুন্দ বাইরে উদ্দণ্ড নৃত্য করতে করতে হরিনাম করেছে। মহাপ্রভু তখন জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমার এত আনন্দ কিসের? তোমাকে ত' কীর্তনমণ্ডলী থেকে বের করে দিয়েছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীমন্নহাপ্রভুর প্রেমধর্ম-প্রচার

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১৮ পৃষ্ঠার পর]

Heathrow বিমানবন্দর হইতে ভক্তগণ শ্রীল মহারাজকে Radlett এ আনয়ন করেন। তথায় ১৫।৫।২৬ ও ১৬।৫।২৬ দুইদিন হরিকথা পরিবেশন করেন। ১৭।৫।২৬ তারিখে Radlettস্থিত ইস্কনের প্রচারকেন্দ্র Bhakti Vedanta Manor দর্শন ও হরিকথা পরিবেশন। শ্রীল মহারাজের পাশ্চাত্য-দেশে শ্রীগৌর-বাণী-প্রচারে ঈর্ষান্বিত হইয়া ইস্কন্-কর্তৃপক্ষগণ কোনরূপ সহযোগিতার পরিবর্তে বিরোধিতাই করেন।

শ্রীল মহারাজ যথাক্রমে ১৮।৫.২৬ তারিখে Aldenham War Memorial Hall, ১৯।৫।২৬ Cantbury house, ২০।৫।২৬ জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত লণ্ডনস্থিত শ্রীবাসুদেব গোড়ীয় মঠ, ২১।৫।২৬ পুনরায় Aldenham War Memorial Hall, ২২।৫।২৬ শ্রীনাম-দীক্ষা প্রদান, ২৩।৫।২৬ Reading, ২৪।৫.২৬ ও ২৫।৫।২৬ Bath, ২৬।৫।২৬ Glastonbury Assembly Hall, ২৭।৫।২৬ ও ২৮।৫।২৬ Birmingham City, ২৯।৫।২৬ হইতে ৩১।৫।২৬ পর্যন্ত Leicesterস্থিত শ্রীসনাতন মন্দির ও ১।৬।২৬ Rushey Mead School, ২।৬।২৬ লণ্ডনস্থিত Croydon, ৩।৬।২৬ Moor side road প্রভৃতি স্থানে বিপুলভাবে শ্রীহরিকথা প্রচার করেন। ৪।৬।২৬ তারিখে হল্যান্ডের Amsterdam বিমানবন্দর হইতে রওনা হইয়া সন্ধ্যায় Utrecht এ বক্তৃতা প্রদান করেন। ৫।৬।২৬ তারিখে আমেরিকার Houston মহানগরীর বিমানবন্দরে

অবতরণ করেন এবং তথাকার ভক্তগণ শ্রীল মহারাজকে বিশেষ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন ।

ইংল্যাণ্ড-এর Radlett এ প্রচারকালে ইক্ষনের কতিপয় বরিষ্ঠ ভক্ত শ্রীল মহারাজকে প্রশ্ন করেন,—“আপনি আমাদের গুরুদেব শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের মিত্র, সহযোগী এবং একই গুরুর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু আপনাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত ও বিচারের এত পার্থক্য কেন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ?”

তদন্তরে শ্রীল মহারাজ বলেন,—আমরা দুইজনেই একই শ্রীব্রহ্ম-মাদ্ব-গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে দীক্ষিত ও শিক্ষিত । দুইজনেই একই গুরুদেবের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি এবং একত্রে অতিবাহিত করিয়াছি অনেক বৎসর । সিদ্ধান্ত-বিচারে আমাদের কোনরূপ পার্থক্য থাকিতে পারে না । তবে বিশেষ কোন স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া এইরূপ অপপ্রচার করা হইতেছে । আমাদের মধ্যে কোথায় সিদ্ধান্তবিরোধ, তাহা আপনারা নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ।

“শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে জীবতত্ত্ব আলোচনা-প্রসঙ্গে আমাদের গুরুদেব শ্রীল স্বামী মহারাজ বলিয়াছেন,—“জীব গোলোক হইতে পতিত হইয়া এই জগতে আসিয়াছেন । কিন্তু আপনি এই সিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধিতা করেন কেন ?”

শ্রীল মহারাজ তদন্তরে বলেন,—আমার নিজস্ব স্বতন্ত্র কোন বিচার নাই । অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ঐ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিচারধারা, গোড়ীয়-গুরু-পরম্পরা, শ্রীল জীব গোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীল ভল্লিবিনোদ ঠাকুরের জৈবধর্ম প্রভৃতি গ্রন্থের প্রমাণের ভিত্তিতে দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি—বন্ধজীব বৈকুণ্ঠ, গোলোক বা বৃন্দাবন হইতে পতিত হইয়া মায়িক জগতে আসে নাই । শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ কখনই এরূপ সিদ্ধিতে পারেন না । অত্যন্ত সাধারণ এবং অপরিপক্কের পক্ষে এইরূপ প্রতীত হইতে পারে । আমি গোড়ীয়-গুরুবর্গের বিচারধারা ও তত্ত্বসিদ্ধান্তদ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি । আপনারা স্বয়ংই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে আমাদের মধ্যে বিচারের কোন পার্থক্য নাই ।

জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

তত্কা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহজ্জুর্ন ॥ (গী: ৪:৯)

হে অজ্জুর্ন ! আমার অপ্রাকৃত জন্ম কৰ্ম যিনি তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় এই মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন না এবং আমাকেই প্রাপ্ত হন ।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।

নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ (গী: ৮।১৫)

আমার লীলার পরিকরত্ব প্রাপ্ত মহাত্মা ভক্তগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় দুঃখের নিলয়স্বরূপ অনিত্য জন্ম কখনও গ্রহণ করেন না ।

আব্রহ্মভুবনালোকাঃ পুনরাবর্তিনোহজ্জুন ।

মামুপেত্য তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিত্ততে ॥ (গী: ৮।১৬)

ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া অধস্তন সমস্ত লোকই অনিত্য । সেই সেই লোকগত জীবের পুনর্জন্ম সম্ভব । কিন্তু হে কোন্তেয় ! আমাকে প্রাপ্ত হইলে পুনরায় জন্ম হয় না ।

তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্বতীনাং স্ততেক্ষণম্ ।

ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোহজ্ঞানসত্ত্ববঃ ॥ (ভা: ১০।৬।৪০)

যাঁহারা ব্রজের গোপগোপীগণকে অহুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিজ সখা, পুত্র এবং প্রিয়তম জানিয়া প্রেমভক্তির দ্বারা ব্রজধাম প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহারা জন্ম-মৃত্যুর প্রভাবে আর কখনও পড়েন না ।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জৈববশ্মে স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন,—গোলোক, বৃন্দাবন এবং পরব্যোমস্থ বলদেব ও সহস্রধন-প্রবর্তিত নিত্যপার্বদ জীবসকল অনন্ত, তাঁহারা উপাস্ত-সেবায় রসিক, সর্বদা স্বরূপার্থ-বিশিষ্ট; উপাস্ত-সুখাশ্রয়ী; উপাস্তের প্রতি উন্মুখ জীব চিহ্নতির বল লাভ করিয়া সর্বদা বলবান; মায়া সহিত তাঁহাদের কোন সংঘর্ষ নাই; মায়াশক্তি বলিয়া কোন শক্তি আছে, তাহাও তাঁহারা অবগত নন । তাঁহারা নিত্যমুক্ত, প্রেমই তাঁহাদের জীবন; শোক, মরণ ও ভয় যে কি বস্তু তাহা তাঁহারা জানেন না । ভগবদ্ধামপ্রাপ্ত জীবের কখনও পতনের সম্ভাবনা নাই ।

আমি উপরিউক্ত শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা আদি শাস্ত্রের কিছু অকাট্য প্রমাণদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করিলাম যে,—গোলোক, বৈকুণ্ঠ হইতে জীবের পতন অসম্ভব । যদি এইস্থান হইতে জীবের পতন স্বীকার করা হয় তাহা হইলে বেদ, উপনিষদাদি শাস্ত্র-বচন অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় । কিন্তু শাস্ত্রসমূহ অভ্রান্ত এবং একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ।

লক্ষ লক্ষ জন্ম আরাধনাপূর্বক দুর্লভতম কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াও যদি জীব পতিত হইয়া যায়, তাহা হইলে গোলোক, বৃন্দাবন ধামের ও শ্রীকৃষ্ণসেবার নিত্যত্ব কোথায় ?

দ্বিতীয়তঃ—যদি কেহ জয়-বিজয়, চিত্রকেতু মহারাজ প্রভৃতি মুক্ত পুরুষের

উদাহরণ দিয়া গোলোক-বৃন্দাবন হইতে জীবের পতন সিদ্ধ করেন, তদন্তরে শ্রী জীব গোস্বামী, শ্রী চক্রবর্তী ঠাকুর প্রভৃতি সিদ্ধান্তবিদ আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—জয়-বিজয়, চিত্রকেতু মহারাজ আদি মুক্তজীবগণ ভগবৎপরিকর ছিলেন। তাঁহারা নিজ আরাধাদেবের মনোহীভীষ্ট পূর্ণ করিবার জন্ত এবং মায়াবদ্ধ জীবকে শিক্ষা প্রদান করিবার জন্ত একস্বরূপে বৈকুণ্ঠে বিদ্যমান থাকিয়াও ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বদ্ধজীবের গায় অভিনয় মাত্র করিয়াছেন। তাঁদের ভূতলে অবতরণ ভগবানের প্রেমবিজুস্তিত স্বেচ্ছা মাত্র। তাঁহাদিগকে বদ্ধজীব মনে করা অপরাধজনক।

এঁদের কথা দূরে থাকুক, দেবর্ষি নারদের মোহ, জন্ম, সাধন-ভজন এবং ভরত মহারাজের হরিণের প্রতি মোহ প্রভৃতি সমস্তই বদ্ধজীবের শিক্ষার জন্ত। ইহাদের পতন অসম্ভব।

এখন আমি পূজ্যপাদ শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত স্বামী মহারাজের লেখনী হইতে কিছু উদাহরণ দিতেছি, যেখানে তিনি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন জীবের বৈকুণ্ঠাদি স্থান হইতে কখনও পতন হয় নাই।—

“From Vedic Scriptures it is understood that sometimes even Brahma and Indra fall down, but a devotee in the transcendental abode of the Lord never falls.”

(Smd. Bhagbatam 3-15-48 purport)

বেদাদি শাস্ত্রে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে—কখনও কখনও ব্রহ্ম এবং ইন্দ্রের পতন হইয়া থাকে, কিন্তু ভগবানের নিত্যধামে অবস্থানকারী ভক্তের কখনও পতন হইতে পারে না।

“The conclusion is that no one falls from the spiritual world or Vaikuntha, for it is the eternal abode ”

(Smd. Bhagbatam 3-16-48 purport)

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে—চিন্ময় জগৎ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক হইতে কাহারও পতন হয় না, কেননা ইহা শাস্ত।

যদি স্বামীজীর গ্রন্থে কোথাও এইরূপ বিচার পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা কেবলমাত্র প্রচারের জন্ত, বিশেষ করিয়া বিদেশে খ্রীষ্টানধর্মাবলম্বীদের সনাতনধর্মে আকর্ষণ করিবার জন্ত বলিয়াছেন। খ্রীষ্টানধর্মে ‘paradise lost’—আমরা স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছি, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সমধর্মীকে সহজেই আকর্ষণ করা যায়। এজন্যই স্বামীজী এইরূপ বলিয়াছিলেন। কোন বিষয়ে

সিদ্ধান্তের জ্ঞান পূর্বাণর বিচার করিয়াই সামঞ্জস্য করিতে হয়। শ্রীল জীব গোস্বামী যেরূপ লিখিয়াছেন,—“স্বচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া। যৎ পূর্বাণর সম্বন্ধং তৎ পূর্বমপরং পরম্॥” এইভাবেই সিদ্ধান্ত-বিষয়ে সামঞ্জস্য করিতে হয়।

অতঃপর ৬/৬/২৬ ও ৭/৬/২৬ **Houston** এ, ৮/৬/২৬ **Houston City** স্থিত স্থানীয় দুইটি রেডিওতে হিন্দী ও ইংরাজীতে **interview**, ৯/৬/২৬ স্থানীয় হিন্দু-মন্দিরে ও **Palacios Court** এ, ১০/৬/২৬ **Lofty Mountain Trial** এ, ১১/৬/২৬ **Merine Drive**, ১২/৬/২৬ হইতে ১৪/৬/২৬ **Houston** স্থিত প্রসিদ্ধ মহাত্মা গান্ধী হলে, ১৮/৬/২৬ দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলস্-এ আগমন ও ১৯/৬/২৬ হইতে ২৩/৬/২৬ পর্য্যন্ত ‘রাধারমণ বৈদিক মন্দির’ ও মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে, ২৩/৬/২৬ দূরদর্শনে বক্তৃতা, ২৪/৬/২৬ **Bakers Field** এ, ২৫/৬/২৬ **Badger** এ, ২৬/৬/২৬—২৯/৬/২৬ **Badger** স্থিত শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই মন্দিরে, ৩০/৬/২৬ **Barkley**, ১/৭/২৬ হইতে ৫/৭/২৬ **Pleasant Hill** এ, ৬/৭/২৬, ৭/৭/২৬ **Eugen** এ, ৮/৭/২৬ কানাডার **Vancouver** মহানগরীতে আগমন ও ১২/৭/২৬ পর্য্যন্ত **Vancouver** এর বিভিন্নস্থানে, ১৩/৭/২৬ আমেরিকার নিউইয়র্ক আগমন ও ১৪/৭/২৬ নিউইয়র্কের আত্মানন্দ যোগ সংস্থায়, ১৫/৭/২৬ ২৬ নেক্‌ও এভিনিউ ও **Toms Kin Square Park** এ, (যেখানে পূজ্যপাদ স্বামী মহারাজ প্রথম কীর্ত্তন করিতেন), ১৬/৭/২৬ **New Jercey** স্থিত ইস্কনের **Towaco** মন্দিরে, ১৭/৭/২৬—১৯/৭/২৬ **New Jercey**র বিভিন্ন স্থানে শ্রীল মহারাজ কীর্ত্তন ও হরিকথা পরিবেশন করেন।

বলাবাহুল্য, প্রত্যেক স্থানে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ শ্রীল মহারাজের হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁহার পুনরাগমনের জ্ঞাত বিশেষ আবেদন জানান।

২০/৭/২৬ তারিখে শ্রীল মহারাজ পুনরায় হল্যাণ্ডে এবং ২২/৭/২৬ হল্যাণ্ড হইতে মুম্বই ও দিল্লী হইয়া ২৭/৭/২৬ মথুরায় শ্রীকেশবজী গোড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার পাশ্চাত্য-প্রচারাভিযান-শেষে ২৩/৭/২৬ মুম্বইতে এবং ২৬/৭/২৬ দিল্লী মহানগরীর মানসরোবর গার্ডেনে সনাতন ধর্ম মন্দিরে ও ২৮/৭/২৬ মথুরা শহরে নাগরিক সম্বন্ধনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল মহারাজ পাশ্চাত্যে শ্রীমন্নহাপ্রভুর-প্রেমধর্ম প্রচার করিতে যাওয়ায় পাশ্চাত্যবাসী হরিভক্তনোমুখ ব্যক্তিগণ শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির ছত্রছায়ায় আশিবার স্বর্ণ স্মরণ পাইয়াছেন।

— শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাস ব্রজচারী, বিজ্ঞানকার

॥ শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(রেজিষ্টার্ড)

ফোন—৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

২৯শে পৌষ, ১৪০৩ ; ১৪।১।২৭

“ভার্যায়ণং ননঙ্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জন্মমুদীরয়েৎ ॥”

ব্যাসকুল-শ্রবণসজ্জারাদ্য-বেদান্ত-বিশিষ্টে -

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উত্তোগে নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৫১০ শ্রীগৌরান্দ ; ১৩ই ফাল্গুন, ১৪০৩ (ইং ২৫।২।২৭) মঙ্গলবার শ্রী সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্বদপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তস্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ-আবির্ভাব মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তস্তিসিকান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ-প্রকটবাসর মাঘী-কৃষ্ণা পঞ্চমী ৫ই গোবিন্দ, ১৫ই ফাল্গুন (ইং ২৭।২।২৭) বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদিপঞ্চক, আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক ও তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুভতত্ত্বানুষ্ঠানে সবাক্ষব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবানুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সত্যব্রন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—১৩ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার—ব্রাহ্মযজ্ঞার্থে যথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরুমহিমাশ্লোক বন্দনাদি, মহাজনগীতি-কীর্তন, পূর্বাহ্ন শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলিপ্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা, কীর্তন এবং শ্রীগুরুমহিমাশ্লোক ভক্ত্যঞ্জলিরূপ-প্রবন্ধাদি পাঠ ও শ্রীশ্রীল গুরুশাসনগণের অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্ক বক্তৃতা।

১৪ই ফাল্গুন, বুধবার—পূর্বাহ্নে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। এবং সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বৈষ্ণবীয় দয়া ও অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা।

১৫ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—পূর্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি-প্রদান; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্য চরিত্র সম্পর্কে ভাষণ।

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।
অধোক্ক্ষে অহৈতুকী ভক্তি বিল্লশূণ্য ॥

অন্য ধর্ম স্মৃষ্টরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৮শ বর্ষ	}	২০ মাঘ, অনির্কক, ৫১০ শ্রীগোরাঙ্গ ২৯ মাঘ, বুধবার, ১৪০৩, ইং ১২/২/৯৭	}	১২শ সংখ্যা
----------	---	--	---	------------

সান্নুবাদং

শ্রী শ্রী জগন্মোহনাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্তি-ঠাকুর-বিরচিতম্]

গুঞ্জাবলী-বেষ্টিত-চিত্রপুষ্প,-চূড়া-বলন-মঞ্জুল-নব্য-পিচ্ছম্ ।

গোরোচনা-চাকু-তমালপত্রং, বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ১ ॥

ঋতাহার মন্তকে গুঞ্জাসমূহে বেষ্টিত বিচিত্র কুসুমনির্মিত চূড়া সমন্বিত মনোহর
ও অভিনব ময়ূর-পুচ্ছসকল মিলিত হইয়াছে এবং ললাটাদি সর্বদিকে গোরোচনা-
দ্বারা মনোহর তিলক শোভা পাইতেছে, এতাদৃশ ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে
জামি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

ক্র-বল্লনোন্মাদিত-গোপনারী,-কটাক্ষ-বাণাবলি-বিক্রনেত্রম্ ।

নাসাগ্র-রাজন্-মণি-চারু-মুক্তং, বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ২ ॥

যাঁহার স্বীয় ক্রমর্জনদ্বারা উন্মাদিত গোপাঙ্গনাগণের কটাক্ষবাণসমূহে নেত্রদ্বয়বিক্র এবং নাসিকাগ্রভাগে মণিময় মনোহর মুক্তা শোভা পাইতেছে, এতাদৃশ ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি প্রণাম করি ॥ ২ ॥

আলোল-বক্রালক-কান্তি-চুম্বি,-গণ্ডস্থল-প্রোন্নত-চারু-হাস্যম্ ।

বাম-প্রগণ্ডোচ্চল-কুণ্ডলান্তং, বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ৩ ॥

যাঁহার গণ্ডস্থল কুটিল অলকাবলীর ছটায় চুম্বিত, বদনে মৃহমনোহর-হাস্য ও বামবাহুমূলে কুণ্ডলের অন্তভাগ আন্দোলিত হইতেছে, সেই ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

বন্ধুক-বিশ্ব-হ্যুতি-নিন্দি-কুঞ্চং,-প্রাস্তাধর-ভ্রাজিত বেণু-বক্ত্রম্ ।

কিঞ্চিত্তিরশ্চীন-শিরোধিভাতং, বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ৪ ॥

যাঁহার অধর ও ওষ্ঠ, বন্ধুক পুষ্প ও বিশ্বের প্রত্যেক গুহ্যত্ব করিয়াছে, সেই সঙ্কুচিত অধর প্রান্তে শোভিত বেণুযুক্ত বদন এবং মস্তকে ঈষদক্র চূড়া শোভা পাইতেছে, সেই ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

অকুণ্ঠ-রেখাত্রয়-রাজি-কণ্ঠ,-খেলৎ-স্বরালি-শ্রুতিরাগ-রাজিম্ ।

বক্ষঃ-সুরৎ-কৌস্তভমুন্নতাংসং, বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ৫ ॥

যাঁহার কণ্ঠের উপরিভাগে অবিচ্ছিন্নভাবে রেখাত্রয় শোভা পাইতেছে এবং সেই কণ্ঠমধ্যে “উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত” এই ত্রিবিধ স্বর, শ্রুতি (ষড়্জাদি) ও রাগ (স্বরপ্রকারবিশেষ) বিরাজ করিতেছে, বক্ষঃস্থলে কৌস্তভমণি শোভমান ও স্কন্দদ্বয় উন্নত, সেই ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি অভিবাদন করি ॥ ৫ ॥

আজানু-রাজদলয়াজদাঞ্চি,-স্মারগলাকার-সুবৃদ্ধ-বাহুম্ ।

অনর্ঘ-মুক্তা-মণি-পুষ্প-মালাং, বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ৬ ॥

যাঁহার সুন্দর ভুজযুগল বলয় ও অঙ্গদযুক্ত এবং আজানুলব্ধিকন্দর্পাগলাকার, এবং যিনি অমূল্য মণি, মুক্তা ও পুষ্পমালাধারী, সেই ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি প্রণতি করি ॥ ৬ ॥

শ্বাসৈজদশ্বখ-দলাভ-তুন্দ,-মধ্যস্থ-রোমাবলি-রম্য-রেখম্ ।

পীতাম্বরং মঞ্জুল-কিঙ্কণীকং, বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ৭ ॥

যাঁহার অশ্বখ পত্রাকার উদরের মধ্যবর্তী রোমাবলী নিশ্বাস বায়ুদ্বারা কম্পিত হইতেছে এবং উদরে সেই রোমাবলীর অপূর্ব রেখা শোভা পাইতেছে, পরিধানে

পীতবসন ও কটিদেশে মনোহর কিঙ্কিণী ঢুলিতেছে, সেই ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

ব্যত্যস্ত-পাদং মণি-নূপুরাঢ্যং, শ্যামং ত্রিভঙ্গং সুর-শাখি-মূলে ।

শ্রীরাধয়া সার্কিমুদার-লীলং, বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ৮ ॥

যিনি মণিময় নূপুর সম্বলিত চরণযুগল বিপরীতভাবে অর্থাৎ বামপদোপ ॥ দক্ষিণপদ সংস্থাপনপূর্বক শ্রীরাধাসহ কল্পবৃক্ষ-মূলে অবস্থান করিতেছেন, সেই উদার-লীলাময় ও শ্যামবর্ণ-বিশিষ্ট ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

শ্রীমজ্জগন্মোহন-দেবমেতৎ,-পত্যাষ্টকেন স্মরতো জনস্য ।

প্রেমা ভবেদ্ যেন তদাভ্যু-সাক্ষাৎ,-সেবামৃতে নৈব নিমজ্জনং স্যাৎ ॥৯॥

যিনি এই পত্যাষ্টকদ্বারা শ্রীজগন্মোহনদেবের স্মরণ করেন, তাঁহার প্রেমভক্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ তিনি প্রেমলাভ করিয়া জগন্মোহনদেবের চরণযুগলের সাক্ষাৎ সেবামৃতে নিমজ্জিত হয়েন ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪০৭ পৃষ্ঠার পর]

৯। একমাত্র ভাগবত ধর্ম নিত্য কেন ?

“ভাগবত-প্রবৃত্তিক্রমে শুদ্ধ সর্বিশেষ ভগবৎ-স্বরূপাত্মগত ভক্তিতত্ত্বে সমস্ত ভাগ্যবান্ জীবের রুচি হয় । ইহারা যে ভগবদারাধনাদি করেন, সে-সকল ক্রিয় কর্ম বা জ্ঞানার্জনয়—শুদ্ধভক্তির অঙ্গ । এই মতের বৈষ্ণবধর্মই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম শ্রীমদ্ভাগবত-বচন (১২।১১) যথা—

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ঞজ্ঞানমদ্বয়ম্ ।

ব্রহ্মৈতি পরমাশ্রুতি ভগবান্নিতি শব্দ্যতে ॥

দেখুন, ব্রহ্ম-পরমাশ্রুতি ভগবত্তত্ত্বই সমস্ত তত্ত্বের চরম । ভগবত্তত্ত্বই বিষ্ণুতত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বের অঙ্গগত জীবই শুদ্ধজীব ; তাঁহার শুদ্ধপ্রবৃত্তির নামই ‘ভক্তি’ । হরিভক্তিই শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম, নিত্যধর্ম, জৈবধর্ম, ভাগবতধর্ম, পরমার্থধর্ম, পরধর্ম বলিয়া বিখ্যাত । ব্রাহ্মপ্রবৃত্তি ও পরমাশ্রু-প্রবৃত্তি হইতে যত প্রকার ধর্ম হইয়াছে, সে-সমস্তই নৈমিত্তিক । নির্বিশেষ ব্রহ্মাত্মসন্ধানে নিমিত্ত আছে, অতএব নৈমিত্তিক অর্থাৎ ‘নিত্য’ নয় । জড়বিশেষে আবদ্ধ হইয়া যে জীব বন্ধন-মোচনের

অন্ত ব্যতিব্যস্ত, সে জড়-বন্ধনকে ‘নিমিত্ত’ করিয়া নির্বিশেষ-গতির অহুসন্ধানরূপ নৈমিত্তিক ধর্মকে আশ্রয় করে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম ‘নিত্য’ নয়। যে জীব সমাধি-সুখ-বাজায় পরমাত্মধর্ম অবলম্বন করেন, তিনিও জড় স্মৃদ্ধভূক্তিকে নিমিত্ত করিয়া নৈমিত্তিক-ধর্মকে অবলম্বন করিয়াছেন। অতএব পরমাত্মধর্মও নিত্য নয়। কেবল বিশুদ্ধ ভাগবতধর্মই নিত্য।” — জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

১০। ধর্ম কেন বহুবিধ হইল ?

“ধর্ম কেন বহুবিধ হইল ? ইহার সত্ত্বতর এই যে, শুদ্ধ-অবস্থায় জীবের ধর্ম একই প্রকার। জড়বদ্ধ হইয়া জীবের ধর্ম আদৌ দুই প্রকার হইয়াছে অর্থাৎ সোপাধিক ও নিরূপাধিক। নিরূপাধিক ধর্ম কখনও দেশভেদে পৃথক হয় না। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে জড়োপাধিক প্রাপ্ত জীবের প্রকৃতির পার্থক্যক্রমে সোপাধিক-ধর্ম দেশ-বিদেশ ও কাল-ভেদে সহজেই পৃথক হইয়া পড়ে। উক্ত সোপাধিক ধর্মই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও নাম প্রাপ্ত হয়। জীব যত উপাধি হইতে পরিকৃত হন, ততই তাঁহার ধর্ম নিরূপাধিক হয়। নিরূপাধিক-অবস্থায় সকল জীবেরই এক নিত্যধর্ম।” — শ্রীমঃ শিঃ ১ম পঃ

১১। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অস্তিত্ব কেন যুক্তির দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে না ? আত্ম-প্রত্যক্ষের দ্বারা কি প্রতীত হয় ?

“সত্যের লোপ নাই, এজন্ত তাহারা লুপ্তপ্রায় থাকে। আত্মার নিত্যত্ব ও ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রভৃতি সত্যসকল যুক্তি দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে না। কেননা, যুক্তির প্রপঞ্চাতীত বিষয়ে গতি নাই। আত্ম-প্রত্যক্ষই ঐ সকল সত্যের একমাত্র স্থাপক। ঐ আত্মপ্রত্যক্ষ বা সহজ-সমাধি দ্বারা জীবের নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ ও নিত্যক্রিয়া কৃষ্ণদাস্ত্র সততই সাধুদিগের প্রতীত হয়।” — কৃঃ সং ৯।৫

১২। আত্মার ধর্ম কি ?

“It would indeed be the height of error to conceive that all the opposite qualities of matter, space and time are in spirit. Hence we must look to some other attributes for spirit. Love and Wisdom are certainly spiritual attributes which are not opposite qualities of matter. Man must be wise and love God. This is the religion of the soul.”

—The Temple of Jagannath at Puri.

১৩। আত্মধর্ম কি অসংসান্দ্রদায়িক ধর্ম নহে ?

“We do not profess to belong to any of the sects of

religion under the sun, because we believe the Absolute Faith, founded upon instinctive love of God natural in human souls.”
—The Temple of Jagannath at Puri.

১৪। আত্মধর্মের চরম অবস্থা যুক্তিবাদী বা সাধারণ আন্তিকগণের ধারণার অতীত কেন ?

“Bhakti (love) is thus perceived in the very first development of the man in the shape of heart, then in the shape of mind, then in the shape of soul and lastly in the shape of will. These shapes do not destroy each other but beautifully harmonise themselves into a pure construction of what we call the spiritual man or the Ekanta of Vaishnava literature. But there is another sublimer truth behind this fact which is revealed to a few that are prepared for it. We mean the spiritual conversion of the soul into a woman. It is in that sublime and lofty state in which the soul can taste the sweets of an indissoluble marriage with God of Love. The fifth or the highest of Vaishnava development is this, which we call Madhura Rasa, and on this alone the most beautiful portion of the Vaishnava Literature so ably expatiates. This phase of human life, mysterious as it is, is not attainable by all, nay, we should say, by any but God's own. It is so very beyond the reach of common men that the rationalists and even the ordinary theists cannot understand it, nay, they go so far as to sneer a tit as somewhat unnatural.”

—“To Love God” (Journal of Tajpur 25th Aug. 1871

১৫। প্রেম আত্মার ধর্ম ও সার্বজনীন ধর্ম কিরূপে ?

“The essence of the soul is wisdom and its action is to love Absolute. The absolute condition of man is his absolute relation to the Deity in pure love. Love then alone is the religion of the soul and consequently of the whole man.”

—“To Love God” (Journal of Tajpur 25th Aug. 1871)

১৬। সাধারণ ভক্তিবর্ষ কি ?

“You must love God with all thy strength or will. You are wrong in concluding that you will lose your active existence, —you will get it the more. Work for God and work to God, proceeding from no interested views but from a holy free will (which is above the strength of man) and identifying itself with pure love, will fully engross your attention. This description is of Bhakti in general.”

—“To Love God” (Journal of Tadjpur 25th Aug. 1871)

১৭। আত্মার প্রত্যগ্গতি ও পরাগ্গতি কি ?

“বিষয়রাগকে ভগবদ্ভাগরূপে উন্নত করিবার আশয়ে প্রবৃত্তির পরাক্গতি পরিত্যাগ ও প্রত্যক্গতি সাধনের জন্ত ভগবদ্ভাব-সকল বিষয়ে বিমিশ্রিত হইয়াছে। মনোযন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয়দ্বার অতিক্রম করত আত্মা যে বিষয়াভিমুখে ধাবমান হন, তাহার নাম—আত্মার পরাক্গতি ; ঐ প্রবৃত্তিশ্রোতঃ পুনরায় স্বধামে ফিরিয়া যাইবার নাম প্রত্যক্গতি। সুখাত-লালসার প্রত্যক্ধর্ম সাধনার্থ মহাপ্রসাদ-সেবন ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমূর্তি ও তীর্থাদির দর্শনদ্বারা দর্শনবৃত্তির প্রত্যক্গমন সাধিত হয়। হরিলীলা ও ভক্তিশূচক গীতাди শ্রবণদ্বারা শ্রবণ-প্রবৃত্তির প্রত্যক্গতি সম্ভব। ভগবদর্পিত তুঙ্গী-চন্দনাদি সুগন্ধি-গ্রহণদ্বারা গন্ধ-প্রবৃত্তি বৈকুণ্ঠগতি সনকাদির চরিত্রে সিদ্ধ হইয়াছে। বৈষ্ণব-সংসার-সমৃদ্ধি-মূলক বিবাহিত ভগবৎপর পত্নী বা পতির সঙ্গমদ্বারা স্ত্রী বা পক্ষান্তরে পুরুষ-সংযোগ প্রবৃত্তির প্রত্যক্গতি মনু, জনক, জয়দেব, পিপাজি প্রভৃতি বৈষ্ণবের চরিত্রে লক্ষিত হয়। উৎসব-প্রবৃত্তির প্রত্যক্গতি সাধনে-জন্ত হরিলীলোৎসবাদির অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। এই সকল প্রত্যগ্ভাবাবিহিত-নরচরিত্র সর্বদা সারগ্রাহীদিগের পবিত্র-জীবনে লক্ষিত হয়।

—কৃঃ সং ১০।১১

১৮। বিষয়-রাগ ও ব্রহ্মরাগে কি সত্তার ভিন্নতা আছে ?

“বিষয়-রাগ ও ব্রহ্মরাগে সত্তার ভিন্নতা নাই, কেবল বিষয়ের ভিন্নতা মাত্র। ঐ রাগ যখন বৈকুণ্ঠাভিমুখ হয়, তখন প্রপঞ্চ-বিষয়ে রাগ থাকে না, কেবল আবশ্যকমত তাহাতে প্রপঞ্চ স্বীকার ঘটিয়া থাকে। স্বীকৃত বিষয়-সকলও তখন বৈকুণ্ঠভাবাপন্ন হয় ; অতএব সমস্ত রাগই অপ্রাকৃত হইয়া পড়ে।” —কৃঃ সং ১০।২

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

‘আমি কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার’—এইরূপ একনিষ্ঠ না হইলে কৃষ্ণোপাসনা হয় না । তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

“আমি ত’ তোমার, তুমি ত’ আমার,
কি কাজ অপর ধনে ।”

“কৃষ্ণের আমি, আমার কৃষ্ণের সব”—এইরূপ অকিঞ্চনা ভক্তি যাহার আছে, তাহারই কৃষ্ণোপাসনা সম্ভব ।

আমি, তুমি ও তিনি—এই তিনটি পুরুষের মধ্যে ‘আমি’—এই প্রথম পুরুষের সহিতই আমার সম্বন্ধ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের মধ্যে আমার ‘আমি’র কথা যে পরিমাণ আছে, সেই পরিমাণে আমার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ, নতুবা আমার তাঁহাদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই । আমি চাই—সম্পূর্ণ স্বার্থপরতা, আমার স্বার্থের বিষয়—একমাত্র কৃষ্ণ এবং আমি কৃষ্ণের ; ইহা ব্যতীত কৃষ্ণের স্বার্থে আমার কোন সহানুভূতি নাই ।

যাহারা কৃষ্ণকে সর্বস্ব দেন, তাঁহারা কৃষ্ণের সর্বস্ব লাভ করিতে পারেন । যাহাদের কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য পুরুষদ্বয়ে কিছু দিবার আছে, তাঁহারা কৃষ্ণ কি বস্তু, কৃষ্ণ-প্রীতি কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারেন না । সেইজন্য তাঁহাদের কৃষ্ণসেবা ভিন্ন নানা কার্য্য পড়িয়া যায় । দেশ-সেবা, মনুষ্য-সেবা, পশু-পক্ষী-কীটপতঙ্গাদির সেবা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সেবার কথা তখনই আসিয়া পড়ে । তখন আমরা কৃষ্ণপ্রেম গুরুপাদপদ্ম-দেবাসৌন্দর্য্যে বঞ্চিত হই । গুরুকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত আমার আর কোন স্বার্থ নাই । এই বিচারে প্রকৃত স্বার্থপর হওয়াই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য ।

‘কৃষ্ণ’ এই নামটীতেই ভগবত্তার পরিপূর্ণ পরিচয় আছে । অগ্ণাত্য মানব-কল্পিত নামে চিদচিৎ-এর সহিত সম্বন্ধ থাকায় কৃষ্ণমাধুর্য্য সমাগ্ রূপে উপলব্ধির বিষয় হয় না । আংশিক দর্শনকে মাত্র বহুমানন করিয়া সমাগ্ দর্শনলাভে বঞ্চিত হইতে হয় এবং তদ্বারা মতবাদের সৃষ্টি হইয়া পড়ে । স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনই গৌরহৃন্দরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া জীবের পূর্ণ সৌভাগ্যলাভের সুযোগ দিয়াছেন । ভগবান্ দশটি পাঁচটি তত্ত্ব নহেন । ভগবৎপ্রীতির পরিপূর্ণতা না থাকায় আমরা শ্রীভগবান্কে নিত্যচিদ্বিলাসময় বা সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহরূপে দর্শন করিতে পারি না । প্রীতির আংশিকত্বহেতু ভগবদর্শনেরও বিভিন্ন আংশিক প্রকাশ লক্ষ্য করি । শ্রীমন্নহাপ্রভুর কৃপা ব্যতীত জীব তাঁহার পূর্ণ সৌভাগ্যলাভে চিরকালই বঞ্চিত থাকিবেন ।

দ্রাবিড়দেশে মহাভূতপুরীতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কেবলাদৈত নির্বিশেষ-বাদের হেয়ত্ব প্রদর্শনকল্পে এবং ব্যাসদেবের শক্তি-পরিণামবাদের সূষ্ঠত্ব বিচার-সংস্থাপনোদ্দেশ্যে যিনি জগদগুরু আচার্য্য-নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, যিনি উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার নিত্যত্ব সংস্থাপনপূর্বক মর্যাদা বা বিধিমার্গে সান্নিধ্যিতর-রসে বৈকুণ্ঠপতির আরাধনার বিষয় লোকলোচনের গোচরীভূত করিয়াছিলেন, তাঁহারও সিদ্ধান্তের পূর্ণতা বিধানের জন্ত শ্রীগৌরসুন্দরের বিশস্ত বা রাগমার্গে অবশিষ্ট পঞ্চাঙ্গরসের বিচার প্রদর্শন করেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামী ও শ্রীমন্নিম্বাকেরও বিচারসমূহের সূষ্ঠতা ও পূর্ণতা সম্পাদনপূর্বক মহাপ্রভু নিজ ভজনমুদ্রাদ্বারা অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বল মধুররসের সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনপূর্বক বিষয়ের প্রতি আশ্রয়ের এবং আশ্রয়ের প্রতি বিষয়ের প্রীতি কিরূপ নবনবায়মানভাবে অনন্তরূপে পরিবর্তিত হইতে পারে, তাহা ভাগ্যবান্ নিম্নংসর জনগণের গোচরীভূত করিয়াছেন। সুতরাং এমন মহাবদান্তাবতারী অমন্দোদয়-দয়াবারিধি গৌরহরি ব্যতীত আর কে আমাদের শরণ্য হইতে পারেন ?

আচার ও প্রচার

অত্যন্ত সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিই এই পুণ্যময় ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মানবমাত্রেরই প্রত্যেক জীবকে নিত্য দয়া বা কৃষণোন্মুখী করা অবশ্য কর্তব্য। কায়মনোবাক্যে জীবকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়া বা মঙ্গলাচরণ। নিজে কৃষ্ণভজনের অন্তরুল বিষয়সমূহের আচরণ করিয়া অপরকে সেই আচরণ করিবার উপদেশ প্রদান করাই হইতেছে প্রকৃত প্রচার। আচারবিহীন প্রচার নিষ্ফল ও অমঙ্গলজনক। বিষদন্তহীন বিষধর সর্প লোকের ভয় উৎপন্ন করিলেও যেরূপ তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না, তদ্রূপ আচারবিহীন প্রচারক জাঁকজমক ও চাকাচকোর দ্বারা হারকথা প্রচার করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিলেও কিছুতেই তাঁহাদের মঙ্গল করিতে পারেন না। জগদগুরুই যুগপৎ আচার ও প্রচারকার্য্যের দ্বারা জীবকে কৃপা করিয়া মহেশ্বের পরিচয় প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে মহাবদান্ত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন,—

আপনে আচারে কেহ, না করে প্রচার ।

প্রচার করেন কেহ, না করে আচার ॥

‘আচার’, ‘প্রচার’,—নামের করহ ‘তুই’ কার্য্য ।

তুমি—সর্ব-গুরু, তুমি—জগতের আর্ধ্য ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১০২-১০৩)

আচার ও প্রচার

শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত পাওয়া যায়,—

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি ।

স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্য স্তেন কীর্তিতঃ ॥ (বায়ুপুরাণ)

“শাস্ত্রার্থ অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্যগ্রূপে সংগ্রহ করিয়া অপরকে আচারে স্থাপন এবং স্বয়ং শাস্ত্রাদেশ আচরণ করেন বলিয়া আচারবান্ তত্ত্ববিৎ পুরুষ ‘আচার্য্য’ নামে কীর্তিত হইয়া থাকেন ।”

সাধারণতঃ ‘আচার’ বলিতে ‘সদাচার’, ‘ইষ্টনিষ্ঠা’, ‘শাস্ত্রবিহিত আচরণ’ প্রভৃতি শব্দকে লক্ষ্য করে । ‘কদাচার’, ‘ইতরনিষ্ঠা’ ‘অসদাচরণ’ প্রভৃতিকে ‘আচার’ বলিয়া চালাইতে গেলে মারাত্মক ভুল করা হইবে । নিজের সদাচার অপরের নিকট প্রকাশ বা প্রসার করার নামই ‘প্রচার’ । কদাচারের প্রচারের দ্বারা জগতের ধ্বংসকার্য্য সাধিত হয় । নিজে মাতাল হইয়া অপরকে মত্তপান করিবার শিক্ষা দেওয়া, নিজে চোর হইয়া অপরকে চুরিবিদ্ধা পদ্ধতির শিক্ষা দেওয়া অথবা নিজে নাস্তিক হইয়া অপরকে নাস্তিকতার শিক্ষা দেওয়া—কোনটিই প্রকৃতপক্ষে আচার ও প্রচারের পর্যায়ভুক্ত নহে । সমস্তগুলিই কদাচার ও অপপ্রচারের তালিকায় তালিকাবদ্ধ । বিষয়ী, মায়াবাদী, কস্মী, ধর্ম্মধ্বজী, কপট ব্যক্তির ভগবৎ-স্তুবস্ততি ও প্রচারকার্য্য ভগবানের অঙ্গে বজ্রহনন করিয়া জীবকে পরমার্থের পথ হইতে চ্যুত করে । কৃষ্ণভক্তির আচারই প্রকৃত আচার এবং কৃষ্ণভক্তির প্রচারই প্রকৃত প্রচার । কেহ যদি নিজে ধূমপান করেন, অথচ অপরকে ধূমপান না করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহার উপদেশ যেরূপ কেহ মান্য করিবে না ; তদ্রূপ নিজে কৃষ্ণভক্তির আচার না করিয়া অপরকে তাহা উপদেশ করিলে অপরে তাহা শ্রবণ করিলেও কিছুতেই আচরণ করিবে না । কৃষ্ণভক্তির আচারই প্রচারের একমাত্র পাথের-স্বরূপ । শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আচার-যুক্ত প্রচারের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

আপনি করিম্ ভক্ততাব অঙ্গীকারে ।

আপনি আচারি’ ভক্তি শিখাইমু সবারে ॥

আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায় ।

এই ত’ সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায় ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩।২০-২১)

জীবের নিত্যকালের মঙ্গললাভের নিমিত্তই হরিকথা প্রচারের একান্ত

আবশ্যকতা। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণই প্রকৃত প্রণালী ও শুদ্ধভাবে নিজে আচার করিয়া তাহা প্রচারের মাধ্যমে জগজ্জগাল দূর করিয়া জগজ্জীবের কল্যাণ সাধন করেন। শ্রদ্ধালু ব্যক্তি যথার্থ সাধুর মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধায় দৃঢ় হইয়া নামভজনে প্রবৃত্ত হন। যথার্থ সাধুর হরিকথায় অধিক লোক আকৃষ্ট হয় না, কারণ মায়াদেবীর কারাগারে অধিকাংশই অপরাধী, অশ্রুতিলাবী। পাছে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির পথে বাধা পড়ে, সেইজন্ত তাহারা সাধুর হরিকথায় মনোনিবেশ করে না। কৃষ্ণবহিস্মুখগণের হরিকথায় অকুচি দেখিয়াও তাহাদের মঙ্গলের জন্ত পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবগণ স্থানুর ন্যায় বসিয়া না থাকিয়া বিপুল উৎসাহের সহিত হরিকথা প্রচার করেন। জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ প্রত্যেককে মহাপ্রভুর বাণী প্রতি দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইবার উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছেন,— “আমরা জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র।” হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে কৃষ্ণনাম প্রচারদ্বারাই সংকীৰ্ত্তন-প্রভুর নিত্যসঙ্গ লাভ হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বকৃতিসম্পন্ন আচারনিষ্ঠ জীবকে উপদেশ করিয়াছেন,—

যারে দেখ, তারে কহ ‘কৃষ্ণ’-উপদেশ।

আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার’ এই দেশ।

কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ।

পুনরপি এই ঠাক্রি পাবে মোর সঙ্গ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৮-১২৯)

উপরিউক্ত পয়ারের অনুভাষ্যে জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,— “আমি সর্বোত্তম বৈষ্ণব, শিষ্ট্য করিলে গৰ্বরূপ ভজন নষ্ট হয়—এই উৎকট ভক্তাভিমান ত্যাগ করিয়া দৈন্তের সহিত শুদ্ধনাম-গ্রহণাচার ও শুদ্ধনাম প্রচাররূপ গুরুর কার্য্য করিলে জড়-প্রতিষ্ঠারূপ বিষয়-তরঙ্গ প্রবল হইতে পারে না। শ্রীরূপ, শ্রীদনাতন, শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতি পার্শ্বদ মহাত্মাগণের গ্রন্থ লিখিয়া উপদেশ-প্রদান এবং শ্রীমন্নরোত্তম, শ্রীল মধব-রামানুজাদির বহু শিষ্ট্যকরণকে ভক্ত্যঙ্গের বাধক ও বিষয় তরঙ্গ বলিয়া কল্পনা করিয়া অনেক নির্বোধলোক প্রকৃত অকিঞ্চন-ভক্তগণের চরণে অপরাধী হন। তাহারা প্রভুর এই আদেশ সবিশেষ আলোচনা না করিয়া নিজের ক্ষুদ্র গৰ্বরূপ দীনাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিবিমুখজনের প্রতি প্রতিশোধ না দেখাইতে গিয়া গোঁরাহুগত্য-পূর্ব্বক যাহাতে নিজভজন বৃদ্ধি করেন, তজ্জন্ত জগদগুরু আচার্য্যরূপে শ্রীগোঁরাঙ্গের এই শিক্ষা প্রদান।”

আজকাল আচার না করিয়া প্রচারের উৎসাহ অধিকমাত্রায় দেখাইতে গিয়া প্রচারকগণ নিজের ও অপরের অমঙ্গল বিধান ও সর্বনাশ করিতেছে। নিজের কোন আচার নাই, হরিকথা শ্রবণে কোন রুচি নাই ; অথচ প্রচারকের আসন দখল করিয়া প্রচারের ছলনায় অপরকে হরিকথা শ্রবণ করাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকিলে মহা অনর্থের সৃষ্টি হয়। কীর্ত্তন বা প্রচারের ছলনা আর প্রকৃত কীর্ত্তন বা প্রচার এক নহে। প্রচারের ছলনার মধ্যে রহিয়াছে নিজের ইন্দ্রিয়-প্ৰীতিবাঞ্ছা, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের বিপুল চেষ্টা। তাই দেখা যায়, অনেক হতভাগ্য ক্ষুদ্র জীব নিজেদের তেজীয়ান্ ও সামর্থ্যবান্ প্রচার করিয়া কনকের অসদ্ব্যবহার, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ও জড়প্রতিষ্ঠার আকাজক্ষা করিয়া নরকের দ্বার পরিষ্কার করিতেছে। লোকের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপর ব্যক্তিগণ যে বহুবিধ সুরতলাদি সংযোগে আখর দিয়া স্থললিত কণ্ঠে কীর্ত্তনের ছলনা করেন অথবা দুঃখে করুণস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নানাপ্রকার ভাবের ছলনায় হরিনাম করেন, তাহা কোটি জন্মেও ফল উৎপাদন করিতে পারে না। কারণ হরিনাম কীর্ত্তন ছলনার মধ্যে কোন ভগবৎসুখানুসন্ধান থাকিতে পারে না। বরং নামাপরাধে নরক যন্ত্রণা লাভ হয়। গ্রন্থপ্রচারের ছলনায় অর্থোপার্জনের জন্য ব্যবসাও—অপরাধময়ী ব্যাপার।

গোড়মে শ্রীমমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হরিনামের হৃদে মহামূল্য নাম-প্রেম প্রচার ও বিক্রয়কেন্দ্র খুলিয়াছিলেন। শ্রীগৌরপার্বদপ্রবর নামহট্টের ঝাড়ুদার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই গোড়মেই নামহট্টের বিষয় জ্ঞাপন ও প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিয়া জগতের মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। আজ সমগ্র বিশ্বে “পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥” —ভগবানের এই বাণীর সার্থক রূপায়ণ দেখা যাইতেছে। প্রকৃত প্রচারে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্ৰীতিবাঞ্ছা ব্যতীত অণু কিছুই থাকিতে পারে না। প্রচার করিতে গেলে প্রতিষ্ঠা আসা স্বাভাবিক ; কিন্তু তাহা শূকরের বিষ্ঠাস্বরূপ জড়প্রতিষ্ঠা নহে, তাহা বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা। ‘গুরু-বৈষ্ণবের জন্য এই প্রতিষ্ঠা আসিয়াছে, অতএব প্রতিষ্ঠা তাঁহাদেরই প্রাপ্য বস্তু’—এই চিন্তাধারাই জীবের পক্ষে প্রকৃত শ্রেয়স্কর। রূপাভূগ বৈষ্ণবগণই যথার্থ প্রচারক, তাঁহারা কখনও প্রতিষ্ঠার কান্দাল নহেন। তাই শ্রীল ভক্তিসিকান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ “মনঃশিক্ষা”তে গাহিয়াছেন,—

ব্রজবাসিগণ,

প্রচারক ধন,

প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তা'রা নহে শব।

প্রাণ আছে তার,

সে-হেতু প্রচার,

প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব ॥

নিজে আচার করিয়া গুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে পরমোৎসাহের সহিত হরিকথা প্রচার করিলে ভববন্ধন ছিন্ন হইয়া দুর্লভ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার উপদেশাবলীর মধ্যে বলিয়াছেন,—“আপনারা শ্রীকৃপানুগ-গণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীকৃপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীক কণ্ঠে প্রচার করুন।*** ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও স্তব্ধ হ'বে না, আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ-মনোহরীষ্ট-প্রচারে ব্রতী হবেন।” অতএব রূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচারের দ্বারাই শ্রীল প্রভুপাদের মনোহরীষ্ট পূরণ হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীগুরুতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণের নিজজনই পারমার্থিক শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব মনুষ্য নহেন, তিনি অতিমর্ত্য পুরুষ—জগতে ভগবৎসেবা শিক্ষা দিবার জন্ত ভগবৎপ্রেরিত অভ্যাগত ও ভগবচ্চিহ্নিত জন। শ্রীগুরুদেবই জীবের একমাত্র নিত্যবান্ধব। এই মর্ত্য-জগতে যদি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী, সর্বশ্রেষ্ঠ বদান্ত পুরুষ কেহ থাকেন, তবে তিনিই সেই শ্রীগুরুদেব। তিনিই আমাদের অপ্রাকৃত নিত্যশান্তিনিকেতনে লইয়া যান। তাঁহার অপ্রাকৃত মহিমার কথা জগতের ভাষায় জগতের জীবকে বুঝান যায় না। সেই অতিমর্ত্য মহাপুরুষকে মর্ত্যজীব নিজ বিজ্ঞাবুদ্ধিবলে কখনও চিনিতে পারে না। অতিমর্ত্যপুরুষের কৃপোদ্ভাসিত ও শরণাগত জনই সৎগুরুর সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন। তিনিই আমাদের নিকট বস্তুপ্রদর্শক গুরু বলিয়া পরিচিত।

আ—চর ধাতুর উত্তর ণ্যৎ-প্রত্যয়দ্বারা আচার্য্য-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ‘চর’ ধাতুর অর্থ গমন করা অর্থাৎ যিনি সম্যগ্ভাবে গমন করিয়া থাকেন এবং যাহাকে অনুগমন করিয়া অপর ব্যক্তি শিক্ষালাভ করিতে পারে, তিনিই আচার্য্য। আচার্য্যই গুরু। আচারবান্ পুরুষই একমাত্র আচার্য্য হইতে পারেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু আচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছেন,—

আচার করয়ে কেহ, না করে প্রচার।

প্রচার করয়ে কেহ, না করে আচার ॥

আচার-প্রচার নামের করহ দুই কার্য।

তুমি সর্বগুরু, তুমি জগতের আর্ধ্য ॥

আচার্য্য যুগপৎ আচার ও প্রচার করিয়া থাকেন। আচারহীন প্রচার নিষ্ফল। আচার বাদ দিয়া ‘আচার্য্য’ কথার কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না। পূর্ব পূর্ব আচার্য্যগণের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহারা সকলেই যুগপৎ আচারবান্ প্রচারক ছিলেন।

চৈতন্যগুরুর কৃপাতেই জীব শ্রোতপথের সন্ধান পায়। চৈতন্যগুরুর কৃপা ব্যতীত বস্তুপ্রদর্শক গুরু, মহান্ত-দীক্ষাগুরু, মহান্ত-শিক্ষাগুরুগণের শ্রীপাদপদ্ম-সেবালাভ করিবার কোনপ্রকারই যোগ্যতা হয় না। আবার কৃষ্ণ-প্রসাদজ স্মৃতি উদ্ভিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবগণ চৈতন্যগুরুর নিকপট কৃপালাভ করিতেও পারে না। অত্যাভিলাষ থাকিলে চৈতন্যগুরুর কৃপা পাওয়া যায় না। সরল ও নিকপট হইলে চৈতন্যগুরু কৃপা করিয়া দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুগণের প্রতি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধালাভ করিবার বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। শ্রীগুরুদেব বৈকুণ্ঠ-লীলাময় হইয়াও ইহজগতে অবতরণ করেন। ভগবদ্ভক্তিই তাদৃশ অবতরণের অবলম্বনরজ্জু। শ্রীগুরুদেব ভগবৎ-কৃপাবতার। তিনি শ্রোতপন্থী। চৈতন্যগুরুর কৃপায় মহান্তগুরু নির্দিষ্ট হন। চৈতন্যগুরুর কৃপা দ্বিবিধ। সেই দুই প্রকার কৃপাফলে কেহ বা আধ্যাত্মিক, কেহ বা অধোক্ষজসেবক। ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছাই যাহার একমাত্র আরাধ্য, তিনিই অত্যাভিলাষী। অত্যাভিলাষীর কর্তৃ-অভিমান প্রবল। তিনি শ্রেয়ঃপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃপথের পথিক। চৈতন্যগুরুর মায়া-বিস্তাররূপা কপট কৃপাতেই জীবের এইরূপ দুর্ভাগ্য হয়। কর্তা একমাত্র ভগবান্। সেই কর্তার প্রতি উদাসীন হইলেই জীব পুরুষাভিমানের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ভক্তিপথ হইতে চ্যুত হয়। চৈতন্যগুরুর অমায়ায় কৃপা জীবকে মাধু-গুরুর সন্ধান দিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণ-পদপ্রাপ্তির সুযোগ দান করেন। মাধু-গুরু-কৃপাতেই জীবের ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব হয়।

শ্রীগুরুদেব অদ্বয়জ্ঞানের প্রিয়তম সেবক। শিক্ষাগুরু অনেক হইলেও দীক্ষাগুরু মাত্র একজন। শ্রীগুরুদেব অসমোদ্ধ বস্তু। তিনি বিষয়জাতীয় অসমোদ্ধ না হইলেও আশ্রয়জাতীয় অসমোদ্ধের লীলাপ্রদর্শনকারী। শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরুর বাস্তবজ্ঞানলব্ধ শরণাগত শিষ্যকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহার অমুকুল শিক্ষায় দিব্যজ্ঞান লাভের সুষ্ঠুতা হয়। শিক্ষাগুরুর বহুত্ব থাকিলেও অদ্বয়জ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরুর সহিত তাঁহাদের মতভেদ নাই, পরন্তু তাঁহারা দীক্ষাদাতার অকৃত্রিম বন্ধু। দিব্যজ্ঞানলাভে জীবের স্বরূপোদোদন হয়। উন্মেষিত স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ইহজগতে ও পরজগতে কি করিয়া হরিসেবা করিতে হইবে, তাহা শিক্ষাগুরু-

বর্গের উপদেশ ও কৃপাতেই জানা যায়। কোন কোন সময় দীক্ষাগুরুও শিক্ষাগুরুর কার্য করেন। ভগবান্ চৈত্যান্তরূপে ষাঁহার অকপট মঙ্গলাকাজ্ঞা করেন, তিনিই ভগবন্তরূপে মহাস্ত-গুরুরূপে নির্দেশ করিবার সম্বুদ্ধি প্রাপ্ত হন। ভগবদন্তগ্রহক্রমে জীব শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণনখশোভা সন্দর্শন করিয়া ধৃত হন। শিক্ষাগুরুর অভাবে অনেক সময় মহাস্তগুরু-প্রদত্ত অদ্বয়জ্ঞানও বিপর্যাস্ত হইয়া পড়ে। জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—শ্রীগুরুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই। অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকৃত হইলে পঞ্চতত্ত্ব ও গুরুতত্ত্ব—এই ছয়তত্ত্বই ভগবান্, কিন্তু পরস্পর পৃথক্। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত অভেদ হইলেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথক্ দাস, শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যদেবের দাস হইলেও ভগবানের প্রকাশ-স্বরূপ। ভগবান্ই গুরুদেব। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রকাশ হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম দাস। শ্রীগুরুদেব মর্ত্য নহেন, অনিত্য নহেন, তিনি কৃষ্ণ হইতে দাসরূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয়বস্ত। তিনি ভক্ত, স্তবরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার খর্ব্বতা করা হয়। “কৃষ্ণ-সাম্যে নহে তাঁ’র মাধুর্য্য আশ্বাদন।” “কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্তপদ।” ভক্ত, কৃষ্ণ ও গুরুদেব কেবল অভিন্ন হইলে ভক্তিমার্গের অস্তিত্ব থাকে না, উহা নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানমার্গ হইয়া যায়। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ ও শ্রীমন্নহাপ্রভু শ্রীগুরুদেবকে মর্ত্যবুদ্ধি করেন নাই, কিন্তু ভগবদ্বুদ্ধি করিলেও তাঁহাকে ভগবানের সেবক ভক্ত জানিয়াছেন। কন্মী, জ্ঞানী, ভক্তগণ—সকলেই শ্রীগুরুদেবকে ভগবদ্দৃষ্টি করিয়া থাকেন, কেহই প্রাকৃত-দৃষ্টি করেন না। কিন্তু গুরুভক্তগণ গুরু ও ভগবানে অভেদ-দৃষ্টি করিলেও গুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রিয়তমই জানেন।” গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও বলিয়াছেন,—

“গুরুকে সামান্য জীব না জানিবে কভু।

গুরু কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, নিত্যপ্রভু ॥”

শ্রীগুরুদেব লীলাপুরুষোত্তমের লীলার সঙ্গী। আমরা সেই শ্রীতগুরুপাদ-পদের কিঙ্করাঙ্কিকর, ইহাই আমাদের স্বরূপের পরিচয়। অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণই দেবতা। এই দেবতা যেরূপ নিত্য, গুরুও তদ্রূপ নিত্য। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ—কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ। শ্রীগুরুদেব কখনও ভোক্তা নহেন, তিনি নিত্যকাল ভগবদ্রোগ্য—সেবক-ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণই সেবা-ভগবান্ বা ভোক্তা-ভগবান্। শ্রীগুরুদেব গোপীনাথ নহেন, তিনি গোপী। তিনি বিষয়বিগ্রহ নহেন—আশ্রয় বিগ্রহ। শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দমূর্তি।

ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অপরে গুরু হইতে পারে না। শ্রীগুরুদেব অহৈতুক দয়াময় ও পরহঃখদুঃখী। গুরুর মধ্য দিয়া কৃষ্ণকৃপা পাওয়া যায়। যাহার কপালের জোয় খুব বেশী, তিনিই এই সুযোগ পান—গুরুানুগত্যে কৃষ্ণসেবা-সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রীগুরুদেব দয়ার সাগর। তাঁহার দয়াসিন্ধুর একবিন্দু জীবকে আনন্দসাগরে নিমগ্ন করিতে পারে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—“গুরুর অবজ্ঞা করিতে নাই—শ্রোতবাণীর নিন্দা করিতে নাই—বহুব্যক্তিকে পূজ্যজ্ঞানে শ্রীগুরুপাদপদের অবজ্ঞা করিতে নাই। অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনের আশ্রয় ব্যতীত জীবের অন্য মঙ্গল নাই। শ্রীগুরুদেব ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী। ভগবান্‌ও যাহার পূজা করিয়া থাকেন, সেই গুরুদেবের পূজা সবচেয়ে বেশী। সমগ্র জগৎ শ্রীগুরুপাদপদের প্রতিকলিত প্রতিবিম্ব। প্রত্যেক রেণু-পরমাণুতে গুরুর সঙ্কল্প পরিস্ফুট। তাঁহাদের অসম্মান বা অনাদর করা গুরুসেবকের কর্তব্য নহে। গুরুসেবার জায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদের সেবা বড়। এই প্রতীতি স্মৃতি না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সংসঙ্গ বা গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার হয় না। আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক, এই বিচার হয় না। শ্রীগুরুদেব মর্ত্য নহেন, তিনি অমরবস্তু—নিত্যবস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ নিত্য্য, তাঁহার নেবক নিত্য্য, তাঁহার সেবা নিত্য্য; সুতরাং কত আশা-ভরসা আমাদের—মরণ বলিয়া কোন কথা আমাদের নাই। আমরা—বশুবস্তু, গুরুদেব ঈশ্বরতত্ত্ব। আমরা যদি নিকপটে প্রাণভরা আশীর্বাদ-প্রার্থী হই, তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ অমায়ায় সর্ববিধ মঙ্গল দান করেন। শ্রীগুরুদেব কর্তৃত্বাভিমান হইতে জীবকে রক্ষা করেন। যিনি আমাদের পুনঃ পুনঃ মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, তিনিই গুরুদেব। জীবকে দুর্ব্বুদ্ধির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত যিনি অনন্ত শক্তি সঞ্চার করেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ। মানব যে-কাল পর্য্যন্ত তর্কপথ গ্রহণ করে, সে-কাল পর্য্যন্ত গুরুর দর্শনলাভ ঘটে না। কর্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তি সৎগুরুর সন্ধান পায় না। শ্রীগুরুদেব আমার জন্ত অমায়ায় যে ব্যবস্থা করেন, তাহা নতশিরে গ্রহণ করাই আমার কর্তব্য—ইহাই শরণাগতের বিচার।”

হরিভক্তি গুরুপূজাময়ী না হইলে তাহা হরিভক্তিই নহে। যাহার নিকপট গুরুসেবারুত্তি আছে, তিনিই হরিভজন করিতে পারেন। নিকপট গুরুসেবক বাছে যতই সাময়িক অনর্থযুক্তরূপে প্রতিভাত হউন, তাঁহার মঙ্গল অনিশ্চিত। গুরুসেবায় নিকপটতাই সর্বমঙ্গলজননী। গুরুকৃপা ছাড়া জীবের গতি নাই।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবই সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম । শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে সম্পূর্ণ নির্ভরতা বা তাঁহার সম্পূর্ণ আত্মগত্যই কৃষ্ণকৃপালাভের একমাত্র উপায় । ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব গৌরজন । তিনি শ্রীগৌরানন্দের কৃপাশক্তি— অবতার । শ্রীকৃপাঘুনাথের পরমপ্রিয় তিনি, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রেষ্ঠজন তিনি । শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে আমাদের নিত্যবান্ধব ও নিত্যপ্রভুরূপে বরণের সৌভাগ্য হইলে আমাদের মঙ্গল অনিবার্য্য । তাঁহার কৃপার প্রতি নির্ভরতাই সকল মঙ্গলের মূল । আমরা যেন শ্রীল ঠাকুরের আত্মগত্যে বলিতে পারি,—

ভক্তিবিনোদ, এই আশা করি', বসিয়া গোদ্রুম বনে ।

প্রভুকৃপা লাগি', ব্যাকুল অন্তরে, সদা কান্দে সঙ্কোপনে ॥

ব্যাসপূজা-বাসরে পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্মে

প্রণতি-প্রসূনাঞ্জলি

(১)

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তি বামন ।

অজ্ঞান নাশন প্রভু পতিতপাবন ॥

ব্যাসাভিন্ন গুরুরূপে তব আবির্ভাব ।

রূপানুগ ভক্ত জানে তব তত্ত্ব-ভাব ॥

রূপানুগ-ধারা কভু রুদ্ধ নাহি হয় ।

গুরু-পরম্পরা তাই তোমার উদয় ॥

বেদাদি শাস্ত্রের স্মৃতি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ।

গৌড়ীয় ঋতির তুমি জ্ঞানী মহাজন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ ব্যাস-অবদান ।

গোবিন্দ-মহিমা-তত্ত্ব তাহাতে ব্যাখ্যান ॥

গৌড়ীয় ভক্তি-সিদ্ধান্ত সর্ব মত সার ।

তুমি তাহা বিশ্বব্যাপি' করিছ প্রচার ॥

তব দিব্য গুণ-লীলা ব্যাসের সমান ।

বেদে ভাগবতে গাহে তব জয়গান ॥

জয় জয় ব্যাসগুরু ভক্ত-প্রাণধন ।
তোমার চরণ ধ্যান করি অনুরাগ ॥

(২)

জয় জয় গুরুদেব রাধা-প্রিয়জন ।
তোমার পূজনে হয় ব্যাসের ভোষণ ॥
শাস্ত্র কহি' জীবে জ্ঞান দিলা ব্যাসমুনি ।
শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা তব কাছে শুনি ॥
আম্নায়-গুরু-পরম্পরা তুমি গুরুদেব ।
জীব উদ্ধারণ-কার্য তোমাতে সম্ভব ॥
কৃষ্ণ-কাছে তত্ত্ব শুনি' বিরিকি শ্রোত্রিয় ।
সব তত্ত্ব জানি' তুমি হৈলে গুরু-প্রিয় ॥
গুরুর শিষ্য মাত্রেই গুরু-যোগ্য নয় ;
গুরু যাঁ'রে আজ্ঞা করে সেই গুরু হয় ॥
গুরুদেব স্বতঃসিদ্ধ, স্বপ্রকাশ তত্ত্ব ।
জনমতের ভোটে গুরু হয় না নির্ণিত ॥
গুরু-পদে সমপিত পূজোপকরণ ।
তিনি তাঁ'র গুরু-পদে করে সমর্পণ ॥
পরম্পরা-ক্রমে ব্যাস সেই পূজা পায় ।
গুরুপূজা করে তাই ব্রহ্ম-সম্প্রদায় ॥

(৩)

গুরুপূজা নামান্তরে শ্রীব্যাস-পূজন ।
হেন তত্ত্ব শিক্ষা দিলা শচীর নন্দন ॥
গুরু নিত্যানন্দ-পূজা গৌর-প্রবর্তন ।
ভক্তগণে করে নিত্যানন্দের অর্চন ॥
ব্যাসদেবে পুষ্পমাল্য করিতে অর্পণ ।
নিত্যানন্দ ইতি উতি করে নিরীক্ষণ ॥
শেষে গুরু নিত্যানন্দ নেহারি' গৌরাজে ।
তাঁ'র গলে মালা দিয়া নাচে প্রেমরঙ্গে ॥

প্রকটাচার্য্য-পূজায় ব্যাস-পূজা হয় ।
 প্রকটাচার্য্য ও ব্যাস ভিন্ন কভু নয় ॥
 প্রকটাচার্য্য ও ব্যাস একই স্বভাব ।
 জীবে প্রেম দিতে দৌহে সতত উদ্গ্রীব ॥
 প্রকটাচার্য্য-পূজার এহেন বিধান ।
 গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাঝে রয়ে প্রচলন ॥
 পূজোপকরণ যবে যায় ব্যাস-পাশে ।
 ব্যাস তাহা পৌছে দেন গোবিন্দ-সকাশে ॥

(৪)

জয় জয় প্রভুবর করুণা নিদান ।
 দীনার্ভ জনেরে দিলে তব পদে স্থান ॥
 পিতৃ-বাৎসল্য যথা অনুভবে স্মৃত ।
 স্নিগ্ধ শিষ্য জানে তথা তোমারে তত্ত্বতঃ ॥
 রাধা স্নেহাধিকা সখী 'বিনোদমঞ্জরী' ।
 লীলা কৈলা চরাচরে গুরুরূপ ধরি' ॥
 'শ্রীকেশব ঠাকুর' নামে তিনি সদা খ্যাত ।
 তুমি তাঁ'র প্রেষ্ঠ শিষ্য মহাভাগবত ॥
 তাঁ'র দিব্য লীলামৃত রচি' গ্রন্থাকারে ।
 রাখিলে অক্ষয় কীর্তি জগৎ মাঝারে ॥
 'বৈষ্ণব-বিজয়'-গ্রন্থ—গৌড়ীয় সম্পদ ।
 ইংরেজী ভাষাতে তাঁ'র কৈলে অনুবাদ ॥
 শ্রীগুরুদেবের গ্রন্থ আদৃত বিদেশে ।
 ভক্তগণে মুগ্ধ তব এহেন প্রয়াসে ॥
 শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন ।
 শ্রীকেশব-লীলার ব্যাস তুমি মহাত্মন ॥

(৫)

দারুব্রহ্ম জগন্নাথ, নরব্রহ্ম তুমি ।
 কৃষ্ণৈকশরণ, সদা জীব-হিতকামী ॥
 শ্রীরামের আশীর্ব্বাদে ভক্ত হনুমান ।
 অসাধ্য সাধন কৈলা—শাস্ত্রে পরমাণ ॥

গুরু-আশীর্ব্বাদে রাম হৈয়া বনবাসী ।
 অযোধ্যায় ফিরেছিল রাবণে বিনাশি' ॥
 গুর্বাশীর্ব্বাদে আরুণি বিনা অধ্যয়নে ।
 সর্ব' শাস্ত্র-জ্ঞানে ধন্য হইলা জীবনে ॥
 গুরু-অমুগ্রাহে পার্থ লভিল বিজয় ।
 গুরু তুষ্ট হৈলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয় ॥
 গুরুরে অবজ্ঞা করি' ইন্দ্ৰের হৈল ক্ষতি ।
 গুরু-লাঞ্ছনা-দোষে কংস পাইল দুর্গতি ॥
 গুরু না প্রসন্ন হৈলে সাধন বিফল ।
 বিপ্রলস্ত সেবক লভে গুরু কৃপা-বল ॥
 'গুরু কৃপাহি কেবলম্'—সাধন সম্পদ ।
 শোক-মোহ-ভয়-হারী তব পূত পদ ॥

(৬)

জয় মোর ইষ্টদেব, ভকত বৎসল ।
 জয় বাঞ্ছাকল্পতরু, দুর্ব্বলের বল ॥
 অপ্রাকৃত দৈন্য 'রাজে তোমার অন্তরে
 তব দৈন্য গৌর-কৃষ্ণে আকর্ষণ করে ॥
 গৌর-কৃষ্ণের সুখকর সেবা উদ্ভাবনে ।
 নিতি ব্যস্ত আছ সদা ব্যাকুলিত মনে ॥
 শ্রীগৌড়ীয়গুরু তুমি—রাগাত্মিক জন ।
 বিপ্রলস্তভাবে রস কর আশ্বাদন ॥
 ব্রজে নন্দ-সুত-লীলা—সম্পত্তি তোমার ।
 ব্রজে কৃষ্ণের মাধুর্য্য—ভগবত্তা-সার ॥
 “তন্মাম গ্রহণাদিভিঃ”—ভক্তিয়োগ কথা ।
 দেশে দেশে মঠ স্থাপি' প্রচারিছ সদা ॥
 শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থরাজি করি' সম্পাদন ।
 শ্রীকেশব-মনোহভীষ্ট করিছ পূরণ ॥
 তব গুণ-লীলা কিছু করিয়া কীর্তন ।
 প্রণমিয়া তব কৃপা যাচি অনুক্ষণ ॥

শ্রীব্যাসপূজা-বাসর

ইং ৩।১।১৯৯৭

}

—শ্রীগুরু-কৃপাপ্রার্থী

শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৫ পৃষ্ঠার পর]

মুকুন্দ বললেন,—তুমি ত' বলেছ যে কোটি জন্ম তোকে উদ্ধার করব না। তাহলে কোটি জন্ম পরে আমাকে উদ্ধার করবে, সেটা আমি বুঝে নিয়েছি। এইজন্ত আনন্দ করছি। তাহলে কেমন ধৈর্য্য দরকার? হিমালয়ের মত ধৈর্য্য দরকার। যুগ-যুগান্তর ধরে সে ঝড়-ঝঞ্ঝা সহ্য করেছে। ঐরকম ধৈর্য্য দরকার। কোটি জন্ম পরে উদ্ধার করবে—এটা তোমার মুখের বাণী, স্মৃতরাং কখনও মিথ্যা হওয়ার নয়। কোটি জন্ম পরে ত' তোমার দর্শন পাব, কৃপা পাব। আমি তোমার জন্ত বসে থাকলাম।

তখন মহাপ্রভু বললেন,—চল্ চল্, তোর কোটি জন্ম হয়ে গেছে, তোর কোটি জন্ম শেষ। কোটি জন্ম এক মুহূর্তে শেষ। ভগবানের ইচ্ছাতেই সব সম্ভব। কোটি জন্ম মুহূর্তের মধ্যেও হতে পারে, দু-এক ঘণ্টায়ও হতে পারে। ভগবান্ ইচ্ছা করলে কি না করতে পারেন। “কাকেরে গরুড় করে ঐছে দয়াময়।” ভগবানের এমন দয়া যে সে দয়া অণু কেউ করতে পারবে না। মুহূর্তের মধ্যে সব কপূরের মত উড়ে যাবে। সব জিনিষটার মধ্যে হিসাব আছে, ওগুলো আমাকে বিচার করতে হবে। ভগবানের সামর্থ্যের পরে কারও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। গীতায় বলছেন—অজ্ঞ, অশ্রদ্ধাধান ও সংশয়াত্মা পুরুষের কখনও আত্মকল্যাণ হয় না। ‘শ্রদ্ধা’-শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তা খুব সুন্দর। “শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম্ম কৃত হয় ॥” এ চিন্তা কার মাথায় আছে? কথায় কথায় আমরা বলি—আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। মানে কি মুখে মুখে? মুখে মুখে ত' অনেক কিছু বলা যায়। কিন্তু অন্তর থেকে আসবে যখন, অন্তরের অন্তঃস্থল—**from the core of the heart** থেকে আসবে যখন, তখন সেটা ঠিক হবে। মুখে মুখে বললে কিছু হচ্ছে না। ভগবান্ সেখানে আসছেন না।

ভাগবতের দশম স্কন্ধের ১৯শ অধ্যায়ে আছে ভগবানের দাবাগ্নিপান-প্রসঙ্গ। দাবাগ্নি সব পুড়িয়ে মারছে। গোপবালকগণ, গাভী, গোবৎসগণ সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কৃষ্ণ-বলদেব দুজনে আছেন, কিন্তু কেউ এগিয়ে আসছেন না। এদিকে কান্নাকাটি আরম্ভ হয়ে গেছে। সখাগণ বলছেন,—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর হে রামামোঘবিক্রম।

দাবাগ্নিনা দহমানান্ প্রপন্নাংস্ত্রাতুমর্হথঃ ॥

একথা বলা সত্ত্বেও এগিয়ে আসছেন না কৃষ্ণ । তারপর আগুন যত কাছে এসে যাচ্ছে তত চিৎকার আরম্ভ হয়েছে । তখন বলছেন,—‘নূনং তদ্বাক্ত্বাঃ কৃষ্ণ ন চাইন্ত্যবসাদিতুম্ ।’ হে কৃষ্ণ, হে বলদেব, আমরা ত’ তোমার বন্ধু-বান্ধব, সখা । সখাগণ বিপদে পড়েছে, সখা সখাকে বাঁচাবে না, রক্ষা করবে না ! তাহলে সখা কাকে বলে ?—বিপদে যে নিজের প্রাণ উপেক্ষা করেও বন্ধুকে রক্ষা করে, সেই ত’ সখা । কিন্তু কই কৃষ্ণ ত’ আমাদের রক্ষা করতে আসছেন না । কৃষ্ণ তখনও চূপ করে আছেন । তারপর বলছেন,—“বয়ং হি সৰ্ব্বধৰ্ম্মজ্ঞ” । তোমরা ধৰ্ম্মজ্ঞের কি কাজ করেছ ? ধৰ্ম্মজ্ঞ **Discipline** পালন করেন, নীতি-আদর্শ পালন করেন । তোমরা কি নীতি-আদর্শ পালন করেছ আমার জন্ত ? আমি ও দাদা বলরাম দুজনে তোমাদের উপরওয়াল । আমাদের না বলে তোমরা চলে এলে কেন ? তোমরা খেলাধুলা করছিলে, গাভী, গোবৎস সব চলে গেছে, আমাদের বলতে পারতে । কিন্তু তা না করে তোমরা চলে এলে কেন ? আমাদের বললে আমরা ব্যবস্থা নিতাম । বাহাদুরি করে চলে এসেই ত’ এই বিপদে পড়েছ । ভগবানকে যখনই ভুলে যাই আমরা, নিজেরা বাহাদুরি করতে যাই যখন আমরা, ঠিক সেই সময়ই বিপদ এসে যায় । যখন আমরা নিজেরা নিজেরদের পরে খুব আস্থাশীল হই ভগবানকে বাদ দিয়ে, সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণকে বাদ দিয়ে, তখনই মুশ্কিলে পড়ে যাই—শিক্ষাটা এই । সেইরকম ধরনের মুশ্কিল হচ্ছে । সেই মুশ্কিলের হাত থেকে রেহাই পেতে গেলে নিশ্চয় **Submission**—শরণাগতি দরকার, আত্মসমর্পণ দরকার । না, না, আমরা পারলাম না, আমাদের সব অহমিকা ছেড়ে দিচ্ছি—এ ভাবটা দরকার । তোমরা ক্ষণিকের জন্ত হলেও আমাদের কথা মান নাই । আমরা যে উপরওয়াল আমাদের সে উপরওয়ালার মর্যাদা রক্ষা কর নাই । তখনও পর্য্যন্ত কৃষ্ণ এগিয়ে আসেন নাই । তারপরে ভীষণ কান্নাকাটি, সব পুড়ে শেষ । “ত্বন্নাথাস্ত্বপরায়াণাঃ”—তুমি আমাদের প্রাণনাথ, রক্ষাকর্তা, সবকিছু । সমস্ত দায়দায়িত্ব তোমার পরে ছেড়ে দিলাম । এই কথা যখন বলেছে তখন কৃষ্ণ ছুটে গিয়েছেন । ঠিক আছে, সব ঠিক আছে । তোমরা সব চোখ বন্ধ কর । তোমরা চোখ না বন্ধ করলে আমি তোমাদের বাঁচাতে পারব না ।

চোখ বন্ধ করার কারণ সেখানে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে । আগে একবার একটা ঘটনা ঘটে গেছে, যার জন্ত মা-যশোদা কৃষ্ণকে মারতে গেছেন । মারতে গেলে আবার সেখানে আর এক দৃশ্য দেখিয়ে দিলেন ভগবান্ । মা যখন বলছেন—হাঁ কর তুমি, দেখি মাটি খেয়েছ কিনা । তখন কৃষ্ণ বলছেন—না, না, আমি মাটি খাই নি । সখারা বলছে—তুমি মাটি খেয়েছ । তখন বললেন,—সখারা সব

মিথ্যাবাদী। এরা সব তোমার কাছে মার খাওয়াবে বলে নালিশ করছে আমার বিরুদ্ধে। সত্যি বলছি মা, আমি মাটি খাইনি। কিন্তু অনেক মাটি খেয়েছে। সখাদেরও মিথ্যাবাদী বানিয়ে দিচ্ছে। তখন সখারা দাউজীকে ধরেছে। বলদেবের এক নাম দাউজী। দাউজী অর্থে দাদা। দেখতো দাদা আমাদের সব মিথ্যাবাদী বানিয়ে দিচ্ছে। যশোদা মা যখন দাউজীকে জিজ্ঞাসা করেছে, হাঁারে বলাই, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে? বলদেব বললেন,—হ্যাঁ মা, অনেক মাটি খেয়েছে, কেন খেয়েছে তা বলতে পারব না। বলাই যখন সাক্ষী দিয়েছে তখন আর রেহাই নেই। যশোদা মা তখন লাঠি নিয়ে এসেছে মারবে বলে। কৃষ্ণ বলছেন,—আমাকে মেরো না, আমি মাটি খাইনি। আমি মাটি খেলে আমার মুখে লেগে থাকবে ভ'। এই দেখ, আমার মুখে মাটি লেগে আছে কি না। এই বলে মুখ হাঁ করে ভেলকি, ভোজবাজী দেখিয়ে দিল। তাতে মা একেবারে চুপ। গোটা ব্রহ্মাণ্ড তাঁর মুখের মধ্যে, এমন কি, মা যশোদাও তাঁর মুখের মধ্যে। তখন মায়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। আজ আবার আগুন খাব, তোমরা মাকে গিয়ে আবার বলবে। হবে না তা, আমি দেখতে দেব না।

সব চোখ বন্ধ কর। তখন সখারা একেবারে হাতজোড় করে জড়সড়। ব্যাস, এবার চোখ খোল। ততক্ষণে সব কাজ শেষ, দাবাগ্নি পান হয়ে গেছে। চোখ খুলে দেখে তারা যে ভাগীরবনে বসে খেলছিল, সেখানেই সব বসে আছে। আর গাভী, গোবৎসগুলো তাদের পাশে ঘুমোচ্ছে। ভগবানের ঐশী লীলা। এক একদিনের গোচারণের যে রাস্তা, তার হিসাব ভাগবতে দেওয়া আছে ২৫ থেকে ৫০ মাইল রাস্তা। কোন সাধারণ ছেলেরা পারে ২৫ থেকে ৫০ মাইল রাস্তা গিয়ে গোচারণ করতে! ভগবানের যোগমায়াশক্তির দ্বারা এসব অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে। মানুষ বুঝবে কি?

ভগবান্ ওখানে কিছু ঐশ্বরিক ক্ষমতা দেখিয়েছেন। সেটা বিচার করেছেন টীকাকারগণ। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এর ভিতরে আমরা সব খেতে পারি, কিন্তু আগুন খেতে পারি না। ভগবান্ দাবাগ্নি পান করে দেখালেন যে আমার বিশেষ কিছু ক্ষমতা আছে, সেটা তোমাদের কারও নেই। সব জিনিষটা শরণাগতির পরে নির্ভর করছে। সখারা সব কান্নাকাটি করছে—আমাদের বাঁচাও, বাঁচাও। আমাদের আর কেউ নেই, রক্ষাকর্তা বলে তোমাকেই জানি—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। কিছু ভুল করে ফেলেছি বলে ত' তুমি আসনি, কিন্তু তুমি ত' বাঁচাও।

তব পাদপদ্ম নাথ রক্ষিবে আমারে।

আর রক্ষাকর্তা নাই এ ভব-সংসারে ॥

ঠিক এইরকম Submission যখন দিয়েছেন, তখনই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে, আর থাকতে পারেননি ভগবান্। সখারা রক্ষা পেয়ে গেল। তারপরে সখারা পরস্পর কি বলছে?—বলছে আমরা সব মরিনি। কেন মরিনি বল ত’? —আমরা অমর কৃষ্ণের সখা, সেজন্তু মরিনি। যদি কৃষ্ণের সখা না হতাম তাহলে মরে যেতাম। যেহেতু আমরা অমর কৃষ্ণের সখা সেহেতু মরিনি। এ আলোচনা সখারা পরস্পর করছে। এখানে কি তাদের দাস্তিকতা প্রকাশ পেয়েছে? —না, তা নয়, এখানেও আনুগত্য আছে। শুধু আনুগত্য নয়, একটা তত্ত্ব-দর্শন, একটা বিচারও আছে। কি বিচার? —“নাদেবো দেবমর্চয়েৎ।”—দৈবীগুণ লাভ না করে কেউ পূজার্চন করতে পারে না। “দেবং ভূত্বা দেবং যজ্ঞেৎ।”—দৈবীভাব লাভ করে তুমি দেবতার পূজার্চন সেবা কর।

ভূতশুদ্ধি বলে একটা জিনিষ আছে অর্চনের ব্যাপারে। সেই ভূতশুদ্ধির ব্যাপারটা এর মধ্যে আছে। এটা কোন দাস্তিকতা নয়, অহঙ্কার নয়। ভগবান্ময় চিন্তা করা—আমি ভগবানের, ভগবান আমার—এই ভাবটা। শুদ্ধ চিন্তাবের উদয়, আত্মস্বভাবের উদয় হল ভূতশুদ্ধি। ভূতশুদ্ধি অণু কিছু নয়, আমি ভগবানের, ভগবান্ আমার—এই ভাব। জড়বদ্ধ-দশায় আমরা কি করি?—সবসময় আমি আমার, আমি আমার এই করি। দশরকমের নামাপরাধ আছে। তার মধ্যে সব থেকে বড় নামাপরাধ হল অহংমমবুদ্ধি। শুধু কেবল আমি আমার; আমি আমার, আমার; আমার এই করছি। কখনও ভাবতে পারছি না—হে ভগবান্! সব তোমার—আমিও তোমার; তুমিও আমার। কিন্তু পদকর্তা বলছেন,—

“আমি ত’ তোমার, তুমি ত’ আমার, কি কাজ অপর ধনে।”

বিচারের কথা। এটা শুদ্ধ শরণাগতি, শুদ্ধ আত্মসমর্পণ। যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবান্কে আমার নিজের না করতে পারছি, ভগবান্ আমাকে নিজের না করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ত’ আমার বিপদ, মুশ্কিল। অতএব ভাবটা রাখতে হবে। কোনক্রমেই আমরা যেন দাস্তিক হয়ে না যাই, অহঙ্কারী হয়ে না যাই। দস্ত, দর্প, অহঙ্কার, অভিমান পেয়ে বসে আমাদের সবসময়। এতে ভাল কিছু হচ্ছে না আমাদের।

আনুগত্যের ধর্ম হল বৈষ্ণবধর্ম। বিশেষ করে গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের যে বিচার তা শুধুই আনুগত্যময় জীবন। আনুগত্য বাদ দিলে চলবে না। বৈষ্ণবের আনুগত্য, গুরুর আনুগত্য দরকার। আনুগত্য যখনই ছেড়ে দিলাম তখনই সব চলে গেল আমার। আর যতক্ষণ আনুগত্যে আছি, ততক্ষণ পর্যন্ত Line ঠিক আছে। গুরু-বৈষ্ণবে আনুগত্য রেখে কেউ মহান্ হয়েছেন, আনুগত্য

ছেড়ে দিলেন মাঝখানে, তাহলে কি হবে ?—যতদিন পর্য্যন্ত তিনি গুরু-বৈষ্ণবে আত্মগত্য করেছেন, ততদিন তিনি গ্রহণযোগ্য। যখন আত্মগত্য ছেড়ে দিলেন, তখন আর তাঁর বিচার গ্রহণ করা যাবে না—এ বিচারটাও দেখানো আছে।

একজন লোক উন্নতাদিকারী ব্যক্তি, যতদিন গুরু-বৈষ্ণবের আত্মগত্যে লেখালেখি করেছেন, ততদিন মান্য করা হয়েছে। আত্মগত্য ছেড়ে দিলেন, তাঁকে আর মানা হবে না। কেন ?—তিনি উন্টোপথে যাচ্ছেন, বৈষ্ণব-বিরোধ করছেন, গুরু-বৈষ্ণবের আত্মগত্য অস্বীকার করছেন। মুস্কিল ত' ! গৌড়ীয় মিশনের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাগুলো আসছে। পরবর্ত্তিকালে তাঁদের লেখাগুলো আর মানা হয়নি, হচ্ছে না, হবে না। এটা আইনতঃ হতে পারে না। কারণ, বিচারগুলো ত' উন্টো নিয়েছেন। যখনই পূর্ব পূর্ব গুরুবর্গের আত্মগত্য ছেড়ে দেবে, গোস্বামিবর্গের আত্মগত্য ছেড়ে দেবে, শাস্ত্রের আত্মগত্য ছেড়ে দেবে, তখনই সে ভুল করতে থাকবে, উন্টোপাণ্টা লিখতে থাকবে, উন্টোপাণ্টা করতে থাকবে।

'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব' গ্রন্থখানা জগদগুরু শ্রীশ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ একজনকে দিয়ে লেখালেন। সেই ভদ্রলোক যখন গুরু-বৈষ্ণবের আত্মগত্য ছেড়ে দিয়ে জাতি-গোস্বামিগণের আত্মগত্য করতে লাগলেন, তখন প্রভুপাদ তিনখানা বই লিখলেন ঐ গ্রন্থখানার প্রতিবাদ করতে। তিনখানা গ্রন্থ হল—গৌড়ীয়ার তিনঠাকুর, গৌড়ীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য ও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদকে বাদ বলা হয় না, সিদ্ধান্ত বলা হয়। কিন্তু নাম হল অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। এই তিনখানা বই লিখে গুরুর ঋণ পরিশোধ করলেন। 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব'-বইটিতে যে theory গুলো তিনি লিখেছেন তা তিনি ত' নিজে লিখতে পারেন নি, তাঁর গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে তিনি লিখেছেন। তিনি (শ্রীল প্রভুপাদ) আবার তার প্রতিবাদ করেছেন, অতএব এতে তাঁর গুরুঋণ শোধ হয়েছে। আশ্চর্য্য ব্যাপার ! উদাহরণের ত' অভাব নেই, বহু উদাহরণ আছে। অতএব সব বুঝে-সুঝে চলতে হবে আমাদের—আমরা যেন গুরুপরোধ না করি, বৈষ্ণবপরোধ না করি।

হরৌ রুষ্টে গুরুম্বাতা, গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।

তস্ম্যাং সৰ্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥

এখানে চৈতন্যগুরু, দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু, ভজনশিক্ষাগুরু সবাই আছেন। কোন গুরুকে অস্বীকার করা যাবে না তত্ত্বদর্শন যখন আছে। সুতরাং সব বুঝে-সুঝে আমাদের চলতে হবে।

“অপরাধী বালকের বন্ধন-সময়ে সেই বন্ধন-রজ্জু দুই অঙ্গুলি পরিমাণ হ্রস্ব (ছোট) হওয়ায় যশোদা-মাতা তার সঙ্গে অণু রজ্জু যোগ করলেন। সেই রজ্জুও দুই অঙ্গুলি হ্রস্ব (কম) পড়ল। এরূপে যত রজ্জু গ্রহণ করছিলেন, সে-সমস্তই দুই অঙ্গুলি পরিমাণে কম হতে লাগল। এরূপে নিজ-গৃহের সমস্ত রজ্জু গ্রহণ করেও মা যশোদা তাঁকে বন্ধন করতে পারলেন না। তখন গোপীগণ হাসতে লাগলেন এবং যশোদা মাও হাসতে হাসতে বিস্ময়াপন্ন হলেন।”

কি ব্যাপার! ছেলেকে বাঁধা যাচ্ছে না কেন! যশোদাদেবী তখন বিস্মিত হলেন। কিন্তু ভগবান্ তখন বিশ্বস্তর মূর্তি ধারণ করেছেন। তিনি দেখাচ্ছেন—আমি যদি বাঁধা পড়ি তবে আমাকে বাঁধতে পার তোমরা। সেটা আমার ইচ্ছাধীন। সেজন্য তিনি ধরা দিচ্ছেন না। শিক্ষা এখানে—মা যশোদার কোন প্রাকৃত অহঙ্কার নেই, কিন্তু আমাদের যে প্রাকৃত অহঙ্কার আছে, সেই অহমিকা যাতে না আসে। সেই অহঙ্কার, দাস্তিকতা যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ ভগবান্ ঠিক ঠিক ভাবে আমাদের কৃপা করেন না।

ভগবানের করুণা দু'রকম। একটা হল সকপট করুণা, আর একটা হল নিষ্কপট করুণা। সকপট করুণায় তিনি কাকেও প্রেমধন দেন না, নিষ্কপট করুণায় তাঁর সেবা লাভ হয়। শাস্ত্রে এটা বুঝানো আছে।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া।

কতু ভক্তিধন না দেন, রাখেন লুকাইয়া ॥

এর মধ্যে সকপট করুণার কথা আছে কিছু। নিষ্কপট করুণা হয় কখন? —যখন ভক্তের পরীক্ষা শেষ হয়, ধৈর্য্য-স্বৈর্য্যের পরীক্ষায় যখন উত্তীর্ণ হয় তখন কৃষ্ণ নিজে বলছেন,—

আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।

স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব।

এটা হল নিষ্কপট করুণা। গোপীগণ হাস্ত করছেন মা যশোদা বাঁধতে পারেন নি কৃষ্ণকে। মা যশোদাও হাস্ত করছেন তাদের সঙ্গে। কিন্তু আমার ছেলেকে আমি বাঁধতে পারছি না কেন? যত রশি আনছি আর জোড়া দিচ্ছি প্রত্যেকবারে দু' অঙ্গুল করে কম পড়ছে, কি ব্যাপার! কি ভোজবাজী! সত্যই সেখানে কৃষ্ণ বিশ্বস্তর মূর্তি ধারণ করেছেন। তাঁকে বাঁধতে পারা যাবে না যদি তিনি ধরা না দেন। মা যশোদাকে দিয়ে ভগবান্ কৃষ্ণ—সর্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছেন। তোমাদের যেন কখনও এরকম অহঙ্কার না আসে, আমি তোমাদের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আছি। “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্ৰাপ্য

মনসা সহ”—বাক্য-মনের অগোচর তত্ত্ব হলেন ভগবান্, কি করে তাঁকে জানব, কি করে তাঁকে বুঝব? তাঁকে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে পাব কি করে?—কাতর ক্রন্দন, প্রার্থনা ও আত্মগত্যা চাই।

বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।

এ হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয় ॥

সেখানে দেখছি **Recomendation**—আবেদন, নিবেদন এর দরকার হচ্ছে। তাঁদের **Recomendation** না নিলে ভগবানের কাছে যাওয়ার সামর্থ্য নেই। ভগবান্ যে দয়া, মায়া নিয়ে বসে আছেন সেটা পেতে গেলে গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপা, করুণা দরকার, তাঁদের **Recomendation** দরকার। তা না হলে ভগবান্ দেখছেন না।

ধ্রুব কঠোর তপস্যা করছেন মথুরার মধুবনে। কৃষ্ণ সর্বভূতান্তর্যামী, নিখিল ভূতান্তর্যামী। জগতের কোন্ কোণায় তাঁর ভক্ত কিভাবে সাধন-ভজন করছেন তা সব তাঁর **Screen**-এ ধরা পড়ছে। নারদঋষি সর্বত্র ভগবানের গুণগান করে বেড়াচ্ছেন। কিছুদিনের জুতা তিনি আটকে ছিলেন দক্ষ প্রজাপতির কাছে। তারপর সেখান থেকে কৌশল করে তিনি ছুটি পেয়ে গেলেন। সেটাকে তিনি ভাল বলে মানলেন এবং ভগবানের বিশেষ করুণা হয়েছে আমার পরে সেটাও মেনে নিলেন তিনি। দক্ষ প্রজাপতি নারদঋষির সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন, সে ব্যবহার কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, অত্যন্ত অশালীন। তাঁকে প্রথমে বলেছেন যে, আমার ছেলেদের লেখাপড়া হচ্ছে না, আপনি এদের লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব নেন। তিনি বললেন, আমি কি করি তা ত' আপনি জানেন—আমি জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্বত্র ভগবানের গুণগান করে বেড়াই। এই ত' আমার **Duty** বেছে নিয়েছি। তা আপনি যখন বলছেন আপনার ছেলেদের **Private tutor** গিরি করতে হবে আমাকে, আমার কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে তা আমি বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, যদি লোকের কিছু উপকার হয়, তাহলে না হয় একটু ত্যাগ স্বীকার করি। রাজী হলেন। কিন্তু নারদ ঋষি যে শিক্ষায় শিক্ষিত, যে দীক্ষায় দীক্ষিত তাছাড়া অণু কিছু কাকেও ত' শেখাবেন না। ভক্তিমার্গের সব লোকগুলো নারদঋষির বশব্দ। ধর্মসম্প্রদায়ের যত লোক আছেন সকলে তাঁকে পূর্বগুরু বলে মেনে নিয়েছেন। এমন কি, শুধু ভক্তিবাদী নয়, জ্ঞানবাদী, কর্মবাদী ধারা আছেন, তাঁরাও নারদঋষিকে পূর্বগুরু বলে মেনে নিয়েছেন। নারদঋষি দক্ষ প্রজাপতির অহরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি তাদেরকে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, ভাগবতাদি সমস্ত গ্রন্থ পড়াতে

লাগলেন। কিছুদিন পরে যখন শিক্ষা সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে তখন ছেলেগুলো সব সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে দক্ষপ্রজাপতির হাজার হাজার ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাচ্ছে।

তখন দক্ষ প্রজাপতি বললেন,—আমি প্রজাসৃষ্টির জন্তু আদিষ্ট হয়েছি, আর এই হাজার হাজার ছেলে আমার সব বেরিয়ে যাচ্ছে! নারদঋষি, তোমার এই **Private tutor** গিরি আর চলবে না। খুব রাগ করেছেন, হেসে হেসে কথা বলছেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে খুব রাগ। আমার সব ছেলেকে সাধু করে দিচ্ছি—যা আজকালকার সমাজে চলছে। কোন গৃহস্থের ছেলে যদি সাধু হয়ে যায় এক আধজন, তাহলে বড় আপত্তি। কিন্তু **Central Govt.** যখন বলবেন—প্রত্যেক গৃহস্থের ঘর থেকে একজন ছেলে (সৈনিক) দরকার, তখন কিন্তু ছেলেকে দিতে হবে। আর সাধু-সন্ন্যাসীদের মঠ-মন্দির চলবে এজন্ত বড় আপত্তি। একটা ছেলে যদি চলে যায় তাহলে মঠের বিরুদ্ধে **Case** করে তাকে ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু সে ছেলে থাকতে পারে না বাড়ীতে, আবার বেরিয়ে যায়, সুবিধা হয় না কিছু তাতে। তথাপি এরকম প্রচেষ্টা রয়েছে।

দক্ষ প্রজাপতির কাজ কি?—সংসারের শ্রীবৃদ্ধি। কোন্ সংসার?—নাস্তিক্য সংসার, ভজনবিরোধী সংসার। সেই সংসারে জনবৃদ্ধি। দক্ষ প্রজাপতি সন্তুষ্ট হতে না পেলে নারদঋষিকে অভিসম্পাত দিয়ে দিলেন—তুমি এক-জায়গায় বসে কাকেও শাস্ত্রোপদেশ করতে পারবে না। নারদঋষি হয়ত' ওরকম একটা চাচ্ছিলেন, তিনি ঐ অবস্থা পেয়ে খুব খুশী। তিনি বললেন,—বা! আমি যে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম, অভিসম্পাত পেয়ে আমার সেই প্রতিজ্ঞা **Successful** হল। ইচ্ছা করলে তিনিও দক্ষ প্রজাপতিকে অভিসম্পাত দিতে পারতেন, কিন্তু দেননি। এগুলো শাস্ত্রের উদাহরণ।

কৈলাসে শিব-শিবানী বসে আছেন। সেখানে গেছেন শিবের পরমবন্ধু চিত্রকেতু মহারাজ। তিনি শিব-শিবানীকে দেখে একটু ঠাট্টা করেছেন। দেবীকে কিছু বলেন নি, বলেছেন শিবঠাকুরকে। দেবীর গায়ে লেগে গেল, সঙ্গে সঙ্গে অভিসম্পাত দিলেন—যাও, তুমি অশ্বরকুলে জন্মগ্রহণ কর। তিনিও শিবঠাকুরের বন্ধু, যে সে ব্যক্তি নন, তিনি পাণ্টা অভিসম্পাত দিতে পারতেন দেবীকে। কিন্তু মর্যাদা রক্ষা করলেন। ঠিক আছে, দেবীর সম্মান থাকুক, আমি অশ্বরকুলে যাই। অশ্বর হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর যথেষ্ট ক্ষমতা থাকলেও তিনি অপপ্রয়োগ করেন নি, সদ্ব্যবহার করেছেন, বৈষ্ণবতা দেখিয়েছেন।

নারদঋষিরও ঐ অবস্থা। যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি তিনি, ইচ্ছা করলে দক্ষ প্রজাপতিকে পাণ্টা অভিশাপ দিতে পারতেন। কিন্তু দেননি যেহেতু তিনি বৈষ্ণব। তাঁর বৈষ্ণবধর্ম রক্ষা করেছেন তিনি। বরং আনন্দিত হলেন। আমি ত' সবসময় ভগবানের নাম করছিলাম—এই ত' আমার প্রতিজ্ঞা। মাঝখানে থানিকটা আটকে গেছিলাম, ওদের পড়াতে যে সময় গেছে ঐ সময়টা আমি নাম করতে পারছিলাম না। ছুটি পেয়ে গেছেন। কখনও কখনও তাঁর একান্তভাবে এক জায়গায় বসে ভগবানের নামকীর্তন করতে ইচ্ছা হত, কিন্তু দক্ষ প্রজাপতি অভিসম্পাৎ দিয়েছেন। তাঁর এই অভিসম্পাৎ জগতের সর্বত্র কার্যকরী হবে, কিন্তু একটা জায়গায় কার্যকরী হয় না। সেটা হল ভগবানের লীলাভূমি দ্বারকা। সেজগু উনি মাঝে মাঝে দ্বারকায় গিয়ে নামভজন করতেন। কারণটা এই ব্যাখ্যা করা আছে।

একটু নিরালস্য, নিভৃত্তে তিনি ভগবানের লীলা দর্শন করতে দ্বারকাতে যান। ভগবান্ সেখানে বিভিন্নভাবে লীলা করছেন। ষোড়শ সহস্র মহিষীর ঘর। একজায়গায় গিয়ে দেখছেন ভগবান্ স্নান করছেন, একইসঙ্গে আর এক জায়গায় গিয়ে দেখছেন তিনি খেতে বসেছেন। আবার এক জায়গায় গিয়ে তিনি দেখছেন ভগবান্ গুয়ে পড়েছেন। আবার কোথাও কথোপকথন করছেন। সেই লীলা দর্শন করছেন আর অবাক হচ্ছেন নারদঋষি। ভগবান্ তোমার এই লীলা দর্শন করার জগু আমি এখানে এসেছি, এখানে দক্ষ প্রজাপতির অভিসম্পাৎ প্রবেশ করতে পারবে না। নারদঋষি তা জানেন। সেজগু ঐখানে গিয়ে তিনি ভগবানের আরাধনায় তৎপর আছেন। (ক্রমশঃ)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানানো হইতেছে যে, শ্রীপত্রিকার আজীবন সদস্য গ্রহণ করা হইতেছে। যাহারা আজীবন সদস্য হইতে ইচ্ছুক তাহারা ১০০১'০০ (এক হাজার এক) টাকা এককালীন বা এক বৎসরে চারিটা সমান কিস্তিতে দিয়া সদস্য হইতে পারেন। এ ব্যাপারে কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত যোগাযোগ করুন। বিনীত নিবেদক—

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব বিশেষভাবে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ‘শ্রীব্যাসপূজা’ অর্থে শ্রীব্যাসদেবের পূজাকেই লক্ষ্য করে। জ্যামিতি-মতে ‘ব্যাস’ অর্থে পরিধিদ্বারা সীমাবদ্ধ কেন্দ্রে অবস্থিত সরলরেখাকে বুঝায়। একরূপ সরলরেখা অসংখ্য হইতে পারে; কিন্তু অসংখ্য হইলেও প্রত্যেকটিরই একই ধর্ম। সেইরূপ ব্যাস বহু হইলেও প্রত্যেকেই মূলতঃ একই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। গোলোক-মধ্যস্থিত কেন্দ্রকেই কৃষ্ণ কহে। তাহাতে সন্নিহিত রেখাস্বরূপ শক্তিই শ্রীব্যাস। তাঁহাকে কখনও অংশ, কখনও শক্তিরূপে গণ্য করা হয়। বেদাদি-বিভাগ কার্য্যদ্বারা বদ্ধজীবকে কৃষ্ণসম্বন্ধ স্মরণ করাইয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করাই শ্রীব্যাসের কার্য্য। ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুদেবও তাহাই প্রধানরূপে পরিদৃষ্ট হয়। একারণে শ্রীগুরুদেবই শ্রীব্যাসদেব, শ্রীব্যাসদেবই শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীগুরুপূজাই শ্রীব্যাসপূজা। শ্রীভগবানের শত্ৰ্য্যাবেশাবতার শ্রীব্যাসদেবের মনোহীভীষ্ট পূরণ করা শ্রীগুরুদেবের অন্যতম প্রধান কার্য্য বলিয়া গুরুপূজার নামান্তরই—“শ্রীব্যাসপূজা”।

প্রথমন্ত গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চনম্।

কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হুত্বা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

“প্রথমতঃ গুরুপূজা করিয়া অনন্তর আমার পূজা করিলেই সিদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইয়া থাকে। অন্যথায় অর্থাৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রমে পূজা নিষ্ফল হয়।” জগদগুরু শ্রীশ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—“জগতে যতপ্রকার পূজ্যবস্তুর পূজা আছে সকল পূজা অপেক্ষা ভগবানের পূজা সর্বোত্তম, আর সেই সর্বোত্তম পূজ্যের পূজকের পূজা আরও অধিক বড়। সেই পূজককে ভগবান্ পূজা করিয়া থাকেন। সর্বোপেক্ষা পূজা—শ্রীভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র—প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত; সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যার পূজা করে থাকেন, তাঁর পূজা নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড়।” ভবভয়ত্রাতা শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিকে কেন্দ্র করিয়া ভক্তগণ হৃদয়গুহায় অন্তর্নিহিত মায়াচ্ছাদিত কল্মষসমূহকে বিনাশপূর্ব্বক পরম প্রয়োজন—কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবার জন্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য—শ্রীব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ানুগত ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের ৭৬তম শুভাবির্ভাব-তিথি তাঁহার সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে শ্রীসমিতির পরিচালিত

অগ্রতম প্রচারকেন্দ্র শিলিগুড়ি-সহরস্থ (মিলনপল্লী) শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে গত ১৮ই পৌষ ১৪০৩, (ইং ৩।১।২৭) শুক্রবার মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। এই ব্যাসপূজা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান-সূচী দৈনিক “উত্তরবঙ্গ সংবাদ” পত্রিকায় ১।১।২৮ তারিখে প্রকাশিত হয়।

শ্রীব্যাসপূজার পূর্বদিবস শ্রীমঠ ও মন্দির বিচিত্র বর্ণের রঙিন পতাকা, পুষ্প, আম্রপল্লব, পূর্ণকলসসহ কদম্বীবৃক্ষ ও বৈদ্যুতিক বাতির সাহায্যে সুসজ্জিত করা হয়। শ্রীমঠের সম্মুখস্থ রাজপথের দুই প্রান্তে দুইটি প্রবেশ-তোরণও তৈরী করা হয়। সবকিছু মিলিয়ে মঠপ্রাঙ্গণ যেন কোন এক বিশেষ চিরকাজিতের সাদর অভিনন্দন জানাইবার জন্ত প্রস্তুত। শ্রীল গুরুপাদপদের শুভাবির্ভাব-তিথির সম্মান জ্ঞাপনার্থে বাংলা, বিহার, আনাম, মেঘালয়, শিলং, শিলচর, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি স্থান হইতে তদন্তগামী ভক্তগণ শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া এই মহোৎসবকে প্রাণবন্ত ও সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তোলেন। এই উৎসবে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমন্তুক্তিশরণ সাধু মহারাজ, শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমন্তুক্তিবোন্ত মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ, শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ প্রভৃতি ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ব-প্রচারিত অনুষ্ঠান-সূচী অনুযায়ী ১৭ই পৌষ (ইং ২।১।২৭), বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় সুসজ্জিত গাড়ীতে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীগুরুবর্ণের অর্চালেখ্য লইয়া শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল, করতাল ও ব্যাণ্ড সহযোগে এক বিশাল বর্ণাঢ্য নগর-সঙ্কীর্্তন শোভাযাত্রা শিলিগুড়ি-সহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীব্যাসপূজার অধিবাসান্তে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ ও শ্রীরঘুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী।

১৮ই পৌষ (ইং ৩।১।২৭), শুক্রবার অর্থাৎ ব্যাসপূজা-দিবসে ব্রাহ্মমুহুর্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরান্দ-গান্ধার্বিকা-গিরিধারীজীউ ও শ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের মঙ্গলারতি ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমাস্তে শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ নাট্যমন্দিরে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের সংগৃহীত, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত “শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ” অনুসারে পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরুপঞ্চক ও তত্ত্বপঞ্চকের পূজা-হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। অনন্তর শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্য তাঁহার পূর্ব গুরুবর্ণের শ্রীপাদপদ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরে ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্যে হৃদয়ের আর্তিপূর্ণ পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন।

পুষ্পাঞ্জলি প্রদানান্তে শ্রীমন্দিরে ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পন্ন হয়। অতঃপর জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে আহুত, অনাহুত, রবাহুত ত্রিসহস্রাধিক ভক্তকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় আয়োজিত ধর্মসভায় ব্রহ্মচারিগণ স্থূললিতকণ্ঠে শ্রীগুরুবন্দনা, বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্তন করেন। কীর্তনান্তে শ্রীল আচার্যাদেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলে পর বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীগুরুপূজা-বাসরে নিবেদিত পুষ্পাঞ্জলি, শ্রদ্ধাঞ্জলিসমূহ পাঠ করা হয়। অতঃপর “শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীবাসতত্ত্ব” সম্বন্ধে শ্রীমদ্বক্তিশরণ সাধু মহারাজ, শ্রীমদ্বক্তিব্যাস বেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্বক্তিব্যাস ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্বক্তিব্যাস মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমদ্বক্তিব্যাস যতি মহারাজ, শ্রীমদ্বক্তিব্যাস বোধায়ন মহারাজ, শ্রীমদ্বক্তিব্যাস গোবিন্দ মহারাজের বক্তৃতার পর শ্রীল সভাপতি মহারাজ তাঁহার স্বভাব-স্থূলত অম্বয়ব্যতিরেকমুখে ভাবগম্ভীর তত্ত্বনিকান্তপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে মুখবন্ধে তিনি জানান,—

“গতকাল এবং আজ প্রায় সারাদিন কারও জন্মতিথি উপলক্ষে বহু কথা আলোচনা হচ্ছে। এই আলোচনা যদি ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর হয়ে থাকে তাহলে আমি মনে করব এই গুণগান, মহিমা সবই আমার গুরুপাদপদ্মের এবং পরমগুরু, পরাংপর গুরু, পরমেষ্টী গুরু ও পূর্বতন সকল গুরুবর্গেরই প্রাপ্য। এই জিনিস হজম করার ক্ষমতা আমার নেই। তথাপি বৈষ্ণবগণ তাঁরা স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করে তাঁদের কর্তব্য সমাপন করেছেন। আজ এই আনন্দের দিনে আমার ভিতরে একটা বিষয়ে খুব দুঃখ অনুভব হচ্ছে—আমাদের শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ভূতপূর্ব সম্পাদক—মদীয় জ্যেষ্ঠ সতীর্থ ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্বক্তিব্যাস ত্রিবিক্রম মহারাজ আজ আমার পাশে নেই। এবং আরও দুঃখ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সাধারণ-সম্পাদক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্বক্তিব্যাস নারায়ণ মহারাজ তিনিও আজ আমার পাশে নেই। তিনি এই দিনে বিশেষ অসুস্থ হয়ে দিল্লীর হাসপাতালে রয়েছেন। আমি উভয়েরই শুভ স্বাস্থ্য কামনা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—ভগবান্ তাঁদের শীঘ্রই সুস্থ করে তুলুন এবং তাঁরা বহুদিন ধরে জগতে শ্রীমহাপ্রভুর প্রেমধর্মের বাণী প্রচার করুন। এই আশা শুধু আমি নই, আমরা এখানে উপস্থিত সকলেই এই আশা করব।”

১৯১২৭ তাং অর্থাৎ তৃতীয় দিবসের অনুষ্ঠিত সভায় “শ্রীগুরু-পরম্পরা ও সম্প্রদায়-প্রণালী” সম্পর্কে ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্বক্তিব্যাস যতি মহারাজ, শ্রীমদ্বক্তিব্যাস বোধায়ন মহারাজ, শ্রীনিবুজবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী,

শ্রীজগদীশদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর সভাপতির ভাষণে শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীগুরু-পরম্পরা ও সম্প্রদায়-প্রণালীর বিভিন্ন জটিল প্রশ্নের সমাধান ও গৃঢ় রহস্য উদ্ঘাটনপূর্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বীকৃত শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কোনও সম্প্রদায়ানুগত সঙ্গুকের আশ্রয়ে ও আনুগত্যে হরিভজনই শ্রেয়ঃ এবং অবশ্য কর্তব্য, তাহা আলোচনা করেন।

তিনদিনের অনুষ্ঠান-সূচী থাকা সত্ত্বেও চতুর্থদিনে অর্থাৎ ৫।১।২৭ তারিখেও যথারীতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপরে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীস্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী “শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীগুরুর মহিমা-মাহাত্ম্য” বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীমৎ যতি মহারাজ অস্মদীয় গুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্য জীবনী ও মঠবাসী জীবনে তাঁহার সেবানিষ্ঠার বিভিন্ন দিক উল্লেখপূর্বক বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রোতৃবৃন্দের তথা আমাদের কাছে কিভাবে গুরু-বৈষ্ণব সেবার দ্বারা ভগবৎকৃপা, সাধন-ভজন ও ভগবৎ-প্রাপ্তি সম্ভব, তাহা জানান। পরিশেষে মহাজন-পদাবলী কীর্তনদ্বারা উৎসবের সমাপ্তি হয়।

এই শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসবে শ্রীসমিতির সেবকবৃন্দের সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভগবান্ তাঁহাদের শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় উত্তরোত্তর প্রেরণা দান করুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা। শ্রীসমিতির মূলকেন্দ্র ও বিভিন্ন শাখামঠ হইতে বৈষ্ণবগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করায় ইহা সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে

শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-বিরচিত

মাধুর্য্য কাদম্বিনী

[ব্যাখ্যামূলক-বঙ্গানুবাদ-সহ]

আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়ত:

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরভক্ত-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(রেজিষ্টার্ড)

এস্-টি-ডি : ০৩৪৭২ * ফোন : ৪০০৬৮

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;

জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ) ।

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তস্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাশীর্বাদে ও সমিতির বর্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদিবস্বামী শ্রীশ্রীমন্তস্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আহুগতো উপরিউক্ত ঠিকানায় আগামী ৫ই চৈত্র ১৪০৩ (ইং ১৯৩৯), বুধবার হইতে ১১ই চৈত্র (ইং ২৫৩৯), মঙ্গলবার পর্য্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ-বিভরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত নয়টী (৯টী) দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান মাহাত্ম্যকীর্তন এবং নগর-সঙ্কীর্তনমুখে যোলকোশ শ্রীধাম-পরিক্রমা হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুভভক্ত্যানুষ্ঠানে সবাঙ্কবে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী স্বকৃতি অজ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাজ মহাশয়ভুর জন্মোৎসব এবং শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—২রা পৌষ, ১৪০৩

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সত্যেন্দ্র,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে সমিতির 'সাধারণ-সম্পাদক'-এ'র নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জাতব্য বা প্রেরিতব্য।

শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ৫ই চৈত্র (ইং ১৯৩৯), বুধবার;—(১) শ্রীগৌরদ্বীপ (কীর্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, স্ববর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, নৃসিংহপল্লী; এবং (২) শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন। শ্রীএকাদশীর উপবাস।

২। ৬ই চৈত্র (ইং ২০৩৯), বৃহস্পতিবার;—(৩) শ্রীকোলদ্বীপ (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি; এবং (৪) শ্রীকান্তদ্বীপ (অর্চনাখ্য)—রাতুপুর। পূর্ববাহু ৮।১২ গতে ৯।৪৪ মধ্যে একাদশীর পারণ।

৩। ৭ই চৈত্র (ইং ২১৩৯), শুক্রবার;—(৫) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (সার্কভৌম ভট্টাচার্যের পাট); এবং (৬) শ্রীমোদক্রমদ্বীপ (দাসাখ্য)—মামগাছি (শ্রী বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ৮ই চৈত্র (ইং ২২৩৯), শনিবার;—(৭) শ্রীকুরুদ্বীপ (সখ্যাখ্য)—কুরুপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা; এবং (৮) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (প্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চড়, বেলপুকুর; অতঃপর শহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (প্রোচা-মায়াস্থান)।

৫। ৯ই চৈত্র (ইং ২৩৩৯), রবিবার;—(৯) শ্রীঅম্বুদ্বীপ (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচাধ্য-ভবন), জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারী গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্তন।

৬। ১০ই চৈত্র (ইং ২৪৩৯), সোমবার;—শ্রীগৌর-জন্মোৎসব।

৭। ১১ই চৈত্র (ইং ২৫৩৯), মঙ্গলবার;—সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)।

প্রত্যয় :—রাত্রিবাসে ইচ্ছুক যাত্রিগণ হাঙ্কা থালা ও ঘটি এবং মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন। ৪ঠা চৈত্র (ইং ১৮৩৯) মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন; এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্বেই কেহ মঠে আসিলে থাকার ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না।

বিঃ দ্রঃ—“শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট”-এর অনুকূলে প্রদত্ত যাবতীয় দান আশ্রয়-মুক্ত।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।
- ২। সাধারণ ডাকযোগে “শ্রীপত্রিকা” গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইলে বার্ষিক ভিক্ষা ৩০.০০ টাকা ও ষাণ্মাসিক ১৭.০০ টাকা এবং আজীবন সদস্যপক্ষে ১০০১.০০ টাকা অগ্রিম প্রেরিতব্য। ভারত ও বিদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রা দেয়। ভি.পি.তে লইতে হইলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহকগণের স্বীকার্য।
- ৩। যে কোনও সময়ে “শ্রীপত্রিকা”র গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হয়।
- ৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোস্টকার্ড বাঞ্ছনীয়।
- ৫। “শ্রীপত্রিকা”র কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।
- ৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি “শ্রীপত্রিকা”য় প্রকাশিত হইবে না। সং-আলোচনা সর্বদা আদরণীয়া।
- ৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে ‘কার্য্যাধ্যক্ষ’ অথবা ‘প্রকাশক’ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়, শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ; ২৮, হালদার বাগান লেন; কলিকাতা-৭০০ ০০৪ ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

- ১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম), ৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক, ৪। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ, ৫। মায়াবাদের জীবনী, ৬। শরণাগতি, ৭। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-রচিত, ৮। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ও পরিক্রমা-গ্রন্থাবলী, ৯। সংক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা, ১০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ১১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ১২। জৈবধর্ম (বাংলা ও হিন্দী), ১৩। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী, ১৪। শ্রীদামোদরাষ্টকম্, ১৫। অর্চন-দীপিকা, ১৬। শ্রীগৌরাঙ্গ, ১৭। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা, ১৮। শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা, ১৯। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, ২০। উদ্ধারের পথ, ২১। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, ২২। শ্রীমনঃশিক্ষা, ২৩। শ্রীউপদেশামৃতম্, ২৪। তত্ত্বমুক্তাবলী (যুক্তিমল্লিকাসহ), ২৫। শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী, ২৬। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য, ২৭। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-কণ্ঠহার, ২৮। Shri Chaitanya Mahaprabhu, ২৯। The Bhagavat, ৩০। Nam-Bhajan, ৩১। Life Story of Impersonalism (Mayavad) or Victory of Vaishnavism (Vaishnava Vijaya), ৩২। The Vedanta, ৩৩। Vaishnavism, ৩৪। Rai Ramananda। ৩৫। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব, ৩৬। প্রেম-প্রদীপ, ৩৭। শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্ররত্নমালা।

১৩/NC-281
শ্রীসমিতির পরিচালিত শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্রসমূহ

- ১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ — তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)।
- ২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ — চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী)।
- ৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ — কংসটীলা, মথুরা পোঃ (মথুরা), ইউ.পি.।
- ৪। শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ — দানগলি, বৃন্দাবন পোঃ (মথুরা) ইউ.পি.।
- ৫। শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ — রাণাপতঘাট, বৃন্দাবন পোঃ (মথুরা) ইউ.পি.।
- ৬। শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ — সন্ন্যাস রোড, কঙ্কাল পোঃ (হরিদ্বার) ইউ.পি.।
- ৭। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ — গৌরবাটসাহি, পুরী পোঃ (পুরী) উড়িষ্যা।
- ৮। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ — ২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪।
- ৯। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ — গোলকগঞ্জ পোঃ (ধুবড়ী) আসাম।
- ১০। শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ — অরবিন্দ লেন, পোঃ ও জেলা কোচবিহার।
- ১১। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র — বান্দিয়াহাট পোঃ (বালেশ্বর) উড়িষ্যা।
- ১২। শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ — শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ (জলপাইগুড়ি)।
- ১৩। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ ও পাদপীঠ — আশুতিয়াবাড় পোঃ (মেদিনীপুর)।
- ১৪। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ — সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ (বর্ধমান)।
- ১৫। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ — বাসুগাঁও পোঃ (কোকড়াবাড়) আসাম।
- ১৬। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ — তুরা পোঃ (ওয়েস্ট গারো হিলস) মেঘালয়।
- ১৭। শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ — মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি পোঃ (দার্জিলিং)।
- ১৮। শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠ — মাথাভাঙ্গা পোঃ (কোচবিহার)।
- ১৯। শ্রীকৃষ্ণভক্ত গৌড়ীয় মঠ — শ্রীচৈতন্য এ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৫ (বর্ধমান)।
- ২০। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ — রংপুর, শিলচর-২ (কাছাড়) আসাম।
- ২১। শ্রীদুর্বারাধ্বাষি গৌড়ীয় আশ্রম — ঈশাপুর, মাঠবন পোঃ (মথুরা) ইউ.পি.।
- ২২। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী — মণিপুর, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)।
- ২৩। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম — গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)।
- ২৪। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয় — দেয়ারাপাড়া রোড, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)।

To

BOOK POST

Sl. No.

From :-

SHRI GOUDIYA-PATRIKA OFFICE
SHRI BINODE BEHARI GOUDIYA MATH
28, Halder Bagan Lane
Calcutta-700 004

Ph: 555-8973